স্বপনবুড়ো রচনাবলী

স্বপনবুড়ো রচনাবলী

১ম খণ্ড

মুখবন্ধ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

অসিতাভ দাশ

পরিবেশনায়

প্রিয়া বুক হাউস

৬০, রাই মোহন ব্যানার্জী রোড,

কোলকাতা - ৭০০ ১০৮

সূচীপত্র

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

আজকের শিশু ও কিশোররা স্বপ্ন দেখতে হয়তো ভুলে গেছে। আমরা বড়রাই কেড়ে নিয়েছি ওদের স্বপ্ন। স্বপ্ন নেই বলে স্বপনবুড়ো নামেও কেউ আজ শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখেনা। একই নামের, কিংবা ছদ্মনামের লেখক যে নেই সেটাও রক্ষে। স্বপনবুড়ো এক এবং অদ্বিতীয়ই থেকে গেলেন।

এমনও হতে পারে, স্বপ্নের চেহারাটাই হয়তো এখন বদলে গেছে। পৃথিবীতে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন আর ক'জন দ্যাখে। তরুণের স্বপ্ন, সে তো ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। আজকের স্বপ্ন শুধু আত্মকেন্দ্রিক 'কেরিয়ার' গড়ে তোলার স্বপ্ন। পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষদের নিয়ে স্বপ্ন দেখার যে মন ও মানসিকতার প্রয়োজন, তা দ্রুত চারপাশ থেকে হারিয়ে গেছে।

তবু স্বপনবুড়ো আছেন এবং থাকবেন। অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সাঁকরাইল গ্রামের অখিলবন্ধু নিয়োগী কবে স্বপনবুড়ো হলেন, তা নিয়ে গবেষকরা চিন্তা ভাবনা করবেন। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই শিশু ও কিশোরদের স্বপ্ন দেখার সাহস দিতে পেরেছিলেন। নব্বই বছর বয়সে তিনি মারা যান। তার আগে লিখে গেছেন একশোটির বেশি নাটক, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, গল্প, উপন্যাস, অজস্র ছড়া ও কবিতা। 'শিশুসাথী' পত্রিকায় ছোটদের জন্য তিনি প্রথম লিখতে শুরু করেন। সে ছিল ধারাবাহিক এক উপন্যাস। নাম 'বেপরোয়া'। বেপরোয়া না হলে সত্যিই বোধহয় স্বপ্ন দেখা যায় না। সিটি কলেজ থেকে বিজ্ঞানে 'ইন্টারমিডিয়েট' পাশ করে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন সরকারি আর্ট কলেজে। ছবি এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শ্রীনিকেতন নিয়ে তথ্যচিত্র করেছেন, শিশু ও কিশোরদের নিয়ে তৈরী করেছেন সংগঠন। সেইসঙ্গে লিখেছেন অনেক, অনেক গান, আর 'বনপলাশীর ক্ষুদে ডাকাত', 'ব'থুইবাসা বোর্ডিং', 'শশী-শ্যামেলের সাঁকো'-র মতো উপন্যাস। যা কিছু করেছেন তার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে তাঁর শিল্পী-মনের পরিচয়।

শিশু ও কিশোরদের জন্য নিবেদিত প্রাণ এরকম মানুষ যথার্থই বিরল। চার বন্ধু মিলে তিনি পয়লা' নামে যে পত্রিকাটি বের করেছিলেন, সেই পত্রিকায় ছোটদের উদ্দেশে তিনিই প্রথম চিঠি লিখতেন। ওদের অনেকের সঙ্গেই ছিল তাঁর সরাসরি পরিচয়।

আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর লেখায় আছে মানবিক গুণ। 'স্বাধীনতা দিবসে' গল্পটির কথা মনে পড়ে। গল্পের শুরুতেও আছে স্বপ্ন। 'কাল সারারাত স্বপ্ন দেখেছে মুকুল। স্বাধীনতা দিবস কি করে পালন করবে, তাই নিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া কাটা-কাটা স্বপ্ন। ছেলের দলে কত আনন্দ উৎসব চলছে তারই কত রঙ বেরঙের মিষ্টি স্বপ্ন।'

কিন্তু স্বাধীনতা-দিবসের প্রভাত ফেরীতে মুকুল যোগ দিতে পারেনি। দলের নেতা হীরেনদা মারমুখো হয়ে তেড়ে এসেছিল। বলেছিল, "এই মুকুল, অসভ্যের মতো নোংরা পোষাক পরে মিছিলে ঢুকবি নে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখ।"

গল্পের শেষে বলা হয়েছে, 'স্বাধীনতা উৎসব কি শুধু কয়েকটি বাছাই করা লোকের জন্য? মুকুলরা কি চিরকাল আলো-ঘেরা প্যান্ডেল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

স্বপনবুড়োর স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দেশের স্বাধীনতার বয়সও হল পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশ বছরে দেশের চেহারাটাই বদলে দেওয়া যেত। কিন্তু যায়নি। স্বপনবুড়োর পৃথিবীর চেহারা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর মতো আবার কেউ কখনও যদি স্বপ্ন দেখেন, দেখাতে পারেন, 'রঙ-বেরঙের মিষ্টি স্বপ্ন', এখন শুধু তাঁরই অপেক্ষা।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের কথা

'স্বপনবুড়ো' নামটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে খুব বেশী পরিচিত না হলেও শিশু সাহিত্য জগতে তাঁর লেখনীর জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর আসল নাম অখিলবন্ধু নিয়োগী। তাঁর জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সাকরাইল গ্রামে। তাঁর জন্ম তারিখ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৯ই কার্তিক (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর), রবিবার। সাকরাইল গ্রামেই তাঁর মামা কবিরাজ যদুনাথ সেনগুপ্তের কাছে বালক অখিলবন্ধু মানুষ হয়েছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুরুমশাই তীর্থবাসী পণ্ডিতের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

বাকী জীবনটা কলকাতায় অতিবাহিত করলেও তাঁর বালক মনে পল্লী-প্রকৃতির একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ যে সুগভীর রেখাপাত করেছিল তা তাঁর লেখার মধ্যে বারবার ফুটে উঠেছে। শৈশবে পল্লী প্রান্তরে বিনা বাধায় ঘুরে বেড়ানো, নৌকা করে খালবিল পেরিয়ে অজানা জায়গায় চলে যাওয়া, সমবয়সী ছেলেদের সাথে চড়ুইভাতি, নাট্যাভিনয়, রাত জেগে যাত্রাগান শোনা—এই ছিল তাঁর নিত্য জীবনের সাথী। পূর্ববঙ্গের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকার জন্য পল্লী সমাজের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা থাকার জন্য এই জীবনের নিবিড় চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়।

'স্বপনবুড়ো' নামে তিনি শিশুসাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠা পেলেও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা অখিল নিয়োগী নামে। তিনি যখন ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করেন তখন তিনি সরকারী কলা মহাবিদ্যালয় বা গর্ভণমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। এর আগে অবশ্য তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন সিটি কলেজে। এই কলেজ থেকে তিনি আই. এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি. এসসি.র পরিবর্তে তৎকালীন গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে (বর্তমানে গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে) গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। শৈশব থেকে ছবি আঁকার দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকার ফলে বিজ্ঞানের অঙ্গন থেকে শিল্পকলার প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি।

আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তাঁর প্রথম লেখা আত্মপ্রকাশ করেছিল 'শিশুসাথী' পত্রিকায়। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাঘ মামা', 'পরীর দৃষ্টি' ও 'স্বপ্নপুরী'। এর পরে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'বেপরোয়া' নামে কিশোর উপন্যাসটি। এটি পরে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। এই কিশোর উপন্যাসটিই তাঁকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। এই রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক কিশোর উপন্যাসটি আহ্বান জানায় সমস্ত কিশোর কিশোরীকে ভীরুতা বিসর্জন দিয়ে সাহসী হয়ে উঠবার জন্য।

অখিল নিয়োগী ওরফে স্বপনবুড়ো ছোটদের জন্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, নাটিকা, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। আবার সিনেমা ও রেকর্ডের জন্য, এক সময় বহু গানও রচনা করেছেন। 'স্বপনবুড়ো' নামটা তিনি সর্বপ্রথমে রেকর্ডে ব্যবহার করেন। সেই যুগে

'স্বপনবুড়ো' নামে ছোট একটি রূপক নাটিকা রেকর্ডে প্রকাশিত হলে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যে রেকর্ড-নাটিকায় তিনি নিজেই রূপদান করেছিল 'স্বপনবুড়ো' চরিত্রটি। টিপিকাল দাড়ি, নাকের উপর ঝুলে পড়া চশমা, ঢোলা হাতার বিচিত্র জামা গায়ে ছবি 'স্বপনবুড়ো'কে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল অসংখ্য ছেলেমেয়েদের মনোজগতে। ১৯৪২-এ বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র যুগান্তর পত্রিকায় 'ছোটদের পাততাড়ি' প্রকাশিত হতে থাকলে ১৯৪৫-এর মে মাসে ঐ বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন অখিল নিয়োগী 'স্বপনবুড়ো' নামে। এরপর প্রতি মঙ্গলবার ১৯৪৫ থেকেই 'সব পেয়েছির আসর' নামক শিশু সংস্থার মুখপত্র রূপে 'ছোটদের পাততাড়ি' দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এরপরে 'স্বপনবুড়ো' নামেই আমাদের মধ্যে রয়ে যান তিনি।

'সব পেয়েছির আসর' ছিল শিশুদের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি এই সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য এই সাংগঠনিক কাজে দক্ষতা তাঁর শৈশব থেকেই ছিল। তিনি কিশোর বয়সে সহপাঠী বন্ধুদের সহযোগিতায় নিজের গ্রামেও পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন, আর্ট স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন তিনি 'আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন" নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন ও সেই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন এবং এই সমিতির পক্ষ থেকেই প্রকাশ করা হয়েছিল হাতে লেখা একটি পত্রিকা, নাম ছিল 'চিত্রা'। এই পত্রিকায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সেকালের অনেক বিখ্যাত শিল্পী ছবি এঁকেছিলেন।

১৯৫২ সালে উড়িষ্যার কটক শহরে অনুষ্ঠিত "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন"-এর শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন তিনি। এর পর আরও দু'বার নাগপুর ও হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন"-এ শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে 'আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতি' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ভিয়েনাতে যান ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি সাক্ষাৎ করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্নী ও কন্যার সাথে। তাঁর এই ইউরোপের ভ্রমণ কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে" বইটিতে। এই বইতেই প্রথম নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যার কথা জানা যায়। নেতাজীর জন্মশতবর্ষে তাই এই ভ্রমণ কাহিনীটির গুরুত্ব অনেক বেশী।

শিশু সাহিত্য পরিষদ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক রূপে 'ফটিক-স্মৃতি পদক' ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। শিশু সাহিত্যে সব্যসাচী স্বপনবুড়োর জীবনাবসান ঘটে ২১শে ফেব্রুয়ারী, কিন্তু তাঁর জীবনাবসান ঘটলেও তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্বপনবুড়ো ওরফে অখিল নিয়োগী নিজেকে শুধু শিশু সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি ছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। এই পেশায় নিযুক্ত থাকতে থাকতে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন চলচ্চিত্রে শিল্প পরিচালক ও প্রচারের দায়িত্ব বহন করা ছাড়াও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে স্বরচিত কয়েকটি কাহিনীর রূপদানও করেন তিনি। অবিভক্ত বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 'শ্রী নিকেতন' সম্পর্কে একটি দলিল চিত্র বা ডকুমেন্টারী ফিল্মের চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন তিনি।

বাঙালী শিশুদের আনন্দ-যজ্ঞের পুরোহিত, তাদের উৎসবের নায়ক ও সহচর স্বপনবুড়ো ওরফে অখিল নিয়োগীর রচনাবলীর সম্পাদনার ভার আমার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। এই গুরুদায়িত্ব কতখানি সার্থকভাবে পালন করতে পারব জানিনা। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের প্রকাশিত রচনা প্রায় সবই বর্তমান যুগের পাঠকের আয়ত্বের বাইরে বলা চলে। এই সমস্ত রচনা অর্থাৎ উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, নৃত্যনাট্য, গান সংগ্রহ করে রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করাও বর্তমান যুগের কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। বর্তমানে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হলেও আশা করা যায় এই রচনাবলী পাঁচ বা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হবে।

স্বপনবুড়োর জীবনাবসানের কয়েক বৎসর আগে একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আমি ও আমার কয়েকজন ছাত্র তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম (সম্ভবতঃ কোন পত্রিকার সঙ্গে এটাই তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার ছিল)। সেই সময় বর্তমান শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মনে যে একরাশ অভিমান জমে ছিল, তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এর কারণ হয়তো বা তিনি যখন লেখা শুরু করেন 'কল্লোল' তখনো নবযৌবনের লাবণ্যে ভরপুর, 'প্রগতি' তখন শুরু হয়েছে। তিনি কিন্তু সেই 'এলিটিস্‌মে'র জোয়ারে ভেসে যাননি। নিজের পথটি ঠিক বেছে নিয়ে শিশুসাহিত্যের জগতে তিনি নিভৃত জায়গাটুকু করে নিয়েছিলেন। রামধনু, শিশুসাথী, মৌচাক, মাস পয়লার পৃষ্ঠায় একটা অপরিহার্য নাম ছিল স্বপনবুড়ো। ঠিক সেইভাবে বর্তমানে শিশু সাহিত্য নিয়ে কেউ চিন্তাভাবনা না করায় তাঁর মনে অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছিল, যার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছিল আমাদের কাছে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে।

রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন বাংলা ভাষায় সর্বাধিক জনপ্রিয় কিশোর-কিশোরীদের পত্রিকা 'আনন্দমেলার' সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। গত এক দশকের উপর তিনি কৃতিত্বের সাথে এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন। সম্পাদনার সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা তাঁর উপন্যাস ও গল্প যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আশা করি তাঁর লেখা মুখবন্ধ 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' এই খণ্ডের আর একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ বলে বিবেচিত হবে। আমি তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই মূল্যবান মুখবন্ধটি লিখে দেবার জন্য।

স্বপনবুড়ো রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রভা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী অসীম মণ্ডলকে সাধুবাদ জানাই। মুদ্রণের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য প্রেসের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। আশা করি শীঘ্রই সকলের যৌথ সহযোগিতায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে সমর্থ হব।

অসিতাভ দাশ

বেপরোয়া
(কিশোর উপন্যাস)
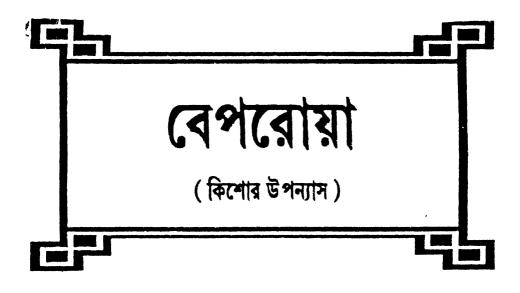
পৌষের প্রথমটা।

সবে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে তাই পড়াশুনার কোন চাড় নেই। বাইরের পেয়ারা গাছটায় চড়ে আপন মনে কাঁচা-পাঁকা পেয়ারা চিবুচ্ছিলুম, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে মার ডাক শুনতে পেলুম,—"নীলে, পেয়ারা গাছে কি কচ্ছিস্?" শীতের দুপুর হলেও সমস্ত রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছে গা-ও বেশ ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল। তাই শান্ত সুবোধ শিশুটির মতো মুখ মুছে ভেতরে এসে বললুম—"দোল খাচ্ছিলুম।" মা চোখ রাঙিয়ে বললেন, "হতভাগা ছেলে, দোল খাচ্ছিলে? কোঁচড়ে ও-গুলো কি?"

ধরা পড়ে গেলুম। কোঁচড়েও যে ডজন-দুই আধ-পাকা পেয়ারা জমা রেখেছিলুম তা আর মনে ছিল না। মা কোঁচড় ধরে টানতেই টুপ্ টাপ্ করে পেয়ারাগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

দিদির ছেলে টিকটিকি একটা আস্ত পেয়ারা মুখে পুরে দিলে। মা হাঁ-হাঁ করে তাকে ধরতে যেতেই সুযোগ বুঝে আমি এক ছুটে পড়ার ঘরে এসে ভুগোলখানা খুলে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে দিলুম—"রংপুর—অ্যাঁ—রংপুর—রংপুর জেলার প্রধান নগর রংপুর—তামাকের জন্য বিখ্যাত।" এমন সময় মা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললেন, "ছেলের পড়ার চাড় দেখ না। যা, তোকে পড়তে হবে না, একখানা গাড়ী ডেকে আন দেখি শিগ্‌গীর।" হাঁ করে মার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। খুব একটা বড় রকম শাস্তিবই আশঙ্কা কচ্ছিলুম, এমন সময় কি না গাড়ী ডাকতে হবে। একটু সাহস পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললুম, "কোথায় বেড়াতে যাবে মা?"

মা বললেন, "আমার ছেলেবেলার সই এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা আছে।" গাড়ী ডেকে মা, মেজদি, আমি যখন মার সইয়ের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলুম তখন বিকেল হয়ে গেছে।

গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বাইরের ঘরে কেউ নেই, তারপর একটা সরু গলি পেরিয়ে ভেতরে উঠোনেতে ঢুকতেই দেখতে পেলুম, ঠিক মার বয়সী আর আমার মেজদির বয়সী দু'জন মেয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে।

বয়সে যিনি বড়, আমাদের পায়ের শব্দ শুনে তিনি হাসি চেপে—উঠে মাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "একি বাসন্তী যে। তুই যে লোক পাঠিয়েছিলি সে খবর পেয়েছি।" মা বললেন, হাঁ, তোরা এখানে এসেছিস্ শুনে দেখতে এলুম; তোর বিয়ের পর তো দ্যাখাশুনো নেই।—তবু ভাগ্যি চিনতে পেরেছিস্। আমি

ভাবছিলুম বুঝি চিনতেই পারবিনে। মার সই হেসে বললেন, "তা বই কি, তোরাই শুধু মনে রাখিস্ আর আমরা বুঝি ভুলে যাই?"

মেজদির বয়সী মেয়েটি হাঁ করে মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মার সই বললেন, "অরুণা, প্রণাম কর্, তোর মাসিমা হয় যে!" মেয়েটি মার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। মার চোখের ইশারায় আমি আর মেজদিও তাঁকে প্রণাম করলুম। মা আমাদেরও বলে দিলেন, "এঁকে মাসিমা বলে ডেকো—বুঝলে?" মাসিমা বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্ না বাসন্তী!" তারপর সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "যা তো মা অরুণা, তোর মাসিমাকে বসবার একটা আসন এনে দে।"

মা বললেন, "তা না হয় বসছি। কিন্তু তোরা এত হাসাহাসি কচ্ছিলি কেন বল্ দেখি?" মাসিমা আবার ফিক্ করে হেসে ফেললেন, "ও আমার ছোট ছেলে নাড়ুর কাণ্ড"। অরুণাদি আসন নিয়ে ফিরে আসতে, মা তার হাত থেকে সেটা টেনে নিয়ে বসে বললেন, "কি কাণ্ড করেছে নাড়ু?"

মাসিমা মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে দেয়ালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ঐ যে—"

চেয়ে দেখি দেয়ালের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে কে লিখে রেখেছে—"আর একবার সাধিলেই খাইব।" মা হাসতে হাসতে মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সে আবার কি?" মাসিমা বললেন, "এখানে এক্‌জিবিসন্ হচ্ছে না কোথায়? সকাল বেলা উঠে ও বললে, বেলা আটটার মধ্যে ভাত চাই; খেয়ে দেখতে যাব। শীতের সকাল, অত শিগ্‌গীর কি আর রান্না হয়? তাই বাবুর হল রাগ। না খেয়েই এক্‌জিবিসন্ দেখতে গেল। ফিরে আসতে আমি আর অরুণা কত সাধাসাধি—নাঃ খাবে না! এই তো আমাদের খাওয়ার আগেও কত ডেকে গেলুম—কিছুতেই এল না! তারপর আমরা খেতে গেছি, কোন্ ফাঁকে এসে গোদা-গোদা অক্ষরে ঐ যে লিখে রেখে গেছে।"

সব শুনে আমরা তো হেসে খুন — ভারি মজার ছেলে তো! মাসিমা অরুণা দিদিকে ডেকে বললেন, "যা তো অরুণা, ওর খাবারটা আলাদা করে ঢেকে রেখে আয়।"

অরুণাদি ততক্ষণে মেজদির সঙ্গে ভাব করে খুব গল্প জমিয়ে তুলেছে। মাসিমার ডাকে মুখ না ফিরিয়েই বললে, "রেখেছি, রান্নাঘরে ঢেকে, খাবে' খন।"

মেজদি অরুণাদির সঙ্গে গল্প কচ্ছে - আজকাল কি প্যাটার্ণের চুড়ির আদর বেশী। মেয়েদের ধরণই ঐ, দেখা হলেই চুড়ির গল্প, ব্লাউজের গল্প। যখন আর

কিছু বলবার থাকে না, তখন কি দিয়ে ভাত খেয়েছিস ভাই — কি রান্না হয়েছিল তোদের — এমন তরো —দু-উ-উ —চক্ষে যা দেখতে পারি না তাই।

এদিকে চেয়ে দেখি মা আর মাসিমাও কম নন। তাদেরও গল্প চলেছে ছেলেবেলায় আম বাগানে লুকিয়ে কাঁচা আম খাওয়ার কথা—পুতুলের বিয়ে— এমনি আবোল তাবোল কত কি! উইয়ের টিপির মাথা ভেঙে দিলে সব উই যেমন কিলবিল করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে — খোলা রাস্তা পেয়ে মা আর মাসিমার গল্পের ধারাও ঠিক তেমনি ক্রমাগত একটির পর একটি বেরিয়ে আসতে লাগল। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলুম ভাব করি এমনতরো কেউ নেই। তাই হাঁ করে মাসিমাদের গল্প গিলতে লাগলাম। এমন সময় খুট্ করে একটা শব্দ হতেই পেছন ফিরে দেখি — প্রায় আমার বয়সীই একটি ছেলে পা টিপে টিপে রান্নাঘরের শেকল খুলে ভেতরে ঢুকছে।

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাসিমা চোখের ইশারায় তাঁকে বারণ করলেন।

কাউকে আর কিছু বলতে হল না। মুহূর্ত পরেই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এসে হাত পা ছুঁড়ে বলতে লাগলো, "আমি খাবো না — কিছুতেই খাব না,-- কেন? কেন বললে ডিমের ডালনা রেখেছি—চিংড়ি মাছ ভাজা রেখেছি"—তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে — ঐ পোড়ামুখী ছোড়দি বুঝি সব খেয়ে নিয়েছে? অরুণাদি এইবার তার গহনার গল্প থামিয়ে বললে, "হ্যাঁ আমি খেয়েছি। আমি তোরটা খেতে যাব কেন রে?

"তবে কোথায় গেল আমার ডিমের ডালনা, দে শিগ্গীর আমার চিংড়ি ভাজা" — বলে ছেলেটি দুমদুম করে পা ফেলে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

মাসিমা উঠে গিয়ে তার হাত ধরে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আজ তো ফুরিয়ে গেছে, আর একদিন করে দেবো'খন।"

নাড়ু মাথা নেড়ে বললে, "হুঁঃ তা বৈকি --- ফুরিয়ে গেছে? আমায় ফাঁকি দিয়ে খাওয়াবার জন্যে।" তারপর হঠাৎ "নাঃ -- আমি খাবো না — কিছুতেই খাবো না" —বলে চেঁচিয়ে উঠে, এক ছুটে মাসিমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

মাসিমা ফিক্ করে হেসে ফেল্লেন। মা শুধোলেন, "একি ছেলে রে তোর?" মাসিমা হাসতে হাসতে বললেন, "ওই রকমই।"

"তা ইনিই বা কম কি, এই তো পেয়ারা গাছ থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে এলুম" — এই বলে মা আমার দিকে তাকালেন। মাসিমা আমায় তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "সত্যি নাকি রে? তা'হলে তোদের দুটিতে মিলবে ভালো।"

আমি মাসিমার বুকে মুখ গুঁজে চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগলুম। সত্যি নাড়ুকে আমার ভারি ভাল লেগেছিল।

মা বললেন, "বাইরে থেকে নাড়ুকে ডেকে নিয়ে আয়।" আমিও তাই চাই। নাড়ুর সঙ্গে ভাব করতে আমার সমস্ত মনটা বল্‌গা ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। পা টিপে বাইরের ঘরে গেলুম। দেখি দরজার দিকে পেছন দিয়ে নাড়ু পা দোলাতে দোলাতে আপন মনে বলছে "কেন আমায় মিথ্যে বলে খাওয়াতে চাইলে — সেই জন্যই তো আমার রাগ হল। ছোড়দি পোড়ারমুখী আমার খাবারগুলো খেয়ে নিলে কেন? আর যদিই বা খেয়ে থাকে তবে অমন করে বল্লে কি আর আমি খেতুম না?" অভিমানে তার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়াতে লাগলো।

আস্তে আস্তে বললুম, "ডাকছে।" সে বোধহয় আমার কথা শুনতে পেলে না, জানলার ফাঁক দিয়ে জলভরা চোখদুটি তুলে রাখ্‌লে। আবার ডাকলাম, "মাসিমা ডাকছে যে" — আমার সাড়া পেয়ে ফস্‌ করে চোখের জল মুছে ফেলে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে "কি?"

আমি সেই কথাই আবার বললুম। নাড়ু আস্তে আস্তে কাছে এসে আমার হাত ধরে বললে, "বোস্‌"। তাই পাশে বস্‌লুম।

সে বললে "তোর নাম কি রে?" "নীলে।"

আবার বললে, "আমার নাম তো শুনেছিস্‌?"

ঘাড় নেড়ে জানালুম, "হ্যাঁ।"

নাড়ু বললে, "আজ যে মার সইয়ের আসবার কথা ছিল, তুই সেই বাসা থেকে আসছিস্‌ বুঝি?" আমি বললুম, "আমার মা-ই তোমার মার সই।" নাড়ু বললে "ও বুঝেছি।"

খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, "আজকে আমার কাণ্ড দেখে কিছু মনে করিস্‌ নি তো?"

আমি হাসি চেপে বললুম. "কি কাণ্ড?" খুব সংক্ষেপেই জবাব দিলে, "এই যা সব দেখলি?" বললুম. "না আমার ওসব খুব ভাল লাগলো। তাইতো ভাব করতে এলাম। এইবার নাড়ু খিলখিল করে হেসে বললে "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি ও রকম করি যে, কিন্তু মনে করিস্‌ নি।"

ও বাসা থেকে আসবার সময় নাড়ু আমায় এক কোণে ডেকে নিয়ে বলল "মাঝে মাঝে আসবি তো আমাদের বাসায়? বড্ড একলা রে আমি — ভালো লাগে না।"

আমি ঘাড় নেড়ে গাড়ীতে উঠলুম।

তারপর প্রায় মাসখানেক নাড়ুর আর কোন খোঁজ খবর পাইনি। সেদিন খাবার সময় কথায় কথায় মা বললেন, "নাড়ু তো তোদের ইস্কুলে ভর্তি হবে রে।" আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কবে গিয়েছিলে ওদের বাসায়।" মা বললেন, "তোর মেজদি এসে যে বললে। ও প্রায়ই ও বাসায় যায় কি না।"

এর দুদিন পরের কথা বলছি। আঁকের ক্লাসের পেছনের বেঞ্চিতে বসে বুড়ো মাষ্টারের ইয়া বড় টাকওয়ালা মাথাটা আঁকবার চেষ্টা করছি — এমন সময় সিধু বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে এসে সংবাদ দিলে, আমাদের ক্লাসে একজন নূতন ছেলে ভর্তি হল।

খানিক বাদেই দপ্তরী এসে নাড়ুকে আমাদের ক্লাসে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে পাশে এসে বস্‌ল। দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষটি। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার যো নেই, পেটে পেটে এর কি বুদ্ধি খেলছে। নাড়ু রীতিমত ক্লাসে আসত, আমার পাশটি ছিল তার বসবার জায়গা। ক্লাসের কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে এই মুখচোরা ছেলেটাই একদিন সকলের সর্দার হয়ে দাঁড়াবে।

ক্লাসের মধ্যে আমার প্রতাপটাই ছিল সবার চাইতে বেশী। সোজা কথায় আমিই এতদিন সকলকার মাথার ওপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে এসেছি। কি করে আমার হাতের ডাণ্ডা ধীরে ধীরে নাড়ুর হাতে গিয়ে উঠল সেই কথাই এখন বলতে চেষ্টা করবো।

আমাদের যে দলটার কথা বললুম, তাকে ছোটখাটো অনেক কিছুই করতে হত। পাড়ায় ভালো ভালো ফলের বাগান থেকে রাতারাতি ফলচুরি — ও পাড়ার মিত্তিরদের দলের সঙ্গে ঝগড়া — তাদের জব্দ করার উপায় ঠাওরানো — দুষ্টু মাষ্টারকে শায়েস্তা করা — এই সব ছিল আমাদের কাজের অঙ্গ। নাড়ু যখন আমাদের ক্লাসে ভর্তি হলো, ঠিক সেই সময়টাতে এক পণ্ডিত আমাদের বড় জ্বালাতন করছিল। কি করে তাকে জব্দ করা যায় — অনেক দিন থেকেই তার জল্পনা-কল্পনা চলছিল। দলের একটা নিয়ম ছিল — কোন সমস্যা উঠলে লটারী করে একজন বিশিষ্ট সভ্যকে কাজের ভার দেওয়া হত। কি উপায়ে কাজটা হাসিল করতে হবে সেইটে নিয়েই আমাদের সমিতি মাথা ঘামাচ্ছিল, কাজেই লটারীর কথা ওঠেনি মোটেই। আমরা মাষ্টার ঠেঙানো বিদ্যা তখনো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি। কারণ আমাদের বয়স ছিল কাঁচা। তারপর তেমন শক্তিও ছিল না, আর বাড়ীতে প্রহারে ভয় যে ছিল না তা বলতে পারিনে।

এর মাস দুই পর — একদিনের কথা বেশ মনে আছে। পণ্ডিতের ঘন্টা ছিল সকলের শেষে। কি একটা সামান্য কথা দিয়ে পণ্ডিত মশাই ক্লাসের একটি ছেলেকে বেদম প্রহার দিলেন। ইস্কুল ছুটি হবার পর আমরা সকলে মিলে একটা পোড়ো বাড়ীর পেছনে বুড়ো একটা বটগাছের তলায় গিয়ে জড় হলুম। ঠিক হ'ল, আর নয় — পণ্ডিতের একটু সাজা হওয়া খুবই দরকার।

আমি বললুম, "সে তো নিশ্চয়ই। বাজে কথা ছেড়ে লটারী কর — যার নাম উঠবে সে নিজের উপায় খুঁজে নেবে — উপায়ের আশায় বসে থাকলে, সাত জন্মেও পণ্ডিতকে শায়েস্তা করা যাবে না।"

সকলেই আমার মতে মত দিল। লটারী হল, ভার পড়ল গিয়ে অমরের উপর। বেচারী নেহাৎ ভাল মানুষ। বয়সেও সকলের ছোট। সে ছলছল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে — "আমি পারবো না নীলুদা।" ছেলেরা বললে — "পারতেই হবে তোকে। লটারীতে নাম উঠেছে যখন, এ কাজ তখন তোকেই করতে হবে।"

বেচারী মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, "পণ্ডিতমশায় আমায় পড়ান যে"! সত্যি, তার পক্ষে বিঘ্ন ছিল যথেষ্টই। অমরকে সকাল-সন্ধ্যে দুবেলাই পণ্ডিতের কাছে পড়তে হয়। পণ্ডিত মশাইকে শায়েস্তা করতে গিয়ে যদিই বা তার কোপানল থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তার বাবার তরফ থেকেও আশঙ্কা নেহাৎ কম নয়। অমরের বাবা বেশ রাশভারী লোক। ছেলের এ বখামো তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। কিন্তু হলে কি হবে, বয়স তখন আমাদের কাঁচা — রক্ত গরম, কাজেই তার এ কাপুরুষতার প্রশ্রয় ত কিছুতেই আমরা দিতে পারিনে। তার ওপর আমি হলাম দলের মোড়ল। আমার কথারও তো একটা মূল্য আছে। তাই বললুম, "তা হ'লে চলবে না অমর, দলের স্বার্থের জন্য এ কাজ তোমায় করতেই হবে।

বেচারীর চোখ দিয়ে টপ করে দুফোঁটা জল পড়ল, সে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, "নীলুদা" —

তার মুখে আর কথা ফুটল না। — কিন্তু তার হয়ে কথার জবাব দিল নাড়ু। নাড়ু যে ছুটির পরে আমাদের সঙ্গে এসেছে তা আমি লক্ষ্য করিনি, এতক্ষণ সে বোধহয় পেছনে ছিল, এইবার এগিয়ে এসে বললে, "নীলে, ওর হয়ে আমি য দি একাজের ভার নি, তা হলে কারো আপত্তি আছে?"

এইবার সকলের চোখ গিয়ে পড়ল নাড়ুর উপর। নাড়ু কিন্তু দমলে না -- আমার চোখের উপর চোখ রেখে দু'টো সোজা কথায় বললে, 'কি বল?' বেশ মনে আছে সেদিন নাড়ুকে এই রকম আপনা থেকে এসে অন্যের ভার নিজের মাথায় তুলে নিতে দেখে কী লজ্জা পেয়েছিলুম!

পরের ভার আপন করে গৌরবের রাজটীকা তো আমার কপালেও উঠতে পারতো। দলের মোড়ল আমি, যদি সেধে দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিতুম, তা'হলে দলে আমার মাথা আরো উঁচু বই নীচু হত না। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। নাড়ু সে পথের সন্ধান অতি সহজেই দিয়েছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার শুধোলে, "তা হ'লে আপত্তি নেই তো?" আমি বললুম, "না আপত্তি আর কি? তুমি যদি সেধে ওর ভার নাও তো ভালোই।"

নাড়ু বললে, "হ্যাঁ, আমিই ওর হয়ে পণ্ডিতকে শায়েস্তা করবার ভার নিলুম।"

পরাজয়ের বোঝা মনে চাপিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। যে ঘটনার উল্লেখ করলুম সেটা হয় তো খুবই সামান্য। কিন্তু, আমার শুধু ঘুরে ফিরে এই কথাটাই মনে হতে লাগল — সেই বা কেন যেচে অমরের ভার নিজের হাতে তুলে নিলে, আমিই বা নিলুম না কেন? এতদিন দলের নেতা হয়ে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করেছি। ক্ষমতাও যে নেহাৎ কম দেখিয়েছি তা নয়। দলের সকলেই আমাকে মেনে চলত, এইটাই যে ছিল সব চাইতে সেরা গর্ব।

আজ কে যেন থেকে থেকে আমার কানে কানে বল্‌তে লাগলো, রাশ ধরবার খাঁটি লোক মিলেছে নীলু, তোমার কাজ ফুরোলো। তাই মনে হল, এতদিন ধরে সর্দারিই করে এলুম, কিন্তু কৈ কারো দুঃখের বোঝা বইবার তো কোন চেষ্টা করিনি! আজ যেন হঠাৎ বুঝতে পারলুম হুকুম করতে হলে হুকুম মানতেও হয়। এতদিন যে ডাণ্ডা সকলের মাথার উপর ঘুরিয়েছি, সেই ডাণ্ডাগুলো ঠিক যেন হিসেব মতো নিজের মাথায় পড়তে লাগল।

সেদিন রাত্তিরে ভালো ঘুম হল না। আবার এও ভাবলুম, নাড়ু ভার নিল বটে, কিন্তু কি ভাবে যে কাজ করবে, তা কিছু বললে না। ও নূতন ছেলে, সোজাসুজি পণ্ডিতকে খোঁচাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে, তবে সমস্ত ঝুঁকিটা আমাকে সামলাতে হবে! কারণ নাড়ু ধরা পড়লে এটা জানতে আর কারো অসুবিধে হবে না যে, যাদের কথায় নাড়ু এমনতর কাজ করতে গিয়েছিল, সে দলের সর্দার আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

খুব সকালে উঠে নাড়ুদের বাড়িতে গেলুম। গিয়ে দেখি তার চার বছরের বোনের সঙ্গে ছোট্টটি হয়ে সে পুতুল খেলছে! এ যেন এক নূতন মানুষ। কে বল্‌বে এই নাড়ুই অন্যের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল!

দলের সর্দার হিসাবে একটা গুমোর আমার বরাবরই ছিল, আর নিজের গুরুত্বও যখন-তখন ছেলে-মহলে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র কসুর করিনি। কিন্তু এ ছেলেটা কি! এর ভিতরে এমন কি শক্তি আছে. যার বলে এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েও দিব্যি পুতুল খেলায় ব্যস্ত! এক কোণে ডেকে নিয়ে ভারিক্কি চালে বেশ গম্ভীর ভাবে বললুম,"যে কাজটা হাতে নিয়েছ সেটা ঠিক করতে পারবে তো?"

সে ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে বললে, "সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে দেবো।" আমি বললুম,"হ্যাঁ, খুব হুঁশিয়ার হয়ে বুঝে শুনে কাজ করবে, আবার পণ্ডিতকে ঠ্যাঙাতে যেও না যেন।" নাড়ু হা হা করে হেসে শুধু বললে, "পাগল"। বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু সারা রবিবারটা বেশ একটা দুর্ভাবনার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালুম।

সোমবার দিন সকাল সকাল ক্লাসে গিয়ে হাজির হলুম। আমার মতো অনেকেই আজ আগে থাকতে ক্লাসে এসেছে। কারণ নাড়ু নূতন ছেলে, এখনও অনেকের

সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই। সকলেই আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "নাড়ু কি করবে?" আমি বল্‌লুম, "তোমরাও যেমন জান আমি তার চাইতে বেশী কিছুই জানিনে। ক্লাসে এলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।" ঘন্টা বাজবার কিছু আগে রোজকার মতো এসে নাড়ু নিজের জায়গাটাতে বসলে। সকলে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল। নাড়ু তাদের সকলকে ঠাণ্ডা করে বললে, "তোমাদের কারো ভয় নেই, মারামারির ভেতর যাবো না। খুব সহজ উপায়েই আমি পণ্ডিতকে জব্দ করবো।"

ঘন্টা পড়ল। অন্যান্য দিনের মত ক্লাস চলতে লাগলো। সেদিন পণ্ডিতের ঘন্টা ছিল ঠিক টিফিনের পর। পণ্ডিতমশায়ের একটা বড় বদ দোষ ছিল, তিনি পড়াতে পড়াতে ঢুলতে শুরু করে দিতেন। সেদিনও খানিকটা পড়াবার পরই পণ্ডিতের হাতের বই টেবিলের ওপর থেকে টপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তন্দ্রার ঘোরে পণ্ডিতের মাথাটা পেছনে ঝুলে পড়ল! না, তারপর দেখি নাকটাও বেশ একটু ডাকছে।

ছেলেরা সুযোগ বুঝে গোলমাল শুরু করে দিল। একটা ছেলে আবার পণ্ডিতের টিকির সঙ্গে কী বাঁধতে যাচ্ছিল—এমন সময় নাড়ু চাপা গলায় বললে "সব চুপ"।

নাড়ুর কথায় যে যার জায়গায় গিয়ে শান্ত শিষ্ট হয়ে বসলে। সে আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা শিশি বের করলে। সকলে দেখলে শিশিটা বড় বড় লাল পিঁপড়েয় ভর্তি। সব্বাই শুধোলে, "এ কি হবে?"

নাড়ু বললে, "দেখ না মজাটা।" এই বলে উঠে পণ্ডিতের কোটের গলাটা একটু ফাঁক করে শিশির ছিপি খুলে সবগুলো পিঁপড়ে ছেড়ে দিলে। ক্লাসময় একটা চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গেল।

নাড়ু বললে "চুপ চুপ—যে যার পড়া করো।" সকলে তখন খুব মনোযোগী হয়ে যে যার পড়ায় মন দিলে। খানিক বাদে পণ্ডিত হঠাৎ তিড়িক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ রগড়ে বললেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ পড়া দাও।" আমরা আড়চোখে দেখতে লাগলুম, পণ্ডিত দু'এক জনকে পড়া জিজ্ঞেস করছেন আর থেকে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে আবার চেয়ারে বসছেন। তারপর খানিক বাদে আর যাবে কোথা, লাফিয়ে উঠে কোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পণ্ডিত লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ক্লাসে হৈ হৈ চীৎকার শুরু হয়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, "সব চুপ করো, পণ্ডিত হয়তো এক্ষুনি হেডমাষ্টারকে ডেকে নিয়ে আসবে।"

সনৎ বললে, "হ্যাঁ, পণ্ডিত যাবে হেডমাস্টারকে ডাকতে, তুমি পাগল হয়েছ?"

কথাটা ঠিক। পণ্ডিতমশাই আমাদের ওপর যত অত্যাচারই করুন না কেন, হেডমাষ্টারকে তাঁর বাঘের মতো ভয়, তা ক্লাস শুদ্ধ সকলেরই জানা।

আমাদের হেডমাষ্টার ছিলেন হ্যাটকোট পরা ইংরেজীনবীশ লোক। মুখে সব সময়ই তাঁর ইংরেজী বুলির খৈ ফুটতো। পণ্ডিতমশায়ের ইংরেজী না জানাই ছিল তাঁর ভয়ের একমাত্র কারণ। তবু সাবধানের মার নেই। একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলুম পণ্ডিত মশাই কোথায় আছেন দেখতে। সে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললে, তিনি বাড়ীর দিকে চোঁ-চাঁ দৌড় মেরেছেন।

যাতে আমাদের ওপর সন্দেহ না হয় সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ইস্কুল ছুটি হতে পণ্ডিতের জামাটা নিয়ে আমরা জনা কয়েক তাঁর বাড়ীতে হাজির হলুম। গিয়ে দেখি পণ্ডিত জ্বরে ধুঁকছেন! ঔষধের গুণ দেখে আমরা এ-ওর মুখ চেয়ে একটু চাপা হাসি হেসে নিলুম। তারপর কোটটা ফিরিয়ে দিয়ে হঠাৎ এমনভাবে চলে আসার কারণ শুধোতে পণ্ডিত শুধু জবাব দিলেন, "শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল তাই চলে এলুম রে।" এর বেশী আর কিছু তাঁর মুখ থেকে আমরা বের করতে পারলুম না।

আমাদের জানারও তেমন আগ্রহ ছিল না। মনে পড়ে সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে খুব একচোট হেসেছিলুম।

এই ঘটনার পর থেকে সকলেই বিশেষ করে যাদের ওপর পণ্ডিত মশাই অত্যাচার করেছেন তারা, নাড়ুকে খুব মেনে চলত। এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা কাউকে শাসনের গণ্ডীর ভেতর রাখতে চায় না—তবু দশজনে তাকে মেনে চলে। নাড়ুর সম্মানও অনেকটা তেমনি পাওয়া। সে কারো ওপর জোর খাটাবার চেষ্টা না করলেও ক্লাসের সকলেই তার আধিপত্য চাইত, আর দলের কাজ ছাড়া নিজেদের সামান্য কাজেও তার মত নিতো। এমনি করে দলের প্রত্যেকের মনে যে পাকা-পোক্ত আসন নাড়ু পেল, তা থেকে সরাবার ক্ষমতা আমাব কেন, কারুরই রইল না।

এর পর কদিন আমাদের বেশ আরামে কেটেছিল। পণ্ডিতের তাড়া নেই—বল্গাছাড়া ঘোড়ার মতো চলছিলাম আমরা বেশ। কিন্তু জ্বর তো কারো চিরদিন থাকে না—পণ্ডিতেরও থাকলো না।

সেদিন ক্লাসে যেতেই অমর এসে খবর দিলে, পণ্ডিত ভালো হয়ে গেছেন, আজ ক্লাসে আসবেন। রোদ চন্‌চনে পুকুরের বুকে হঠাৎ কাল-বোশেখী মেঘের ছায়া পড়লে যেমনতর দেখায়, এই সুখবরটা শুনে আমাদের ক্লাসের দশাও ঠিক তেমনি হ'ল।

একটি ছেলের মনে বোধ হয় আশা ছিল—পণ্ডিতের জ্বর ছাড়েনি। আস্তে আস্তে অমরকে শুধোলো, "আচ্ছা সত্যিই কি আসবেন? তুমি কি করে জানলে ভাই?"

অমর বললে, "বাঃ! আমার পণ্ডিত মশাই আজ সকালে পড়াতে এসেছিলেন যে!"

সে বললে, "সত্যি নাকি?"

অমর বললে, "হ্যাঁ, আর আমায় কত দোষ দিলেন, সেদিন মুখে বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর এটা মনে বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, কাজ আমাদেরই।" আমি বললুম, "পণ্ডিতকে ছাড়িয়ে দে না, ও ছাড়া কি দুনিয়ার আর মাষ্টার নেই?"

অমর বললে, "আরে ভাই, এত ভালো লোকে মরে, ওর কি মরণ নেই।"

এইবার নাড়ু হেসে বললে, "আরে পণ্ডিত মরলে কি হবে, তোর ত বাবা বেঁচে,—আবার ঐ রকম এক পণ্ডিত এনে হাজির করবে। যতদিন বাবা আছে—নিস্তার নেই বাবাজী।" ক্লাস সুদ্ধ সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

আমরা মনে করেছিলুম, জ্বরে ভুগে ভুগে পণ্ডিত মশাই বেশ একটু শায়েস্তা হয়েছেন। কিন্তু দেখি সে দিক দিয়েই নয়। বরং তার আক্রোশটা যেন আরো বেড়ে গেছে বলে বোধ হ'ল। তবে তাঁর সন্দেহটা নাড়ুর ওপর না পড়ে কতকগুলো পুরানো দাগী নাম করা ছেলের ওপরই ছিল।

এর মাসখানেক পরেই আমাদের দলের হরিশ বলে একটি ছেলে পণ্ডিতের পড়ার ঠিক জবাব দিতে পারেনি বলে বেশ উত্তম মধ্যম এক চোট খেল। সেদিন বোধ হয় পণ্ডিতের রাগটা একটু বেশী উগ্র হয়েছিল, তাই শুধু প্রহারেই সেটার শান্তি হ'ল না। নাড়ুকে ডেকে বললেন, "নাড়ু এক টুকরো কাগজে ইংরাজীতে লিখে দাও তো ও কেন পড়া করে না, আমি হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আগেই বলেছি—পণ্ডিতমশায়ের ইংরেজী জানা ছিল না, তাই কোন লেখা পড়ার দরকার হলেই তিনি নাড়ুর ওপর সে ভারটা দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—নাড়ুই এ সব কাজের উপযুক্ত ছেলে।

আমরা দেখলুম, আজ ব্যাপারটা তো অনেক দূর গড়াচ্ছে। সকলে গিয়ে বললুম, স্যার, আজকের মত ওকে মাপ করুন—কাল থেকে ঠিক পড়া করে আসবে। পণ্ডিত তাঁর টেকো মাথাটা দুলিয়ে বললেন, "না না, সে কিছুতেই হবে না—আমি ওকে নীচু ক্লাসে নামিয়ে দেবো।" নাড়ু কিন্তু পণ্ডিতের কথায় খুব সায় দিয়ে বললে, "হ্যাঁ পণ্ডিতমশায়, আপনি ঠিক বলেছেন, নীচু ক্লাসে নামিয়ে দিলে ওরই উপকার হবে! আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি।" এই বলে খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কী লিখে পণ্ডিতের হাতে দিলে।

আমাদের একটা পশ্চিমা পাঙ্খাওয়ালা ছিল। পণ্ডিতমশাই তাকে দিয়ে কাগজখানা হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ক্লাস সুদ্ধ আমরা সকলে নাড়ুর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে রইলুম। হরিশ তো কাঁদ কাঁদ হয়ে পণ্ডিতমশায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো, কিন্তু তিনি পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইলেন—তাঁর মত বদলাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এমন সময় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে পাঙ্খাওয়ালা এসে ক্লাসে ঢুকলো। শুধু পণ্ডিত মশাই নন, আমরা সকলেই দেখে অবাক্। প্রথমটা পণ্ডিতের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। তারপর ঝোঁকটা সামলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন. "কিরে — কি হল?"

পাঙ্খাওয়ালা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "চিঠি দেখকে সাহেব কো বড়ি গোসা হো গিয়া, হামকো তো বাবু আচ্ছা মার লাগায়া—হাম এয়সা কাম কভি নেই কিয়া।"

পণ্ডিতের তখন হয়ে এসেছে! একেই তো হেডমাষ্টারকে পণ্ডিত এড়িয়ে চলতেন —তার ওপর এই কাণ্ড, তাই ভয় হল, ঝোঁকের মাথায় কি ফ্যাসাদই না বাঁধিয়ে বসলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "কেন, রে, সাহেব রাগলেন কেন?"

পাঙ্খাওয়ালা বললে, "হাম কেইসে বলেঙ্গে বাবু? হামারা তো কুস্ কসুর নেই হ্যা—"

এমন সময় নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে, "পণ্ডিত মশাই, হেডমাষ্টারের রাগ তো হতেই পারে। নাঃ, আপনি হরিশের নামে রিপোর্ট করে ভাল কাজ করেন নি।" পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে বললে, "কেন কেন?"

নাড়ু বললে,—"আমি শুনেছি পণ্ডিত মশাই, কথাটা নাকি হেডমাষ্টারের কানে গেছে যে, আপনি ক্লাস ঠিক রাখতে পারেন না। তার উপরে আজ আবার হরিশের নামে রিপোর্ট করেছেন। হেডমাষ্টারের খুব ভাল রকম ধারণা হয়ে গেছে, আপনি ক্লাস চালাতেও পারেন না, আর ছেলেদের ঠিকমত শেখাতেও পারেন না! এজন্য বোধহয় তিনি এতটা রেগে গেছেন যে—বেচারী পাঙ্খাওয়ালাকে সামনে পেয়ে তার ওপরই সমস্ত ঝাল ঝেড়েছেন! আর তা ছাড়া ছেলেদের নামে রিপোর্ট করাটা তিনি আদপেই পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণা কি জানেন? যে মাষ্টার নিজে শেখাতে পারেন না—ছেলেদের নামে নালিশ করেন তিনিই—"

নাড়ুর কথা শুনে পণ্ডিতের মুখ তো চুন। বললেন, "তুমি আমায় কথাটা আগে জানালে না কেন?" নাড়ু জবাব দিলে "তা কি আমার অতটা খেয়াল ছিল? আপনি লিখতে বললেন, আমি লিখে দিলুম।"

পণ্ডিতের মুখে আর রা নেই!

আমরা তো অবাক্! কি করে কি ঘটল কিছুই বুঝতে পারলুম না। পণ্ডিতের ঘন্টার শেষে নাড়ুকে সকলে ঘিরে ধরলুম। নাড়ু সবাইকে ঠাণ্ডা করে বললে, "আরে —সত্যিই কি আর রিপোর্ট করলে হেডমাষ্টার রেগে যায়? তা মোটেই নয়। আজ বেশ একটু মজা করেছি।" আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, "আঃ, কি

করেছ, তাই বল না ছাই।" নাড়ু হাসতে হাসতে বললে, "কি লিখে দিয়েছিলুম জানিস? লিখেছিলুম The pankhawalla cannot pull the pankha well (পাঙ্খাওয়ালা ভাল রকম পাখা টানতে পারে না)।

হেডমাষ্টার তো তাই পড়ে পাঙ্খাওয়ালাকে উত্তম-মধ্যম বেশ দু'ঘা দিয়েছে। পণ্ডিত কিন্তু খুব ঘাবড়ে গেছে। দেখিস্—আমি বলে দিচ্ছি, বাছাধন আর কখনো কারো নামে রিপোর্ট করবে না।"

সব শুনে ক্লাস সুদ্ধ সকলে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমি বললুম, "বেচারা পাঙ্খাওয়ালার কি দোষ, ওকে শুধু শুধু মার খাওয়ালি কেন?"

নাড়ু হাসতে হাসতে বললে "আরে বুঝতে পাচ্ছিস নে? এক ঢিলে দুই পাখী মারলুম।"

আমি বললুম, "সে আবার কি?" নাড়ু বললে, "জানিস না বুঝি? ঐ যে বেটা পাঙ্খাওয়ালাকে দেখছ—ভাবছ খুব ভাল মানুষটি—কিন্তু মোটেই তা নয়। তোমাদের পিঠের ওপর যে তেল-তেলে বেতগুলো ভাঙে তাতো সব ওরই হাতে তৈরী। বেটা রোজ তেল দিয়ে মেজে কুচ্‌কুচে করে রাখে। আমি জানুতমও না এ কথা। সেদিন ছুটির পর লাইব্রেরীতে একটু কাজ ছিল, ফেরবার মুখে দেখি, বসে বসে বেত মাজছে। বললুম ওগুলো ফেলে দে। তো বেটা জবাব দিল কি শুনবি? বলে—আঁরে ঘাবড়াতা কাহে? ইয়ে তো বড়ি আচ্ছা "চিজ হ্যায়।" রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগলো। সেদিন থেকে আমি ভাবতে লাগলুম, এমন একটা উপায় ঠাওরাতে হবে, যাতে নাকি পণ্ডিতও জব্দ হন, আর ও বেটাকেও বেশ একটু শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। এতদিন পরে আজকে তার সুযোগ পেলুম।" নাড়ুর দুষ্টু চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করে জ্বলতে লাগলো।

তারপর থেকে পণ্ডিত মশাই খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। মারধোর করবার শক্তি যেন পণ্ডিতমশায়ের একেবারে খোলা শিশির কর্পূরের মত উড়ে গেল।

সাপুড়েরা যেমন গাছের শেকড় দেখিয়ে বিষওয়ালা সাপকে কাবু করে রাখে, নাড়ুর তৈরী সেই ফুস্ মন্তরের জোরে পণ্ডিত একেবারে ভালো মানুষটি হয়ে রইলেন।

এই ঘটনার তিন চার দিন পর সামান্য সর্দি-জ্বর হওয়ায় ইস্কুলে যাইনি, বিকেলের দিকটায় দাদার আলমারী থেকে লুকিয়ে এনে একখানা বাংলা উপন্যাস পড়ছিলাম, রাস্তার দিকে পায়ের আওয়াজ শুনে বইখানা লুকোতে যাব, এমন সময় চেনা গলায় শুনতে পেলাম, ভয় নেই আজকের মত দোষ মাপ করলুম। হেসে আর একখানা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, "একি, নাড়ু, কি মনে করে?"

নাড়ু চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে বললে, "ইস্কুলে যাওনি, ভাবলুম, শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়, ফিরতি পথে একবার দেখে যাই।"

এতটা আশা করিনি। তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ক্লাসের কেউ তো এল না, শুধু সে-ই আসে কেন? তা ছাড়া ওর বাসা থেকে তো কম দূর নয়! নিজে যতটা সে আমাদের দিয়ে ফেলেছে—আমরা তো কৈ সাহস করে ততটা দিতে পারিনি। কোথায় যেন সংকোচের একটা কাঁটা বিঁধতে থাকে, খোলাখুলি ধরে নিতে দেয় না।

নাড়ু বললে, "মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আমার পেট ভরবে না। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, একবার বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে এসো!"

চোখেমুখে হাসি ছড়িয়ে—একবুক আনন্দের বোঝা নিয়ে ছুটলুম মার কাছে খাবার আনতে । সব শুনে মা বললেন, আঃ । কি যে তোদের কাজের ছিরি, বুঝতে পারিনে । ওকে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছিস কেন ? ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়, আমার সামনে বসে খাবে'খন ।

দুজনে পাশাপাশি জলখাবার খেতে বসলাম । খেতে খেতে নাড়ু বললে, পণ্ডিত আবার দুষ্টুমি শুরু করেছে রে! আমি উৎসুক হয়ে বললুম, "সে কি ? আবার কোন পথে ?" নাড়ু হেসে বললে, "ভয় নেই, এবার অহিংস উপায়ে।" আমি বললুম, "সে আবার কি?" নাড়ু বললে, এবার মারধোরও নয়—রিপোর্টও নয়, এবার শুধু কথার মার-প্যাঁচ । সত্যি ভাই, আজকে এমন সব টিপ্পনী দিয়ে কথা বলেছেন যে, পিত্তিশুদ্ধু জ্বলে ওঠে। আমি চোখ বুজে বললুম, "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী !"

নাড়ু জোর দিয়ে কইলে, "না, কথা দিয়ে কথার মুখ বন্ধ করতে হবে।"

সন্ধ্যা পর্যন্ত নাড়ুর সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্তা চললো। যাবার সময় পিঠ চাপ্‌ড়ে সর্দি-ফর্দি ছেড়ে কাজে নামতে বলে বললে, "হ্যাঁ, কাল আসছ তো?"

আমি মাথা নেড়ে আমার সম্মতি জানালুম। এই নাড়ুই পণ্ডিতের গায়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছিল, আবার আজ আমি ইস্কুলে যাইনি বলে সেই নাড়ুই ছুটে এসেছে আমায় দেখতে। আমার একটা ধারণা ছিল, একটু বোম্বেটে বেপরোয়া গোছের ছেলে যারা, কারো সুখ-দুঃখের ধার ধারে না। নিজের আনন্দে নিজেই তারা পথ তৈরী করে চলে যায়। কিন্তু নাড়ু তো ঠিক তা নয়, এ রাস্তা তৈরী করেই ক্ষান্ত নয়, আশে-পাশে চাইবার অবকাশও ওর যথেষ্ট আছে।

তারপরের দিনও শরীর তেমন ভাল ছিল না, কিন্তু নাড়ুর সে ডাক উপেক্ষা করে ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না — ক্লাসে গেলুম। গিয়ে দেখি, পণ্ডিতের ওপর আবার সকলেই খাপ্পা হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঘন্টা বাঁধ্‌বে কে? ইচ্ছে আছে পুরো দমে সকলেরই, কিন্তু সাহস কৈ? খানিকবাদে নাড়ু এসে হাজির। আমায় দেখে বললে, "সেরে গেছিস্? বেশ, বেশ!"

আমি বললুম, "ক্লাসসুদ্ধ সকলেই তো পণ্ডিতের মুণ্ডুপাত কচ্ছে।"

সে শুধু জবাব দিল, — "হুঁ"।

সেদিন ইংরেজী ঘন্টার পর পণ্ডিতের ক্লাস। ইংরেজীর মাষ্টার চলে যেতে সকলে ভয়ে ভয়ে যে যার জায়গায় বসল।

পণ্ডিত ক্লাসে ঢুকে সকলের উপর টিপ্পনী কাটতে লাগ্‌লেন। হুঁ! চুলের বাহার ত খুব দেখছি! পড়াশুনার বেলায় ঢু ঢু! আবার কাউকে হয়তো বললেন — ওরে জ্ঞানা .... এঁঃ নাম তো খুব জমকালো জ্ঞানাঞ্জন, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! দ্যাখ, তোর বাবাকে বলিস্ তোকে দিয়ে লেখাপড়া হবে না — আরে বাবা, ছাগল দিয়ে হাল চাষ যদি হ'ত ত কেউ বলদ রাখতো না! আর একজনকে ডেকে বল্লেন জগাকে সেদিন ঐ পাড়াতে বিয়ে বাড়িতে দেখলুম— যেন নব কার্তিকটি। এখানে তোর কিছুই হবে না, বলিস তোর খুড়োকে পণ্ডিত মশাই একজোড়া বলদ কিনে দিতে বলেছেন।

এমনি নানারকম কথার খৈ পণ্ডিতমশায়ের মুখ থেকে ফুটতে লাগলো। তারপর আধ ঘন্টা পর ডাক এলো — এই ক্যাবলা, বই নিয়ে আয়, পড়া দে।

সেদিনকার সংস্কৃত পড়ার ভেতর এক জায়গায় ছিল — "শৃণুরে-বর্বর" —

পণ্ডিত মশাই বই না খুলেই আমাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠলেন — শৃণুরে বর্বরঃ—

হঠাৎ পিছন দিক থেকে তার জবাব এলো — "গর্দভঃ ব্রূতে" —

ক্লাস শুদ্ধ সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে গুরুতর এক দণ্ডের আশঙ্কায় বসে রইল। জবাব যে কার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, তা এক পণ্ডিত ছাড়া কারো জানবার বাকি রইল না।

পণ্ডিতের কান লাল হয়ে উঠল। কাউকে কিছু না বলে বইখানা টেবিলের ওপর রেখে পণ্ডিত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদে হেডমাষ্টার মশাই আর তাঁর পিছনে দপ্তরী লিক্‌লিকে একখানা বেত হাতে করে আমাদের ঘরে ঢুকল।

হেডমাষ্টার প্রথমে আদেশ, শেষে অনুরোধ করেও কে এমন কথা বলেছে, তাকে খুঁজে বার করতে না পেরে, ক্লাস সুদ্ধ সকলের দু'টাকা করে জরিমানা করে চলে গেলেন।

জরিমানা সকলেই দিতে পারব না, তা ছাড়া পণ্ডিতের ক্রোধানল কি নতুন বেশে আবার দেখা দেয়, সে ভয় সকলেরই ছিল। পরদিন প্রথম ঘন্টাই পণ্ডিতের। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে এসে আমরা ক্লাসে ঢুকলুম। কিন্তু খানিক বাদেই আমাদের অবাক করে পণ্ডিতের বদলে অংকের মাষ্টার এসে হাজির। আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। কারণ, পণ্ডিত এসেছেন, এ আমরা ইস্কুলে ঢোকবার সময়েই দেখেছি — অংকের ক্লাস শেষ হতেই একটি

ছেলে ছুটে লাইব্রেরীতে গেল খোঁজ নিতে। মিনিট দশেক পরে সে লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে — সুখবর দিলে, পণ্ডিত আর আমাদের ক্লাসে পড়াবেন না, তিনি আমাদের নীচু ক্লাসের সঙ্গে রুটিন বদলে নিয়েছেন।

রাম বাঁচা গেল। আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমরা নাড়ুকে ঘিরে ধেই ধেই করে ক্লসের মধ্যে নাচতে শুরু করে দিলুম।

পণ্ডিত আমাদের ছেড়ে যাবার পর থেকেই ক্লাসটা ভয়ানক নির্জীব হয়ে পড়ল। ধাক্কা খেলে লোকের স্বরূপটা যেমন শিগ্‌গীর বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আর কিছুতে নয়। কষ্টিপাথরের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতেই পাকা সোনার রং ধরা পড়ে।

পণ্ডিতের সে তাড়নাও আর নেই, আমাদের মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন নেই। দিব্যি "গড্ডলিকা" প্রবাহে ভেসে চলেছিলুম, শান্ত নিরীহ মেষ শিশুর মতো। এই সময়েই আমি হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করে বসলাম, "আয় না সবাই মিলে একটা থিয়েটার করি।"

নাড়ু মাথা নেড়ে বললে, "ব্যাপারটা তো খুব খারাপ শোনাচ্ছে না। এর মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে, সে কথা মানতেই হবে।"

বিপিন বললে, "থিয়েটার করতে আমি সব সময়েই রাজী — যদি তোমরা আমায় রাজার পার্ট দাও। এমন অ্যাকটিং করবো যে, সবাই হকচকিয়ে যাবে।"

হরিশ প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললে, "ওরে বাবা, চূণ-কালি মেখে হনুমান সাজা ......আমি ওর মধ্যে নেই।"

আমি হো হো করে হেসে উঠে বললাম "তাহলে হরিশ, তোমার পরিষ্কার ভাবে জানা আছে যে মুখখানি তোমার ঠিক লংকা পোড়ারই মতো। নইলে নাটকে এত পার্ট থাকতে বেছে তোমার সেই হনুমানের কথাই মনে হল কেন?"

হরিশ খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, "সত্যি, আসল হনুমানের মতো দেখায় নাকি রে? বাড়ীতে তা সবাই ওই নামেই আমায় ডাকে। মুশকিল কি হয়েছে জানিস? আমাদের বাড়ীতে কোন আয়না নেই। নিজের মুখটা যে একবার ভালো করে দেখবো তার কি যো আছে?"

হরিশের সরস স্বীকারোক্তি শুনে আমাদের সকলকার হাসির মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

বিপিনের যেন আর সবুর সইছে না। বললে, "অত কথার কচ্‌কচির দরকার কি বাপু? তার চাইতে "হরিশচন্দ্র" নাটক করো — "শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র", এমন অ্যাকটিং করবো যে, সবাই শুনে ভিরমি খেয়ে পড়বে।"

নাড়ু মুচকি হেসে ফোড়ন কাটলে "তোর অ্যাক্‌টিং শুনে সবাই যদি ভিরমি খেয়েই পড়ে তবে মেডেল দেবার জন্য তা কারো হুঁশ থাকবে না! তা হলে

তোর সব বক্তৃতাই যে বেনা বনে মুক্তো ছড়ানোর মত হবে। বিপিন মাথা নেড়ে জবাব দিলে, "সে কথাও ত ঠিক। মেডেল একটা চাই। নইলে লোকে খাতির করবে কেন? আর বাড়ীর লোককে গিয়েই বা কি দেখাবো?

অমর বললে, "পন্ডিতমশায়ের কুলুঙ্গীতে কতকগুলো যাত্রার বই দেখেছি। সেই থেকে একটা পালা আমরা থিয়েটার করতে পারি।" বিপিন লাফিয়ে উঠে বললে, "ওরে বাবা। পণ্ডিত এমনিতেই আমাদের ওপর চটে আছে। তার ওপর যদি যাত্রার বই চাইতে যাই, তবে সবাইকে মেরে একেবারে তক্তা করে ছাড়বে।" নাড়ু আঙুল কামড়ে খানিকটা কি ভাবলে, তারপর হঠাৎ দুটো কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "ঠিক হয়েছে। চল সবাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে। আরে, ভয়টা কিসের? কবরেজী বড়ির মত আমাদের জল দিয়ে ত আর গিলে খাবে না। পায়ের ধুলো নিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবো'খন।"

হরিশ তখনও গাঁই-গুঁই করছিল।

নাড়ু তার হাতটা ধরে টেনে বললে, "আরে, আয় না আমার পেছন পেছন, পণ্ডিত মশাই রেগে গিয়ে যদি চোখ থেকে আগুন বের করেন ত আমিই না হয় ভস্ম হয়ে যাবো। তোরা সবাই জ্যান্তই ফিরে আসতে পারবি।"

আমরা সবাই গুটি গুটি নাড়ুর সঙ্গে রওনা হলাম। কেন না, এত কথার পরও যদি পেছপা হই, তবে ভীতু বলে বদ্‌নাম হবে যে।

সন্ধ্যার পর পণ্ডিত মশাই চোখে চশমা লাগিয়ে সুর করে রামায়ণ পড়ছিলেন। এতগুলো ছেলেকে একসঙ্গে তাঁর উঠোনে ঢুকতে দেখে সুতো-বাঁধা চশমাটা কপালের ওপর তুলে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম। নাড়ু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধুলো জিভে আর মাথায় ঠেকিয়ে বললে, "আপনার কাছ থেকে একটু উপদেশ নিতে এলাম। ভেবে ঠিক করেছি, আমরা আর আপনার কথার অবাধ্য হব না।"

পণ্ডিত মশাই খুশী হয়ে বললেন, "বেশ। তোমাদের সুমতি হোক।" তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন, "তা বাবা, তোমরা কি বিষয়ে উপদেশ নিতে এসেছ?" নাড়ুর দেখাদেখি ততক্ষণে আমরাও পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে দাওয়াতে তাঁর পাশে বসে গেছি।

পণ্ডিতমশায়ের প্রশ্নের উত্তরে নাড়ু বললে, "আজ্ঞে, আমরা একটু ঠাকুর দেবতার নাম করতে চাই। আপনার কাছে সৎপরামর্শের জন্যে এসেছি। পণ্ডিত মশাই আনন্দে মাথা নাড়তে লাগলেন। বললেন, "এইবার তোমাদের সুমতি হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি। তা হলে এক কাজ করো তোমরা। 'পেহ্লাদের' পালা পেলে করো। হ্যাঁ, আরো একটা কথা, আমার ছোটছেলে ক্যাবলা—

আমার নিজের সন্তান বলে বলছিনে বাবা; ওর গানের গলাটা ভারী মিঠে। যখন গলা ছেড়ে গান গায়, "ওরে মধুসূদন — দাও হে শ্রীচরণ—" তখন আসরে কেউ চোখের জল রাখতে পারবে না। ওকেই তোমরা পেহ্লাদের পার্টটা দাও। দেখবে, ক্যাবলা একাই তোমাদের 'থ্যাটর' জমিয়ে দিতে পারবে।"

তারপর আমাদের কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই পণ্ডিত মশাই হাঁকলেন "ওরে ক্যাবলা, শিগ্‌গীর শুনে যা" —

পণ্ডিতমশায়ের ডাকে যে ছেলেটি এসে আমাদের সামনে হাজির হ'ল, সে বোধ করি কিছুক্ষণ আগে লুকিয়ে গুড় খাচ্ছিল। মুখের দু-পাশ বেয়ে গুড়ের ঝোল গড়িয়ে পড়ছে .... গলায় একটা প্রকাণ্ড মাদুলী .... খালি গা .... ধুতিটা কোমরে বাঁধা।

দেখে আমাদেরই লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্যাবলাকে দেখতে পেয়েই তিনি বললেন, "ওরে ক্যাবলা— পেহ্লাদের সেই গানটা গা ত একবার .... এই আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে, শুনবে।"

ওই মূর্তিতে সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হয়ে গেল। সে যে কী ভঙ্গী, কী সুর আর কী গলা .... ঠিক লিখে বোঝানো যাবে না।

গান শেষ হলে নাড়ু বললে, "চমৎকার হবে পণ্ডিত মশাই, তাহলে পালাটা আমাদের দিন — আমরা যে যার পার্ট লিখে নিয়ে 'মহলা' শুরু করে দিই। পেহ্লাদ ত আমাদের ঘরেই রইল।"

আনন্দে আটখান' হয়ে পণ্ডিত মশাই বললেন, "ঠিক কথা বাবা! ঠিক কথা।" তারপর বটতলার ছাপা একটি জীর্ণ 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাড়ুর হাতে দিয়ে বললেন, "বই হারিয়ো না যেন বাবা! তোমাদের 'পার্ট' লেখা হয়ে গেলেই আমায় ফেরৎ দিয়ে যেও।"

সে কথা আর বলতে! নাড়ু আগ্রহে বইখানি হাতে তুলে মাথায় ঠেকালো আর একদফা পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা পথে পা বাড়ালাম।

খানিক দূর আসবার পর আমরা সবাই রাস্তার মাঝখানেই নাড়ুকে ছেঁকে ধরলাম। বিপিন রেগেমেগে বললে "এটা তোর কি কাণ্ড হল নাড়ু? ওই ক্যাবলা যদি পেহ্লাদ হয়, তবে সবাই আমাদের পালচাপা দেবে .... একথা আমি আগেই বলে রাখলাম।"

নাড়ু মুচকি হেসে জবাব দিলে, "আরে তোরা কয়েকটা দিন চুপ করে থাক্ না। তারপর দেখবি রগড়টা কেমন জমে!"

রগড়ের আশায় আমরা সবাই চুপ মেরে গেলাম। সাতদিন পরেই অভিনয়। আমরা যে যার পার্ট খুব ক'ষে মুখস্থ করেছি। ক্যাবলা যে কি করবে, সেই হয়েছে সক্কলকার মস্ত বড় ভাবনা।

অভিনয়ের দিন পাড়ায় একেবারে হুলস্থুলু কাণ্ড। গোটা পাড়া ভেঙে এসেছে -- ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই। পণ্ডিত মশাই তাঁর ছেলের ক্যারামতি দেখাবার জন্য ইস্কুলের সব মাষ্টার মশাইকে নেমন্তন্ন করেছেন। খবরের কাগজ জুড়ে জুড়ে সীন তৈরী করা হয়েছে। আর নানান রকম গুঁড়ো রঙ আর ফুল ঘষে ঘষে দৃশ্য আঁকা হয়েছে।

যে দেখছে, সেই ছেলেদের মুনশীয়ানা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

পাড়ার যত ভাঙা ক্যানেস্ত্রা ছিল, তাই জড় করে 'অর্কেষ্ট্রা পার্টি' তৈরী করা হয়েছে। ইস্কুলের সামিয়ানাটা পণ্ডিত মশাই অনেক তদ্বির করে চেয়ে নিয়ে এসেছেন; সেটাও ছেলেরা অনেক কষ্টে টানিয়ে দিয়েছে। ক্যানেস্ত্রা-কনসার্ট বেজে উঠল।

ছেলের দল গোলমাল থামাতে ব্যস্ত।

এমন সময় নাড়ু ষ্টেজের সামনে এসে ঘোষণা করলে, "আজ আমাদের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয়ের আগে একটা নক্সা হবে। আশা করি, নক্সাটা আপনারা উপভোগ করবেন! নক্সাটার নাম কি, তা ছেলেরা এক্ষুনি আপনাদের জানিয়ে দেবে।"

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠে গেল। দুটি ছেলে একটি লম্বা কাগজ দু'পাশে ধরে ষ্টেজে হাজির হল। তাতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে—গুঁতিয়ে দিল ষাঁড়ে"। একটি ছেলে ঠিক পণ্ডিতমশায়ের মতো চেহারা করে মঞ্চে ছুটে বেরিয়ে এলো — আর তার পেছনে পেছনে ষাঁড়ের মুখোশ পরা একটি ছেলে।

পণ্ডিতের ভূমিকায় ছেলেটি যত "বাঁচাও — বাঁচাও" বলে চীৎকার করে -- ষাঁড় তত তার পেছনে তাড়া করে। সেই সঙ্গে চল্লিশটি ক্যানেস্ত্রার শব্দ। ছেলেরা এই মজার কাণ্ড দেখে ক্রমাগত হাততালি দিতে লাগলো।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই ঃ

কিছুদিন আগে পণ্ডিত মশাই যজমান বাড়ী গিয়েছিলেন। চাল কলার পুঁটলি বেঁধে যখন তিনি বাড়ী ফিরে আসছিলেন, তখন এক ষাঁড় তাঁকে তাড়া করে গুঁতিয়ে দেয়। এই কথাটা কি করে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। ষ্টেজের ওপর এই কাণ্ড দেখে পণ্ডিত মশাই রাগে ফুলছিলেন। তারপর ছেলেরা যখন ক্রমাগত হাততালি দিতে লাগলো, তিনি তখন মরিয়া হয়ে ছাতা নিয়ে ছুটলেন সেই ষ্টেজের দিকে।

চিৎকার করে বললেন, "আজ পরশুরামের মতো সবাইকে নিক্ষত্রিয় করে ছাড়বো। বাঁদর-বিচ্ছুদের একটাও জ্যান্ত রাখবো না!

পণ্ডিতমশায়ের ওই মার-মূর্তি দেখে ষ্টেজের সাজা-পণ্ডিত আর মুখোশ-পরা ষাঁড় পালিয়ে পগার পার! পণ্ডিত মশাই যাকে সামনে পেলেন, এলোপাথাড়ি

ছাতাপেটা করতে লাগলেন। ষ্টেজ-সীন-ভেঙে একাকার। তারপর ছেলেদের হুটোপুটিতে পায়ের ধাক্কায় বাতি গেল নিভে। সুতরাং পেল্লাদের গান যে কেমন জমেছিল, সেটা অনুমান করা একটুও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়! এই অভাবনীয় ঘটনার পর সব বাড়ীর অভিভাবকরাই একেবারে কড়া মেজাজের লোক হয়ে পড়লেন। ছেলেদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া দিন কয়েকের জন্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

কেন না সামনেই আমাদের পরীক্ষা। পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমরা দিন সাতেকের ছুটি পেলুম। এতে পড়াশুনার সুবিধা হলেও আমাদের দলের ভয়ানক ক্ষতি হতে লাগল। কারণ দেখাশুনা এক রকম প্রায় বন্ধ হয়েই গেল। আর এ সময়টাতে বাঙালীর ছেলে আমরা বড় একটা কেউ বাইরের ডাক শুনতে পাইনে। বইয়ের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকাই এ সময়টার চিরকেলে প্রথা।

পরীক্ষার আগের ক'দিন বাইরে যাইনি। এ ক'দিন পড়াশুনায় বাড়ীতেও বেশ ভাল নাম কিনেছিলুম। পরীক্ষার প্রথম দিন সকাল সকাল নেয়ে-খেয়ে পড়বার ঘরে ঢুকতেই মা ডেকে বললেন, "নীলু একবার এঘরে আয়।" গিয়ে দেখি, শোবার ঘরে মেঝেতে একটা ঘটের ওপর আমের পল্লব, আর ঘটের গায়ে তেল সিন্দুর দিয়ে একটি মূর্তি আঁকা। মা তার সামনে আমায় দাঁড় করিয়ে বললেন, "প্রণাম কর।" আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি! হাত তুলে নমস্কার করে পালাতে যাচ্ছি, আমার হাত ধরে মা বললেন, "দাঁড়া, বোস একটু।" নিরুপায় হয়ে বসে পড়লুম। মা আমার মাথায় সাপের মন্তরের মতো বিড়বিড় করে কি সব পড়তে লাগলেন।

ঠিক এমনি সময়টায় দরজার গোড়া থেকে আওয়াজ এলো, "খুব শক্ত মন্তর পড়ে দিন মাসিমা, পরীক্ষার ভয় মগজে ঢুকতে পারবে না।" আমি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠলুম। মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোদের আর তর সয় না।" তারপর হাসি মুখে নাড়ুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আয় নাড়ু প্রণাম কর।" নাড়ু বললে, "ভূত প্রেতের আবার যাত্রা অযাত্রা কি মাসিমা, যেখানে-সেখানে অমনি আমাদের রাস্তা করে দেয়।"

মা বললেন, "তোরা যে আজকাল কি হয়েছিস—ঠাকুর দেবতা মানিস নে?"

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বললে, "কে বলেছে মাসিমা, আমরা ঠাকুর দেবতা মানিনে? দেখে আসুন আজকে কালীবাড়ীতে—পড়ুয়াদের কি ভিড়! আজকে সব ভক্ত।" নাড়ুর বলবার ভঙ্গি দেখে মা হাসতে লাগলেন।

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় নাড়ু মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, "এতেই আমাদের যাত্রাপথে কোন বাধা থাকবে না মাসিমা!" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "নে নীলু, মায়ের আশীর্বাদ নিতে হয় তো সে ওইখানে" বলে একরকম জোর করেই আমাকে মায়ের পায়ের তলায় বসিয়ে দিলে।

দুজনে চুপচাপ রাস্তা চলছিলুম, প্রথমেই নাড়ু কথা বললে। রাস্তার পাশে কালীবাড়ীর দিকে আঙুল উঁচু করে বললে, "ঐ দেখ্।" চেয়ে দেখি, ছেলের পাল কালীবাড়ীর দেওয়ালের ওপর মাথা ঠুকছে। নাড়ু বলে যেতে লাগলো, "হয়তো এরাই এর আগে কালীবাড়ীর দিকে ফিরেও তাকাতো না। আর কাণ্ড দেখেছ, মাথা ঠুকতে ঠুকতে দেয়ালের গা তেল-তেলে করে দিয়েছে। আরে বাবা, একি আফিসের বড়বাবু, যে একদিন খোসামোদ করলে কিম্বা ডালি পাঠালেই কাজ-হাঁসিল হবে?"

নাড়ু এমনি অনেক কিছু বকছিল। তার কোনো কথার জবাব দিলুম না—শুধু এই কথাটাই ভাবতে লাগলুম—বাস্তবিক আমরা কি হতে যাচ্ছি?

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, উপরো-উপরি দিন কয়েকের পরিশ্রমে শরীরটা একটু ভেঙে পড়েছিল। বিছানার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষার ফলের কথাই ভাবছিলাম—এমন সময় অমর এসে খবর দিলে নাড়ু আমায় ডাকছে। বেরোবার বড় ইচ্ছে ছিল না, তবু ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে অমরের সঙ্গে রাস্তায় এসে নামলুম। নাড়ুদের ওখানে পৌঁছে দেখি, তার পড়ার ঘরে আমাদের দলের মজলিস বসে গেছে।

নাড়ু আমায় বললে, "কি হে, পোষা মেনিটীর মতো একেবারে ভেতরে সেঁদিয়ে আছ, বেরোবার নামটি নেই।"

বললুম, "শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

আমার দু'হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "আরে ওসব শরীর খারাপ টারাপ সব সেরে যাবে'খন। দেখো, একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, শরীরের পেছনে যতই লাগবে—তোমাকে সে ততই পেয়ে বসবে। মনে স্ফূর্তির ঝড় বইয়ে দাও দেখি"—এই বলে সে আমার সমস্ত শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। আরে বাবা সে কি ঝাঁকুনি— তাতে আমি তো আমি, আমার অন্তরাত্মার পর্যন্ত কাঁপন লাগিয়ে "শরীর খারাপ" যে কোথায় পালিয়ে গেল—তার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না!

খগেন বললে, "সত্যি ভাই একটানা জীবন আর ভালো লাগে না। এই একজামিন হয়ে গেছে, একটা কিছু করো নাড়ু, একটা চড়ুইভাতিরই না হয় [illegible] করে ফেল।" সকলে সায় দিয়ে বললে, "ঠিক, ঠিক— একটা বড় রকমের চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত করে ফেল দাদা। ওপারে নদীর চরে গিয়ে বেশ হবে'খন!" কথাটায় বেশ রস পেলুম। মুখ চট্‌কে বললুম, "হ্যাঁ, একটা পাঁঠা কিম্বা খাসী যদি যোগাড় করতে পার, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না।"

নাড়ু বললে, "চড়ুইভাতিও হতে পারে, পাঁঠাও চলতে পারে—কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনে

নয়। যদি ছলে বলে কৌশলে যোগাড় করতে পার, তবেই বলব তোমাদের বাহাদুরি।”

আমি বললুম, “কথাটা নেহাৎ মন্দ শোনাচ্ছে না, বেশ একটু অ্যাড্‌ভেঞ্চারও হবে।”

বিপিন চেয়ারটা একটু সরিয়ে এনে খাটো গলায় বললে, “ওহে, আমি একটার খোঁজ দিতে পারি।” হরিশ বললে, “কোথায় হে? পাড়ার মিত্তিদের সেই কালো পাঁঠাটা বুঝি?” বিপিন বিরক্ত হয়ে বললে, “না, না মিত্তিদের হতে যাবে কেন? ও পাড়ার রায়বাবুদের বেশ একটা নধর পাঁঠা দেখে এলুম। বোধহয়, কোনো প্রজা দিন দুয়েক হল দিয়ে গেছে।”

নাড়ু বললে, “ঠিক। বড়লোকদের জিনিস যাওয়াই ভালো। তার ওপর যখন প্রজার ঘাড় ভেঙে আদায় করেছে, ও তো আমাদেরই পাওনা।”

অনেক গবেষণার পর ঠিক হল, রায়বাবুদের নধর পাঁঠাটি যখন আমাদের রক্ত মাংস বৃদ্ধি করবার জন্যই মর-জগতে এসেছে, তখন তাকে কিছুতেই এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এখন কি উপায়ে ছাগ নন্দনকে ওখান থেকে সরানো যায় সেইটেই হল সব চাইতে বড় সমস্যা। নাড়ু বললে, “আগে দু'একদিন গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। কোথায় তাকে সমস্ত দিন বেঁধে রাখে, কে তার রক্ষক—এইসব খুঁটিনাটি তত্ত্ব আগে যোগাড় করে ফেল—তারপর এক শুভদিন দেখে কাজ সমাধা করলেই হবে।” অমর ছেলেমানুষ, তাকে কেউ সন্দেহ করবে না—কাজেই টিকটিকির কাজটা তার ওপরেই পড়ল।

এর দু'দিন পরে সন্ধ্যেবেলা—নাড়ুর ওখানে মজলিসটা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় অমর ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে সকলের মাঝখানে ঝুপ করে বসে পড়ল।

হরিশ তার হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে বললে, “কি রে, ফিটের ব্যামো-ট্যামো নেই তো?”

অমর শুধু চোখ বুজে বললে, “পাখী উড়ে গেছে।”

আমি বললুম, “কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বল, ভাল বুঝতে পারলুম না।”

অমর বললে, “বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু। রায়বাবুদের পাঁঠা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে!” নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে, “অ্যাঁ—বলিস কি রে? তার চেয়ে আমার যে জিভে জল আসে, সেই জিভটা কেটে ফেলে দে না রে—।” তারপর ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করে দিলে।

আমি হেসে বললুম, “আহা, আগেই মরা-কান্না শুরু করে দিলে? ওতে আমাদের শুভ কাজের অকল্যাণ হবে যে!” নাড়ু শুধোলে, “হয়েছিল কি রে? আমার কথা কাউকে কিছু বলেছিলি না কি?”

অমর নাড়ুর হাত ধরে বললে, "আমি তোমার গা-ছুঁয়ে বলতে পারি— কাউকে আমি পাঁঠার একটি কথাও বলিনি; —তবে" ব'লে সে একটা ঢোক গিলল।

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বললে, "আবার তবে কি রে?" অমর মাথা চুলকে বলল, "যে ছোকরা চাকরটা পাঁঠাকে সারাদিন আগলে রাখে, আমি শুধু তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, পাঁঠাটা রাত্তিরে কোথায় থাকে?" নাড়ু হাঁ করে অমরের কথা গিলছিল—এই কথা শুনে সে হতাশ হয়ে বসে পড়ে বলল, "এঃ! তবেই সেরেছে! ও নিশ্চয়ই বাড়ীতে গিয়ে এক কথায় দশ কথা সাজিয়ে বলে দিয়েছে। তার ফলে হয় পাঁঠা রায়বাবুদের পেটে গেছে, নয়তো অন্য কোন আত্মীয় বাড়ী রেখে দিয়েছে।" অমর এতক্ষণ বোকা বনে গিয়ে চুপচাপ বসেছিল, এইবার একটু সাহস পেয়ে খাটের ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটা একটু সোজা করে— ধীরে ধীরে চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, "না, আমি জানি, রায়বাবুরা খায়নি।"

হরিশ বললে, "যদি না খেয়ে থাকে— তো আমি জোর করে বলতে পারি ও পাঁঠা দারোগা বাড়ী গেছে।" নাড়ু বললে, "দারোগা-বাড়ী আবার কোনটা বল্ তো?" আমি বললুম, "দারোগাগিরি করে মেলা টাকা জমিয়ে ছিল—সেই থেকে ওরা জমিদারী কিনে কিনে—আজ মস্ত বড় জমিদার।"

নাড়ু বললে, "ওসব দারোগা-ফারোগা বুঝিনে, যখন একবার লোভ লাগিয়ে দিয়েছ, ও পাঁঠা তখন খেতেই হবে।

বিপিন বললে, "শেষকালে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? না বাবা, অতটা সহ্য হবে না"—

নাড়ু টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বললে, "কেন হবে না? আলবৎ হবে।" তারপর দাঁড়িয়ে উঠে পেটে হাত বুলিয়ে বললে, "এই আমি বলে রাখলাম, ও পাঁঠা আমাদের পেটের মধ্যে আসবেই, তোমরা নিশ্চিত হয়ে মশলা বাটতে পার।" হরিশ বললে, "গাছে কাঁঠাল দেখে গোঁফে তেল দিলে আর সব সময় কাঁঠাল ছিঁড়ে পড়ে দাদা?"

নাড়ু বললে, "কাঁঠাল শুধু ছিঁড়ে পড়বে না—গোফের ফাঁক দিয়ে, একেবারে ভেতর গিয়ে সেঁধোবে। তবে বাবাজীদের একটু খাটতে হবে, তা আগেই বললে, "তাতে আমরা খুব রাজী—কিন্তু বেড়ালের গলায়

াগেই পেটে পুরে রাখলে, কিন্তু দারোগাবাড়ী আর উপায় নেই, তা জানো?" নাড়ু চোখ বললে, "খেয়ানৌকায় পার হওয়া যায় বটে,

কিন্তু পাঁঠা নিয়ে সকলের সামনে তো আর খেয়া দিয়ে আসতে পারবে না।" বিপিন বললে, "নৌকোর জন্যে আটকাবে না—আমাদের ঘাটে নৌকো রয়েছে, আর সুবিধেও আছে, দাদা বাড়ীতে নেই।" নাড়ু বললে, "তবে চল্ এক্ষুনি আর দেরী নয়।" আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, "আজই? এক্ষুনি? তুমি পাগল হয়েছ নাড়ু?" নাড়ু মাথা নেড়ে বললে, "কথা যখন উঠেছে, তখন ও পাঁঠার মাংস আজই আমার মুখের মধ্যে চাই।" এই বলে সে মুখ চট্‌কাতে লাগলো। পাঁচ জনে তক্ষুনি উঠে পড়লুম। রাস্তায় কোন কথা হল না। এই কথাটুকুই শুধু সকলে প্রাণে প্রাণে বুঝলাম, যে কাজ আমরা শুধু নিছক আমোদের জন্যে হাতে তুলে নিলুম, তা যে করেই হোক শেষ করতে হবে। আর আমাদের এক কাজ করবার সকল উদ্যমের কেন্দ্র হয়ে রইলো—নাড়ু।

বিপিনদের বাইরের ঘাটেই নৌকা বাঁধা ছিল, আমরা গিয়ে নৌকোয় উঠলুম। নাড়ু বললে, "বিপিন, হাত-বৈঠে আছে?"

"আছে" বলে বিপিন বাড়ীর ভেতর চলে গেল—খানিকবাদে চারখানা বৈঠে নিয়ে এসে নায়ে উঠলো। আমরা চারজন চারখানা বৈঠে ধরলুম। রাস্তা ভালো জানে বলে হরিশ গিয়ে হালে বসলো। কোনো কথা নেই, শুধু ছপ্ ছপ্ শব্দে জল কেটে বৈঠেগুলো নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চললো। সবে চাঁদ উঠেছে। গাছের মাথায় মাথায় ছিটকে ছিটকে জ্যোৎস্না পড়ে আকাশটাকে ফাঁক করে ধরে রেখেছিল। মন্দিরের পাশ দিয়ে, বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে, তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে, জ্যোৎস্না এসে চলতি পথে আমাদের নৌকার উপর আলো-ছায়ার খেলা শুরু করে দিল। খানিকটা গিয়েই নৌকা বাঁ দিকে চললো। সোজা খাল, ধারে ধানের ক্ষেত।

ধান কাটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় খড়ের গাদা— ঠিক যেন নির্বাক সাক্ষীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। দূরে চাষীদের কুঁড়ে থেকে ক্ষীণ আলো বেরিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে।

এপারে রায়বাবুদের দারোয়ান তেওয়ারীর পাকা কুঠুরী থেকে ভজন গানের দু'একটা রেশ ভেসে আসছিল। আমাদের হাতের বিরাম নেই— ছপ্-ছপ্ শব্দে নৌকা বর্ষার জলে মোচার খোলার মত এগিয়ে যাচ্ছিল। আরো খানিকটা গিয়ে নৌকা একটা সরু খালের ভিতর ঢুকলো। দুধারে লম্বা লম্বা গাছগুলো মাথার ওপর জড়িয়ে এক হয়ে গেছে, চাঁদের আলো তার ভেতর রাস্তা খুঁজে পায় না—ঠিক এমনি একটা খাল দিয়ে নৌকো চলতে লাগলো।

এতক্ষণে আমি একটা কথা বললুম, শুধোলুম, "এর চাইতে কি আর ভালো রাস্তা নেই রে হরিশ?" জবাব এলো, "কিন্তু তাহলে অনেক ঘুরতে হবে।" নাড়ু বললে, "তবে এইটেই ভালো।"

*　　*　　*　　*　　*

আবার চুপচাপ। সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তালে তালে বৈঠে ফেলতে ফেলতে মনে হলো, আমরাও যেন এই অন্ধকারের এক একটা বিশেষ অংশ। এই নিশ্চল বট—অশ্বত্থের সার, এই মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর ডাক, দু'ধারেই পচা আবর্জনার গন্ধ—এদের সঙ্গে যেন আমরা কোন যুগ থেকে একেবারে মিশে আছি। আমাদের বাদ দিয়ে এই বীভৎস রসের অনুভূতি যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

এ ভাবটা কতক্ষণ ছিল জানি না। চমক্ ভাঙল—যখন নৌকোটা খ—স্ করে এক জায়গায় এসে ভিড়ল। অন্ধকার তত বেশী না থাকলেও জায়গাটাকে যেন আরো ভয়াবহ বলে ঠেক্‌ল।

এতক্ষণ যা দেখছিলাম—তা অন্ধকারের ভেতরে দিয়েই দেখছিলাম। বিশেষ একটা আকার পেতে তা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেনি। কিন্তু এখন আলো-আঁধারের মাঝে যে জায়গায় এসে পৌঁছলুম, সে তার, একটা রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরল। নৌকোটা যেখানে এসে লাগলো, ঠিক তার সামনেই একটা উইয়ের ঢিবি—যেন আশেপাশের গাছগুলোর সঙ্গে বাজি রেখে তার মাথাটা আকাশের ভেতরে দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। দুদিকে পানা-পচা দুর্গন্ধে বোধহয় ভূতপ্রেতেরও অরুচি ধরে। আশেপাশের গাছের রাশি রাশি ঝরা পাতা পড়ে সমস্ত জায়গাটার মাটি ঢেকে রেখেছে।

সকলেই বৈঠে রেখে উঠে দাঁড়ালুম। নাড়ু আমায় বললে, "না, সকলে গেলে তো চলবে না। তুমি আর অমর নৌকোয় থাকো। আমরা তিনজনে পাঁঠার খোঁজে যাব; আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত নৌকো এখান থেকে কোথাও সরিও না।" তারা তিনজনে নৌকো থেকে নেমে ঝরাপাতার ওপর দিয়ে মর্-মর্ শব্দ করতে করতে ওপরে উঠে গেল। উইয়ের ঢিবির আড়াল হতেই ধীরে ধীরে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে এলো। শীতের সন্ধ্যা, বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস চালিয়েছিল—র‍্যাপারটা ভাল করে মাথার ওপর দিয়ে জড়িয়ে বসলুম।

অমর বললে, "বড্ড মশা হে।"

বাস্তবিক এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এইবার নিজের আশেপাশে চেয়ে দেখি, ঝাঁকে—ঝাঁকে মশা এসে যেন আমাদের ছেঁকে ধরেছে। তার ওপর অনেকদিন হয় তো মানুষের তাজা রক্তের স্বাদ খোঁজ পেয়ে দলবল নিয়ে ছুটে আসতে লাগলো।

বললুম, "র‍্যাপারটা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বোস্।"

অমর বললে, "নাহে, শুধু জড়িয়ে বসলে হবে না" এই বলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত র‍্যাপারে ঢেকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি বললুম," ওকি, শুয়ে পড়লি যে।" অমর শুধু বললে,"হুঁ।"

সেই নির্জন প্রান্তরে আমি একা বসে রইলুম। ছেলে-মহলে সাহসী বলে আমার বেশ নামডাক ছিল। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে যাব বলেও দু'একবার বাজি রেখেছি। কিন্তু আজ এই ঠাণ্ডা শীতের বাতাসে আলো-আঁধারের মাঝখানে কোত্থেকে ভয়ের একটা রেখা যেন মনের কোণে উঁকি মারতে লাগল। আস্তে আস্তে ডাকলুম,"অমর—ওরে অম্‌রা—"

র‍্যাপারের তল থেকে ক্ষীণকণ্ঠে আওয়াজ এলো উঁ—

বুঝলুম, তাকে ডাকা বৃথা। এইবার যেন চারিদিকের নীরবতা আমাকে আরো পেয়ে বসল। কেন যেন মনে হল, আমি প্রেতপুরীর ঠিক মাঝখানে এসে বসেছি। খানিকবাদেই হয়তো চারিদিকের এই ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে তাদের মজসিল বসে যাবে।

আমি যেন আজ দু'চোখ মেলে সামনা-সামনি তাই দেখতে কার ডাকে এখানে এসে বসেছি। "তারা আসবে" এই কথাটাই যেন জগতে সব চাইতে সত্যি বলে ঠেকতে লাগল।

হঠাৎ মাথা উঁচু করতেই ওটা কি ? নড়ছে, না আমার দিকে এগিয়ে আসছে! চোখ রগড়ে আবার দেখলুম—দেখি একগোছা কাশফুল বাতাসে দুলছে। মনে হল হাতের মুঠোয় প্রাণটা আবার ফিরে পেলুম। এরপর আর কোন দিকে চাইবারও সাহস রইল না—এবার যদি কাশফুল না হয়ে—

ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তারপর পেছনে দিকে—ও আবার কিসের শব্দ! দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে কাঠের মত বসে রইলুম।

হঠাৎ শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে চাইতেই দেখলুম, এবার আর কিছু নয় — মানুষই বটে! নাড়ু ছুটতে ছুটতে এসে নৌকোয় উঠলো। তখনো আমার সে ভাবটা কাটেনি।

নাড়ুর হাত চেপে ধরে বললুম, "কিসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস?"

সে খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলে, তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কেন শুনতে পাসনি?" নাড়ু আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে, "ভয় পেয়েছিস নাকি রে?"

আমি সে কথায় কান না দিয়েই বললুম "কিসের শব্দ, তাই বল না!"

হাসতে হাসতে নাড়ু বললে, "আরে বোকা, ও যে মশার ডাক্!"

আমি তো একেবারে চুপ!

নাড়ু বললে, "আয় শিগ্‌গীর আমার সঙ্গে — হরিশ নৌকোয় থাকবে।" আমি বললুম, "ওদিকের কি খবর? নাড়ু বললে, "সব জানতে পারবি — আয় শিগ্‌গীর!" এই বলে সে একরকম টেনেই আমায় নৌকো থেকে নামাল। ছুটতে

ছুটতে যেখানে গিয়ে পৌঁছলুম, সেটা দারোগাবাড়ীর পেছন দিকটা। দেখি বিপিন একটা গাছতলায় বসে আছে। আমাদের আসতে দেখে সে লাফিয়ে উঠে বললে, "ভারী সুবিধা হয়েছে হে। বাড়ীসুদ্ধু সব এইমাত্র থিয়েটার দেখতে গেল। বাড়ীর ভেতর এখন এক মাষ্টার, এক চাকর, আর বাইরে দারোয়ান ব্যাটারা সব আছে। মাষ্টারটাকে হাত করেছি। ওকে কিছু ভাগ দিলেই চল্‌বে। কোন্ ঘরে ছাগনন্দন আছেন, আমায় দেখিয়ে মাষ্টারটা এই শুতে চলে গেল।"

আমরা বললুম, "তবে আর কি — কাজ তো ফর্সা। কোন্ ঘরে আছে, চলো দেখি — "

ইশারায় আমাদের থামতে বলে বিপিন চুপি চুপি বললে, "ওহে, অত সোজা নয় একটু গোলমেলে আছে। পাঁঠা যে ঘরে বাঁধা, চাকর বেটা যে সেই ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে, নইলে কি আমি এতক্ষণ বসে আছি?" নাড়ু একটু ভাবলে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "নীলে, তোর কাছে পয়সা আছে?" আমি পকেটে হাত দিয়ে বললুম, "আছে একটা আনি।" নাড়ু বলেলে, "ওতেই হবে'খন।" এই বলে আনিটা বিপিনের হাতে দিয়ে বললে, "যা দিকিন্ বাড়ীর সামনের দোকান থেকে দু'পয়সার তেল আর এক পয়সার সরষে নিয়ে আয়।"

বিপিনকে তার মুখের দিকে হাঁ কবে তাকিয়ে থাকতে দেখে নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বললে, "তাকিয়ে রয়েছিস কেন? শিগ্‌গীর নিয়ে আয়।"

বিপিন ছুটে চলে গেল।

আমি বললুম, "তেল আব সরষে দিয়ে কি হবে নাড়ু?"

নাড়ু বললে, "তুই দেখতে ছোট আছিস্ — তোকেই এ কাজ কবতে হবে।"

আমি বললুম, "কি করতে হবে বল না ছাই।" নাড়ু ফিক্ করে হেসে বললে, "আনুক তো আগে তারপর দেখ কি হয়।" —

একটু বাদেই কাগজে মোড়া কিছু সরষে আর ছোট্ট একটা শিশিতে সরষের তেল নিয়ে বিপিন হাজির হল।

নাড়ু জিজ্ঞেস কবল, "কোন্ ঘরটায় আছে?"

বিপিন রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট ঘর দেখিয়ে দিলে। ঘরটার সব দরজাই বন্ধ শুধু একটা জানলা মাত্র খোলা রয়েছে। নাড়ু চুপি চুপি আমায় বললে, "দ্যাখ্, তুই ছোট্ট আছিস — এই জানলা দিয়ে তোকে আমরা দুজন উঁচ করে ধরে গলিয়ে দেব। এই দুটো জিনিস সঙ্গে নে।"

আমি বললুম, "কি হবে ওতে?"

নাড়ু বললে, "শোন্ না, ভেতরে ঢুকে পাঁঠাটার কানের মধ্যে সরষে ঢেলে দিবি — আর তেল লাগিয়ে দিবি জিভে" —

আমি বললুম, "কেন?"

নাড়ু বললে, "তা হলে পাঁঠাটা আর ডাকতে পারবে না।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "সত্যি?"

ও বললে, "হ্যাঁ, আর দ্যাখ তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিবি — আমি আর বিপিন গিয়ে তখন পাঁঠাটাকে তুলে নিয়ে আসবো।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, "যদি চাকরটা জেগে ওঠে?"

নাড়ু বললে, "আরে দূর বোকা, টের পাবে কোত্থেকে? তুই তো আগেই গিয়ে পাঁঠাটার ডাক বন্ধ করে দিবি।"

রাজী হলুম।

দুজনে উঁচু করে ধরে আমায় ভেতরে গলিয়ে দিলে। ঢুকেই দেখি কোণে তেলের বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। চাকর বেটা বিছানায় পড়ে ভোস্-ভোস্ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর পাঁঠাটা এক কোণে শুয়ে কাঁঠালের পাতা চিবুচ্ছে। প্রথমটা আমি থতমত খেয়ে গেলুম। তারপর কি ভেবে ফস্ করে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলুম। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকলো। আস্তে আস্তে নাড়ুর কথামত পাঁঠার জিভে তেল ঘষে দিলুম। শুধু একটিবার ব্যা-আ—শব্দ করেই পাঁঠাটা আর আওয়াজ করতে পারলে না। আমি তো ওষুধের গুণ দেখে অবাক্। তারপর সব সরষেগুলো দুই কানে ঢেলে দিলুম। পাঁঠাটা মরার মত মাটিতে পড়ে রইল। বাস্ আমার কাজ ফর্সা —

পেছনে চেয়ে দেখি, চাকর বেটা বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

নাড়ু ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক করেছিস তো?" আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

ওরা বললে, "নীলে, দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দে" —

দরজা ভেজিয়ে তিনজনে এসে রাস্তা ধরলুম। নাড়ু বললে, "সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। কেউ দেখতে পাবে হয়তো। সোজা গাছের ফাঁক দিয়ে — চল দেখে।"

আমি বললুম, "সেই ভালো।"

নৌকোয় ফিরে এসে দেখি, দুটোতেই আরাম করে ঘুমোচ্ছে। তাদের ঠেলে তুলে দিলুম। নাড়ু বললে, "নৌকোর তক্তা তুলে পাঁঠাটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখ, আর যদি নড়াচড়া করবার চেষ্টা করে তো — একটা কচুর পাতা ওর কানের ওপর রেখে ছোট্ট একটা ঢিল চাপা দিস্।" এই বলে পাশ থেকে গোটাকয়েক কচুপাতা তুলে নৌকোয় ফেলে দিলে।

বিপিন বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?"

নাড়ু বলল, "না, আমি আর নীলে খেয়া দিয়ে যাবো। পাঁঠার খোঁজ খবর করছে কিনা, একটু খবর নিয়ে যেতে হবে। তোমরা শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর চলে যাও।"

নৌকা ছেড়ে দিল। নাড়ু আর আমি নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলুম।

দারোগাবাড়ীর সামনের দিকটায় যেতেই দেখতে পেলুম জনকয়েক দারোয়ান এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। আমাদের দেখতে পেয়ে একজন এসে জিজ্ঞেস করল, "বাবুজী, — ইধার একঠো বক্‌রী দেখা?"

আমরা বললুম, "এদিকে, কৈ না তো!"

লোকটা ছুটতে ছুটতে আরেক দিকে চলে গেল। নাড়ু বললে, "আর দরকার নেই, বৃষ্টি আসছে, ছুটে চলো।"

ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, এরি মধ্যে প্রায় আধখানা আকাশ কালো কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। বৃষ্টি এলো বলে। দু'জনে ছুটে চললুম। আধ মাইলটাক যেতেই সামনে খেয়া। নদীটা কোন কালে খুব বড় ছিল। এখন চব পড়তে পড়তে খুবই ছোট হয়ে গেছে। স্রোতও নেই বললেই চলে।

খেয়ার মাঝি নেই — নৌকাব এধার-ওধার শক্ত রসি দিয়ে দু'ধারেব সঙ্গে বাঁধা। লোকে রসি ধরে নৌকাখানা এপার ওপারে টেনে যাতায়াত করে।

নাড়ু বললে, "শিগ্‌গীর ওঠ।" রসি টেনে তো দুজনে ওপারে গেলুম। আবার ছুটতে যাচ্ছি। নাড়ু বললে, "থাম। ছুরি আছে?" পকেট থেকে ছুরি বের করে দিলুম। নাড়ু খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে এপারের সঙ্গে বাঁধা রসিটা কেটে ফেলে দিল।

আমি বললুম, 'ও কি হল?" নাড়ু ছুরিটা আমার পকেটে ফেলে দিয়ে বললে, "যাঃ ব্যাটারা আর খেয়া পার হয়ে এদিক পানে খুঁজতে আসতে পারবে না।" তারপর দুজনে সে কি ছুট্‌ — এমন ছোটা জীবনে কখন ছুটেছি বলে মনে পড়ে না। খানিকটা যেতেই মেঘগুলো চাঁদটাকে ঢেকে ফেললে। রাস্তা-ঘাট একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। দু'চক্ষে কিছু দেখবার যো'টি নেই। একবার একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে কাপড়খানা ফ্যাস্‌ করে গেল ছিঁড়ে। নাড়ু বললে, "আমার হাত ধর।"

তারপর আবার ছুট। বিপিনের বাড়ীর কাছাকাছি গেছি, এমন সময় ঝুপ্‌-ঝুপ করে বৃষ্টি এলো, ভিজতে ভিজতে ওদের বৈঠকখানা ঘরে উঠলুম। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ফরাসের ওপর তিন মূর্তি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। চৌকীর পায়ার সঙ্গে বাঁধা ছাগ-নন্দন শীতে থরথর করে কাঁপছে।

নাড়ু বললে, "দেখেছিস্‌ ব্যাটাদের কাণ্ড দেখেছিস্‌?" এই বলে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সকলকে টেনে তুলল। কাঁচা ঘুম ভাঙতেই তারা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললে, "কি — কি — কি হয়েছে?"

নাড়ু রেগে বললে, "হয়েছে আমার মাথা আর তোদের মুণ্ডু। পাঁঠাটাকে যে এখানে বেঁধে রেখেছিস্, তোদের এটা মাথায় এলো না যে, কেউ দেখলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে?"

বিপিন বললে, "তা কি করবো? আজকে রাত্তিরের মত অমনি থাকবে— কালকে যা হয় একটা ব্যবস্থা করলেই হলো।"

নাড়ু বললে, "হ্যাঁ, যাতে নাকি একেবারে হাতে-হাতে ধরা পড়ে যাও। সে সব কথা শুনতে চাইনে। আজকে এক্ষুণি খেতে হবে।" আমরা সব একসঙ্গে বলে উঠলুম, "আজকে — অসম্ভব।"

নাড়ু হেসে বললে, "তার মানেই সম্ভব।"

আমি বললুম, "প্রথম কথা — কাতা কৈ?"

বিপিন বললে, "কাতার জন্য আটকাবে না, পাশের ঘরেই আমাদের পাঁঠা বলি দেবার খড়্গ আছে।"

নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে, "নিয়ে আয় কাতা।" তারপর নিজেই ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে কাতাখানা বের করে নিয়ে এলো। হরিশের দিকে তাকিয়ে বললে, "হরিশ, নিয়ে আয় তো পাঁঠাটাকে জলের ধারে" —হরিশও অমনি সুবোধ বালকের মতো পাঁঠার দড়ি ধরে টানতে টানতে জলের ধারে নিয়ে চললো — আমি চেঁচিয়ে বললুম, "আহা-হা কর কি নাড়ু — শোনো।" — কিন্তু কার কথা কে শোনে? নাড়ু ততক্ষণ পাঁঠার ধড় থেকে মাথাটা খসিয়ে দিয়েছে।

বিপিন বললে, "তারপর এখন কি করা?"

নাড়ু কাতাখানা রেখে বলল, "হরিশ, তোমার ওখানে ইক্-মিক-কুকার আছে — আমি জানি — ওটা এক্ষুণি চাই।"

হরিশ বললে, "নৌকা নিয়ে গেলে শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর আসতে পারি।"

নাড়ু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "নীলে, নৌকা নিয়ে ওর সঙ্গে যা।" তারপর বিপিনের দিকে ফিরে বললে, "বিন্দেকে জাগিয়ে আমার নাম করে চাল, ঘি, মশলা, —যা যা দরকার সব নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ মাংসটা ছাড়িয়ে ফেলি।

কাছেই একটা মুদির দোকান ছিল। রাত্তিরে বিন্দে বলে একটা ছোকরা দোকান ঘরে শুতো — নাড়ু তার কাছ থেকেই জিনিস পত্তর নিয়ে আসতে বললে।

বিপিন চলে গেল দোকানের উদ্দেশে, আমি আর হরিশ গিয়ে নায় উঠলুম। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস। তার ওপর টিপ্‌টিপ করে তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু উপায় নেই পাঁঠার সংগতি আজকেই করতে হবে, কালকে ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা। আর ঠাণ্ডায় পাঁঠার মাংস উপাদেয় সন্দেহ নেই।

ভাগ্যিস্ হরিশের পড়বার ঘরেই কুকারটা ছিল, নইলে অত রাত্তিরে ঐখানেই এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বলতে হ'ত। ফিরে এসে দেখি, মাংস বানানো হয়ে গেছে, ছালটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। বিপিন আর অমর ঘাটে চাল ধুচ্ছে।

নাড়ু কুকার জ্বালিয়ে মাংস চাপিয়ে দিলে। তারপর সকলে কুকারের চারিদিকে ঘিরে বসে গরম হয়ে গল্প করতে লাগলুম।

নাড়ু বললে, "দেখলি বোকারা, শীতের রাত্তিরে কেমন গরম হবার উপায় বাতলে দিলুম। কালকে খেলে কি আর এত মজা হ'ত?"

তার কথায় আমরা সকলে সায় দিলুম। ঠিক হ'ল আজকের রাত্তিরে বিপিনদের ওখানেই কাটাতে হবে। খেয়ে-দেয়ে আমরা যখন শুয়ে পড়লুম, তখন আড়াইটা বেজে গেছে। পরদিন খুব সকালে পাঁচজনে ঘুম থেকে উঠলুম।

অমরের বাড়িতে একটু ভয় ছিল। সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। বাড়ীর বাঁধন আমরা তখন অনেকটা কাটিয়েছি। ততটা ভয় আমাদের ছিল না —বসে বসে বেশ গল্প জমিয়ে তুলেছিলুম। সামনেই ছাগ-নন্দনের ছালটা ঝুলছিল। তাই কালকের অ্যাডভেঞ্চারের কথাই হচ্ছিল বেশী। এমন সময় অমর ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "সাবধান, পাঁঠা যে আমরা খেয়েছি, তা ওরা কি করে টের পেয়েছে, শুনলুম আমাদের এদিকে এক্ষুনি খোঁজ করতে আসবে।"

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লুম।

নাড়ু বললে, "কি করে টের পেলে তারা?"

অমর বললে, "ওদের কে একজন প্রজা নাকি আমাদের নৌকোয় পাঁঠা তুলতে দেখেছিল —সেই গিয়ে বলে দিয়েছে।"

বিপিন তো কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "দাদা যদি টের পায় তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে।"

অমর বোধহয় তখনো কাঁপছিল, এইবার খাটের ওপর চুপ করে বসে পড়ে বললে "কি হবে ভাই? বাবা জানতে পারলে আমায় বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবেন।"

হরিশ লাফিয়ে উঠে বললে, "পাঁঠার ছালটা জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিয়ে আসি।"

নাড়ু শুধু বললে, "না।"

আমার মনের অবস্থাও যে নেহাৎ ভালো ছিল, তা বলতে পারিনে। বাড়ীতে জানতে পারলে যে রসগোল্লার বাটী এগিয়ে দেবে না, তা জানতুম। তাই নাড়ুকে বললুম, "ছাল ফেলতে তো মানা করলে, কিন্তু উপায় কি হবে ঠাউরেছ কি?"

নাড়ু জবাব দিলে না, বিপিনের দিকে ফিরে শুধু বললে, "কালো জুতোর ব্রক্কো আছে?"

অমর এইবার কেঁদে ফেলে বললে, "নাড়ু তোমার কথায়ই আমরা এমনতর কাজ করলুম, এখন আমাদের বিপদের মাঝখানে ফেলে জুতো ব্রুস্কোর খোঁজ করছ? এই কি তোমার বেড়াবার সময়? হয় তো তুমি পালিয়ে বাঁচবে ভাবছ, কিন্তু আমাদের অবস্থা কি হবে বল তো?

নাড়ু হা — হা — করে হেসে উঠল। ওর হাসি আমাদের কারো কানে ভালো লাগলো না। সকলেই নাড়ুর উপর চটে উঠলুম। অনেকটা নাড়ুরই আগ্রহে আমরা একাজে হাত দিয়েছিলুম, এখন ওর এমন ছাড়া ছাড়া ভাব দেখে সকলেই খুব দমে গেলুম।

নাড়ু অমরের পিঠ চাপড়ে বললে, "আরে পাগলা, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? তোর কোনো ভয় নেই," এই বলে মায়ের মতো কাছে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর বিপিনের দিকে আবার ফিরে বললে, "জুতোর কালো কালি থাকে তো নিয়ে আয় না —"

বিপিন একবার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কালি আনতে ভেতরে চলে গেল। নাড়ুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস না পেলেও এটা কিছুতেই বুঝতে পারলুম না —হঠাৎ জুতোর কালির তার কি দরকার পড়ল।

বিপিন কালি নিয়ে আসতে নাড়ু কোনো কথা না বলে দেয়াল থেকে ছালটাকে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর জুতোর ব্রাসে কালি লাগিয়ে ছালটা ঘষতে শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে সাদা ছালটা একদম কুচকুচে কালো হয়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে সকলে তার কাজ দেখছিলুম। এইবার শুধোলুম, "একি হচ্ছে নাড়ু?"

মুচকি হেসে, নাড়ু বললে, "দেখতেই পাবে।" কালি লাগিয়ে ছালটা আবার দেয়ালে ঝুলিয়েছে —তার একটু পরেই রায়বাবুদের গোমস্তা এসে ঘরে ঢুকলো।

আমাদের তখন একরকম হয়ে এসেছে। হাতে-হাতে ধরা পড়বার ভয়ে বুক টিপ্ টিপ্ করছে —তার শব্দ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। ওপর দিকে চাইবার সাহস পর্যন্ত তখন আমাদের কারো ছিল না।

লোকটা নাড়ুকে সামনে পেয়ে তার সঙ্গেই কথাবার্তা শুরু করল। শুধোলো, "তোমরা নাকি কাল রাত্তিরে একটা পাঁঠা নিয়ে এসেছ?"

নাড়ু ভালো মানুষটির মতো বললে, "হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে আমরা একটা চড়ুই-ভাতির বন্দোবস্ত করেছিলুম —একটা পাঁঠাও মেরেছিলুম।"

বল্‌বামাত্রই —ছেলেটা স্বীকার করবে, ভদ্রলোক বোধ হয় ততটা আশা করেনি, তাই, প্রথমে অবাক হলেও সামলে নিয়ে চোখ গরম করে বললে, "কে তোমাদের পাঁঠা মারতে বললে — সে পাঁঠা আমাদের—"

নাড়ু যেন আকাশ থেকে পড়ে বললে, "আপনাদের পাঁঠা — কৈ না, আমরা

তো পাঁঠা কাল হাট থেকে কিনে এনেছি" এই বলে আঙুল দিয়ে দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বললে, "ঐ দেখুন না — তার ছাল—"

ভদ্রলোক খানিক'ক্ষণ হাঁ-করে ছালটার দিকে তাকিয়ে রইল — তারপর বললে, "না, এটা তো আমাদের নয়, আমাদের পাঁঠার রং সাদা" বলে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাড়ু মুচকি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে বললে, "দেখলি মজা! বিপ্‌নে তো সাত তাড়াতাড়ি ছালটা ফেলে দিতে চেয়েছিল।"

বাস্তবিক আমাদের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না। এই মাত্র মস্তবড় একটা ভূত যেন আমাদের ঘাড় থেকে নেমে গেল।

অমর আনন্দে আত্মহারা। চোখ দুটো বড় বড় করে নাড়ুর হাত দুটো চেপে ধরে বললে, "সত্যি, তুই ভাই মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিস্ —বাবা যদি কোনো রকমে এই কাণ্ড জানতে পারতেন, তবে আমার আত্মহত্যা ছাড়া তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোন উপায় ছিল না।"

এই কথা শুনে নাড়ু হো-হো করে হেসে উঠলো।

অমর বললে, "হাসলি যে?"

নাড়ু হাসতে হাসতে বললে, "তোর আত্মহত্যার কথা শুনে।"

আমি বললুম, "কেন, তাতে হাসির এমন কি কথা আছে?"

নাড়ু মুখ টিপে বললে, "আমিও একবার করতে গিয়েছিলুম কিনা।"

একটু এগিয়ে এসে বললুম, "কি রকম?" নাড়ু বললে, "সে এক ভারী মজার গল্প।" যারা শুয়েছিল, গল্পের নামে উঠে ভালো হয়ে বসল। নাড়ু শুরু করল, "তবে শোন্, —তখন আমার বয়স দশ এগারোর বেশী নয় —কি একটা দুষ্টুমি করার জন্যে মা আমায় ঘরে কুলুপ এঁটে বন্ধ করে রেখেছিলেন, সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে ভয়ানক রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। বিকেল বেলা ঘর খুলে খাবার দিতেই থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে —লাফিয়ে উঠোনে এসে বললুম, "আজ আমি জলে ডুবে মরবো।"

মা রেগে বললেন, "মরগে যা" — আমি ছুটে খিড়কির দোর দিয়ে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তখন বেশ সাঁতার জানতুম। যতই ডুবতে যাই, আমায় কে যেন ঠেলে ভাসিয়ে তোলে। চেয়ে দেখি, ওপরে দাঁড়িয়ে সকলে মজা দেখছে। মা-ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

দেখে আমার রাগ হল আরো বেশী।

কী! আমি ডুবতে যাচ্ছি — আর সকলে মজা দেখছে। আরো বেশী করে ডুবতে লাগলাম। কিন্তু ফি বারেই ভেসে উঠি — ডোবা আর কিছুতেই হল না।

এমন রাগ হল আমার! ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গা নিজেই কামড়াই। করলুম

কি, একবার ডুব দিয়ে ঘাটের তলায় এসে চুপটি করে বসে রইলুম। তক্তার ঘাট, ফাঁক দিয়ে সব দেখা যাচ্ছিল। মা যখন দেখলেন, এবার ডুব দিয়ে আর আমি উঠলুম না, তাঁর চোখ দুটো যেন ছল্‌ছলিয়ে উঠলো। পাশেই দাঁড়িয়েছিল আমাদের পুরনো চাকর ভুলুয়া। মা তাকে জলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "দ্যাখ তো ও গেল কোথায়।"

ভুলুয়া তো ডুবে ডুবে সারা। আমাকে আর খুঁজে পায় না, দেখি, মা পুকুর ধারে কাদার ভেতরে থপ্‌ করে বসে পড়লেন। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল। আর থাকতেও পারলুম না।

হি-হি করে হেসে উঠলুম। ভুলুয়াটা আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাটের তলা থেকে হিড় হিড় করে আমায় টেনে বের করে উঁচু করে একেবারে উঠোনে এনে ফেললে। ঠিক এমনি সময় বাবা আপিস থেকে ফিরলেন। সব শুনে বাবা আমার কানটা ধরে গালে গোটা কয়েক চড় মেরে বললেন, "হতভাগা ছেলে ফের এমন করবি?" আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে চোখ মুছে বললুম, "না, আর কখনো করবো না।"

নাড়ুব আত্মহত্যার কাহিনী শুনে, ঘরে একটা হাসির তুফান এলো। মুচকি হেসে সে বলল, "কিন্তু সে দিন লোকসানের চাইতে লাভই হয়েছিল আমার বেশী।"

বিপিন বললে, "কি রকম?"

হাসতে হাসতে নাড়ু বললে, "বাবাব হাতে দুটো চড় খেয়েছিলুম বটে, কিন্তু রাত্তিরে মা কোলে বসিয়ে এক বাটী রসগোল্লা খাইয়েছিলেন। বেশ মনে আছে, এক-সঙ্গে অত রসগোল্লা আর কোনদিন খাইনি" বলে মুখ চোকাতে লাগলো। আমি বললুম, "বেশ বেশ, এই তো বীর পুরুষের লক্ষণ।" সেবারের মতো নাড়ুর কৃপায় আমাদের মস্তবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরের ব্যাপার। বিকেলবেলা মাঠে একটা হাডু-ডু প্রতিযোগিতা ছিল। খেলা হল পাশের গ্রামের ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে। এই প্রতিযোগিতায় আমাদেরই জয় হয়েছে, এই জন্য মন মেজাজ সকলেরই ভালো ছিল।

সবাই নাড়ুকে ধরে বসল, "গবম রসগোল্লা খাওয়াতে হবে।" নাড়ু হাসতে হাসতে জবাব দিলে, "বেশ খাওয়াতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।"

সবাই একযোগে হামলা করে উঠে জিজ্ঞেস করলে, "শর্তটা কি শুনি?"

"হুঁ-হুঁ—শুনলে উৎসাহ কমে যাবে।"

নাড়ু বাঁকা চোখে তাকিয়ে রসিকতা করে।

সকলের চোখ ততক্ষণে উৎসাহে গোলালু হয়ে উঠেছে। নাড়ু সবাইকার কৌতুহলের খোরাক দেয় আস্তে আস্তে ঃ—

"রসগোল্লার দোকানে একেবারে উনুনের পাশে গিয়ে বসতে হবে। আমি দোকানিকে বলব, গরম গরম রসগোল্লা কড়া থেকে তুলেই তোদের মুখে ফেলে দিতে হবে! অবশ্যি তোরা সবাই সার দিয়ে হাঁ করে বসে থাকবি।"

অমর মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললে, "না-না, তা কেমন করে হবে?"

নাড়ু বোকা সাজবার ভান করে বললে, "কেন হবে না শুনি? আলিবাবা আর চল্লিশ দস্যুর গল্প মনে নেই? মর্জিনা কেমন করে জালার ভেতর গরম তেল ঢেলেছিল? সেই রকমই গরম রসগোল্লা আর রস ঢালা হবে তোদের মুখে। অবশ্যি সহ্যশক্তির একটা পরীক্ষা দিতে হবে।" বিপিন ফোড়ন কেটে বললে, "হাঁ, যদি প্রাণটা শেষ পর্যন্ত দেহ ছেড়ে পালিয়ে না যায়।"

নাড়ু হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "কেন, জিব হচ্ছে গরম রসগোল্লা, কিন্তু পরীক্ষা দেবার সাহস নেই কেন? দুয়ো!"

আমাদের এই হাসি মস্করার সহজ সুরে বাঁধা তার হঠাৎ ছিঁড়ে গেল মাঝিপাড়ার বিশ্বম্ভরের কান্নাকাটিতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "একি রে, বিশ্বম্ভর কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?"

বিশ্বম্ভর গামছার খুঁটে চোখ মুছে বললে, "দাঠাকুর, একটা লিখন এসেছে। কদ্দিন আগে খবর পেয়েছি আমার মেয়ের ভারী ব্যামো। তা এই লিখনটা কেউ পড়ে দিতে পারছে না পাড়াতে। লেখাপড়া তো কেউ জানে না! এই দু'মাস আগে আমি পুঁটির বিয়ে দিয়েছি। তুমি লিখনটা পড়ে দাও না....পুঁটি আমার বেঁচে আছে না মরে গেছে।" বুড়ো বিশ্বম্ভর ছোট ছেলের মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। আমি চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে পড়লাম ; তারপর বললাম, "তোমার মেয়ের শক্ত অসুখই বটে। আজই চলে যেতে লিখছে।"

বিশ্বম্ভরের চোখে-মুখে যেন একটা শেষ আশায় আলো উঠল। বললে, "এই দেখ! আজকের রেলগাড়ী ত' চলে গেল। সেই কালে আমার লিখনটি যদি কেউ পড়ে দিত, তবে আজকের গাড়ীতেই আমি চলে যেতে পারতুম দাঠাকুর! বুঝলে দাঠাকুর, পাড়ার একটা জোয়ান বেটা লেখাপড়ি জানে না, সব গো-মুখ্যু!"

আমি বললাম, "তুমি যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে নাও গে বিশ্বম্ভর। কাল সকালের ট্রেনেই চলে যেও।"

বিশ্বম্ভর উদাস ভাবে বললে, "তা তা যাবো বাবু। কিন্তু গিয়ে আমার পুঁটির ধড়ে কি প্রাণটুকু দেখতে পাবো?"

বাঁ হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সে চলে গেল।

বিশ্বম্ভর এই অঞ্চলের বহুকালের পুরনো লোক। নৌকোর মাঝিগিরি করে

পেট চালায়। সাচ্চা লোক। সবাইকার বিপদে-আপদে একেবারে বুক দিয়ে এসে দাঁড়ায়। ওই একমাত্র মেয়ে ছাড়া সংসারে তার আর কেউ নেই।

এমন একটা ভালো মানুষের বিপদের কথা শুনে আমাদের সকলকারই মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

হরিশ বললে, "আহা! মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে বেচারা একেবারে মুষড়ে পড়েছে। আমরা যদি কিছু চাঁদা তুলে ওর হাতে দিতে পারতাম, তবে এই দুঃসময়ে ভারী কাজে আসত।"

নাড়ু বললে, "সে প্রস্তাব অবিশ্যি খুবই ভালো। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা।"

আমি শুধোলাম, "কি রে?"

নাড়ু জবাব দিলে, "এই যে আমাদের দেশেব হাজার হাজার লোক চিঠিখানাও পড়তে পারে না···· এতে আমাদের জীবনের কত ক্ষতি হয়ে যায়। বিশ্বম্ভর যদি সামান্য লেখাপড়া জানত, তবে আজকের ট্রেনেই সে রওনা হয়ে যেতে পারত···· আর তার মেয়ের রোগ-শয্যার পাশে পৌঁছে যেত। ভগবান না করুক— ও যদি গিয়ে ওর পুঁটিকে দেখতে না পায় ত' সারাজীবন দগ্ধে দগ্ধে মরবে। সত্যি ভাই অশিক্ষা আমাদের অমানুষ করে একেবারে জন্তু-জানোয়ার তৈরী করে রেখেছে।"

খানিকটা চুপ করে করে থাকবার পর হঠাৎ নাড়ুর চোখ দুটো যেন উৎসাহে জ্বলে উঠল। বললে, "আচ্ছা, আমরা সবাই মিলে ছুটির মধ্যে ত একটা ভালো কাজ করতে পারি?"

অমর জিজ্ঞেস করলে, "কি সে ভালো কাজ?"

নাড়ু প্রবল উৎসাহে বলতে লাগল, ধর, আমরা যদি নিজেদের চেষ্টায় একটা নৈশ-বিদ্যালয় পাড়ার মধ্যে গড়ে তুলি, তবে যারা দিন মজুর —সন্ধ্যের পর এসে আমাদের কাছে লেখাপড়া শিখতে পারে। অন্ততঃ বই চিঠি পত্তর পড়তে পারবে··· আর নিজের নাম সইটা করতে শিখবে। এটুকু শিক্ষাও আমরা দিতে পারি।"

নাড়ুর এই প্রস্তাবটা আমাদের খুব ভালো লাগলো। হরিশ লাফিয়ে উঠে বললে, "এ ত' একটা কাজের মত কাজ! শহরে আমরা নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে নেতাদের মুখে এত বক্তৃতা শুনি···· এই পল্লী অঞ্চলে আমরা সে ব্যাপারে বেশ খানিকটা কাজ করে যেতে পারি। তারপর ইস্কুলের ছেলেরা আমাদের পরিকল্পনাটা চালু রাখবে। প্রতি বছর নতুন কর্মী আমরা পাবো।"

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, "সবই ত' বুঝলাম। কিন্তু জানো ত' ভাই, ভালো কাজে বিঘ্ন অনেক। নৈশ-বিদালয় আমরা বসাবো কোথায? প্রথমেই একটা আস্তানা চাই ত' —"।

নাড়ু বললে, "কেন? আমাদের বাইরের উঠোনের ওপাশের ঘরটা ত' অমনি পড়ে আছে। ওখানেই আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি।"

অমর বললে, "কিন্তু কেরোসিন তেলেরও ত' দরকার আছে। সেটা মিলবে কোথা থেকে শুনি?"

নাড়ু জবাব দিলে, "আমরা এক একদিন এক এক বাড়ী থেকে চাঁদা হিসেবে ওটা দেবো···· সেটা কি কোন মতেই ব্যবস্থা করা যায় না।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করা যাবে। ঘোড়া যদি পাওয়া গেল, তবে লাগামের জন্য আটকাবে না। শ্রীদুর্গা বলে কাল থেকেই তাহলে আমরা কাজ শুরু করে দি।"

পরদিন সকালবেলা নাড়ুদের বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করে আমরা দল বেঁধে মাঝিপাড়া, কৈবর্তপাড়া, মুসলমানপাড়া, তাঁতি, ছুতোর, কুমোরদের অঞ্চল টহল দিয়ে এলাম। এই ব্যাপারে একটি মুসলমান বন্ধুর কাছ থেকে আমরা খুব উৎসাহ পেলাম। ছেলেটির নাম আব্দুল। শহর অঞ্চলে কোনো একটা ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ে। ছুটিতে তার মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে।

নাড়ুদের বাইরের ঘর দেখে সে খুশী হয়ে বললে, "শুধু নৈশ-বিদ্যালয় কেন? আমরা এখানে একটি পাঠাগারও গড়ে তুলতে পারবো। তোমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ী থেকে পাঁচখানা করে বইও দাও···· তবে একদিনেই আমরা পাঠাগার স্থাপন করতে পারি।"

নাড়ু বললে, "আমাদের ঘরে জায়গার অবিশ্যি অভাব হবে না; কিন্তু গ্রন্থাগার গড়তে গেলে প্রথমেই দরকার একটি আলমারীর। নইলে বইগুলো এনে আমরা সাজাবো কোথায়?"

ঠিক কথা। আলমারী একটা না জুটলে লাইব্রেরীর পরিকল্পনাই যে ভেস্তে যাবে।

অমর এতক্ষণ চুপচাপ কথাগুলি গিলছিল। এইবার এগিয়ে এসে বললে, "আমাদের বাইরের ঘরে একটা কাঠের আলমারী অমনি পড়ে আছে···· আরশুলারা দিব্যি বাসা বেঁধে রয়েছে সেখানে। তবে একটি দরজা তার ভাঙা।"

আব্দুল বললে, "কুছ্ পরোয়া নেই। আলমারীটা আমাদের পাঠাগারে ব্যবহার করতে দিতে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তবে ধরাধরি করে ওটাকে আমরা আজই নিয়ে আসবো।"

নাড়ু বললে, "আরো একটা কাজ আমরা করতে পারি। ছুতোর পাড়ার যে সব লোক সন্ধ্যের পর নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়তে আসবে, তাদের বলে-কয়ে আলমারীর দরজাটা সারিয়ে নেয়া খুব শক্ত হবে না।"

উৎসাহ যখন আন্তরিক হয়, তখন কোনো কাজই আটকায় না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা নৈশ-বিদ্যালয় আর পাঠাগার একই সঙ্গে উদ্বোধন করা হল। পাড়ার একজন উৎসাহী অভিভাবক ছোটদের কাজ দেখে খুশী হয়ে সভায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি মাসে দশ টাকা করে চাঁদা দেবেন।

ছেলেদের থেকেও বই নেহাত কম জুটল না। প্রত্যেক বাড়ীতেই গল্পের বই, ইতিহাসের কাহিনী, বিজ্ঞানের কথা, ছড়া ছবির বই খুঁজলেই পাওয়া যায়। যে বলেছিল পাঁচখানা বই দেবে — সে দশখানি এনে হাজির করল। বিভিন্ন বিভাগ আলাদা ভাবে সাজিয়ে সংখ্যা বসিয়ে আলমারীতে তুলে রাখা হল।

অমর বললে, "আমি হবো গ্রন্থাগারিক।" এতে কারোই আপত্তি হবার কথা নয়।

আব্দুল, নাড়ু আর আমি নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করলাম।

আমাদেরও তাহলে ছাত্র জুটল।

এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বলতে হবে।

দু'দিন পর ছেলেদের কাছ থেকে আরো একটা প্রস্তাব এলো।

নাড়ুদের বাইরের ঘরের পেছন দিকে অনেকটা পতিত জমি ছিল।

বিপিন বললে, "আমরা এই জমিটা পরিষ্কার করে একটা ব্যায়ামাগার চালাতে পারি। রোজ সকালবেলা এসে আমরা সবাই এখানে ব্যায়াম করবো। লাইব্রেরীর ঘরে ছোলা ভেজানো আদা আর গুড় থাকবে। ব্যায়ামের পর ভারী উপকারী জিনিস।"

সবার একবাক্যে সম্মতি দেয়াতে মনে হল, কথাটা সবারই মনে ধরেছে।

কথায় বলে —ছেলের হাতে দা!

ওই যে অত জঙ্গল জমেছিল জমিটাতে···· দু'দিনে একেবারে সাফ হয়ে গেল।

পাড়ায় দাদাদের বয়সী এক কলেজের ছেলে ব্যায়ামে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাটা দিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের উথলে-ওঠা উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। ফলে নৈশ-বিদ্যালয়, পাঠাগার আর ব্যায়ামাগার বেশ সুন্দরভাবে চলতে লাগলো।

স্থির হল, আমরা যখন থাকবো না, স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।

* * *

সংগঠনমূলক কাজে ছুটিটা যে কি করে ফুরিয়ে এলো, তা মোটেই টের পাইনি — যখন টের পেলুম — ইস্কুল খোলবার তখন আর মোটে দু'দিন বাকি। ছুটি ফুরোলেই প্রমোশন। পরীক্ষা যে নেহাত খারাপ দিয়েছি তা নয়, আমাদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতে পণ্ডিত —তার ওপর সোনায় সোহাগা —

সারা বছর পণ্ডিতের সঙ্গে ছিল আমাদের আগুনে কাঁঠালের বীচির সম্পর্ক। কাজেই সংস্কৃতে আমাদের বেশ একটু ভয় ছিল।

সেদিন দুপুর বেলায় সময়টা আর কাটছিল না। গড়িয়ে, হাই তুলে গল্পের বই পড়ে, কিছুতেই না। হঠাৎ প্রমোশনের ভয় মাথায় ঢুকতেই আমাদের বোধ হয় এমনতর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। বাইরে আমরা যাই করি না কেন, প্রমোশন না পেলে বাড়ীতে অবস্থা যে নেহাত নিরাপদ থাকবে না, সে বেশ ভালো করেই জানতুম। আর জানতুম বলেই আমাদের এমন হেসে-খেলে-উড়িয়ে দেয়া দিনগুলো হঠাৎ যেন কেমন বিস্বাদ হয়ে উঠল।

নাড়ু একবার হাই তুলে বললে, "চল হে, পণ্ডিতের কাছ থেকে নম্বর জেনে আসা যাক্।"

কথাটায় সকলেই রাজী হলুম।

বিপিন বললে, "এই রোদ্দুরে?"

আমরা সকলে মিলে তাকে টেনে তুলে বললাম, "আরে চল না হে জেনেই আসা যাক্ না — এখানে বসেই বা কি করবে শুনি?"

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর —শীতকাল হলে কি হবে — হাঁটতে হাঁটতে ঘামে জামা ভিজে গেল — চোখ কান লাল হয়ে উঠল। পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলুম সূর্যিমামা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

রোদে পোড়া ঘাসের ওপর বসে পড়ে, জামা খুলে বাতাস খেতে খেতে বিপিন বললে, "কেন বাবা, বললুম তখুনি, খাসা বিকেলবেলা যাওয়া যাবে'খন, এখন কোথায় পণ্ডিত? তিনি বোধ হয় আরামসে তাকিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন! এদিকে তেষ্টায় প্রায় প্রাণ যাবার যোগাড় আর কি!"

তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললে, "ঝি —ও— ঝি।"

পাঁকাটির বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরকার উঠোনের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। চেয়ে দেখি, কালো মিশমিশে মোটা একটি স্ত্রীলোক বিপিনের আচমকা ডাক শুনে, একহাত ঘোমটা টেনে ছুটে পালাচ্ছে।

নাড়ু জিব কেটে বললে, "ছি-ছি-ছি, কি করলি বল দেখি?"

বিপিন বললে, "কেন? —ঝিকে ডাকলুম তো!" নাড়ু ধমক দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, ঝিকে ডাকলে বৈ কি? —ও কে, তা জানো?" বিপিন বললে, "কে আবার?"

নাড়ু বললে, "বাঁচতে চাও যদি তো এক্ষুণি পালাও সব। উনি পণ্ডিতমশায়ের শাশুড়ী।" বিপিন বললে, "অ্যাঁ?"

আর অ্যাঁ! যেমনি ও কথা শোনা—সকলে একেবারে চোঁচা দৌড় ছুট্-ছুট-ছুট, খেলার মাঠে পৌঁছুবার আগে একবারও ফিরে তাকাবার সাহস হয়নি আমাদের। কেন না পণ্ডিত মশাই জানতে পারলে একেবারে হাতে মাথা কাটা যেত।

* * *

এত কাণ্ড করেও শেষটা আমরা পাশই করলুম। প্রমোশনের দিন হেডমাষ্টার মশাই আমাদের সকলের নামই ডাকলেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু শুধু পাশ করলেই তো হয় না —পাশ করেই ভাবনা এলো, এখন কোথায় পড়তে যাবো?

গ্রামের ইস্কুলের পড়া ত আমাদের সাঙ্গ হল। আশে-পাশে আর ভালো ইংরাজী ইস্কুল নেই। কাছেই একটা ছোট্ট শহর। সেখানেই হয়ত যেতে হবে। সাব দলের সকলেই যে সেই শহরেই যাবে, তার তো কোনো মানে নেই। অনেকেই হয় তো অন্য কোনো জায়গায় আত্মীয়বাড়ী থেকে পড়বে —আবার দূরে যাবার ভয়ে হয় তো আমাদের কেউ কেউ পড়াই ছেড়ে দেবে। এমনতর অনেক কথাই আমাদের মনে আসতে লাগল। দল ভেঙে যাবে, এই রকম একটা আশঙ্কায় আমরা একেবারে নুয়ে পড়লাম।

এ যে আরো ভালো হল। এখন দেখলুম, পাশের চাইতে ফেল করাই ছিল আমাদের ভালো। বিদাযের দিন ক্রমেই এগিয়ে এলো। দল থেকে খসতে খসতে শুধু বাকি রইলুম আমি আর নাড়ু। কেউ ভিন জায়গায় চলে গেল, অনেকেই পড়া ছেড়ে দিলে।

ঠিক হল, আমি আর নাড়ু কাছের ছোট্ট শহরটায় একই ইস্কুলে পড়ব আর থাকবো সেই ইস্কুলে বোর্ডিং- এ।

যাবার দিন চোখের জলের ভেতর দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকোয় উঠলুম। বিপিন ওরা সব হাঁটতে হাঁটতে আমাদের নৌকো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির সঙ্গে চেনা যে জায়গাটা, তাকে ছেড়ে যেতে যে ব্যথা মনের কানায় কানায় ভরে উঠল, তা নিতান্ত আপনার জিনিস, বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই তো। আজ এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল— এখানকার প্রত্যেকটি গাছ— প্রত্যেক পথের বাঁক —ঐ আমবাগান— শিউলিতলার ঐ বাঁধানো বেদীটা, কালীবাড়ীর আঙিনা—এমন কি, যে পাটক্ষেতের ভেতর ইস্কুল পালিয়ে লুকোচুরি খেলতুম—তারও প্রত্যেকটি পাতা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যেও না—তোমরা যেও না—তোমরা দুটিতে আমাদের মনের কোণে যে আসন পেতে নিয়েছ, তা পড়ে রইল কি শুধু চোখের জলে ভিজতে? —আরো ডাক শুনতে পেলাম। পলাশবনের মাথা—হাটখোলার বাঁক—চৌধুরীদের নাটমন্দির —যেন চোখ টিপে টিপে সরে পড়তে লাগল।

আজ মনে, কারো সঙ্গে বিবাদ রইল না আমাদের। পণ্ডিত মশাই, —চৌধুরীদের পাঁঠা চরাতো যে ছোঁড়া চাকরটা, ওপাড়ার বিশ্বনিন্দুক নসুঠাকুর, —এমনকি ইস্কুলের পাঙ্খাওয়ালা পর্যন্ত আজ আমাদের ভালো বলে ঠেকতে লাগলো — এবং তাদের হারানোকেও আমরা মস্ত বড় ক্ষতি বলে স্বীকার করে নিলুম।

* *

হোস্টেলে আমরা দুজনে একটা ঘরেই জায়গা পেলুম।

এখানে এসে নাড়ু যেন একেবারে ভালো মানুষটি হয়ে গেল। কারোর সঙ্গে আলাপ নেই, দুজনে চুপচাপ ইস্কুলে গিয়ে এক কোণে বসি, আবার ছুটি হলে ধীরে হোস্টেলে ফিরে আসি। তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা আমরা নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম।

চমৎকার নদী এখানকার। তরতরে-বয়ে-যাওয়া নদীর ধার দিয়ে, শাড়ীব চওড়া পাড়ের মতো চলে গিয়েছে একটা লাল সুরকির রাস্তা। ঠিক যেন পটুয়ার আঁকা ছবিটির আর রাস্তার দু'ধারে দিয়ে লম্বা সার সার ঝাউগাছ। শীতের বাতাস নদীর জল কাঁপিয়ে, ঝাউগাছের পাতা দুলিয়ে শোঁ-শোঁ করে যখন চলে যায় বেশ লাগে কিন্তু।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যে হয় হয়। জ্যামিতিটা খুলে সোমবারের পড়াটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম। নাড়ু খাট থেকে উঠে বললে, "সন্ধ্যেবেলা আবার পড়া কি রে? চল নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

নেহাত আপত্তি ছিল না। আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে বললুম, "চলো।" দুজনে যখন হোস্টেল ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়লুম, তখন জ্যোৎস্না উঠে গেছে।

শীতের শেষটা। বাতাস ঠাণ্ডা হলেও বেশ মিষ্টি লাগছিল। নদীর ঢেউগুলো টুকরো-টুকরো চাঁদ বুকে নিয়ে পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছিল।

আমরা এগিয়ে চললুম। আরো খানিকটা যেতেই দেখলুম, নদীর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও যেখানটায় বেঁকে গেছে, সেই মোড়ের মাথায় ভয়ানক ভিড়।

নাড়ু বললে, ""চল্ তো দেখি ওখানটায় কি হচ্ছে?"" দুজন ভিড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখি, সে এক মজার ব্যাপার। একটা ফিরিঙ্গি সাহেব ভয়ানক মদ খেয়ে মাতলামী শুরু করে দিয়েছে। নদীর কিনারায় এমন জায়গায় গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে যে, আর একটু হলেই একদম নদীর তলায়! দেখলুম ফিরিঙ্গিটা একটা পা তুলে সুর করে গাইছে। ---ওড়বাব ভঙ্গীতে---

If the bird can fly
Pray, why can't I?

তারপর করলে কি, হাত পা তুলে নদীতে এক লাফ!

যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, সকলেই হৈ-হৈ করে উঠল। কিন্তু কেউ তাকে এগিয়ে ধরতে গেল না। পলক ফেলতে নাড়ু কোটটা আমার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে নদীতে পড়ল। আমি তাকে ধরতে কিম্বা মানা করতেও সময় পেলাম না।

সকলে হায় হায় করে উঠল! নদীতে বেশ স্রোত। তাছাড়া ঐটুকু ছেলে কি করে একটা মাতালকে টেনে তুলবে? আর যদিই বা সে সাহেবটাকে টেনে ধরে— তবে সেও তো প্রাণের ভয়ে মরিয়া হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারে? তখন দুটো সুদ্ধ মারা যাবে যে! এমন অনেক কথাই সকলে বলাবলি করতে লাগলো।

আমি যেন আর আমাতে ছিলুম না। মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম্ করতে লাগলো, নদীব দিকে তাকাবারও সাহস রইল না আমার। রাস্তার ওপরেই বসে পড়লুম।

এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে বললে, "ও ছোকরা তোমার কে হয় বাছা?"

আমি বললুম, "ভাই।"

ভদ্রলোক বললেন, "এই রাস্তা ধরে বরাবর ভাটীর দিকে চলে যাও — খানিক গিয়ে ভেসে উঠবে, ভয় কি?" তিনি চলে গেলেন।

মনে মনে ভাবলুম ভাই নয় বটে, কিন্তু তার চাইতেও বেশী। আরো খানিকটা বসে রইলুম — আমার চলবার শক্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছিল। যখন উঠলুম সেখানে তখন আর কেউ ছিল না। চেয়ে দেখি, সব লোক মজা দেখতে ভাটীর দিকে ছুটছে। আস্তে আস্তে উঠে আমিও রওনা হলুম। দেখলুম, লোকগুলো ছুটে চলেছে, আগে-আরো আগে। নদীর দিকে চেয়ে দেখলুম, ঐ দূরে কি একটা ভেসে যাচ্ছে না! ছুটে চললুম— হ্যাঁ নাড়ুই বটে! আরো খানিকটা এগোতে ওকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে নাড়ু একেবারে নদীর ধারে ছিটকে পড়ল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলুম। দেখি নাড়ুর চোখ লাল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে শুধু তার রাঙা চোখ দুটো আমার মুখের উপর তুলে ধরে বললে, "ভাই ধরেছিলুম ঠিক তাকে, কিন্তু রাখতে পারলুম না," বলেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। সবাই ধরাধরি করে নাড়ুকে হোস্টেলে নিয়ে এলুম।

তারপর অনেক রাত্রে তার জ্ঞান হয়েছিল। বেশ মনে আছে এরপর দু'দিন সে কারো সঙ্গে কথাটি কয়নি -— গুম হয়ে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে আমাকে বলত, "বেচারী প্রাণের ভয়ে আমায় এত জোরে আঁকড়ে ধরলে যে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন পথই রইল না। একটা প্রাণ আমি চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলুম না -—নীলে।"

নাড়ুর মরা প্রাণে আবার যে জোয়ার ডেকে নিয়ে এলো, তার নাম সত্য। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা —মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। অন্য কোথাও পড়ত সে, তার বাবা এখানে বদলি হওয়াতে, আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হল।

সত্যের একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেছি যে, সে কখনও হাসতে ভোলেনি। হাসি ছিল যেন তার গাছের বারমেসে ফল। নিজেও যেমন হাসতে পারত পরকে হাসাবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

এক একজনের কথাবার্তা সে এমন নকল করে বলতে পারতো যে, চোখ বুজে শুনলেই মনে হতো —যার নকল করা হচ্ছে, কথা বলছে যেন সেই। গলার আওয়াজ পর্যন্ত সে এমন হুবহু ধরে ফেলতো যে —অবাক্ কাণ্ড!

একদিন টিফিনের সময় ক্লাশে বেশ জোর আসর বসে গেছে। নাড়ু বললে, 'আচ্ছা সত্য, তুই তো ক্লাসের সকলকার কথাই নকল করতে পারিস্! হেডমাষ্টারের কথা নকল কর দেখি? তবে বুঝবো তোর কেরামতি!"

সত্য হেসে বলল, "তবে দেখবি মজা?" এই বলে দুহাত দিয়ে মুখটা ঢেকে মোটা গলায় ডাকলে —"দপ্তরী —দপ্তরী— !"

ঠিক হেডমাষ্টারের গলা! পাশেই দপ্তরীর একটা ছোট্ট ঘর। ডাক শুনে সে ছুটে এসে ক্লাসে ঢুকলো। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হেডমাষ্টারকে না দেখতে পেয়ে দপ্তরী ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ছুটির পর বেরোতেই দেখি গেটের সামনে হেডমাষ্টার নিজে দাঁড়িয়ে। পাশে ইস্কুলের দপ্তরী। হেডমাষ্টার মশাই আমাদের ডেকে বললেন, "তোমাদের ক্লাসে কে নাকি আমার গলা নকল করে কথা কইতে পার?"

বুঝলুম, এ দপ্তরী ব্যাটার কাজ।

কাউকে কিছু বলতে হল না —সত্য এগিয়ে বললে, "হ্যাঁ স্যার, আপনি যা বলছেন, সে কথা ঠিক। আর সে কাজ আমিই করেছি!" হেডমাষ্টার আমাদের ডেকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝলুম, সত্যকে ফাইন দিতে হবে।

হেডমাষ্টার ভেতরকার দরজা বন্ধ করে দিয়ে আর সব মাষ্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ছেলেটি আমার কথা নকল করে কইতে পারে।" তারপব সত্যকে বললেন, "কি বলছিলে বলতো?"

আশ্চর্য এই যে সত্য একটুও দমলো না। সে দপ্তরীকে ডাকা —হেডমাষ্টার কি করে পড়ান —-কি করে মাষ্টারদের সঙ্গে কথা বলেন, পড়াতে-পড়াতে Silence বলে চ্যাঁচানো —হুবহু সব নকল করে বলে গেল।

মাষ্টাররা সব দেখি রাগে ফুলছে। হেডমাষ্টার কিন্তু হেসেই খুন। হাসি থামলে, সত্যকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "গুণের আদর না করার মতো মূর্খতা আর নেই," এই বলে তিনি নিজের হাত থেকে সোনার ঘড়িটা খুলে সত্যের হাতে পরিয়ে দিলেন।

আমরা হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

দেখতে দেখতে গরমের ছুটি এসে পড়ল। আমি আর নাড়ু আবার আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। খবর পেয়ে আমাদের দলের সব দেখা করতে ছুটে এলো। যারা বাইরে পড়তে গিয়েছিল, তারাও আস্তে আস্তে জুটল। আবার আসর গুলজার হয়ে উঠল।

অমর একদিন এসে বললে, "এ রকমভাবে দু'মাস কি করে কাটবে? চল, একটা কিছু অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা যাক।" হরিশ টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বললে, "হ্যাঁ, নূতন কিছু করতে হয়তো চল পায়ে হেঁটে কাশ্মীর। দিব্যি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে পাঞ্জাব অবধি যাওয়া যাবে।"

নাড়ু হেসে বললে, "কাশ্মীর যাবে তোমরা?" আমি বললুম, "কেন হবে না — ইচ্ছা থাকলেই হয়।" বিপিন বেশ একটু পেটুক। সে মাথা নেড়ে বললে, "না হে না, ও কাশ্মীর-টাশ্মীর ছেড়ে দাও। তার চাইতে চল, রাত্তিরে ভট্টাচাজ্‌ পাড়ায়। দিব্যি তাদের কলাবাগানে এক কাঁদি কলা পুরুষ্টু হয়ে আছে, খাসা নষ্টচন্দ্র হবে'খন।"

নাড়ু হেসে বললে, "হাঁ, এ জিনিসটা ঠিক কাশ্মীব যাওয়াব মতো শোনাচ্ছে না বটে। তা আপত্তি নেই আমার।"

পেটুক বলে বিপিনের একটা বদনাম আছে বটে, কিন্তু কাজের বেলায় রাজী হলুম সকলেই। কথাবার্তা রইল— আসছে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের ভেতর আমাদেব রাতেব অভিযান শেষ করা হবে। আমার ওপরেই সকলকে ডেকে নাড়ুদের বাসায় হাজির হওয়ার ভার ছিল। দলবল নিয়ে যখন ওর বাসায় গিয়ে পৌঁছলুম, সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে। বাইরের ঘবটায় কেউ কোথাও নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ীর ভেতর খবর পাঠিয়ে জানলুম, নাড়ু খেতে বসেছে। খানিক বাদে নাড়ু এলো জামা-কাপড় পরে, হাতে একটা ইউকালিপটাস্‌ অয়েলের শিশি। সবাইকে ইউকালিপটাস্‌ অয়েল মাখিয়ে দিতে দিতে বললে, "যারো সেখানে এটা ঠিক, কিন্তু যে জন্য যাওয়ার কথা ছিল -- সে উদ্দেশ্যে নয়।" আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "হেঁয়ালী ছেড়ে আসল কথাটা বল দেখি — ব্যাপারটা কি শুনিই না?"

নাড়ু বললে, "ভট্টচাজ্‌-বাড়ীর কলাবাগানের চারিদিকে উঁচু দেয়াল তো? তাই কোন্‌ দিক দিয়ে বাগানে ঢোকা সুবিধে হবে, সেইটে দেখবার জন্য বিকেলে ঐ দিকটায় একবার গিয়েছিলাম।"

আমি বললুম, "তারপর?"

নাড়ু বললে, "মালী ব্যাটার সঙ্গে আলাপ করে জানলুম, ও বাড়ীর ছোট্ট মেয়েটার আজ দুপুর থেকে কলেরা হয়েছে—কিন্তু বাড়ীতে দেখবার নাকি কেউ নেই।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, "আমি বলে এসেছি, সব পালা করে রাত্তিরে থাকবো ওখানে।" আমাদের দিকে চেয়ে বললে, "কেমন রাজী আছ তো তোমরা সব?"

এ অবস্থায় কেউ কি মুখ ফুটে বলতে পারে, পারবো না? আমরাও বললুম

না। যেখানে ভক্ষক হতে যাচ্ছিলুম—রক্ষক হয়ে ঢুকতে যে একটুও পা কাঁপেনি, তা বলতে পারিনে।

তারপর নাড়ুর সে রাত জেগে সেবা করবার কথা — না হয় নাই বললুম। সেবা কি করে করতে হয় , তা চোখের সামনে এতদিন এমন ভাবে এসে ধরা দেয়নি। পুরস্কারের আশা না রেখে সেই যে রাতের পর রাত প্রাণপাত পরিশ্রম — আমার ত' মনে হয় — তা' শুধু নাড়ু বলেই সম্ভব হয়েছিল। এ কেবল যে দেখেছে, তার আপনার মনে গেঁথে রাখবার মতো, বাইরের বিজ্ঞাপনের ধার সে ধারে না। বেশ মনে আছে ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে তাকে একদিন চুপিচুপি বলেছিলাম, "নাড়ু, এসো আমরা একটা সেবক সমিতি খুলি, নিঃস্বের সেবাই হবে সেই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিয়ে আমরা কেউ করবো না, আজীবন আমাদের পরের জন্যই কাটবে।"

এমনিতর ছোটখাটো বক্তৃতাও একটা দিয়ে ফেলেছিলাম। আজ সে কথা মনে আনতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। নাড়ু আমার হাতটা তার হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলেছিল, "কাজ কি ভাই আমাদের নামের গোরোতে, মনটা যদি চিরদিন এমনি থাকে তো আপনার কর্তব্য কোনো দিনই ভুলবো না।"

এর দিন তিনেক পরের ঘটনা। ছুটির ভেতরে বাড়ীর যে অংকগুলি করে নিয়ে যাবার কথা ছিল, হিসেব করে দেখা গেল, তার একটিতেও হাত দেওয়া হয়নি।

লেখাপড়ায় ফাঁকি দিচ্ছি তার নিজেই ফাঁকিতে পড়ছি...এই রকম একটা ভাব মনে জাগতে ভারী অনুশোচনা এলো। ঠিক করলাম...আজ অর্ধেক অংক শেষ করে ফেলবো। সেই মতলব নিয়ে খাতা পেন্‌সিল সহ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে মাদুর পেতে বসেছিলাম সন্ধ্যেবেলায়। কিন্তু তার কি যো আছে?

কানে এলো নাড়ুর ডাক, "নীলে, বাড়ী আছিস নাকি?" মা সরস্বতীর আরাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হতে খাতা পেন্‌সিল ফেলে রেখে উঠে পড়লাম।

নাড়ু কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললে, "একটা ভারী মুশকিলে পড়া গেছে — তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বেরুতে হবে যে।"

নাড়ুর মুশকিল যখন, তখন ব্যাপারটা জটিলই হবে।

আমি ভ্রূ কুঁচকে এতক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এইবার একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম "ভনিতা রেখে আসল ব্যাপারটা কি তাই বলত? কোনো দুষ্টু মতলব যদি মগজে এসে থাকে, তবে কিন্তু আমাকে বাদ দিতে হবে। আজ অংকগুলো করে না ফেললেই নয়।" নাড়ু বললে, "অংক না হয় একদিন পরে করলেও চলবে, কিন্তু হরিদাসী পিসির শবদেহটা ত' আর ঘরে পচতে পারে না। তার একটা সদ্‌গতির ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হয়।" আমি অবাক

হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "হরিদাসী পিসী কি মারা গেছে নাকি? কালকেও ত' তার ভাজা মুড়ি খেয়েছি।"

এইখানে হরিদাসী পিসীর একটা পরিচয় দেয়া দরকার। হরিদাসী পিসীর পরিচয়, সত্যি কথা বলতে কি, কেউ জানে না — কবে থেকে যে হরিদাসী পিসী এই অঞ্চলের একান্তে একটি কুঁড়ে বেঁধে বসবাস করছে, তা আমাদের বাবা-কাকা-দাদারাও হিসেব করে বলতে পারবে না।

এই সরকারী পিসীকে কে না চেনে? চেনবার জন্য একটা মুখরোচক কারণ আছে। অমন মুচ্‌মুচে মুড়ি এ তল্লাটে আর কেউ ভাজতে পারে না····তাই হরিদাসী পিসীর এত নামডাক। বর্ষাকালে গল্পের আসরে জমাতে হলে হরিদাসী পিসীর মুড়ি আর ফুঠকড়াই ভাজা তেল লংকার সঙ্গে যে আমেজ সৃষ্টি করে — বাদশাহী পোলাও, মাংস তার কাছে হার মেনে যায়। তাছাড়া ছেলেমহলে পিসীর দারুণ পসার। টিফিনের ঘণ্টা পড়লে হরিদাসী পিসীর মুড়ি-মুড়কি সোনার দরে বিকোয়। এহেন হরিদাসী পিসী আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে শুনে, সত্যি হক্‌চকিয়ে গেলাম।

আমাদের স্কুলঘরের পাশে যে বিরাট বটগাছ আছে, লোকে জানে সেটা স্কুলের একটা অংশ। ওর ছায়া-ঢাকা অঞ্চলটি বাদ দিয়ে আমরা ইস্কুলের কথা ভাবতে পারিনে। তেমনি হরিদাসী পিসীও আমাদের ছোটদের জীবনের সঙ্গে একবারে জড়িয়ে গেছে। শোনা যায় যে, মুড়ি-মুড়কি বিক্রী করে অনেক টাকা করেছিল। আর তার এক দেওর তাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের ছেলেদের মায়াতেই হোক আর ইস্কুলটাকে ছেড়ে যেতে পারে না বলেই হোক—আমাদের হরিদাসী পিসী চিরটাকাল এখানেই রয়ে গেছে। হরিদাসী পিসীর আমরা চিরটাকাল এক রকম দেখে আসছি তাতে জোয়ার ভাঁটা নেই। দেখা হলেই একগাল হাসি হেসে একমুঠ মুড়ি পকেটে গুঁজে দেবে, তার জন্যে অবিশ্যি কোনো কালেই পয়সা চাইবে না। ছোটদের একবারে অন্তর দিয়ে ভালো না বাসলে কেউ অমন করে দেখা হলেই হাসত পারে না।

সেই হরিদাসী পিসী মরে গেছে শুনে সত্যি খুব কষ্ট হল।

নাড়ু ধমক দিয়ে বললে, "অমন করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। পিসী কোন্ জাতের লোক, জানা নেই বলে নাকি তাকে পোড়াতে কেউ রাজী হয় নি। ছুতোরপাড়া, কামারপাড়া, ধোপাপাড়া, কৈবর্তপাড়া সবাইকে খবর দেয়া হয়েছিল—কিন্তু সব অঞ্চলের মোড়লরাই মুখ মুছে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আমরা ছেলের দল ত' জাত-বিচার নিয়ে বসে থাকতে পারিনে।

এইবার যেন আমি চেতনা ফিরে পেলাম। বললাম, সত্যি কথাই ত'। হরিদাসী

পিসী আমাদের নিজের পিসীর চাইতে এতটুকুও কম নয়। তার জাত যাই থাক···· আমাদের ওপর তার স্নেহ ত' কম ছিল না ।

কাঁধে একটা গামছা তুলে নিয়ে বললাম, "আচ্ছা, আমি একবার মাকে বলে আসি। আমি জানি মা একাজে কখনই বারণ করবে না। কতবার দেখেছি, হরিদাসী পিসীকে নিজের পুরোনো শাড়ী দিয়েছে — আর পিসী দু'হাত তুলে আমাদের আর্শীবাদ করতে করতে চলে গেছে।"

নাড়ু বললে, "সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আর বেশী রাত করা ঠিক হবে না। লোকজন যোগাড় করে নিতে হবে ত'।" আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, "সে জন্য আর ভাবনা কি রে? আমাদের ব্যায়ামাগারের দলকে ডেকে নিলে সব সমস্যা চুকে যাবে। নাই বা এলো সব সমাজপতির দল।"

নাড়ু বললে, "আমিও ঠিক সেই কথাটাই ভাবছিলাম।"

মার কাছে অনুমতি নিয়ে আমি আর নাড়ু যখন সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম —তখন অন্ধকার ঝোপ-ঝাড়ে জোনাকির দল লাখো লাখো আগুনের হরির লুট ছড়াচ্ছে। বিপিনটা বেশ গোঁয়ার গোবিন্দ আছে। তাই আমরা প্রথমেই ওর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। একটা চলতি কথা আছে —

"পাগলা ভাত খাবি?"
"না, আঁচাব কোথায়?"

আমাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে শুনে নিয়েই, একটা মোটা তোয়ালে কাঁধে ফেললে, তারপর বললে, "চল, আগে হরিশটাকে ঘাড় ধরে বের করে নিয়ে আসি।"এমনিভাবে এক বাড়ী আর এক বাড়ী করে — হারাধনের দশটি ছেলে না হোক্ — জনা আষ্টেক আমরা জুটে গেলাম।

আরো কয়েকটি ছেলে জোটাবার আশায় আমরা দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছি, হঠাৎ পাড়ার জনার্দন জ্যাঠামশাই আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন।

বললেন, "দেখ বাবাজীরা, তোমাদের একটা কথা বলি। তোমরা সব বামুন, বদ্যি, কায়েতের ঘরের ছেলে হয়ে একটা অজাত -কুজাতের স্ত্রীলোকের মড়া পুড়িয়ে আসবে— এটা মোটেই ভালো কথা নয়।"

নাড়ু বললে, "তা'হলে আমাদের কি করতে বলেন?" জনার্দন জ্যাঠামশাই চশমাটা চাদরের খুঁটে একবার মুছে নিয়ে বললেন, "বাবা, ডোমদের খবর দাও— তারাই এসে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। তোমরা ওসব নোংরা কাজ করতে যাবে কেন শুনি? যাও— যাও, যে যার ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের বাপ-মারাও যে কেমন বুঝতে পারিনে। এই অন্ধকার রাত্তিরে নোংরা কাজ করতে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে।"

বিপিনটা চিরকালই একটু গোঁয়ার গোবিন্দ। একটু এগিয়ে এসে বললে, "দেখুন জ্যাঠামশাই, হরিদাসী পিসীর হাতে ভাজা মুড়ি-মুড়কি আপনার বাড়ীর ছেলে মেয়েরাও বড় কম খেতো না। সেই মুড়ি যদি সবাইকার মুখে উঠতে পারে, তার শবটারই বা সৎকার হবে না কেন? আর আপনিও ত' সারা জীবন ধরে দেখেছেন যে পিসী এমন কোনো নোংরা কাজ করেনি, যার জন্যে তার শবদেহটা ডোমে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে? আমরা তাহলে রয়েছি কিসের জন্য? তার মুড়িটাই না হয় আমরা দাম দিয়ে খেতাম, কিন্তু তার স্নেহটা।"

জনার্দন জ্যাঠা বিপিনের মুখে একসঙ্গে এতগুলি কথা শুনে খানিকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তারপর চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে শুধু মন্তব্য করলেন, "অর্বাচীন!"

বাঁশ কেটে খাট তৈরী করে তার ওপর হরিদাসী পিসীর শব বেঁধে নিয়ে আমরা যখন শ্মশানের পথে রওনা হলাম, তখন লক্ষ্মীপ্যাঁচা দুই প্রহরের ডাক ডাকছে।

আমাদের অঞ্চল থেকে নদীর ধারের মড়া পোড়ানোর ঘাট বেশ দূরের পথ। কাঁধ বদলে বদলে ওখানে গিয়ে পৌঁছুতেও কম সময় লাগলো না।

পৌঁছেই নাড়ু বললে, "আমাদের কিন্তু বিশ্রাম করবার সময় নেই। মরা গাছের ডাল আর বাঁশ কেটে আনতে হবে।" পাড়াগাঁয়ে এই একটা মস্ত বড় সুবিধে···· কার গাছের ডাল কে তুলে নিচ্ছে, তার কিছু হিসেব থাকে না। বিশেষ করে শ্মশান অঞ্চলে।

বিপিন বললে, "নীলে, মড়া ছুঁয়ে বসে থাক্ ···· আমরা দল বেঁধে গিযে গাছের ডাল আর বাঁশ কেটে নিয়ে আসি।" আমরা বুদ্ধি করে অমরদের বাড়ী থেকে দা আর কুড়ুল বেঁধে নিয়ে এসেছি। তারপর ডালগুলো ত' বয়েও নিয়ে আসতে হবে। কাজেই লোকজনের দরকার।

ওরা যখন দল বেঁধে চলে গেল···· তখন কোনো কথাই মনে আসেনি। এইবার জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যেতে ····গা-টা কেমন যেন ছম্‌ছম্ কবতে লাগলো।

দূরে একটা শেয়াল আচম্‌কা ডেকে উঠল। আমরা এ যুগের ছেলে— ভূতকে বিশ্বাস করি না। বলি, চোখের ভুল দেখা।

কিন্তু শ্মশানের মতো জায়গায় এমনভাবে একলা মড়া আগলে ত' কখনো বসে থাকিনি। দশজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বন্ধ ঘরে ভূতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া চলে। কিন্তু ফাঁকা আর জনমানবহীন অন্ধকার জায়গাগুলোতে ভয় যেন ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে বসে থাকে···· মানুষকে একলা পেলেই তার মনের ওপর লাফিয়ে পড়ে। হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে দেখি, আমার আশে-পাশে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। এই সময় সাদা খাতার পাতায় যে

অবস্থা দাঁড়ায়, আমার মনের ভেতরে আর বাইরে ঠিক তেমনিভাবে যেন মা কালী তার রাশি রাশি কালো চুল এলো করে দাঁড়ালো।

মাথার ওপরে আবার কিসের শব্দ? তাকিয়ে দেখি, অনেকগুলো বাদুড় ক্রমাগত ডানা ঝটপট করছে।

চারদিক থেকে হাওয়া হু-হু করে ছুটে এলো। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম — ভূত নয়, ঝড় আসছে! ওরা দল বেঁধে এই অন্ধকাবের মধ্যে যে কতদূরে কাঠ কাটতে গেছে তা ঠাহর করাও ত' মুশকিল। ডাকলে যে সাড়া পাওয়া যাবে, তা মনে হয় না। তবু প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলাম "নাড়ু—বিপিন—হরিশ "।

কিন্তু হু-হু করছে শ্মশানের পাগলা হাওয়া! কে সাড়া দেবে? আর শুধু ঝড়ই ত' নয় — তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। কাছেই একটা খড়ের চালা ছিল।

হরিদাসী পিসীর শবটা বাঁশের খাটিয়ার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। প্রাণপণে টানতে টানতে সেই চালার ভেতর নিয়ে গিয়ে হাজির করলাম।

কি করে যে আমার অমন অসুরের মতো শক্তি এলো, আজ ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যাই। তবু মনের জোর যে আমার চিরদিনই খুব বেশী, সেটা বন্ধু-বান্ধবেরা আড়ালে শুনতে পাই স্বীকার করে।

তারপর আরো ঘন্টাখানেক ঐভাবে কাটবার পর জল-ঝড়ের মধ্যে যখন নাড়ু আমার নাম ধরে ডাকছে শুনতে পেলাম, তখন মনে হল — প্রেতলোক থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম! হরিদাসী পিসী যেমন আমাদের স্নেহ করত ···· তেমনি জীবনে একটি শিক্ষা দিয়ে গেছে। মানুষ-ভূতের ভয় যদি বা আজও করি —আসল ভূত-প্রেতের আতঙ্ক সেই কাল রাত থেকেই জয় করে নিয়েছি!

ওদিকে ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমাদের বন্ধ হয়েছিল যেমন অন্য সব ইস্কুলের আগে, খুললোও তেমনি সকালে। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি আমরা আবার ভালো ছেলে সেজে —সরস্বতীর বরপুত্র 'হবার আশায়' —ইস্কুলে ছুটলুম। গিয়ে দেখি, ইস্কুলের বেশ একটু পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের আগেকার হেডমাষ্টার মশাই চলে গেছেন বদলি হয়ে, আর তাঁর জায়গা দখল করছেন, মোটা কালো কুচকুচে ভুঁড়িওয়ালা এক বুড়ো মাষ্টার। দু'দিনের ব্যবহারেই বেশ বুঝতে পারলুম, হেডমাষ্টার মশাই অযথা ভুঁড়িটির ভার বয়ে বেড়ান না। ওটি তাঁর দুষ্ট বুদ্ধি জমিয়ে রাখবার থলি বিশেষ।

* * *

একদিন বিকেলবেলা আমরা ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলে নদীর ধারে বসে বেশ জটলা করছিলাম, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, সাক্ষাৎ যমদূতের মতো হেডমাষ্টার মশাই তাঁর মোটা লাঠি হাতে করে — ভুঁড়ি বাগিয়ে কখন থেকে

আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় তাকাতে দেখে মোটা গলায় বললেন, "এখানে কি কচ্ছ তোমরা?" সকলেই পেছন ফিরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। আমরা কি বেড়াবার অধিকারও হারিয়ে বসলাম তাঁর আমলে?

কথার জবাব দিলে নাড়ু। সে বললে, "নদীর হাওয়া খাচ্ছি স্যার!" হেডমাষ্টার তাঁর ছড়ি ঘুরিয়ে মোটা গলায় বললেন, "না, এখানে এরকম ভাবে আড্ডা দেয়া চলবে না তোমাদের।" —এই বলে আর একদিকে চলে গেলেন।

ভালো রে ভালো। নদীর ধারে বেড়াবে — তাতেও মাষ্টারী।

নাড়ু বললে, "হ্যাঁ, শক্তের ভক্ত, নরমের যম —রোসো, বাছাধনকে একটু মজা দেখাতে হচ্ছে।"

পরদিন ইস্কুল ছুটির পর নাড়ু আমাদের চুপিচুপি ডেকে নিয়ে শুধোলে, "কি রে কিছু বুঝতে পারলি?"

আমি বললুম, "কিসের কি?"

নাড়ু বললে, "দূর বোকা। হেডমাষ্টার আমাদের পিছনে চর লাগিয়েছে," তা' জানিস?"

সত্য যেন আকাশ থেকে পড়ে বললে, "চর কি রকম?"

নাড়ু হেসে বললে, "আর কি রকম। টিফিনের ঘন্টায় হেডমাষ্টারের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘরের ভিতর ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ শুনে জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, দুটো ছেলেকে হেডমাষ্টার আমাদের খোঁজ-খবর নিতে বলছেন — আর আমরা কখন কি করি, সব সময় পেছন পেছন থেকে তা' জেনে, হেডমাষ্টারকে বলতে হবে।"

আমি বললুম, "তার মানে? আমরা কি চোর না ডাকাত?"

নাড়ু বললে, "চোর হই, আর ডাকাতই হই, মোট কথা, আমাদের পেছনে ফেউ লেগেছে।"

সত্য বললে, "ছেলে দুটো কোন্ ক্লাসের বল্‌তে পারিস?"

নাড়ু চোখ বুজে একটু মাথা চুলকে বললে, "বোধ হয় ফার্ষ্ট ক্লাসের হবে। তবে এটা ঠিক, ওদের শায়েস্তা না করলে চলছে না।"

সত্য বললে, "নিশ্চয়ই।"

নাড়ু বললে, "তোরা খেয়ে-দেয়ে নদীর ধারে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবি। আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।" তিনজনে যখন নদীর ধারে মিললুম তখনও একটু বেলা আছে।

নাড়ু বললে, "চল এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।" আমি বললুম "কোথায়?" নাড়ু বললে, "আয় না আমার সঙ্গে।"

নদীর রাস্তা ছেড়ে পুরোনো বাগানের রাস্তা ধরলুম। শহরের শেষটায় একটা

পোড়ো জায়গা, লোকের বসতি নেই — জায়গাটা একেবারে জঙ্গলে ভর্তি। প্রবাদ আছে, কোনও কালে নাকি নামকরা এক জমিদার ছিল এইখানটায়। তার অত্যাচারে প্রজাবা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শেষটা আর টিকতে না পেরে প্রজাবা বিদ্রোহী হয়ে রাতারাতি জমিদার-বাড়ি চড়াও করে সবাইকে খুন করে ফেলে। বংশে বাতি দেবারও নাকি কেউ ছিল না। একে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, তার ওপর জায়গাটার এমন একটা ভীষণ কংকালসার মূর্তি দেখে, প্রাণটা আপনিই ছম্‌ছম্‌ করে উঠছিল।

নাড়ু গিয়ে একেবারে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ল। বলল, "পেছনে আয়।"

আমাদের দেখে দুটো শেয়াল গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

আমি বললুম, "জঙ্গলের ভেতর এ সন্ধ্যাবেলা কি হবে?"

নাড়ু শুধু বললে, "দরকার আছে।"

চললুম তার পেছন পেছন। মাথার ওপর দিয়ে একটা কালপ্যাঁচা বিকট শব্দ করে চলে গেল। আরো খানিকটা গিয়ে দেখি, পোড়োবাড়ির একটা ভাঙা সিঁড়ি যেন প্রেতের মতো দাঁত বের করে পাহারা দিচ্ছে।

নাড়ু বললে, "এখানে আমরা বসবো।"

সকলে গিয়ে তার ওপর বসলুম। সিঁড়ির তলা থেকে গোটা কয়েক বাদুড় ঝটপট করে বেরিয়ে আমাদের গায়ে ডানার ঝাপটা মেরে চলে গেল। নাড়ু পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই বের করে বললে, "নে ধরা একটা করে।"

আমি বললুম, "নাড়ু, এসব কি?"

নাড়ু বললে, "আরে বোকা, ফেউ দুটো আমাদের পেছু নিয়েছে। ওদের দেখাতে হবে — আমরা সব বকাটে ছেলে এই রকম জায়গায় আমাদের রোজ আড্ডা বসে। তুই তো সত্যি সিগারেট খাচ্ছিস্‌ নে, শুধু ধরিয়ে বসে থাক না।"

আমি বললুম, "ওদের এসব দেখিয়ে লাভ?"

নাড়ু চোখ বুজে বললে, "দরকার আছে।" আর আপত্তি না করে ওর কথামত কাজ করলুম। নাড়ু আপন মনেই বলতে লাগলো, "ছেলেদুটো হেডমাষ্টারকে গিয়ে সব লাগাবে —ভারী মজা হবে কালকে।"

পুরোনো বাগ থেকে যখন ফিরে এসে হোষ্টেলে ঢুকলুম, ঢং ঢং করে তখন ঘড়িতে আটটা বজল। নাড়ু বললে, "কালকেও যেতে হবে কিন্তু।"

পরদিন বিকালবেলা আবার সকলে পুরোনো বাগের দিকে রওনা হলুম। যাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু নাড়ুর সত্যিকারের ইচ্ছাটা যে কি, তা বুঝতে না পেরে মনটা সন্দেহের দোলায় দুলছিল। আজকে নাড়ু আরো নিবিড় জঙ্গলে ঢুকতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তারা যে সত্যি আমাদের পেছন এসেছে তা কি করে জানলি?"

নাড়ু মুচকি হেসে বললে, "আজকে শুধু ফেউ নয় —পেছনে বাঘও আছে।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "সে কি? হেডমাষ্টার মশাইও সঙ্গে আছেন নাকি?"

নাড়ু শুধু বললে, "হুঁ।"

নিঃশব্দে সকলে চলতে লাগলুম। আরো খানিকটা গিয়ে দেখলুম, সামনে বেতকাঁটার মস্ত বড় ঝোপ। বললুম, "এর ভেতরেও ঢুকতে হবে নাকি?"

নাড়ু বললে, "হুঁ।"

ওতো "হুঁ" বলেই খালাস! এদিকে আমাদের তো প্রাণ যায়। বেতঝোপ থেকে এক একটা ডাঁটার আগা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নাড়ু আমাদের হাতে দিয়ে বললে, "টান্" —

টেনে টেনে জায়গাটা বেশ ফাঁকা হতে দেখলুম, ভেতরে দিব্যি একটা পরিষ্কার রাস্তা হয়ে গেছে। পকেট থেকে এক বাণ্ডিল সুতো বের করে বললে, "প্রত্যেকটি ডাঁটার আগা পাশের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখ।" আমরা নাড়ুর কথামত সেই রকমটি করে তার পেছু নুতন পাওয়া রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। খানিকটা গিয়ে নাড়ু বললে, "চুপ, কথা ক'সনি আশে-পাশে দাঁড়িয়ে থাক।"

একই বাদেই দেখি দুটো ছেলের সঙ্গে আমাদের হেডমাষ্টার মশাই পা টিপে টিপে এদিকে আসছেন। বেত ঝোপের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে ছেলে দুটো বোধ হয় হেডমাষ্টারকে ফিসফিস করে বললে, "এই পথেই তারা গেছে।" হেডমাষ্টারও মাথা নেড়ে সেই রাস্তায় নেমে পড়'লেন।

নাড়ু চুপি চুপি বললে, "দু'পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সুতোগুলো কেটে দাও।" আমরাও তার কথা মতো দু'ভাগে দু'পাশ দিয়ে গিয়ে ছুরি দিয়ে কচাকচ সুতো কেটে ফেললুম। আর যাবে কোথা? বেত কাঁটাগুলো ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ভুঁড়ি সুদ্ধ হেডমাষ্টার আর ছেলে দু'টোকে জড়িয়ে ধরল।

আমরা ততক্ষণ পগার পার। পরদিন সকালবেলা শুনলুম হেডমাষ্টারকে নাকি পুরানো বাগের মুখে খ্যাঁকশেয়ালীতে ধরেছিল। শরীরের এমন জায়গা নেই, যেখানে নাকি আঁচড়-কামড়ের দাগ না আছে। কাপড়, জামা-টামা সুদ্ধ নাকি সব ছিঁড়ে গেছে।

আমরা বললুম, "তবু যে প্রাণে-প্রাণে বেঁচে এসেছেন তাই রক্ষে—নইলে আমাদের দশাটা কি হতো।"

পরদিন ইস্কুলে যেতেই হেডমাষ্টার নাড়ুকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর খাস কামরায়। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি দপ্তরী একগাছা লিকলিকে বেত এনে হাজির করল। হেডমাষ্টার নাড়ুর দিকে চেয়ে বললেন, "কালকে কোথায় গেছলে শুনি?"

নাড়ু অবাক হয়ে বললে, "কোথায় স্যার?"

হেডমাষ্টার মশাই রেগে বললেন, "কোথায় জানো না? রোসো দেখিয়ে দিচ্ছি," এই বলে সপাং করে নাড়ুর গায়ে এক বেত। নাড়ু আস্তে, কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গে বললে, "মারবেন না স্যার।" "না, মারবো না মাখন খেতে দেবো," বলে যেই আর এক ঘা মারতে গেলেন, অমনি নাড়ু খপ্ করে বেতটা ধরে ফেলে দু'খানা করে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল। হেডমাষ্টার বোধহয় এতটা আশা করেন নি। চোখ দেখে বুঝলুম ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। তাঁর হাত থর্থর্ করে কাঁপতে লাগলো। খানিক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "যাও ক্লাসে যাও।" নাড়ু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার ৫।৭ দিন পর, একদিন সকালে উঠে ভূগোলটা ভালো করে তৈরী করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছে চেনা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, "মশায়, নীলু বলে কেউ এখানে থাকে?" দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে দেখি, আমাদের পুরোনো বন্ধু অমর, কুলীর মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে এসে হাজির। আমি বললুম, "অমর কোত্থেকে হে?" সে বললে, "ভাই, তোদের এখানেই থাকবো।"

আমি বললুম, "তার মানে?"

অনেক ব্যাখ্যা করে সে যা বললে তাতে এইটুকু বোঝা গেল যে অমর যেখানটায় পড়ত, স্বাস্থ্য তার সেখানে মোটেই টিকছে না—কাজেই তার বাবা নাকি বলেছেন—নীলেরা যেখানে আছে, সেখানে গিয়ে পড়াশুনা কর।

আমি বললুম, "তা হলে নীলের ওপর তোর বাবার খুব ভালো ধারণা আছে বল?"

অমর হেসে বললে, "নিশ্চয়।"

অমরের এখানে এসে লাভের চাইতে লোকসানই হল বেশী। বছরের মাঝখানটায় সবগুলো বই বদলে যাওয়ায় বেচারী বেশ একটু মুশকিলে পড়ে গেল। সে অনেক রাত জেগে পড়ত বটে, কিন্তু কিছুতেই তেমন সুবিধে করে উঠতে পারতো না। তার ওপর সামনেই হাফ্ইয়ারলি একজামিন। একজামিনের দিন সাতেক আগে হোষ্টেলের একটা বড় রকমের ফিষ্ট, ছেলেদের উৎসাহের সীমা নেই।

সকাল থেকেই গবেষণা চলছে, কে কত সের মাংস ওড়াবে, কে কত গণ্ডা লেডিকিনি গলাধঃকরণ করবে, আর, কে কত ভাঁড় দৈ সাবড়ে দেবে। আয়োজনের ত্রুটি নেই, আর অতি উৎসাহী বোর্ডারদেরও অভাব নেই। তখন রেশন কিংবা যুদ্ধের যুগ নয়—কাজেই খাদ্যবস্তু যেমন প্রচুর পাওয়া যেতো, ছেলেরা খেতেও পারতো অসম্ভব রকম।

পাতে ক্রমাগত দিয়ে যাও .... কোথায় যে চলে যাচ্ছে, কেউ তার হদিশ দিতে পারবে না। এমনি কয়েকটি মূর্তিমান ছেলে আমাদের বোর্ডিং-এ ছিল। অন্যান্য ছাত্ররা তাদের দেখিয়ে রসিকতা করে বলত, ওদের মাথা থেকে পা অবধি রবারের বলের মতো ফাঁপা।

যাই হোক, এই ফাঁপা বলের দল গোপনে ঠিক করে ফেললে যে, তারা আজ 'ফিষ্টের' আসরে বসে সব কিছুই সাবড়ে দেবে।

আগেই বলেছি, আয়োজনের কিছুমাত্র কমতি ছিল না। রান্না শুরু হয়েছে বিকেল চারটে থেকে, আর সমাধা হয়েছে রাত দশটায়। বহু রকম পদ আর তার প্রাচুর্য দেখে মনে হবে, বুঝি এক বড়লোকের বাড়ির বৌ-ভাতের আয়োজন করা হয়েছে। শুধু মাছই রান্না হয়েছে পাঁচ রকমের। এরপর মাংস, নানা রকম তরকারী, মিষ্টি, দৈ, রাবড়ী ত আছেই। সন্ধ্যে থেকে হলঘরে বসেছে গানের মজলিস। আবার শুনতে পেলাম যে, সে রবারেরই ফাঁপা দল খিদেটাকে বেশ চাঙা করে নেবার জন্য গোপনে বাটি-বাটি সিদ্ধি খেয়ে নিয়েছে। কথায় বলে—

"একা রামে রক্ষা নেই—
সুগ্রীব দোসর।"

ফাঁপা বলের দলের অবস্থা হয়েছে অনেকটা তাই।

গান-বাজনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। তারা ক্রমাগত রান্নাঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, আর নজর রাখছে, কখন প্রথম ব্যাচের পাতা পড়ে।

বোর্ডিং-এ সবাইকে খেতে ডাকবার সময় ঘন্টা দেবার নিয়ম ছিল। সেই ঘন্টা ধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা দু'তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে এমনভাবে খাবার ঘরের দিকে পড়ি কি-মরি করে ছুটতে থাকত যে, বাইরের লোক থাকলে মনে করত নিশ্চয়ই হোষ্টেলে আগুন লেগেছে।

যাই হোক, ফিষ্টের দিনের তৎপরতা আরো বেশী। কেন না, ছেলেদের ধারণা —প্রথম পংক্তিতেই সব ভালো ভালো খাবার হাওয়ায় উড়ে যাবে।

কথাটা যে একেবারে মিথ্যে নয়, সে কথা ছেলেরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বহু ভোজে। সুতরাং যে করে হোক্ প্রথম ব্যাচের আসনে 'ব্যাঘ্র ঝম্পট' দিয়ে পড়ব, এইটেই সব ছেলের আন্তরিক বাসনা। খাবার প্রথম ঘন্টা পড়ল —রাত সাড়ে দশটায়। দেখা গেল, সঙ্গীতের আসরে যে গায়ক গান গাইছিলেন, হুড়োহুড়ির ঠ্যালায় শুধুই দাঁতটাই তার ভাঙেনি ....। তবে বহু রকম লাঞ্ছনা তাঁকে সইতে হয়েছে। ছেলেরা যে সঙ্গীতের আদর এত বেশী করে, ভদ্রলোকের তা জানা ছিল না। বাঁয়ার ছাউনি ফেঁসে গেছে। হারমোনিয়ামের গোটা দুয়েক রীড খোয়া গিয়েছে বোধ করি।

যাই হোক, এইভাবে তিনটে পংক্তিতে খাওয়া-পর্ব সমাধা হল। আমি আর নাডু কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম। শরীরও পরিশ্রান্ত ছিল নানা কারণে।

কাজেই কে কত ভাঁড় দৈ সাবাড় করলে, কে কয় সের মাংসের হাড় চিবিয়ে ছাতু করে দিলে, তার হিসেব রাখবার উৎসাহ আমাদের মোটেই ছিল না।

বেশ সুনিদ্রাই হচ্ছিল বলতে পারি। হঠাৎ ঠেলাঠেলিতে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল।

নাডু চুপি চুপি বললে, "একবার বাইরে আয় ত', কে যেন ছাতে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ব'লে মনে হল।"

দুজনে পা টিপে টিপে ছাতে এলাম। আকাশভরা জ্যোৎস্নাকে মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে। সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলার মধ্যে দেখলাম, ছাদের কার্নিসের একপ্রান্তে ব'সে সত্যি একটি ছেলে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

ব্যাপার কি?

আমরা দুজনে এগিয়ে এলাম। এ কি! এ যে আমাদের বোর্ডিং - এর ছোকরা চাকর ঝন্টু।

— "কি রে ঝন্টু, ব্যাপার কি? এত রাত্তিরে ছাতে বসে এমন ভাবে কাঁদছিস কেন?"

ঝন্টু প্রথমে কিছুতেই কথা বলে না। তারপর অনেক করে প্রশ্ন করতে জবাব দিলে, "ভুখ লাগা।"

বহু চেষ্টায় দীর্ঘ জেরা করে যে কথা জানা গেল, তা হচ্ছে এই, ছেলের দল সব খাবার খেয়ে ফেলেছে। তাই বোর্ডিং-এর ঠাকুর-চাকরদের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি।

আর সব চাকর আর ঠাকুর রাগ করে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে আছে ঘরে। কিন্তু ঝন্টু ছেলেমানুষ। সে কিছুতেই খিদে সহ্য করতে পারছে না। তাই ত' একলা ছাদে বসে কাঁদছে! নাডু বললে, "দেখলে আমাদের ছেলেদের কাণ্ড! সব চেটে-পুটে খেয়ে চলে গেছে··· আর ঠাকুর-চাকর খেলো কি না সেদিকে কারো দৃষ্টি নেই।" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই সেই 'ফাঁপা বলের' দলের কাণ্ড?" নাডু রেগে উঠে বললে, "কিন্তু বোর্ডিং-এর ম্যানেজারেরও ত এটা দেখা উচিত। সারাদিন বেচারারা খেটেছে।···তারা খালি-পেটে শুয়ে থাকবে, এ কেমন যুক্তি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে এত রাত্তিরে ওদের খাবার-দাবার কি ব্যবস্থা করা যায়?"

নাডু বললে, "চল, সবাইকার ঘুম ভাঙাই।" আমি শুধোলাম, "ঘুম না হয় ভাঙালে। কিন্তু তারপর?" নাডু জবাব দিলে, "তারপর সবাইকার কাছ থেকে আট আনা করে চাঁদা আদায় করে — ঠাকুর-চাকরদের ভরপেট মেঠাই খাওয়াতে হবে।

আমাদের বোর্ডিং -এর পাশেই ত' মেঠাইয়ের দোকান। দরকার হয়, ওদের ডেকে তুলতে হবে। নইলে সারা দিনরাত যাদের অসুরের মতো খাটিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের পেট-উপোসী রাখা তো চলে না।"

কিন্তু ছেলেদের ঘুম ভাঙানোই কি সোজা কাজ? বিশেষ করে সেই ষাঁপা বলের দল।

ঘুমের ঘোরে তারা কোনো কথাই শুনতে চায় না কিন্তু নাড়ুও নাছোড়বান্দা।

ঘটি ঘটি জল মাথায় ঢেলে, তেঁতুলের সরবৎ খাইয়ে তবে ওদের চেতনা ফিরিয়ে আনা হল।

সব কথা শুনে ছেলেরা বললে, "এ ত' ঠিক কথা। আমাদেরই অন্যায় হয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে আট আনা করে মাথা পিছু চাঁদা আদায় হয়ে গেল। তারপর সেই মিঠাইওয়ালাকে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলে প্রচুর মিষ্টি নিয়ে আসা বড় সোজা কাজ নয়।

ঝন্টু এত মিষ্টি জীবনে কখনো খায়নি। এইবার কান্না ভুলে সে বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করে ফেললে।

রাত তিনটের সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লুম। আবার হঠাৎ ঘুম ভাঙতে চেয়ে দেখি — অন্ধকার। ঘরের একটা পাশ আলো করে অমরের শিয়রে আলো জ্বলছে, আর বিছানার ওপর বসে অমর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আবার কান্না।

আজ কি বোর্ডিং-এ কান্নার এপিডেমিক্ শুরু হল নাকি?

লাফিয়ে উঠে তার হাত দু'টো মুখ থেকে টেনে নিয়ে বললুম, "কি হল?" ধরা পড়ে অমরের লুকোনো কান্না আর চাপা রইল না—সে আরো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কান্না শুনে নাড়ু লাফিয়ে উঠে এসে বললে, "ব্যাপার কি?" নাড়ুর অনেক সাধ্য সাধনার পর অমর বললে যে, সে কিছুতেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না—আর সে কথা যদি তার বাবার কানে ওঠে তো তিনি তা'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

নাড়ু খিলখিল্ করে হেসে বললে, "তাই শেষ রাত্তিরের ঘুম নষ্ট করতে মরা-কান্না শুরু করে আমাদের চোখের পাতা এক করতে দিবিনে।"

অমর চোখের জল জামার হাতায় মুছে বললে, "ঠাট্টা নয় ভাই—তোকে আমি সত্যি করে বলছি।"

নাড়ু বললে, "আচ্ছা আমি বলছি তোর প্রশ্ন চুরি করে এনে দেবো। হল

তো, যা এখন ঘুমোগে।" আমি বললুম, "সে কি? প্রশ্ন তুমি পাবে কোথায়?" নাড়ু বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজে বললে, "সে হবে এক রকম করে। বললুম যখন, তখন আর কিছুর জন্যে আটকা থাকবে না।"

তা জানতুম। নাড়ুর "হাঁ" -কে, "না" করতে পারে এমনতর কেউ জগতে ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার কেমন মন সরছিল না। এই সেদিন হেড মাষ্টারের সঙ্গে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। তাই আস্তে আস্তে বললুম, "কাজ নেই ভাই ও সবে!"

নাড়ু আমায় ধমক দিয়ে বললে, "তুমিও আবার মরা-কান্না শুরু করলে — আজ কি ঘুমোতে দেবে না নাকি?"

এরপর আর কথা চলে না —কাজেই চুপ করে গেলুম।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে খাটের ওপর বসে নাড়ু হাঁপাতে লাগলো।

জিগ্যেস করলুম, "ব্যাপার কি?"

বললে, "চুপ্ —কোশ্চেন এনেছি।"

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম!

অমর হাঁ করে নাড়ুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নাড়ু বললে, "প্রেস থেকে আজই কোশ্চেন হেডমাষ্টারের কাছে এসে পৌঁচেছে। হাত-বাক্সের ভিতর বন্ধ করে হেডমাষ্টার গেছে বোনের বাসায় বেড়াতে। তাঁর ভাইপোকে এক সের চম্‌চম্ খাইয়ে তবে অনেক কষ্টে রাজী করাই। তারপর সে চুপি চুপি চাবি এনে দিতে প্রশ্নগুলো নিয়ে এলুম। অবশ্য তারো এতে লাভ হয়েছে। তাদের ক্লাসের কোশ্চেনও একখানা করে দিলুম কি না। নিজের নেবার সাহস নেই, অথচ আমাকে দিয়ে কাজ হাঁসিল করলো।"

হেডমাষ্টারের ভাইপো আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ে, তা জানি। বললুম, "হেডমাষ্টার এসে যখন টের পাবে তখন?"

নাড়ু হেসে বললে, "তা আর জানবার যোটি নেই। প্রত্যেক পেপারের এক খানা করে কোশ্চেন নিয়ে আবার যেমনটি খামে মোড়া ছিল, তেমন করে রেখে এসেছি। তা ছাড়া হেডমাষ্টার নিজে তো আর খাম খুলবে না। মাষ্টারদের হাতে দিয়ে দেবে। দু'চার খানা বেশী ছাপা কি আর থাকে না?" সেই প্রশ্ন নিয়ে অমর দুটো দিন, দুটো রাত প্রায় ঠায় বসে কাটিয়ে দিলো। ইংরেজী পরীক্ষার পর নাড়ু অমরকে জিজ্ঞেস করলে, "কেমন এক্‌জামিন্ দিলি রে?" একগাল হেসে অমর বললে, "দিয়েছি বেশ ভালো।"

এর দিন সাতেক পর একদিন সন্ধ্যাবেলা হেডমাষ্টার মশায়ের ভাইপোকে সঙ্গে করে অমর গুটি গুটি এসে হোষ্টেলে হাজির হল।

আমি আলো জ্বালিয়ে বাড়িতে একখানা চিঠি লিখছিলাম। নাড়ু খেলার মাঠ থেকে তখনো ফেরেনি। আমি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে অমর, আবার এই সন্ধ্যেবেলা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিস্ কেন? হেডমাষ্টার মশাই জানতে পারলে তোকে আর আস্ত রাখবেন না।"

অমর গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে, "যা ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে, তাতে মাথা আস্ত থাকা শক্ত হবে।"

"কেন রে, তোর মাথা ভাঙলো কে?" এই কথা বলতে বলতে নাড়ু এসে ঘরে ঢুকলো।

অমর যেন হাতে স্বর্গ খুঁজে পেল। বললে, "এই যে নাড়ু এসেছিস্। এদিকে আমার সমূহ বিপদ্।"

নাড়ু রসিকতা করে জবাব দিলে, "আরে ভাই জীবনটাইতো একটা obstacle race বিপদ কাটিয়ে কাটিয়ে এগুতে পারলে তবে শেষকালে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার মিলবে।"

অমর বললে, "না ভাই, ঠাট্টা নয়।"

নাড়ু গাল দুটো একবার ফুলিয়ে নিয়ে বললে, "আচ্ছা, না হয় গম্ভীর হয়েই তোর কথা শুনছি। এইবার ধাঁধার সুতো ছাড় দেখি।" হেডমাষ্টার মশায়ের ভাইপো এতক্ষণ খাটের এক পাশে চুপচাপ বসে ছিল। এইবার সে মাথা চুলকে বললে, "ভাই তোমার বুদ্ধিমত প্রশ্ন যোগাড় করে পরীক্ষা দিলাম। ভাবলাম, মোটা নম্বর পেয়ে সবাইকে হক্চকিয়ে দেবো। এখন যে হিতে বিপরীত হল।" নাড়ুর চোখ দুটো যেন আনন্দে জ্বলে উঠল। বললে, "আরে হিতেন নাকি? তুই এসেছিস ত' অন্ধকারের মধ্যে বসে আছিস কেন? ভালো পরীক্ষা দিয়েছিস্। আমার যে একটা ভালো খাওয়া পাওনা আছে!"

হতাশার সুরে হিতেন জবাব দিলে, "আর খাওয়া!" The cat is out of the bag.

নাড়ু চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, "ব্যাপার কি? তুই যে আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস।" হিতেন বললে, "অবশ্য বেড়াল এখনো থলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেনি। তবে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম করেছে। ঘটনাটা তোকে খুলেই বলি। কাল সকালবেলা ভাইদের সঙ্গে লুডো খেলছি.....এমন সময় কাকাবাবু— মানে তোদের হেডমাষ্টার মশাই ডেকে বললেন —হ্যাঁরে হিতেন, তুই পরীক্ষায় এত ভালো নম্বর পেলি কি করে? আমি ত' ভাই সে কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।"

তবু ভয়ে ভয়ে বলাম, "এ বছর পরীক্ষার পড়াটা খুব ভালো করে তৈরী করেছিলাম কিনা কাকাবাবু।"

কাকাবাবু গোঁফটা একবার পাকিয়ে নিয়ে বললেন, "দরকার হলে আবার পরীক্ষা দিতে পারবি ত'?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হুঁ।

বললাম বটে, কিন্তু তোকে কি বলবো। বুকটা টিপ টিপ করতে লাগলো।

আজ টিফিনের ঘন্টায় অমরকে সব কথা খুলে বলতে ও ত' আরও হক্‌চকিয়ে গেল। যদি ঘুণাক্ষরে কাকাবাবু টের পায় যে, কি ক্যারামতি করে আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, তবে বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে দেবেন। অমরই ত' বললে—তুই একটা ফন্দি-ফিকির বের করতে পারবি····· তাই আমরা দুজনে চলে এলাম সোজা এখানে। তোর মাথায় অনেক বুদ্ধি কিলখিল করে, আমায় তুই বাঁচা ভাই।

উর্দ্ধনেত্র হয়ে নাড়ু বললে, "ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কিছু খরচ-খরচা আছে।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা হিতেন, তুই ভূত বিশ্বাস কবিস?"

হিতেন অবাক্ হয়ে বললে, "ভূত?"

—"হ্যাঁরে হ্যাঁ ভূত।" বিজ্ঞের মতো নাড়ু জবাব দেয়। "অমাবস্যার রাত্রে সারা দিন উপোসী থেকে ভূত পূজো করতে হবে। তাতে যদি সিদ্ধকাম হতে পারিস, তবে তার কাছে প্রার্থনা জানাবি, যাতে আবার পরীক্ষা করবার কথা হেডমাষ্টার মন থেকে একেবারে মুছে যায়। যদি রাজি থাকিস্ ত' বল"।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে নাড়ুর কথা গিলছিলাম। এইবার একটু আপত্তি করে বললাম, "কি আবোল-তাবোল বক্‌ছিস? ভূত পুজো আবার কি কান্ড?

নাড়ু, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "ওই ত' তোদের দোষ। বিশ্বাস কবতে চাইবিনে।" তারপর হিতেনের দিকে তাকিয়ে বললে, "তাহলে আমার আব কোনো দায়িত্ব থাকল না।"

কিন্তু হিতেন তখন স্রোতেব মুখে ভেসে যাচ্ছে। বাঁচার জন্যে খড়কুটোও সে আঁকড়ে ধরতে বাজী। বললে, "ভূত সন্তুষ্ট হলে আমার কার্য সিদ্ধি হবে ত'?"

নাড়ু জবাব দিলে, "নিশ্চয়। পূজোয় সন্তুষ্ট হলে ভূত তোব দেয়া ভোগ নিজে হাতে গ্রহণ করবে। বুঝবি তখন যে, সিদ্ধকাম হতে আর বেশী দেরি নেই। কামাখ্যার এক সাধুব কাছে আমি ভূতসিদ্ধির এই পূজোটা শিখেছিলাম। যদি অবিশ্বাস থাকে, তা হলে কিন্তু এব মধ্যে আসিস্‌নে হিতেন,—সে আগে-আগে থেকে বলে রাখছি।"

প্রাণের দায় বড় দায়।

হিতেন ততক্ষণে ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে। তবু ভয়ে ভয়ে শুধোলে, "আচ্ছা ভাই নাড়ু, এই ভূতসিদ্ধির ব্যাপারে কত টাকা খরচ হবে?" নির্বিকার ভাবে নাড়ু জবাব দিলে, "লাগে ত' অনেক কিছু। আচ্ছা, তুই কুড়িটা টাকা নিয়ে আসিস।"

হিতেন বললে, "তা আনতে পারবো। আমার নিজের কাছেই জমানো আছে।"

পাঁজি দেখে নাড়ু বললে, "আসছে শনিবারই অমাবস্যা, সেইদিনই ভূতসিদ্ধির পূজা সাঙ্গ করতে হবে।"

হিতেন সে রাত্রে খুশী হয়ে চলে গেল। আমি নাড়ুকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ সব আবার কি হাঙ্গামা বাধালি বল ত'?"

নাড়ু সবগুলো দাঁত একসঙ্গে বের করে বললে, "ওদের অনেক টাকা। কিছু মিষ্টি খাওয়া যাবে'খন। জানিস ত' বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্'।"

আজ এতদিন বাদে গোপন কথাটা ফাঁস করে দিই। সেই শনিবারের রাত্রে একটা কালো পর্দার আড়ালে আমিই ভূত সেজে দাঁড়িয়েছিলাম এবং মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলোতে হাত বের করে ভোগ গ্রহণ করেছিলাম।

হিতেন 'সিদ্ধকাম' হয়ে বাসায় ফিরে যেতে আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা যে বিশেষ উপাদেয় হয়েছিল, সেটা পরিষ্কার করে না বললেও কারো বোঝবার অসুবিধে হবে না।

হিতেন যে ভূতপূজোর ব্যাপারে সিদ্ধ কাম হয়েছিল, সে বিষয়ে অন্ততঃ তার মনে কোনো সংশয় ছিল না; কেননা, হেডমাষ্টার মশাই আর তাকে পরীক্ষা দেবার আহ্বান করেন নি।

এর দিনকয়েক পর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনলাম কোত্থেকে খুব নাম করা এক যাত্রার দল এসেছে। ফি বছরই এই সময়টায় স্থানীয় বাজারে খুব ধুমধাম করে কালীপূজো হয়, আর সেই সঙ্গে নানা রকম আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকে। গত বছর এই উপলক্ষে খুব বড় একদল সার্কাস এসে নানারকম খেলা দেখিয়ে গেছে। ছেলের দল আজও সেই কথায় লাফিয়ে ওঠে। এ বছরও পর পর তিনদিন যাত্রা হবে শুনে ছেলের দল খুব মেতে উঠল। হোষ্টেলের ছেলেদের উৎসাহই সব চাইতে বেশী। কারণ বাড়ি থেকে যারা পড়াশুনা করে সব দিন দেখবার অনুমতি তারা পায় না। কিন্তু হোষ্টেলের ছেলেরা পালিয়ে গিয়ে সে অনুমতির হাত থেকে রেহাই পায়।

ফি বছরের মতো হোষ্টেলের ছেলেদেরও নেমতন্ন ছিল যাত্রা শোনবার।

প্রথম দিন আমরা সব পালিয়ে গেলুম। যাত্রা যে খুব খারাপ লাগছিল তা বলতে পারিনে। কিন্তু মাঝখানে ঐ যে মোক্তারের পোশাক পরে জুরির দল গালে হাত দিয়ে মরা কান্না শুরু করে দিলে—সে শুনে একেবারে কান ঝালাপালা। এখনকার মতো তখনো থিয়েটারী ঢং—এ যাত্রা শুরু হয়নি। জুরির দল আবার নাছোড়বান্দা। শুধু একবার গেয়েই ওদের মনের আশা মেটে না। —প্রত্যেকে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গাইবে— তবে নিস্তার। এ যেন কে কতটা হাঁ করতে পারে, তার একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা।

নাড়ু বললে, "না, এ' মোক্তারের দল তো বড় জ্বালাতন করলে।" পাশে আর একটি ছেলে বললে, "এরা আমাদের না তাড়িয়ে ছাড়বে না দেখছি।"

নাড়ু বললে, "আমাদের তাড়াবে? রোসো মজা দেখাচ্ছি।"

পাশেই ছিল একটা গ্যাসলাইট, তাতে নানা রকম পোকা এসে উড়ে পড়ছিল। নাড়ু করলে কি, সেই থেকে নানা পোকা ধরে তাল পাকিয়ে জুরিদের মুখের মধ্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল। বেচারী হয়তো মনের আবেগে চোখ বুজে কানে হাত দিয়ে, মস্ত বড় এক হাঁ করে সবে গান শুরু করেছে, হঠাৎ নাড়ুর অব্যর্থ গুলি গিয়ে পড়ল তার মুখের মধ্যে—পোকাগুলো ততক্ষণে গলার মধ্যে ঢুকে গেছে। বেচারী তখন গান থামিয়ে সাজঘরের দিকে দে ছুট।

এই রকম খানিকক্ষণ করতে দেখি, সত্যি সত্যি মোক্তারেরা সব ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। তারপর বেশ আরামে গান শোনা গেল। শেষরাত্রে গান শেষ হতেই সব হোস্টেলে ফিরে এসে লম্বা ঘুম।—এক ঘুমে বিকেল।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে শুনি, আজকের পালা নাকি আরো ভালো। সকলেরই মন উড়ু উড়ু করতে লাগলো। কিন্তু হেডমাষ্টারের কড়া হুকুম—হোস্টেলের ছেলেরা একদিনের বেশী রাত জাগতে পারবে না।

নাড়ু বললে, "রেখে দে তোর হেডমাষ্টারের হুকুম। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ পালিয়ে যাওয়া যাবে'খন।"

সত্য বললে, "ভালো। শুনছি আজকে নাকি পালাটা একটু দেরীতে শুরু হবে।" রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে বসে গল্প করছি, সত্য এসে খবর দিলে সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন।

জামা গায়ে দিয়ে আমরা গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লুম।

সেখানে গিয়ে পৌঁছতে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। পালাটা বোধহয় ছিল মহিষাসুর বধ। খুব মজা করে যুদ্ধ দেখছি — হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে পেছন ফিরে দেখি, আমাদের হোস্টেলেরই একটি ছেলের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বচসা হচ্ছে।

নাড়ু বললে, "চল্ দেখি, কি হচ্ছে ওখানে?" মহিষাসুরের যুদ্ধ দেখতে তখন এত ব্যস্ত যে, ওঠবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। বললুম, "কি আবার হবে, গোলমাল-টোলমাল হয়েছে বোধ হয়—এক্ষুণি মিটে যাবে'খন।"

আমার হাত ধরে টেনে তুলে নাড়ু বললে, "না—না চল্"—

নিতান্ত অনিচ্ছায় সেখানে পৌঁছে দেখি শ্রাদ্ধ অনেক দুর গড়িয়েছে।

ব্যাপার এই—বাজারের কর্তার জনকয়েক কর্মচারী এসেছেন যাত্রা শুনতে—তাই আমাদের উঠে নাকি তাদের জন্য জায়গা করে দিতে হবে।

ছেলেটা নানারকমে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, তাদের এইখানেই বসতে দেওয়া হয়েছে, কর্মচারীদের অন্য কোথাও জায়গা করে দেয়া ভালো।

কিন্তু যে ভদ্রলোক জায়গা করতে এসেছিলেন, তিনি সে কথাটা যে কিছু বুঝেছেন, এরকম কোনই ভাব দেখা গেল না। বরং হঠাৎ যেন পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপে উঠে ছেলেটার হাত ধরে টান দিয়ে বললেন, "না, তোমরা এখানে বসতে পারবো না।"

আর যাবে কোথা—নাড়ু ছিল আমার পাশে দাঁড়িয়ে—সে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের ঠিক নাকের ডগার ওপর এক ঘুষি মেরে বললে, "মশাই, নেমন্তন করে এনেছেন—সেটা খেয়াল আছে?"

আচমকা এই রকম একটা ঘটনায় আসরে ভীষণ হৈ-চৈ চীৎকার উঠল। কর্মচারীদের দল এসে নাড়ুর ওপর রুখে দাঁড়ালো—হোস্টেলের ছেলের দলও নেহাত কম নয়। আসরের চারদিকে যে সব বাঁশ পোঁতা ছিল, তাই তুলে নিয়ে তারাও নূতন করে মহিষাসুরের পালা শুরু করে দিল।

সত্য আমার কানে ফিসফিস করে বললে, "শিগ্‌গীর ছুটে গিয়ে হোস্টেলের ছেলেদের খবর দে।"

ততক্ষণে চারদিকে মার মার রব উঠে গেছে।

পাঁচিল টপকে গিয়ে হোস্টেলে খবর দিতেই—টেনিস্ র‍্যাকেট, হকি ষ্টিক, লাঠি, মুগুর যে যা পেলে, নিয়ে ছুট্ ছুট্।

প্রথমে আমাদের দলটা ছিল নেহাতই কম, এইবার নতুন দল আসছে দেখে তারা যেন দ্বিগুণ বল পেল। তার ওপর নাড়ু আর সত্যের জিমনাষ্টিক করা শরীর —ওরা প্রায় একশো। শুধু মার মার চীৎকার। খানিক পরে বাজারের লোক যে কে কোথা দিকে সট্‌কে পড়লো, তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে বড় বড় সব ঝাড়-লণ্ঠন গুঁড়িয়ে একসা হয়ে গেল। শেষটায় দেখা গেল, মারামারির ফলে আমাদের দলের একটি ছেলের পা ভেঙে গেছে। তাকে কাঁধে তুলে আমরা তক্ষুণি হোস্টেলে ফিরে এলুম।

পরদিন সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের হুমকিতে মারামারির সব খবর বেরিয়ে পড়ল এবং এও জানতে বাকি রইল না যে, এ মারামারির নেতা আমাদেরই নাড়ু!

পরদিন ক্লাসে যেতে হেডমাষ্টার মশাই ইস্কুল ছুটি দিয়ে আমাদের মতো সব দাগী আসামীদের ডেকে পাঠালেন।

কড়া বিচারে সক্কলকার পাঁচ টাকা করে জরিমানা হল। সব শেষে তিনি নাড়ুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "আমি জানি তুমিই এ দুষ্কর্মের নেতা। একমাস তুমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না—আর সক্কলকার সামনে নাকে খৎ দিতে হবে—যাতে আর এমনটি না হয়।"

নাড়ু মাথা উঁচু করে বললে, "তা আমি পারবো না স্যার।" হেডমাষ্টার ফোঁস্ করে উঠে জবাব দিলেন, "সাত দিন তোমায় সময় দিলুম—এর মধ্যে

ভেবে ঠিক কর। হয় আমার কথামত কাজ করতে হবে—নইলে ডিরেক্টর আপিসে জানিয়ে তোমায় আমি রাষ্টিকেট্ করবো।"

নাড়ুকে নিয়ে আমরা সবাই চলে এলুম। সকলকার মনেই যেন কি অনিশ্চিত আশঙ্কা কাঁটার মতো খচ্-খচ্ করে বিঁধতে লাগলো। এই সাতটা দিন নাড়ুর সঙ্গে যেন আমার দেখাই হচ্ছে না। সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যে ও যে কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, কিছুই কেউ টের পাইনে। এক এক দিন অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখি, নাড়ু আলো জ্বালিয়ে কি সব লিখছে। বুক ঠেলে অনেক কথা এক সঙ্গে বেরুতে চায়···· কিন্তু পাছে ও লজ্জা পায়, সে জন্য আমি জেগেছি, সে কথা ওকে জানতে দিই নে। এইভাবে সাতটা দিন কেটে গেল। সে দিন অতি সকালে ঘুম ভেঙে গেল, হঠাৎ নাড়ুর বিছানার দিকে তাকাতেই প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, একি, খাট খালি যে! দু'পা এগোতেই বিছানায় একটা চিঠির ওপর নজর পড়ল। চিঠিটা এই —

ভাই নিলু,

এতদিনের মেলামেশার ফলে যদি আমায় চিনে থাকিস্ ত' এটা হয়তো বেশ ভালো করেই বুঝেছিস যে, আমার এই বেপরোয়া জীবনে কারো কাছে মাথা নীচু আমি করিনি — করবো না', আমি এদেশ ছেড়ে চললুম। আব্দুলের কথা বোধ হয় মনে আছে। যার সাহায্যে আমরা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলাম। হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা।

তার কাকা জাহাজে কাজ করেন। তারই আন্তরিক চেষ্টায় আমি একটা জাহাজে খালাসীর কাজ যোগাড় করেছি। এরপর পথ যে পরিষ্কার হয়ে গেছে আশা করি তা বুঝতে পারছিস্। অকূলে ভেলা ভাসিয়ে দিচ্ছি, দেখি কোথায় গিয়ে কূল পাই।

আমেরিকা যাওয়ার একটা হঠাৎ পাওয়া সুযোগ আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। কেন যাচ্ছি, তা তোর সঙ্গে দেখা করে বললুম না — কারণ জানি, তা হ'লে তুই আমার যাওয়ার পথে বাধা হবি। যদি কখনো মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই তোদের সঙ্গে জীবনে আবার সাক্ষাৎ হ'বে নইলে এই শেষ।

তোদের নাড়ু

ঝুপ করে বিছানার ওপর বসে পড়লুম। নাড়ুর বালিশটা সরাতেই আর একখানা চিঠি বেরিয়ে এলো।

খামের চিঠি খুলে দেখি মাসিমার হাতের রেখা।

একটা জায়গায় চোখ পড়তে দেখি, লেখা রয়েছে—"তুমি এমন করে যে আমাদের মাথা হেঁট করবে তা কোনো দিনের তরেই বুঝতে পারিনি। হেডমাষ্টার মশাই চিঠি লিখেছেন, তুমি সমস্ত হোষ্টেলের ছেলেদের নষ্ট করছ—লেখাপড়া ছেড়ে সবাই দল বেঁধে তোমার কথায় মারামারি করে বেড়াচ্ছে। তুমি একা নষ্ট হয়ে যাও সেইটেই আমি সইতে পারছিনে—তার ওপর এতগুলি ছেলে যদি তোমার কথায় অধঃপাতের পথে চলে যায় ত' তাদের বাপ-মায়ের দেয়া অভিশাপে আমার চোখের জল আর সারা জীবনে শুকুবে না।

হেডমাষ্টার মশাই আরো জানিয়েছেন—"তোমার কথা শুনে ছেলেরা কেউ আর তাঁর কথা শুনছে না"—এত বড় একটা দুষ্কৃতির জন্যেই কি আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় মানুষ করেছিলাম?

পড়াশুনোয় যদি তোমার আর মতি না থাকে—পত্রপাঠ বাড়ি চলে এসো—এমন করে দশের সর্বনাশ আমি তোমায় কিছুতেই করতে দিতে পারবো না।..."

চিঠি দু'খানা পড়ে নির্বাক হয়ে বসে রইলুম। নাড়ুর দেশত্যাগের কারণ আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘুরে ফিরে শুধু এই কথাটাই মনে হতে লাগলো, হেডমাষ্টার এত বড় একটা মহৎ প্রাণের মূল্য যাচাই করতে পারলেন না, তাই না তার ওপর এতটা অবিচার করে বসলেন। শুধু বাইরেট দিয়েই ত মানুষ চেনা যায় না।

আজ শুধু ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে এই কথাটাই বলতে লাগলুম, —জগদীশ, যারা ওকে দেশছাড়া করল—ওকে চিনতে না পেরে—ওর ওপর অবিচার করে নিজের পাপের বোঝা ভারী করে তুললে, তাদের একদিন তুমি জানিয়ে দিও যে, মানুষ হিসেবে সে কারো থেকে ছোট নয়।

চোখের জলে চিঠির কাগজের লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে এলো।

আজ জীবনের চলার পথে অনেক দূর এসে পড়েছি। বছর দুই আগে এক আমেরিকা-ফেরত ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, নাড়ু এখন সেখানকার রামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক। তার বেপরোয়া জীবনে সে পরশমণির সন্ধান পেয়েছে।

শশী-শ্যামলের সাঁকো

(কিশোর উপন্যাস)

।। এক ।।
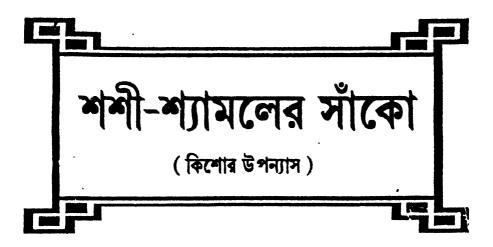
পাড়াগাঁয়ের হাটে-বাজারে হঠাৎ একটা গোলমাল সুরু হলে সচরাচর যা ঘটে থাকে !

জলবিছুটি গাঁয়ের বাজারে সেদিন সকালের দিকে একটা কোলাহল আর চিৎকার সুরু হতে সবাই তৎপর হয়ে ওঠে, কেউ কোমরে কাপড় জড়ায়, কেউ বা কাঁধের গামছা মাথায় ভালো করে বেঁধে নেয়।

—খুড়ো, আমার ঝাঁকাটা ধরো ত' একটু, এগিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি!

—ও করিম চাচা, আমার দুধের হাঁড়িটা রইল তোমার কদুর ঝাঁকার পাশে, একটা হাটুরে-কিল দিয়ে হাতের সুখটা করে আসি —

নফর কুণ্ডু গরম জিলিপি কিনে খাচ্ছিল। এদিকে তপ্ত জিলিপি জিব পুড়িয়ে দিচ্ছে.— ওদিকে ভিড়ের ভিতর ঢুকে কিল ঘুঁষি চালানোর আকর্ষণও বড় কম নয়। হঠাৎ বলে বসল, রইল তোমার জিলিপির ঠোঙা....ঝগড়া বিবাদ ত' বেশীক্ষণ থাকবে না....বিশেষ করে হাটে-বাজারে। আগে ডান হাতের সুখটা করে আসি তারপর তোমার দাওয়ায় বসে আমেজ করে জিলিপি চিবুনো যাবে।

দোকানি চিৎকার করে ওঠে, ও কুণ্ডুমশাই আগে দাম দিয়ে যান—

কার কথা কে শোনে!

কুণ্ডুমশাই তখন মালকোঁচা আঁটতে আঁটতে ভীড়ের মধ্যে একেবারে মিশে গিয়েছেন!

দোকানি খানিকক্ষণ জিলিপির ঠোঙার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে রইল, তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে হুঁ। জলবিছুটি গাঁয়ের লোক কিনা। কিল-ঘুঁষি পেলে আর কিছু চায়না। আমার এমন গরম জিলিপি। তাই ফেলে কিনা কিলোকিলি। আসবে ফিরে নাক ভেঙে আর কপাল ফাটিয়ে! বদ্-রসিক লোক আর কাকে বলে!

দোকানি আপন মনে খুন্তি নাড়তে থাকে।

পল্লী অঞ্চলে সামিয়ানার বহর দেখে যেমন লোকে নেমন্তন্নের ওজন মাপ করতে বসে তেমনি কোলাহল আর চীৎকারের নমুনা দেখে অনুমান করে কিভাবে কিল-ঘুঁষিটা জমে উঠবে!

ঠিক এইভাবেই গোলমাল শুনে ছুটে এলো হরিদাস মাঝি, গোবিন্দ হালুইকর, [illegible] নাপিত, কদম কলু, ত্রৈলোক্য তিলি, বিষ্টু গোয়ালা এমনি আরো অনেক।

কিন্তু ভীড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে তারা যা দেখতে পেলো তাতে সবাইকার উৎসাহ

হাটুরে-কীল চালাবার ব্যাপার মোটেই নয়। যতই কোমরে কাপড় জড়াও, কাঁধ থেকে গামছা নিয়ে মাথায় বাঁধো আর ঝাঁকা রেখে তৈরী হয়ে এসো.....ওখানে কারো ট্যা-ফোঁ চল্‌বে না।

নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!

আসলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে— পূবপাড়ার চৌধুরীদের ছেলে চন্দনের সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের।

দুটি পাড়া নিয়ে এই জলবিছুটি গাঁ!

পুবপাড়া আর পশ্চিমপাড়া।

মাঝখান দিয়ে একটি খাল বরাবর চিরে দিয়েছে গ্রামটিকে। তারপর আরো খানিকদূর গিয়ে উত্তর অঞ্চলে খালটি দেখতে ইংরাজী অক্ষর Y-এর মতো।

পুবপাড়ার সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার জমি কোথাও মিশ খায়নি। মাঝখানের খাল সবসময় ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই পুবপাড়ার লোক যদি পশ্চিমপাড়ায় আসতে চায় তো নৌকা ছাড়া কোনো গতিই নেই। আবার পশ্চিমপাড়ার ছেলেরা পুবপাড়ায় যদি খেল্‌তে আসে তবে ওই খেয়ারই শরণ নিতে হবে। ওপর দিকে খালটি যেখানে Y-এর মাথার মতো ত্রিভুজ আকার ধরেছে সেইখানে বসে রোজকার হাটবাজার। কাজেই পুবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ায় সবাইকেই ঘাটের নৌকা নিয়ে এসে সওদা করে যেতে হয়। দুটি পাড়ার লোক ছোঁয়াছুঁয়ি সত্যি সইতে পারে না। কাজেই এ-পাড়াব লোকেব সঙ্গে ও-পাড়াব মানুষের খট্টাখটি প্রায়ই লেগে থাকে।

জলবিছুটি নাম সেই থেকেই হয়েছে কিনা কে জানে! যে গোলমালটা শুরু হয় ছেলেদের ভেতর দিযে. সেটা আস্তে আস্তে সংক্রামিত হয় বড়দের মধ্যে, এইভাবে দুটি পাড়ার বুড়োরাও হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে আড়ালে আব্‌ডালে দুই দলকে পরামর্শ জোগাতে থাকে। ফলে ঝগড়াটাও জমে ভালো,—জলবিছুটির চুল্‌কুনি সারা গাঁয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু আজকের ঝগডাটা এমন নয় যে, হাটুরে লোকেবা চট্ কবে কিলো-কিলি সুরু করতে পাবে।

পুবপাডার জমিদাব হচ্ছেন—চৌধুরীবা। আর পশ্চিমপাড়ার জমিদার বংশ গাঙ্গুলীরা। সামনা-সামনি এঁদেব মধ্যে বেশ ভাব আছে। একবাড়ি থেকে নেমন্তন্ন হলে অন্য বাড়ির লোকেরা গিয়ে মহানন্দে পাতা পেতে খেয়ে আসে। কিন্তু ভেতরকার কথা হচ্ছে কেউ কারো নাম সইতে পারে না!

পারবেই যদি তবে জল-বিছুটি নামের সার্থকতা কোথায়?

সাম্‌না-সাম্‌নি এই দুই পরিবারের মধ্যে কখনো ঝগড়া-বিবাদ কিম্বা কথা কাটা-কাটি হয়নি।

আজ সকাল বেলা এই গ্রামটির ওপর কোন্ গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি পড়েছিল তা' গ্রহচার্য্যরা ঠিকুজী-কুষ্ঠি মিলিয়ে তার যথার্থ ফলাফল ঘোষণা করতে পারবেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যা' ঘটেছিল—তা সংক্ষেপে হচ্ছে এই ঃ

পূবপাড়ার চৌধুরী বংশের ছেলে চন্দন গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এবার শহর থেকে গ্রামে বেড়াতে এসেছে। শহরের ছেলেদের কাছে নিজের জমিদারী আর ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি গোপন বাসনা যে তার মধ্যে লুকিয়ে নেই কে হল্‌ফ করে বল্‌তে পারে? তাই আজ সকাল বেলা বন্ধুদের নিয়ে দলবেঁধে ঘাটের পান্‌সী নৌকায় চেপে এসেছে বাজারে। উদ্দেশ্য প্রকাণ্ড মাছ কিনে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। কলকাতার ছেলে ত'! কত বড় মাছই এরা দেখেছে? যা-ও বা দেখেছে অধিকাংশ বরফ দেওয়া শক্ত মাছ। আর জলবিছুটি গাঁ হচ্ছে খালবিলের দেশের মাঝখানে। যত খুশী মাছ খাও—মাছ মারো আর বিলোও। লোকে বলে, অরুচি হয়ে যায় মাছে। তাই মাঝে মাঝে নিম-বেগুন খেয়ে মুখের স্বাদ বদলে নিতে হয়।

বাজারে আজ প্রকাণ্ড একটি চিতোল মাছ উঠেছে—তাকিয়ে দেখবার মতো। মাঝিরা বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে মাছটিকে।

ওদিকে পশ্চিমপাড়ার জমিদার গাঙ্গুলীবাড়ির ছেলে ফাল্গুন তার জামাইবাবুকে নিয়ে গাঁয়ের বাজার দেখ্‌তে এসেছে। চিতোল মাছটি দেখে তার ভারী পছন্দ হয়েছে। জামাইবাবুকে যদি এতবড় চিতোল মাছের পেটি না খাওয়াতে পারলে তবে গাঙ্গুলীবাড়ির মান থাকে কি করে?

ফাল্গুন বললে, মাছটা আমার নৌকায় তুলে দাও মাঝির পো, দর যা' হয় গাঙ্গুলীবাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসো—

চন্দন বললে, এটা কেমন কথা? আমার বন্ধুরা পছন্দ করেছে চিতোল মাছটিকে। কাজেই আমাদের কেনা হয়ে গেছে। ও চিতোল মাছ উঠ্‌বে আমাদের পান্‌সীতে—

এখন সমূহ বিপদে পড়ল গোবর্দ্ধন মাঝি! সে দুই জমিদারেরই প্রজা। তার ভিটেবাড়ি পড়েছে পূবপাড়ার চৌধুরীদের জমিতে, আর ধানী-জমি রয়েছে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীদের আওতায়। কাজেই সে চৌধুরীবাড়ির চন্দনকেও চটাতে পারে না, আবার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনকেও ফিরিয়ে দিতে পারে না।

তার অবস্থা হল অনেকটা জলে-কুমীর আর ডাঙ্গায়-বাঘের মতো।

কি করবে সে?

রামে মারলেও মারবে— রাবণে মারলেও মারবে। কাজেই বোবার শত্রু নেই এই সোজা কথা স্মরণ করে সে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। শুধু বোকার মতো একবার চন্দনের দিকে আর একবার ফাল্গুনের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগ্‌লো। যারা কোলাহল শুনে হাটুরে কিল দিয়ে হাতের সুখ করতে ছুটে এসেছিল তাদের মুখেও কে যেন বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল।

একদিকে চৌধুরীবাড়ি....

আর একদিকে গাঙ্গুলীবাড়ি।

এদের চটানোতে বিপদ আছে।

লোকে কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! কাজেই অতি উৎসাহে কোমর বেঁধে এসে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা আর এক পা-ও এগুতে সাহস পেলোনা, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়ির ছেলেদের রকম-সকম দেখতে লাগ্‌লো।

ওরা একে জমিদার তায় আবার লেখাপড়া জানে। কাজেই হাটুরে লোকের মতো ত' চট্ করে মারামারি সুরু করতে পারে না.... কিছুটা কথা কাটাকাটি চল্‌তে পারে বরং।

কথাও বলে ওরা ওজন করে।

কি যে বলে তা-ও ভালো করে বোঝা যায় না।

হাটে-বাজারে কি কথার দাম আছে?

কিল-চড়টা পড়লে বোঝা যায় যে, হ্যাঁ একটা কিছু হল।

কিন্তু চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়ির বচসাতে তার কিছুই ঘটল না।

চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা দলে ভারী আর তাদের সঙ্গে রয়েছে বরকন্দাজ। শেষ পর্যন্ত ওরাই উৎসাহের আতিশয্যে চিতোল মাছটিকে পান্‌সীতে নিয়ে চাপালো।

গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের যেন তার জামাইবাবুর সাম্‌নে একেবারে মাথা কাটা গেল। কিন্তু কি করতে পারে সে?

ওর জামাইবাবুই এই অপমানের হাত থেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে দিলে। বললে চলো, চলো, আর চিতোল মাছের পেটি খেতে হবে না, তোমার দিদির ট্রাঙ্কে চমৎকার 'জেলি' আছে—টক্-টক্-মিষ্টি-মিষ্টি, তাই চাখ্‌বে চলো—

জামাইবাবুই ওকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চললো ঘাটের নৌকোর দিকে।

কিন্তু গোবর্দ্ধন মাঝি একবার আড়চোখে তাকাতেই বুঝ্‌তে পারলে, ফাল্গুনের মুখ লজ্জায় আর অপমানে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। বাজারের আম-কাঁঠাল পাকা গরম আর চড়া রদ্দুর সেই লালমুখে যেন সহসা জলবিছুটি লাগিয়ে দিলে।

এ গাঁয়ের নাম 'জল-বিছুটি' কে দিয়েছিল কে জানে। কিন্তু যেই দিক—ভবিষ্যৎটা সে দর্পণের মতোই দেখ্‌তে পেয়েছিল নিশ্চয়ই।

ফাল্গুন গাঙ্গুলীবাড়ি ফিরে আস্‌তে তার মুখের সব কথা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সদর থেকে অন্দরে, অন্দর থেকে দাসদাসী, আমলা-কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

এ অপমান যেন শুধু গাঙ্গুলীবাড়ির নয়। নায়েব-গোমস্তা থেকে সবাইকার।

নায়েব এসে কর্তার কাছে জান্‌তে চাইলে, পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে খাল থেকে মাছ ছিনিয়ে আনবে কিনা! এখনও হয়ত চৌধুরীদের পান্‌সী ঘাটে গিয়ে পৌছতে পারেনি!

গাঙ্গুলীবাড়ির কর্তা কাছারীতে বসে গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টান্‌ছিলেন। গাঙ্গুলীমশাই পাকা বিষয়ী লোক। মৃদু হেসে বললেন, পাগল হয়েছ নায়েব। ইস্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-ছোক্‌রাদের মতো কি আমি বিবাদ করতে যাবো? তাহলে গাঙ্গুলীবাড়ির মান-মর্য্যাদা থাকে কি করে?

নায়েব একবার হাতটা কচ্‌লে নিয়ে উত্তর দিলে, কিন্তু জামাইবাবুর সামনে আমাদের এই অপমানটা? এটা কি আমরা একেবারে হজম করে যাবো? টুঁ শব্দটি করবো না? চৌধুরীবাড়ির সবাই যে তাতে হাসাহাসি করবে কর্তা?

নায়েব সত্যি তখন রাগে কাঁপছিল।

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, আরে, তুমি যে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়লে নায়েব। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে হলে আগে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ্‌তে হয়। বোসো-বোসো—। অত রাগ্‌লে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় না? আমি তোমায় পন্থা বাত্‌লে দিচ্ছি।

একটা মোড়া টেনে নায়েব বস্‌লে। কিন্তু উত্তেজনায় চোখের চশমা কপালে তুলে ফেলল।

গাঙ্গুলীমশাই এমন নিশ্চিন্ত মনে তামাক টান্‌তে লাগলেন যেন কিছুই ঘটেনি।

নায়েবের কাঁচা-পাকা গোঁফ উত্তেজনায় তখনো কাঁপছে। তবু প্রভুভক্ত কর্মচারীর মতো কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গাঙ্গুলীমশাই আরো খানিকটা ধোঁয়া উর্দ্ধ দিকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, শোন নায়েব, চৌধুরীবাড়ির একটা অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান আছে না? দিন সাতেক পর?

মুখখানা কাচুমাচু করে নায়েব জবাব দিলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু বুঝতে পারলে না যে, আজকের এই মাছের হার-জিতের সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাশনের কি সম্পর্ক থাকৃতে পারে।

গাঙ্গুলীমশাই শুধোলেন, আমরাও ত' নেমন্তন্ন পেয়েছি এই অনুষ্ঠানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ জবাব আসে নায়েবের পক্ষ থেকে। গাঙ্গুলীমশাই নায়েবের দিকে আড়চোখ তাকিয়ে বলেন, এই নিমন্ত্রণ আমরা রক্ষা করবো।

নায়েব যেন হক্‌চকিয়ে যায়।

গাঙ্গুলীমশায়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এতবড় একটা অপমানের পর উনি যাবেন চৌধুরীবাড়ি—নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

কিন্তু পাকা জমিদারী চাল অনেক সময় নায়েবেরাও ঠিক মতো বুঝতে পারে না।

তাই অবাক হয়ে কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকে হতবুদ্ধি নায়েব।

তামাক টান্‌তে টান্‌তে গাঙ্গুলীমশাই শুধোন, আরে ওই যে বিষ্টু গোয়ালা। যে খাসা দৈ তৈরী করতে ওস্তাদ — সে ব্যাটা আমাদের প্রজা না?

নায়েব উত্তর করে, আজ্ঞে, আমাদেরই প্রজা ত। কিন্তু অগাধ জলে পড়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে।

চিতোল মাছ থেকে একেবারে খাসা দৈ?

কর্তা কোন নদীতে বুদ্ধির-নৌকো টেনে নিয়ে যাচ্ছেন?

কর্তা কিন্তু নির্ব্বিকার। বললেন, আজ সন্ধ্যের পর নিরিবিলি বিষ্টু গোয়ালাকে ডেকে পাঠাও—

নায়েব জবাব দেয়, যে আজ্ঞে।

জমিদার বাড়ি থেকে খবর যাওয়া মানে — গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা! সন্ধ্যের পর গাঙ্গুলীমশাই দাবা খেলতে যাবেন — এমন সময় বিষ্টু গোয়ালা জোড়হাতে এসে হাজির হল।

কর্তা শুধোলেন, কি ঘোষের পো, চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাশনে খাসা দৈয়ের বায়না পেয়েছ ত'?

বিষ্টু গোয়ালা ঘাড় কাত করে জবাব দেয়, তা হুজুর পেয়েছি।

কর্তা বললেন দেখ, দুটি দৈয়ের ভাঁড়ের ওপর দিকে থাকবে— ভালো খাসা দৈ, আর নীচে থাক্‌বে কাদা গোলা —বিষ্টু গোয়ালা আঁৎকে উঠে বলল, আজ্ঞে কর্তা— ?

গাঙ্গুলীমশাই চোখ পাকিয়ে জবাব দেন, হ্যাঁ, আমার হুকুম। আর শোনো, এই ভাঁড়দুটিতে খড়ির দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা থাক্‌বে। আচ্ছা বেশী কথা আমি পছন্দ করিনে। এখন এসো —

বিষ্টু গোয়ালা প্রণাম করে পালিয়ে বাঁচে।

কর্তা তখন নায়েবকে কাছে ডেকে বললেন, তোমরা বল্‌ছ গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনকে ওরা অপমান করেছে। এই তো' কথা? চৌধুরীবাড়ির সামাজিক নেমন্তন্নে যখন গাঁয়ের মোড়লরা খেতে বস্‌বেন তখন ওই চিহ্নিত হাঁড়ি থেকে ফাল্গুন পরিবেশন করবে খাসা দৈ গ্রামস্থ মাতব্বরদের —ওই কাদা গোলা দৈ···বুঝ্‌লে?

নায়েব উচ্ছ্বসিত হয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে এইবার বুঝতে পেরেছি। গ্রামস্থ গণ্যমাণ্য মোড়লদের কাছে চৌধুরীবাড়ির মান একেবারে ধুলোয় মিশে যাবে! আপনার হুকুম মাথা পেতে নিলাম। চিহ্নিত হাঁড়ির দিকে চোখ থাকবে আমার।

গাঙ্গুলীমশাই আবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ এ-বাড়ীর ছেলে ও-বাড়ির

ব্যাপারে আগ্ বাড়িয়ে পরিবেশন করবে এত গাঁয়ের চিরকালের প্রথা। কেউ সন্দেহ্ করবে না।

গাঙ্গুলীমশায়ের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ....

নায়েব এগিয়ে এসে কর্তার পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে আর মাথায় স্পর্শ করে।

দুটি পাড়ার মাঝখানের খাল আরো যেন চওড়া হল নায়েবের চোখে।

।। দুই ।।

পুব্পাড়ার চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাশন উৎসবে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির নায়েব মশাই যে কৌশলের-জাল পেতেছিলেন, তাকে খুব বড়ো রকম একটা যুদ্ধ জয়ের পরিকল্পনা বলা চলে।

গ্রামের ইতর-ভদ্র সেই উৎসবে পাত্ পেতেছে। সেখানে চৌধুরীবাড়ির সম্মান এতটুকু ক্ষুণ্ণ হলে বাড়ির কর্তার একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে।

এ গ্রামের চিরকালের প্রথা যে, এক বাড়িতে বিয়ে' শ্রাদ্ধ কিম্বা কোনো যজ্ঞি ব্যাপার হলে অন্য বাড়ীর ছেলেরা এগিয়ে এসে কোমরে গামছা পরিবেশনের কাজে লেগে যায়। সেই হিসেবে পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা পশ্চিম-পাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির উৎসব-অনুষ্ঠানে এগিয়ে আসে; আবার গাঙ্গুলীবাড়ির ক্রিয়া-কাণ্ডে চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা নিজের কাঁধে দায়িত্বের বোঝা তুলে নেয়।

এবার চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাশনে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। গাঁয়ের অন্যান্য বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনও এগিয়ে এলো। এ ব্যাপারে চৌধুরীবাড়ির সবাই খুশীই হল। সন্দেহ্ করবার কি ই বা এতে থাকতে পারে?

কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ির নায়েবের কৌশল-জাল ছিল একেবারে নিখুঁত।

গ্রামস্থ মাতব্বরদের পাতে যখন চৌধুরীবাড়ির দৈয়ের ভাঁড় থেকে কাদাগোলা পরিবেশিত হল, তখন একদল লোক একেবারে ছি-ছি করে উঠলেন।

চৌধুরীবাড়ির দাম্ভিকতা গাঁয়ের লোকের অজানা নয়। সেইজন্যে একদল লোক সব সময় ওৎ পেতে বসে থাকে কি ভাবে এই বাড়ির খুঁত খুঁজে বের করা যায়।

এমনিতেই ত' গ্রামদেশে তিলকে তাল করে ঘোঁট পাকানো হয়ে থাকে। তারপর সত্যি যখন ত্রুটি চোখে পড়ে তখন একদল যেমন উল্লাসে মেতে নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, তেমনি আর একদলের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তারা তখন চুপ করে বসে থাকে না; বিরুদ্ধ পক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য নতুন ফন্দী আঁটতে থাকে।

চৌধুরীবাড়ির এই অপমানে গাঁয়ের অনেক মাতব্বরই বেশ খুশী হল। গাঙ্গুলী-বাড়ির ফাল্গুন—মাছের ব্যাপারে যে অপমান হজম করে রেখেছিল—অন্নপ্রাশনের উৎসবে তার প্রতিশোধ নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ঘরে ফিরে এলো।

চৌধুরীবাড়ির লোকেদের কিল খেয়ে কিল-হজম করে থাকতে হল। নিজেদের বাড়িতে সবাইকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছেন! সেখানে তো আর কারো সঙ্গে অভদ্রতা করা চলে না। ও-স্থলে আর কেলেঙ্কারীর অবধি থাকবে না। সারা গাঁয়ে একেবারে ঢি-ঢি পড়ে যাবে।

চূড়ান্ত অপমানের পর চৌধুরীমশাই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। তারপর খাওয়া-দাওয়ার অন্তে যেভাবে গাঙ্গুলীবাড়ির নায়েব তাঁর কাছে হাতজোড় করে অতিবেশী বিনয় দেখিয়ে বিদায় নিলে, তখন সবকিছু তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

চৌধুরীমশাই নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পরের বাড়ির নায়েবকেও কিছু বল্‌তে পারেন না। যখন মনে মনে ইচ্ছে—লোকটার গলায় গামছা দিয়ে উপযুক্ত শাসন করবার, তখনও দাঁত বের করে হেসে মিষ্টি কথা বলে তাকে বিদায় দিতে হল! যে দাঁত দিয়ে খানিকক্ষণ আগে কাষ্ঠ-হাসি হেসে তিনি নায়েবকে বিদায় দিয়েছিলেন—পরমুহূর্তেই সেই দাঁত তিনি নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। ঠোঁট দিয়ে খানিকটা রক্তও বেরুলো, কিন্তু সেদিকে চৌধুরীমশায়ের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। এমন করে গাঁ শুদ্ধ লোকের সাম্‌নে ফন্দি-ফিকির করে অপমান করে গেল!

অন্দর থেকে দাসী এসে খবর দিলে, কর্তার খাবার ঠাঁই হয়েছে। চৌধুরীমশাই হুমকি দিয়ে উঠে বললেন, সব নিয়ে খালের জলে ফেলে দাও। আজ আমি কিছু দাঁতে কাটবো না।

চৌধুরীমশায়ের রাগ যে কি রকম সাঙ্ঘাতিক তা' বাড়িশুদ্ধ কারো অজানা নয়। ভয়ে আর কেউ কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না। সবাইকার পেটে ক্ষিদে চোঁ-চোঁ করছে। কিন্তু কর্তা না খেলে তো কারো পক্ষে পাত পেতে বসা সম্ভব নয়।

চৌধুরীমশাই যে রকম গম্ভীর মুখ করে বাইরের ঘরে বসে আছেন—কার সাধ্যি যে সেদিকে এগোয়!

সারাটা বাড়ি একেবারে থম্‌থমে নিঝুম। বাড়ির গৃহিণী কর্তাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দাসী একবার ধমক্ খেয়ে গেছে, কাজেই কেউ আর চৌধুরীমশায়ের সামনে এগিয়ে আস্‌তে রাজি নয়।

হঠাৎ চৌধুরীমশাই হুমকি দিয়ে উঠলেন, ওরে, কে আছিস?

হলধর পাইক সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। হলধর ভালোরকমই জানে যে, এইরকম একটা ঘটনার পর সকলের আগে তারই ডাক পড়বে। সেইজন্য সে একরকম

তৈরী হয়েই ছিল। গামছাটাকে সে কোমরে জড়িয়ে একেবারে প্রস্তুত—কখন কর্তার হুমকি আসে!

কর্তা যেন লজ্জায় হলধরের কাছেও মাথা তুল্‌তে পারছিলেন না—এমনি তখন তাঁর মনের অবস্থা!

একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হলধর বললে, হুকুম করুন কর্তা—এইবার যেন চৌধুরীমশায়ের মুখে কথা ফুট্‌লো। বললেন বিষ্টু গোয়ালাকে গলায় গামছা দিয়ে ধরে নিয়ে আস্‌বি।

হলধর মাথা নুইযে বললে, যো হুকুম কর্তা। গ্রাম দেশেও একটা জরুরী কিম্বা সাঙঘাতিক কাজ করার সময় জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের হিন্দিতে কথা বলে ফেলে:

তাতে নাকি কাজেব গুরুত্বটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। লাঠি হাতে নিয়ে হলধর তক্ষুনি বেরিযে গেল। কর্তা তবু গুম্ হয়ে বসে রইলেন।

চৌধুরীমশায়ের খানসামা একটু বাদেই সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তার মনে-মনে ইচ্ছে কর্তার খাওয়ার কথাটা আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু সে কিছু বল্‌বার আগেই কর্তা বললেন, তামাক দে গোবিন্দ—

গোবিন্দের কিন্তু এ সাহস নেই যে, তামাকটাকে ছেড়ে আবার খাওয়ার কথাটা পাড়ে! কাজেই সে পাঠশালার সুবোধ ছেলের মতো অম্বরী তামাক সাজতে বসে গেল!

কর্তা তামাক টান্‌ছেন আর ধোঁয়া ছাড়ছেন। গোবিন্দ বোকার মতো একবার কর্তার মুখের দিকে, আর একবার কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়ার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাতে লাগ্‌লো। বাড়ির গিন্নী যে তাকে এত কথা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—সব সে বেমালুম ভুলে গেল।

কথাটা কোন্ ভাবে ভনিতা করে আরম্ভ করা যায় এইটাই সে মনে মনে মক্স করতে চেষ্টা করছিল—এমন সময়ে হলধর হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। মাথাটা নুইয়ে বললে, কর্তা, গাঙ্গুলীবাড়ির পাইকরা বিষ্টু গোয়ালার বাড়ী আগলে রেখেছে। ওটা তো আমাদের জমি নয়, তাই আপনার হুকুম নিতে এসেছি।

কথাটা শুনে চৌধুরীমশায়ের ভ্রূ কুঁচকে গেল। তিনি আর একবার অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে শুধু বললেন, হুঁ।

ঘটনাটা যে ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে সে কথা বাড়িশুদ্ধ কারো বুঝতে বাকী রইল না।

মীমাংসা না হলে কর্তা জলগ্রহণ করবেন না—এ তার ধনুর্ভাঙা-পণ! এই প্রতিজ্ঞা তার ভাঙতে পারে কে? এ তাকায় ওর মুখের দিকে—ও তাকায় তার মুখের দিকে।

এ ত' অঙ্ক কিম্বা জ্যামিতির একটা সমস্যা নয় যে, চট করে সমাধান হয়ে যাবে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চৌধুরীবাড়ির সম্মান।

ভীষণ একটা বজ্রপাতের পর—সারা আকাশ ও প্রকৃতি যেমন থম্‌থম্‌ করতে থাকে—চৌধুরীবাড়ির অবস্থাও হয়েছে ঠিক তেমনি।

হঠাৎ দেখা গেল যে, এক-পা দু'পা করে চন্দন চৌধুরীমশায়ের বৈঠকখানায় গিয়ে উপস্থিত।

কর্তা তামাক টানা শেষ করে তখন তাকিয়ায় আধশোয়া অবস্থায় চোখ দুটি বন্ধ করে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে চৌধুরীবাড়ির হারানো সম্মান খুঁজে আনবার জন্যে তিনি আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

চৌধুরীমশাইও চোখ মেলে অকান না—আর চন্দনও কিছু বলতে সাহস পায় না!

একটা থম্‌থমে অসহ্য আবহাওয়া!

আচমকা চন্দনের একটা দম্‌কা কাশিতে কর্তার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

তিনি চিন্তা জড়ানো চোখ মেলে তাকালেন—চন্দনের দিকে। তারপর বললেন, কিছু বলতে চাও আমাকে?

চন্দন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি খেয়ে নিন্‌। বিষ্টু গোয়ালকে আপনার সামনে হাজির করবার ভার আমি নিচ্ছি।

চৌধুরীমশাই হতাশায় এতক্ষণ শুয়ে ছিলেন—এইবার উৎসাহে উঠে বস্‌লেন। শুধোলেন, তুমি ওকে আমার সামনে হাজির করবার দায়িত্ব নিচ্ছ? আমি একবার বিষ্টু গোয়ালাকে মুখোমুখি দেখতে চাই। এতবড় ওর বুকের পাটা যে, আমার বাড়ির কাজে সে দৈয়ের ভেতর কাদা গোলা দেয়?

চন্দন এইবার খোলামনে কথা বলবার সাহস পেলে; বললে আজ্ঞে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আজ রাত্রে আমি ওকে আপনার কাছারীতে এনে হাজির করবো। আপনি কিছু মুখে দিন। সারা বাড়ির লোক আপনার জন্যে উপোস করে বসে আছে। আপনি কিছু না খেলে ত' তারা কেউ ভাতে হাত দিতে পারে না।

চৌধুরীমশাই নিজের মনের জ্বালায় এ কথাটা একেবারে ভেবেই দেখেন নি। তাড়াতাড়ি উঠে হাঁক দিলেন,—ওরে গোবিন্দ, শিগ্‌গীরি আমার ঠাঁই করে দিতে বল্‌,—আর সবাইকে বল খেয়ে নিতে। বাড়িশুদ্ধ লোকের না খেয়ে থাকবার কোন মানে হয়?

চৌধুরীমশায়ের চটির শব্দ ধীরে ধীরে অন্দরমহলের পথে মিলিয়ে গেল।

সারাবাড়ির খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল।

সবাই ক্লান্ত।

তার ওপর মন মেজাজও কারো ভালো নেই। তাই যে যেখানে পারে গা এলিয়ে দিলে।

তখন হলধর পাইকের ঘরে বসল—চন্দন আর হলধরের পরামর্শ-সভা।

চন্দন বললে, দেখ হলধর খুড়ো, একটা কাজের ভার নিয়েছি। যে করেই হোক্— সে কাজ হাসিল করতে হবে।

হলধর উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

হাতের লাঠিটায় হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দেয়, তুমি হুকুম দাও না দাদাবাবু। লাঠি হাতে থাক্‌লে আমি আব কিচ্ছু ভয় করি না। না হয় সঙ্গে আরও দু'চারজনকে নেবো।

মৃদু হেসে চন্দন বললে, না হলধর খুড়ো। ওপথে গেলে বিশেষ সুবিধে হবে না। গাঙ্গুলীবাড়ির জমিতে বিষ্টু গোয়ালার ঘর। সেখানে গিয়ে লাঠি-বাজি করলে বে-আইনী হবে। এবার আমাদের কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে।

ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে হলধর জবাব দিলে, কৌশল আমার মাথায় আসে না দাদাবাবু। আমি জানি এক কৌশল—সে হচ্ছে লাঠির খেল। হুকুম করো, কাঁচা মাথা কেটে নিয়ে আস্‌বো। তোমরা শহরে গিয়ে বইপত্তর পড়েছ'—কত কৌশল তোমাদের মগজে গিসগিস করছে।

চন্দন হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, সেই রকম একটা ভালো কৌশলের কথাই তো ভাব্‌ছি। কিন্তু মগজে পেরেক ঠুকেও কোনও বুদ্ধি আজ বেরুচ্ছে না।

নিজের ডান হাতের আঙুলগুলি চন্দন চিরুনীর মতো চুলের ভেতর ক্রমাগত চালাতে লাগলো।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়াতে সে উৎসাহিত হয়ে উঠে বস্‌লো। বললে, আচ্ছা হলধর খুড়ো, আমার বেশ মনে আছে—বিষ্টু গোয়ালা যখন আমাদের বাড়ি এসে দৈয়ের বায়না নেয়—তখন কথায় কথায় একবার বলেছিল যে, ওর মেয়ে শিগ্‌গীরই শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর কাছে আসবে।

—তা হবে, আমি ত' জানিনে কিছু। হতাশভাবে জবাব দেয় হলধর পাইক।

এত মাথা খাটিয়ে যদি বিষ্টু গোয়ালার মত একটা নিরীহ প্রাণীকে ধরে আনতে হয়—তবে দাদাবাবু জমিদারী রক্ষা করবে কি করে—এই হ'ল হলধর পাইকেব এক মস্তবড় ভাবনা।

ইতিমধ্যে কিন্তু চন্দনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে হলধরের দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে খুড়ো। কৌশল আমার মগজে এসে গেছে। এখন তাকে কাজে খাটিয়ে ভালো করে খেলিয়ে তুলতে হবে তোমাকে।

হলধর বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে খানিকটা চেয়ে রইল, তারপর শুধোলে, কি সে কৌশল সেটা খুলে না বললে আমি খেলিয়ে কি করবো ?

—তাহলে শোনো হলধর খুড়ো ; চন্দন বেশ করে মোড়ার ওপর গুছিয়ে বসে তার কৌশলের কথা বলতে সুরু করে।

প্রথমেই একটি বাচ্চা মেয়েকে জোগাড় করতে হবে—যে একেবারে চোখে মুখে কথা কয়।

হলধর কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল চন্দনের এই রকম ভণিতা শুনে। তাই জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে ত' আর বিষ্টু গোয়ালাকে বেঁধে নিয়ে আসা যাবে না।

চন্দন মুচকি হেসে উত্তর করলে, তোমায় আমি আগেই বলেছি যে এখানে, বাঁধাবাঁধির ব্যাপার থাক্‌বে না প্রথমে থাকবে প্রথম নম্বরের কৌশল। সেই কৌশলটা কি তাই তুমি আগে শুনে নাও দেখি। কথা কাটাকাটি করো পরে, আগে ফন্দিটা শোনো।

—বলো। হলধরের মুখে-চোখে কিন্তু হতাশা! চন্দন বললে, সেই ছোট মেয়ে —যার মুখে চোখে কথা যে একটু বেশী রাত্তিরে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে বিষ্টু গোয়ালাকে খবর দেবে যে, তার মেয়ে গরুর গাড়ী করে আসছিল — পথের মাঝখানে সেই গাড়ী একটা গর্তে পড়ে ভেঙে গেছে। বিষ্টু গোয়ালার মেয়েরও খুব চোট লেগেছে। সে পথে বসে কান্নাকাটি করছে।

এই খবর শুনে কোন বাপ চুপ করে থাক্‌তে পারে শুনি?

হলধর পাইক শুধোলে, কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ির সেই পাইকের দল? তারা যদি এগিয়ে আসে? যদি বলে, কোথায় মেয়ে পড়ে আছে — আমরা গিয়ে দেখি—

আরে না শোনই না —বাধা দিয়ে বলে চন্দন। পাইকরা যদি এগিয়ে দেখতে যায় তাতে ত' আমাদেরই লাভ। তখন কি করতে হবে — আমি তোমায় সব জানিয়ে দেব। এই বলে চন্দন হলধর পাইকের কানে কানে কি যেন বললে।

হলধর বললে, হ্যাঁ বুদ্ধিটা অবশ্য মন্দ নয়। তবে শেষ রক্ষা হলে হয়। ছোট মেয়ের জন্যে তুমি ভেবো না দাদাবাবু। আমার এক ভাইঝি আছে। চোখে-মুখে যেন একেবারে খৈ ফোটে। তাকে আমি নিয়ে আসছি বাড়ি থেকে। তারপর তুমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।

হলধর পাইক তার ভাইঝিকে আন্‌তে চলে গেল।

তখন বেশ রাত হয়েছে।

সারাটা গাঁ যেন একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে।

হলধর আর চন্দন চুপি চুপি চৌধুরীবাড়ির খিড়কীর পুকুরের একটা ডিঙিতে গিয়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে রয়েছে হলধরের ভাইঝি ময়না।

ময়নাকে চন্দন কি যেন সব শিখিয়ে দিয়েছে। ওইটুকু মেয়ের কথাবার্তা শুনে চন্দন ভারী খুশী। হলধরকে ডেকে বললেন, খুড়ো, বড় হয়ে তোমাদের ময়না খুব ভালো 'প্লে' করতে পারবে।

হলধর চোখদুটো বড় করে বললে, কি বলছ দাদাবাবু, পিলে হবে? কাজ নেই আর অত সুখে!

হলধরের কথা বলবার ঢঙ্ দেখে চন্দন ত' হেসেই খুন।

ক্ষীণ আলোর ভেতর দিয়ে ওদের নৌকা এগিয়ে চলে।

জোনাকীর মিছিল বেরিয়েছে। —ঝোপঝাড় জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে— আর দূরে মাঝে মাঝে শেয়াল ডেকে উঠ্‌ছে কোন্ বনের অন্তরালে।

বিষ্টু গোয়ালার বাড়ির পিছনে এক নির্জ্জন জায়গা বেছে নিয়ে ওরা নৌকো বাঁধলে। তারপর অন্ধকারের আড়ালে এগিয়ে গেল। গাঙ্গুলীদের বাড়ির দুটো পাইক বাইরের ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে আছে দেখা গেল। কেউ কেউ উঠোনে আনা-গোনা করছে। তখনো বোধ করি খাওয়া-দাওয়া চুকে যায় নি।

চন্দন আর হলধর একটা ঘন ঝাপ্‌ড়া গাছের নীচে দাঁড়ালো। তারপর ময়নাকে আর একবার কি সব শিখিয়ে অন্দরে পাঠিয়ে দিলে।

বলিহারি দিতে হয় বটে ময়নাকে— ।

এমনভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়ে দুর্ঘটনার কথা বল্‌লে যে, বিষ্টু গোয়ালা হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির বাইরে চলে এলো। বারান্দায় পাইক দুটো ঘুমুচ্ছিল তাদের পর্য্যন্ত ডেকে তুললে না।

চন্দন আর হলধর অন্ধকার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলে — আগে আগে আসছে ময়না— তার পেছনে ব্যস্তভাবে পা ফেলছে বিষ্টু গোয়ালা। হলধর নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে ওরা কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হলধর পাইক গামছায় বিষ্টুর মুখ বেঁধে ফেললে তারপর অবলীলাক্রমে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে নৌকার ওপরে এনে ফেললে।

চন্দন আর ময়নাও সঙ্গে সঙ্গে এসে নৌকোর ওপর চড়ে বসেছে।

হলধর দড়ি দিয়ে বিষ্টুকে ভালো করে বেঁধে নিলে। তারপর আঁধার পথে আবার নিঃশব্দে চৌধুরীবাড়ির ঘাটের দিকে নৌকো চালিয়ে দিলে।

।। তিন ।।

শেষ রাত্তিরে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির কর্তা-মা বিছানা সবে ছেড়ে উঠে নিজে হাতে উঠোনে গোবরজলের ছড়া দিচ্ছেন আর শ্রীকৃষ্ণের শত নাম আউড়ে যাচ্ছেন— এমনসময়ে একটি মেয়েছেলে তাঁর পায়ের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো।

কর্তা-মা ভয় পেয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। আশী বছরের ওপর বয়স হয়েছে বটে কিন্তু একটি দাঁতও আজ অবধি পড়েনি। গাঙ্গুলীমশায়ের মা তিনি, তাই এবাড়ির সবাইকার কর্তা-মা।

—শেষ রাত্তিরে এক অলুক্ষুণে কাণ্ড। কোথাকার কোন মেয়েছেলে — সক্কালবেলা তাঁর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কি মতলব তার কে জানে! এত সকালে গাঙ্গুলীবাড়ির অন্দরে ঢুকে পড়বে এমন সাহস কার?

হাঁড়ির ভেতর যে গোবরজল ছিল আচম্‌কা ধাক্কা লাগতে তা পড়ে গেছে··· হাঁড়িটা গেছে ভেঙে। এমন ত' কখনো ঘটেনি। আজ গাঙ্গুলীবাড়ির কি অকল্যাণ হবে কে জানে। মহাবিরক্ত হয়ে কর্তা-মা ডাকলেন —ওরে বামি, নবাব-নন্দিনী, আমি আশি বছরের বুড়ি কখন উঠেছি; — আর তোর ঘুম ভাঙলো না? বামি কর্তা-মার খাস-দাসী।

ঘুম তার ভেঙেছিল অনেকক্ষণ।

তবু যতটা সময় বিছানায় পড়ে থাকা যায়। সারাটা দিন ত' ঘানি ঘোরাতেই হবে!

কর্তা-মার হাঁক শুনে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে শুধোলে কি বল্‌ছ কর্তা-মা?

— দেখ্‌না — সক্কালবেলা কোন অজাত-কুজাতের মেয়ে এসে আমার পায়ের ওপর পড়ল? কর্তা-মা চীৎকার করে বললেন।

বামি এগিয়ে এসে গালে একটা আঙুল রেখে বললে, ওমা এযে আমাদের বিষ্টু গোয়ালার বৌ। তা তুমি বাছা এত সকালে এসে কর্তা-মাকে ভয় খাইয়ে দিলে কেন?

কর্তা-মা এইবার চটে উঠলেন।

—হুঁ। ভয় আমি পাইনি! সক্কালবেলা অন্ধকারে এসে ঘাড়ের ওপর পড়ল। তোরা ত' নাক ডাকিয়েই সারা।

বামি হাসি গোপন করে জবাব দিলে, না কর্তা-মা, নাক ডাকাবো কেন? তোমার এক ডাকেই তো ছুটে এলাম। তারপর বিষ্টু গোয়ালার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে শুধোলে, তা বাছা কি বল্‌বে বল না — কর্তা-মার কি দাঁড়াবার সময় আছে?

বিষ্টুর বৌ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

কর্তা-মা চীৎকার করে উঠে বললেন, আ মর! সক্কালবেলা উঠোনে এসে মরা কান্না সুরু করে দিলি! আজ একটা বিপদ-আপদ না হয়ে যাবে না দেখছি।

সত্যি, শেষ রাত্তিরে বিষ্টু ঘোষের বৌয়ের কান্নাটা একটু বেমক্কা রকমের আর বেয়াড়া ধরণের হয়ে গিয়েছিল।

গাঙ্গুলীবাড়ির অনেকেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেই কান্না শুনে।

সকলের আগে ঘুম থেকে বেরিয়ে এলেন গাঙ্গুলীমশাই।

শুধোলেন, ব্যাপার কি? কি হয়েছে মা?

কর্তা-মা জবাব দিলেন, কি জানি বাপু, কিছু বুঝতে পারছি নে। শেষ রাত্তিরে বিষ্টু গোয়ালার বৌ এসে মরা-কান্না সুরু করেছে।

এইবার গাঙ্গুলীমশাই কি যেন আশঙ্কা করলেন। বললেন, ওরে বামি, ভালো করে জিজ্ঞেস করনা কি হয়েছে?

বিষ্টুর বৌ সাহস পেয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠল, বললে, চৌধুরীবাড়ির পাইকেরা এসে গোয়ালাকে জোর করে ধরে মারতে মারতে নিয়ে গেছে।

বিষ্টুর বৌ একটু বানিয়েই বললে। কেননা তাতে কাজে হবে। রাগ না হলে কর্তাদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যায় না। — এ গাঁয়ের বৌ হয়ে সে কথা তার না-জানা নয়।

গাঙ্গুলীমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কেন? আমার পাইকরা সব কি করছিল?

ঘোমটা টেনে বিষ্টুর বৌ জবাব দিলে, তারা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল কর্তা —

গাঙ্গুলীমশাই গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন, আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি এর বিহিত করছি —

নিশ্চিন্ত মনে বিষ্টু গোয়ালার বৌ এইবার উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

বামি কর্তা-মার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বললে, আচ্ছা কর্তা-মা এই কথাটা ধীরে সুস্থে এসেও ত' বলা যেত। আমাকে ডেকেও খবরটা জানিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মিছিমিছি তোমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার কি দরকার ছিল শুনি?

বিষ্টু গোয়ালার বিপদের কথা শুনে কর্তা-মার মন একটু নরম হয়েছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, না-না, গায়ের ওপব এসে পড়বে কেন? আমার পায়ের ওপরই আছড়ে পড়েছিল। তুই তোর কাজে যা বামি — ; আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি —

অন্দরের আন্দোলন যখন বন্ধ হল — তখন সুরু হল বাইরের শলা পরামর্শ। গাঙ্গুলীমশাই গোঁফটা চুমড়ে নিয়ে বললেন, আগে আমি পাইকদেব বিচার করবো। গাঙ্গুলীবাড়ির নাম ডোবালে হতভাগারা!

তক্ষুনি একটা চাকর ছুটলো পাইকদের খবর দিয়ে নিয়ে আসতে। কার একটা ঘাড়ে দুটো মাথা যে কর্তার এত্তেলা পেয়ে চুপচাপ্ বসে থাকবে?

চোখ কচ্লাতে কচ্লাতে দুটো পাইক প্রণাম করে এসে সামনে দাঁড়ালো।

নায়েবমশাই কর্তার পাশে বসে রাগে কাঁপছিলেন। তিনি কি একটা জোরালো রকম হুকুম দিতে যাচ্ছিলেন — এমন সময় ফাল্গুন এসে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল।

বললে, নায়েব কাকা, আপনার বিষ্টু গোয়ালার ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি ইতিমধ্যে সব খবরই সংগ্রহ করছি। চৌধুরীবাড়ির চন্দনই বিষ্টুকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। হাটে ওরই সঙ্গে চিতোল মাছ নিয়ে আমার বিবাদ

বেঁধেছিল। কাজেই ঝগড়াটা হচ্ছে চন্দনের আর ফাল্গুনের। আপনারা বুড়ো মানুষেরা এর মধ্যে মাথা গলালে আপনাদের মর্যাদা ঠিক না-ও থাকতে পারে। রেষারেষিটা ছেলে-ছোক্‌রাদের মধ্যেই আট্‌কে থাকুক না। আমি কথা দিচ্ছি নায়েব কাকা, চৌধুরীবাড়িকে এমন জব্দ করবো যে, লজ্জায় আর গাঁয়ে ওরা মুখ তুলে কথা কইতে পারবে না!

গাঙ্গুলীমশাই গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে খেতে ফাল্গুনের কথাগুলি শুন্‌লেন। তারপর মৃদু হেসে উত্তর করলেন, এ ত' ভালো কথাই হে নায়েব। আমরা আর ক'দিন। দুজনেই বুড়ো হয়ে পড়েছি। এখন পরকালের চিন্তা করাই ত' ভালো।

নায়েবের কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। প্যাঁচ কস্‌তে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। তবু কর্তা যখন বল্‌লেন তখন ত' আর আপত্তি উত্থাপন করা চলে না।

মুখখানা ভারী করে শেষ পর্য্যন্ত ঘাড় কাত্‌ করতেই হল।

খুশী মনে ফাল্গুন বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

জল-বিছুটি গাঁয়ে একঘর পুরুত আছেন।

পালা পার্বণ, বিয়ে, চুড়ো, অন্নপ্রাশন আর সবকিছু সামাজিকতায় তাঁদের ডাক পড়ে।

গাঁয়ের লোককে যদি কোনো সামাজিক ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করতে হয় তবে বাড়ির লোকের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হয় না — এই পুরোহিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলে তবে তা সিদ্ধ হবে।

ফাল্গুনের মগজে ইতিমধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়ে গেছে।

কিন্তু কোনো কাজই উপযুক্ত পরামর্শ না করে করা ঠিক হবে না।

ফাল্গুনের একটা দল আছে। দুষ্টুবুদ্ধির আবাদ করতে তারা ভারী ওস্তাদ। তাদের সবাইকে ডেকে এনে একটা গোপন বৈঠক বসাবার জন্যে ফাল্গুন ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেইজন্যে তার ছোক্‌রা চাকর বিষ্টুকে পাঠিয়ে দিলে — গোটা দলকে খবর দেবার জন্যে।

ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে কানাকানি, ফিস্‌ফিস্‌, চৌকি চাপড়ানো চললো, অবশেষে একথালা করে গাঙ্গুলীবাড়ির খাবার খেয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খুবই সোজা কিন্তু মজাদার।

ফাল্গুনের দলে আছে পুরোহিত বাড়ির একটি ছেলে। তাকে দিয়ে গ্রামস্থ লোককে নিমন্ত্রণ করা হবে, যেন আজ রাত্রেই একটি বিরাট ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির চৌধুরীমশাই। এই খবরটা চৌধুরীবাড়ির লোকেদের কাছ থেকে একেবারে গোপন রাখা হবে। গ্রামস্থ লোক গিয়ে যখন

দেখবে ভোজনের কোন আয়োজনই নেই, তখন চৌধুরীবাড়ির লোকেরা সকলের কাছে কেমন অপদস্থ হবে। এই কথা মানসনেত্রে অবলোকন করে ফাল্গুনের বন্ধুর দল খুব হাসাহাসি করতে লাগলো।

পুরোহিত বাড়ির ছেলের নাম গণেশরাম চক্কোত্তি। সে ভয়ে ভয়ে বললে, কিন্তু আমার জ্যাঠামশাই যখন জানতে পারবে যে, আমিই সারা গাঁয়ের লোককে নেমন্তন্ন করেছি — তখন কি আর পিঠের ছাল-চামড়া থাকবে?

— পাগল হয়েছিস তুই! অভয় দেয় ফাল্গুন। —আমাদের বাড়িতে তোকে লুকিয়ে রাখবো। তোর জ্যাঠামশাই আর চৌধুরীবাড়ির লোকজন ত' ছার, গাঁয়ের কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না তুই কোথায় আছিস। চাই কি— দরকার হলে — তোকে আমাদের কলকাতার বাসায় রাতারাতি পাঠিয়ে দেবো।

এই জাতীয় একটা কাণ্ড করার মধ্যে বেশ খানিকটা উম্মাদনা আছে। তাছাড়া বন্ধুদের কাছে বাহবাও কম পাওয়া যাবে না। সকলের ওপর ফাল্গুনের যেমন দিল দরিয়া মেজাজ — শাল-দোশালা বক্‌সিস্ পাওয়ার সম্ভাবনা তো রইলোই!

দ্বিধা-দ্বন্দে দুলতে দুলতে গণেশরাম রাজী হয়ে গেল! বন্ধুরা সবাই পিঠ্ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বললে, আরে, তোর ভাবনা কি রে? আমরা ত' সবাই পেছনে রইলামই। এইবার চৌধুরীবাড়িতে এমন একটা খেল দেখিয়ে দে' যা' এরা জীবনে ভুলতে পাববে না।

গণেশরাম কাজে নেমে যেন নেশার ঝোঁকে উড়ে চলে।

এর্কেবারে নারদের নেমন্তন্ন সুরু করে দিল। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, বাচ্চা, কাচ্চা,আত্মীয় স্বজন এমন কি গাঁয়ের চাষাভুষো, হাঁড়ি, মুচি, ডোম সবাইকে জনে জনে বলে এলো চৌধুরীবাড়ির এই নেমন্তন্নের কথা। শুনে সবাই খুশী। ভালো-মন্দ ভোজ কে না খেতে চায়? চৌধুরীবাড়িতে তখন মেয়ে-জামাই আত্মীয় কুটুম্ব একেবারে গিস্‌গিস্ করছে। তাই সবাই ভাবলে চৌধুরী বুঝি সবাইকে নিয়ে আর একদিন আনন্দ করতে চান। ভগবান দুহাত তুলে দিয়েছেন—অভাব ত' নেই কিছুরই। গ্রামস্থ লোকের আবার পাত পড়বে এটা তো ভাগ্যের কথা।

কামার, কুমোব, জোলা, তাঁতি, ঘাটের মাঝি, ক্ষেতের কিষাণ সবাই মুখ চুলকোতে লাগ্‌লো। যাক্ আর একদিন ছেলেপুলেরা পেটপুরে খেতে পারবে।

কিন্তু যাদের বাড়ি নেমন্তন্ন তারা এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারল না।

ঘুর্ণির মতো গণেশরাম চবকিপাক খেতে লাগলো। বগলে ছাতা নিয়ে সে এ বাড়ি থেকে ওবাড়ি —ওবাড়ি থেকে সে বাডি লাটিমের মতো পাক্ খেয়ে বেড়াচ্ছে।

একবার গণেশরাম ভাবলে পাশের গ্রামগুলিতেও ঢুঁ মেরে আসবে কিনা। তাহলে রগড়টা জমবে ভালো।

একটি বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। চুপি চুপি তার মত জানাতে সে লাফিয়ে উঠে বললে, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, নারদের নেমন্তন্ন করতে যখন বেরিয়েছিস্ — তখন ভালো করেই জলটা ঘোলা করে নে না! তারপর গোলে হরিবোলে কে যে আসল দোষী আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব কানামাছি ভোঁ ভোঁ।

একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুজনে খুব খানিকটা হেসে নিলে।

এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে যখন কথাটা চৌধুরীবাড়ির অন্দরে পৌঁছলো, তখন সাঁঝের ঘোর হতে আর বেশী দেরী নেই। — ওমা একি সর্বনেশে কাণ্ড! মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতাও লোকে করে। এই কথা বলে বাড়ীর গিন্নি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন। — এখন এতগুলি লোকের মুখে আমি কি দেবো? চৌধুরীবাড়ি এসে সব না খেয়ে ফিরে যাবে? এতে আমার ছেলেপুলের অকল্যাণ হবে না?

বাড়ির গিন্নি না হয় কাঁদতে পারেন — কিন্তু চৌধুরীমশাইকে ত' বিচলিত হলে চল্‌বে না'

বাড়িশুদ্ধ মেয়ে-জামাই, আত্মীয় কুটুম্ব গিস্‌গিস্ করছে। তাদের সবাইকার কাছে চৌধুরীবাড়ির উঁচু মাথা এমন হেঁট করে দেবে গাঙ্গুলীবাড়ির ঐ সেদিন-কার পুঁচকে ছোকরা ফাল্গুন? জীবন থাকতে চৌধুরীমশাই তা সইতে পারবেন না।

চুপ করে খবরটা শুন্‌লেন তিনি। তারপর হো-হো করে আপন মনে হেসে উঠলেন।

সবাই ভাবলে হঠাৎ মনে ধাক্কা খেয়ে কর্তা পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

কিন্তু না, অত সহজে কাবু হবার লোক চৌধুরীমশাই নন। তিনি তক্ষুনি বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একে একে হুকুম দিতে লাগলেন। ভিটে বাড়ির প্রজা আছে কয়েক ঘর জেলে। তাদের কাছে হুকুম গেল, এক্ষুনি বড়ো পুকুরে জাল ফেলে কয়েক মণ মাছ তুলতে হবে। গোটা কয়েক পাইক ছুট্‌লো আশেপাশে, এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে খাসী পাঁঠা যত দামে পাওয়া যায় — জোগাড় করে আনতেই হবে। আর একদল লোক ছুট্‌লো—গঞ্জে কয়েক মণ রসগোল্লা নৌকোয় করে নিয়ে আসতে হবে। ঘাটের নৌকো দাঁড় টেনে চলে যাবে — কতক্ষণ আর লাগবে? না হয় একটু বেশী রাত্তিরে খাওয়া হবে।' কিন্তু ভোজ কাকে বলে তা দেখিয়ে দেবেন চৌধুরীমশাই। বাপের জন্মে এমন ভোজ কেউ খায়নি। দরকার হয় প্রতি পাতে পাতে মুড়ো দেবেন তিনি। চৌধুরীবাড়ির ইজ্জত সকলের ওপরে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল বিষ্টু গোয়ালার কথা। সে ত' চৌধুরী বাড়িতেই বসে আছে। চাকর দিয়ে খাস কামরায় বিষ্টুকে নিয়ে এলেন। বললেন দেখ বিষ্টু,

তুমি যে বেইমানি আমার সঙ্গে করেছ তাতে তোমার মাথা আমি কেটে নিতে পারি। কিন্তু সব দোষ তোমার আমি মাফ করে দেব— যদি আজ রাত্তিরে সবাইকে খাসা দৈ খাইয়ে দিতে পারো। বিষ্টু চৌধুরীমশায়ের পা জড়িয়ে ধরে বললে, হজুর মা-বাপ। কিন্তু এত শিগ্‌গীর তো দৈ জমবে না। তার চাইতে আমি সবাইকে খাসা ক্ষীর খাইয়ে দেব। একটা নৌকো দিয়ে ছেড়ে দিন। চৌধুরীমশাই একটা একশ টাকার নোট বিষ্টু গোয়ালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই তোমার আগাম বক্‌শিস্; পরে আরো পাবে। আগে আমার মুখরক্ষা করো — কিন্তু একটি কথা, আমার লোক সঙ্গে যাবে তোমার —

বিষ্টু গোয়ালাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দুজন পাইক নৌকায় চলে রওনা হল।

গাঁয়ের খাল পেরিয়ে বিলের কাছে যেতে আর একটা নৌকা আড়াআড়ি ভাবে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালো। তারপর কয়েকটি লোক মুহূর্তের মধ্যে চৌধুরী নৌকোয় লাফিয়ে পড়ে বিষ্টুকে পাঁজা কোলে তুলে নিয়ে কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটাকে ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। চৌধুরীবাড়ির পাইক দুটো চোখবুজে রাম-রাম চীৎকরে করতে লাগলো।

ফাল্গুন বিষ্টু গোয়ালাকে দেখে ভারী খুশী। বললে, এখন তুই আমাদের বাড়ী থাকবি — তোর ভয়টা কিসের? বিষ্টু দাদাবাবুর পা-টা জড়িয়ে ধরে বললে, কিন্তু চৌধুরীমশাই যে আগাম একশ টাকা বক্‌শিস্ দিয়েছেন, আমি যে একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাব দাদাবাবু।

ফাল্গুন হাসতে হাসতে উত্তর করলে, আরে বোকা, ওটা তো তোর উপরিলাভ। আরো বক্‌শিস্ পাবি আমার কাছে। এইবার রগড়টা জমবে আরও ভালো।

গণেশরাম শুধোল, রগড়টা কি ভাই? মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে ফাল্গুন জবাব দিলে, সাইকেল নিয়ে আবার ছোট্ গণেশরাম। সবাইকে নতুন খবর দিতে হবে। বলবি চৌধুরীবাড়ির ভোজ আজ বন্ধ, কেননা গাঙ্গুলীবাড়ী যাত্রা হচ্ছে আজ। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

— যাত্রা? আঁৎকে ওঠে গণেশরাম, — হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ যাত্রা। হুঙ্কার দিয়ে উত্তর করে ফাল্গুন। তলে তলে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। এতক্ষণে গাঙ্গুলীবাড়িতে সামিয়ানা খাটানো হয়ে গেল বোধহয়। তারপর চৌধুরীবাড়ির ওই খাসি, পাঁঠা আর মাছ...সব খালের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। একটা প্রাণীও না যেতে পারে সেজন্য রাস্তায় লোক মোতায়েন করেছি আমি। ওদিকে যাত্রাদলের কনসার্টও বুঝি বেজে উঠল, হা-হা-হা! দেখি বুদ্ধির খেলায় কে বড়ো — চন্দন — না ফাল্গুন।

।। চার ।।

গাঙ্গুলীবাড়িতে যাত্রার যে আসর বসেছে — তা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে হয় খানিকক্ষণ, এ রকম যাত্রার আসর এ অঞ্চলে কখনো সাজানো হয় নি।

ওপরে বিরাট চন্দ্রতপ, যে বাঁশগুলো খাটিয়ে আসর তৈরী করা হয়েছে, সেগুলি আগাগোড়া দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানো, ওপর থেকে দামী সব ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে। এক একটা দিক — এক এক দলের জন্যে পৃথক করে সুন্দরভাবে পরিপাটি সাজানো হয়েছে। এক অংশে গাঁয়ের মোড়ল ও মাতব্বরের দল, একদিকে যুবক-সম্প্রদায়, সাধারণ-শ্রেণী অন্যদিকে। ইস্কুলের ছেলেদের জন্যে আলাদা অংশ ভাগ করে রাখা হয়েছে। মেয়েদের জায়গা চিক দিয়ে ঢাকা। প্রত্যেক অংশেই দুটো তিনটে করে টানা পাখা এবং সেগুলি টানবার জন্য নিযুক্ত চাক্‌রাণ রয়েছে। গাঙ্গুলীবাড়ির ছোটছেলেরা গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছে সকলের গায়ে। মোটকথা এমন সুন্দর এক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে যে — যে-কোনো পালা শুরু হোক না — অতি সহজেই জমে যাবে। দর্শকদল অনেক কাল গাঁয়ে যাত্রা শুনতে পায় নি। তাই দীর্ঘকালের অনাহারী ভিক্ষুকের মতো দল বেঁধে সবাই এসে বসে গেছে।

নবজলধর চক্কোত্তির একটি নাম-ডাক আছে নেমন্তন্ন বাড়ীতে, শ্রাদ্ধে, বিয়েতে আর যে কোনো ফলারে । তার ওপর নবজলধর চক্কোত্তি ইচ্ছে করে উপোসী রয়েছেন, চৌধুরীবাড়ির নেমন্তন্নে একহাত দেখিয়ে দেবেন বলে ।

সন্ধ্যে না লাগতেই তিনি গুটি-গুটি পা রওনা হয়েছেন—চৌধুরীবাড়ির দিকে। মুখে তার শ্লোক ধ্বনিত হচ্ছে—

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"

কিন্তু মাঝপথে গাঙ্গুলীবাড়ির চর ওৎ পেতে বসে আছে, সে খবর ত' তিনি আর রাখেন না ।

আপনমনে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে তিনি এগিয়ে চলেছেন আর মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে তুড়ি মেরে মনের আনন্দ প্রকাশ করছেন ।

হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পাড়ার ডানপিটে ছেলে । আসলে সে ফাল্গুনের চ্যালা । তার নামটি হচ্ছে—ময়নাচাঁদ ।

ময়নাচাঁদ এগিয়ে এসে বললে, এই যে চক্কোত্তিমশাই, আপনার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলাম ।

কেন? কেন ? চক্কোত্তিমশাই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন । তা বাবাজী আমার ত' এখন কোনো কথা শোনবার সময় নেই—যাচ্ছি—চৌধুরীবাড়ি, ভয়ানক জরুরী কাজ । স্বয়ং চৌধুরীমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন ।

চৌধুরীবাড়ি যে কী কাজ ময়নাচাঁদ তা ভালো করেই জানে। কিন্তু সে গুড়ে কি করে বালি দিতে হয় তাও শ্রীমানের অজানা নয়। মনে মনে সে একটু হাসলে। তারপর মুখখানা কাচু-মাচু করে জবাব দিলে, আজ্ঞে আমিও ত' চৌধুরীবাড়ি থেকে আসছি, একটু গোলমাল বেঁধেছে যে।

গোলমালের নামে চক্কোত্তিমশায়ের চোখ দুটি গোল গোল হয়ে উঠল। শুধোলেন আবার কু-গাইস্ কেন বাবাজী? সেখানে একটা শুভ কাজে যাচ্ছি— না-না, তুমি আমাব পিছু ডেকোনা। আমার কাছে যদি তোমার দরকার থাকে ত' কাল সকালে এসো—

ময়নাচাঁদ নাছোড়বান্দা। সে কী আর অত সহজেই চক্রবর্তীকে পথ ছেড়ে দেয়? তাই সোজাসুজি বলেই ফেললে তাকে, চৌধুরীমশাই আজকের নেমন্তন্নের ব্যাপাবটা বন্ধ রেখেছেন।

এই সংবাদ শুনে চক্কোত্তিমশায়ের মনে হল যেন এক চাপ ঠাণ্ডা ববফ কেউ তাঁর পিঠের ওপর চেপে ধবেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন তিনি।

ভাগ্যিস ময়নাচাঁদ একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, তাই তার দুটো মুঠি ধরে ফেলে কোনরকমে নবজলধর ঠাকুরকে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ঠাকুরমশাই নিজে একটু সামলে নিয়ে বললেন, তুই একী ডাকাতী-কথা বলছিস রে ময়নাচাঁদ? চৌধুবীবাড়ির নেমন্তন্ন আজ একেবারে বন্ধ? তবে আমাব কি উপায় হবে শুনি?

ময়নাচাঁদ কিন্তু নবজলধর চক্কোত্তির অতশত খেদোক্তি শুনতে রাজী নয়। এমনি ভাবে সে বহু চৌধুরীবাড়িগামীকে গাঙ্গুলীবাড়ির পথে ফেবত পাঠিয়েছে। কাজেই এইটুকু তাব মনেব মধ্যে স্থির নিশ্চয় হয়ে আছে যে, নবজলধব ঠাকুরকেও ফেরৎ পাঠাতে হবে।

খুব বেশীক্ষণ এই ঝোপে দাঁড়িয়ে সে মশাব কামড খেতে রাজী নয়। তার ওপর কখন চৌধুরীবাড়ির লোকেদেব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যাবে— সেটা খুব বেশী আরামদায়ক হবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া গাঙ্গুলীবাড়িব আকর্ষণও বড় কম নয়। এতক্ষণ যাত্রাদলের লোকেবা সাজ-ঘরে নিশ্চযই পোষাক পরতে শুরু করে দিয়েছে।

নবজলধর বজ্রাহত কদলী বৃক্ষবৎ দাঁড়িয়েছিলেন। ময়নাচাঁদ বললে, তাহলে চলুন চক্কোত্তিমশাই গাঙ্গুলীবাড়ীই যাই—

আঁৎকে উঠলেন চক্কোত্তিমশাই। শুধোলেন, কেন? গাঙ্গুলীবাড়ি যাবো কেন? যাচ্ছিলাম চৌধুরীবাড়ির ভোজে, তুমিই ত' বাবাজী রাস্তার মাঝখানে বাগড়া দিলে। এমনভাবে মূর্তিমান বিঘ্নের মতো আমার সামনে দাঁড়ালে যে, ভোজের সব বাষ্প উড়ে হাওয়া হয়ে গেল। একটু দাঁড়াও, একটু হাঁফ ছাড়তে দাও--

ময়নাচাঁদ কাউকে হাঁফ ছাড়তে দিতেও রাজী নয়, আবার নিজেও হাঁফ ছেড়ে সময় নষ্ট করবার পক্ষপাতি নয়।

তাই তাড়া দিয়ে বললে, চলুন চক্কোত্তিমশাই, ওদিকে বোধ করি এতক্ষণ যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

এইবার সত্যি আঁৎকে ওঠেন নবজলধর চক্কোত্তি। অ্যাঁ। যাত্রা। কোথায় বিরাট ভোজ—যার নামেই কিনা রসনা লালাসিক্ত হয়ে ওঠে আর কোথায় যাত্রা! যাত্রার নামে চক্কোত্তিমশায়ের একটা ভয় আছে ছেলেবেলা থেকেই। কেন না,—তিনি অতি শিশুকাল থেকে বুঝে নিয়েছেন যে, যাত্রা শোনা মানেই প্রাণভরে— আশ্ মিটিয়ে কাঁদা।

পল্লী অঞ্চলে ত' চলতি কথাই আছে—যাত্রা শুনতে যাচ্ছ? তা সঙ্গে চাদর নিয়েছ ক'খানা?

এখনকার দিনের দর্শক হয়ত হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে হক্-চকিয়ে উঠবে। কথায় থৈ পাবে না। যাত্রা শুনতে যাবে তার সঙ্গে চাদরের কী সম্পর্ক বাপু? কিন্তু পল্লী অঞ্চলে এক কথাতেই কার্যকারণ সবাই বুঝে নিতে পাবত। তখন ত' লোকে রুমাল ব্যবহার করতে শেখেনি যে, চট্ করে পকেট থেকে বের করে চোখ মুছে নেবে ফ্যাসান দুরস্ত ভাবে। আর এ কথাও কারো অজানা ছিল না যে, যাত্রা শুনতে বসে যখন লোকে কাঁদতে শুরু করে—তখন এতটুকু ছিটেফোঁটা চোখের জল পড়ে না। যেন একেবারে শ্রাবণের ধারা নেমে আসে। সেই জলকে রোধ করতে পারে কয়েকখানি চাদর। যাত্রার আসরে একজন যদি কাঁদতে সুরু করলে অমনি দেখতে দেখতে সবাইকার চোখের জল বন্যার বেগে বেরিয়ে এলো। সেই বেগ সামাল দেওয়া ত' সোজা কথা নয়। তারপর চক্কোত্তিমশাই অভুক্ত আছেন। খালি পেটে যাত্রা শুনতে হয বসে যদি কাঁদতে হয় তবে শেষ পর্যন্ত হেঁচকি উঠবে কিনা তাই-ই বা কে বলতে পারে?

নবজলধর চক্কোত্তি এই সব ভেবে ইতস্তত করতে থাকেন। কিন্তু তাঁকে বেশী কিছু ভাবতে দিতে রাজী নয় ময়নাচাদ। হাত ধরে একরকম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে টানতে টানতে এনে হাজির করল—গাঙ্গুলীবাড়ির প্রাঙ্গণে। এব একটা বিশেষ কারণ অবশ্য ছিল। কেন না, তিনখানা গাঁয়েব লোক জানে—যেখানে নবজলধর চক্কোত্তি—সেইখানে ভোজ। আজ যখন চক্কোত্তিমশাই চৌধুরীবাড়ি না গিয়ে এখানে হাজির আছেন তখন চৌধুরীবাড়ির ভোজ যে সত্যিই স্থগিত রয়েছে সে বিষযে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকতে পারে না।

জনে জনে খোসামুদি না করে যদি শুধু চক্কোত্তিমশাইকে এনে আসরে হাজির করা যায় তবে—লাখো কথা যাবে বেঁচে।

ফাল্গুনেরও এইরকম একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল।

তাই ময়নাচাঁদ নবজলধর চক্কোত্তিকে আসরে বসিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

গাঁয়ের পাঁচজনও তাঁকে দেখে ভালো হয়ে নড়ে-চড়ে বসল আসরে। অহলে আর ঘ্যাঁট বাদ যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এইবার নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা শোনা যাবে।

ময়নাচাঁদ কিন্তু আসরে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করল না। তার মনে মনে বাসনা রয়েছে—যাত্রাদলের লোকেরা কেমন সাজে তাই সাজঘরে গিয়ে দেখতে হবে। সুযোগ যখন এসেছে—তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

চাকরদের শোবার লম্বা ঘরটা আজ সাজঘরে পরিণত হয়েছে। সেখানে ফাল্গুনের আদেশে পাহারা দিচ্ছে তারই জানা চাকরটা। সুতরাং আর দশজন গাঁয়ের ছেলেকে যেমন ভীড় করতে বারণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন বোধে হাঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে—ময়নাচাঁদের ভাগ্যে তা জুটলো না। সে নির্বিবাদে সাজঘরে গিয়ে ঢোকবার সুযোগ পেলে।

লম্বা লম্বা দড়ি টানিয়ে সাজঘরে নানারকম পোষাক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর রাখা হয়েছে নানাধরণের দাড়ি আর চুল। কোঁকড়া চুল, বাবরি চুল, সন্ন্যাসীর চুল, কাঁচাপাকা চুল, যোগিনী চুল, টাকমাথা চুল, টিকিওলা চুল, চুলেরই কতরকম বাহার ! সাজেরই কি কিছু কমতি আছে ? রাজার পোষাক, মন্ত্রীর পোষাক, সেনাপতির পোষাক, রাণীর পোষাক, সখির পোষাক; রাধাকৃষ্ণের পোষাক ; নারদের পোষাক ; সন্ন্যাসীর পোষাক ; ঘেষেরা-ঘেষেরাণীর সাজ, রাখাল বালকের সাজ, দেবতাদের পোষাক, দৈত্যদের সাজ, বিবেকের সাজ, সুমতি কুমতির সাজ·····কত নাম করা যায় ? ময়নাচাঁদ যেন বাঁশবনে ডোমকানা হয়ে রইল ! কি পালা হবে—সে কথা জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

কেউ বলে, নহুষ উদ্ধার, কেউ বলে, সীতার বনবাস, কেউ বলে, নল দময়ন্তী আবার কেউ বা বলে 'কংসবধ'! যাই হোক হবেই একটা কিছু! যারা রাণী বা সখি সাজবে — পরামাণিক তাদের দাড়ি — গোঁফ উল্টো চাঁছ দিয়ে খুব জোরালো করে কামিয়ে দিচ্ছে। তবু সেই কালো গোঁফের রেখা কি ঢাকা যায় ? সাদা চক ঘষছে ক্রমাগত মুখে। বেশীক্ষণ দেখলে সত্যি হাসি পায়।

ময়নাচাঁদ ভাবলে, এর চাইতে আসরে গিয়ে আগে ভাগে স্থান সংগ্রহ করে রাখা ভালো। নইলে ভালো জায়গার অভাবেই যাত্রা শোনা যাবে না।

কি একটা কথা মনে হতে —ময়নাচাঁদ থমকে দাঁড়ালো। সে লোকটা—বাল্মীকি কিম্বা নারদের পোষাক পরছিল তাকে গিয়ে বললে, দেখুন মশাই পালা আপনারা যাই করুন না কেন—হনুমানের লাফঝাঁপ আর তরোয়ালের যুদ্ধ অবশ্য রাখবেন, এই দুটি থাকলেই যাত্রা খুব জমে যাবে। খুব একটা জরুরী কাজ

শেষ করেছে মনে ভেবে, ময়নাচাঁদ বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করা জায়গায় ঠেলেঠুলে ঢুকে বন্ধুদের মধ্যে বসে পড়ল। যে সব বন্ধুবান্ধব ওর জায়গা রেখেছে তাদের কাছে পানের খিলি এগিয়ে দিয়ে বললে, নে খা!

অবশেষে যাত্রা শুরু হল—"নল দময়ন্তরীর পালা।

প্রথমে সুন্দরী সখিদের নাচ, দময়ন্তীর গান হংসদূতের আগমন, দেবতাদের ঈর্ষা····বেশ জমে উঠল। নল দময়ন্তীর বিয়ে পর্য্যন্ত একেবারে যাকে বলে জমজমাট। কিন্তু নলরাজার রাজ্য হারানোর পর থেকে লোকে এমন হু-হু শব্দে কাঁদতে সুরু করল যে, প্রত্যেকের কাঁধের চাদর ভিজে গেল····শতরঞ্চিও ভিজে ওঠে এই অবস্থা! একে ত' সবাই চৌধুরীবাড়ির নেমন্তন্নে না গিয়ে ক্ষিদেয় হাঁফাচ্ছে, তার ওপর ক্রমাগত কাঁদতে কাঁদতে অনেকেই আসরের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল। একঘেয়ে কান্না শুনে শুনে ছেলের দল ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েদের চোখের জলে পায়ের আলতা অবধি ধুয়ে গেল।

সবাই যদি কাঁদে তবে যাত্রা শুনবে কে? গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুন ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত মরাকান্না কাঁদলে চলবে কেন?

ময়নাচাঁদ তাকিয়ে দেখে, নবজলধর চক্কোত্তি তার চাদরটাকে ভালো করে নিঙড়ে নতুনভাবে চোখের জল মোছবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

ফাল্গুন দেখলে সব হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে। আসর ভেঙে যদি লোকেরা উঠে পড়ে, তবে চৌধুরীবাড়ির পাইকের দল আবার তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভোজনের আসরে বসিয়ে দেবে। তবে ত' সবই মাটি। গাঙ্গুলীবাড়ির এত কলা-কৌশল অর্থব্যয়, যাত্রাদল নিয়ে আসা সব ভস্মে ঘি ঢালার মতো হয়ে যাবে।

না—না, এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। দর্শকদলকে যে কোনো উপায়ে হোক চাঙ্গা করে তুলতে হবে। সে হনুমানের লাফ দিয়েই হোক, ঘেসেরা-ঘেসোরাণীর নাচ দিয়েই হোক্—আর বিদূষকের ভাঁড়ামো দিয়েই হোক।

ফাল্গুন উঠে তাড়াতাড়ি সাজঘরের দিকে চলে গেল। যাত্রাদলের অধিকারী তার বিরাট গোঁফজোড়া নাচাতে নাচাতে এসে বললে, আজ্ঞে জমিদারবাবু, কেমন দেখছেন?

ফাল্গুন একটু রাগ করে জবাব দিলে, দেখুন জমিদার আমি নই, আমার বাবা। কিন্তু যে জন্য আপনাদের ডেকে আনা হয়েছে—তার সবই যে মাটি হয়ে যাচ্ছে।

—কেন কেন? আপনি দেখেছেন ত' দর্শকদল কেমন হাপুস নয়নে কাঁদছে। একেবারে যাকে বলে সবাই অভিভূত হয়ে পড়েছে।—হাত কচলাতে কচলাতে যাত্রা দলের অধিকারী জবাব দেয়। ফাল্গুন ভ্রূকুঁচকে বলেকিন্তু এত বেশী অভিভূত হলে ত' আমার চলবে না। আমি চাই এমন যাত্রা, যাতে লোকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে! কেউ আসর ছেড়ে চলে না যায়। ছেলের দল চোখ বড় বড় করে যেন কথাগুলো গিলতে থাকে। গাঁয়ের বুড়োরা যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে। ····তারা নস্যি নেবার

কথাও বেমালুম ভুলে বসে থাকে। পারেন এমন কিছু দেখাতে?

যাত্রাদলের অধিকারী সবিনয়ে উত্তর করে, কিন্তু নলের রাজ্যলাভটা আগে হোক। এইবার দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সভা ডাকা হবে—

—চুলোয় যাক্ আপনার দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সভা! আসরই যদি ঝিমিয়ে পড়ল, লোকই যদি উঠে পালিয়ে গেল, তবে স্বয়ম্বর সভা দিয়ে আমি কি করব মশাই? তার চাইতে এক কাজ করুন—

আপনমনে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলে ফাল্গুন। তারপর মনের উল্লাসে নিজের কপালে একটা টোকা মেরে বললে, হ্যাঁ, হয়েছে। একটা নক্সা বা প্রহসন করুন। এক জমিদারের ছেলে বাজার থেকে প্রকাণ্ড এক চিতোল মাছ জোর করে এনে খেয়েছে। কিন্তু সেই চিতোল মাছ কিছুতেই আর হজম হচ্ছে না। পেট ফুলে জয়ঢাক। ডাক্তার, বৈদ্যি, হাকিম, তাবিজ, কবচ —না, কিছুতেই না। পেট শেষকালে ফেটে যায় আর কী! লাগান এখানে একটা ঘেসেরা-ঘেসোরাণীর নাচ! একজন দু'জন মোসাহেব থাকবে—যাত্রা আপনিই জমে উঠবে। নল দময়ন্তী আগে বন্ধ করে দিন। লোকের কান্নায় আসরের শতরঞ্চি অবধি ভিজে উঠেছে।

যাত্রাদলের অধিকারী নিরুপায় হয়ে শুধোলে, আজ্ঞে নল দময়ন্তী আর্দ্ধেক হয়ে থাকবে?—লোকে বলবে কি?

ফাল্গুন চটেমটে উত্তর দিলে, আরে মশাই লোকে কিছু মনে করবে না। বরং এখনই মনে করছে। হয়ত আসর খালিই হয়ে গেল। আপনি তাড়াতাড়ি ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে দিন যে, আগে একটা প্রহসন হবে—তার নাম "জমিদার নন্দনের মৎস্য ভক্ষণ"।

এই কথা বলে ফাল্গু[illegible] লম্বা লম্বা পা ফেলে সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যাত্রা দলের অধিকারীর আর উপায় কি? নিজের পাঁঠা যদি নিজেই ল্যাজ কাটে ত' বলবার কিছু থাকে না। তাছাড়া এই জমিদার বাড়িগুলি এত খামখেয়ালী হয় যে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াই ঝকমারী।

তখন অধিকারীর আদেশে দময়ন্তী আগেকার পোষাক ছেড়ে জেলে জেলেনীর সাজ নিয়ে আসরে গিয়ে গান ধরল—

শুন শুন বিবরণ
জমিদার নন্দন—
খায় এক বিশালচিতোল!
তার পরে হাঁস ফাঁস
বাঁচবার নাহি আশ—
পেট ফুলে জয়ঢাক
বল হরিবোল!

সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল মুছে দর্শকদল ভালো হয়ে বসে, ভাঙা আসর দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে যায়। যারা ঘুমন্ত ছেলেদের কোলে তুলে নিয়েছিল, সেইসব মা-জননীরা মুখে পান দিয়ে আবার চিকের আড়ালে বসে পড়ে, পাড়ার মাতব্বরের দল কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে নাকে ভালো করে নস্যি গুঁজে তন্ময় হয়ে ওঠে।

জমে উঠে জমিদার নন্দনের মৎস্য ভক্ষণের পালা। হাসি, হল্লা, টিটকিরিতে আসর জমজমাট।

জেলেনীর নাচ-গান, মোসাহেবের রসিকতা, পণ্ডিতের শ্লোক, কবিরাজের ধমক, জমিদার নন্দনের কাতরানী শুনে দর্শকবৃন্দ হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এতক্ষণ চোখের জলে আসর ভিজে গিয়েছিল, এইবার হাসির হল্লায় সবাই চাদর শুকিয়ে নিতে লাগ্‌ল।

চৌধুরীবাড়ির লোকেরা আসরের আশেপাশে আনাগোনা করছিল। তারা যখন দেখলে যে, তাদের বাড়ি নিয়েই ঠাট্টা তামাসা, মস্করা চলছে—তখন সবাই মরিয়া হয়ে গেল।

কে কি ইসারা করলে ঠিক বোঝা গেল না। চৌধুরীবাড়ির পাইকরা টিকেতে আগুন ধরিয়ে সামিয়ানার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আঁধারে গা ঢাকা দিলে। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। লোকজন প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে পালাতে লাগ্‌ল। চিকের আড়াল থেকে মরা-কান্না সুরু হয়ে গেল। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন খুলে পড়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দে গুড়িয়ে গেল। একেবারে যাকে বলে পাল-চাপা-পড়া যাত্রার আসর। কত লোকের যে ঠ্যাং ভাঙ্‌ল, কত লোকের গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগ্‌ল, কত লোক সামিয়ানা চাপা পড়ে প্রাণের ভয়ে চীৎকার করতে লাগলো তার আর ইয়ত্তা নেই। ওরই মধ্যে এক রসিক দর্শক চীৎকার করে উঠ্‌লো—

"যত হাসি তত কান্না
বলে গেছে রাম শর্মা"

।। পাঁচ ।।

খুব যদি সাঙ্ঘাতিক একটা ঝড় হয় কিম্বা ভীষণ শব্দ করে একটা বাজ পড়ে তবে সেই অঞ্চলটা কিছুদিনের জন্য একেবারে চুপচাপ থাকে, থমথম করে আকাশ আর মাটি।

জল-বিছুটি গাঁয়ের অবস্থাও এখন সেইরকম।

গাঙ্গুলীবাড়ির সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির ঝগড়া যেভাবে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল—যাত্রাগানের দক্ষযজ্ঞের পর যেন একটা সাময়িক বিরতি দেখা গেল।

আবার কোন্ পক্ষ কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ করবে, সারা গাঁয়ের লোক

সেই কথা নানাভাবে আলোচনা করছিল। কিন্তু কোন আলোচনাই প্রকাশ্যে নয়। গাঁয়ের এপাশে-ওপাশে, বাড়ির আনাচে-কানাচে, বৈঠকখানায় ফিস্-ফিস্ আলাপের সঙ্গে ফস্ফস্ তামাক টানার শব্দে।

এই অবকাশে এক দল প্রবীণ লোক ছাতা বগলে করে দিনের বেলা এক বাড়ি, রাত্তিরের অন্ধকারে আর এক বাড়ির বৈঠকখানায় হাজির হচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খুব জোরদার, যদি কোনরকমে চৌধুরীদের সঙ্গে গাঙ্গুলীদের মামলা-মোকদ্দমা বাঁধিয়ে দেওয়া যায়, তবে উকিল-মোক্তারের যোগ-সাজসে বেশ দু'পয়সা ঘরে আসতে পারে।

পল্লীগ্রামের নিষ্কর্মা মাতব্বরের দল এই সময়টায় বিশেষ উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

উপদেশ দিয়ে মানুষর উপকার—সেটুকু আর তারা করবে না? তাদের বাপ-ঠাকুর্দা চিরকাল এই কাজ করে গেছেন এবং সেই উপদেশ মতো নির্দিষ্টে পথে চলে কত বাড়িতে যে ঘুঘু চরেছে, কত সংসার ভেসে গেছে, কত পরিবারের হাঁড়ি চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে, হিসাব করলে তার হদিশ মেলা শক্ত!

জল-বিছুটি গাঁয়ের লোকেরা তাই ভাবছিল খুব শিগ্গীর একটা মামলা-মোকদ্দমা সুরু হয়ে যাচ্ছে এই গাঁয়ে।

কিন্তু যারা দিন গুনছিল, যারা ফিস্ফিস্ করে কথা বলছিল, যারা বৈঠকখানা গরম করে রেখেছিল এবং যাদের দল রাতারাতি ছুটোছুটি সুরু করে দিয়েছিল তাদের সবাইকে হতাশ করে দিয়ে এগিয়ে এলো পূজোর দিন।

পূজোর কথা মনে হতেই বাংলাদেশের গাঁয়ের লোকেরা আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে সুরু করে দেয়।

খুব সকালবেলা যেন একটা মিঠে সুরের বাঁশি কানে শোনা যায়। সোনালী রোদ বাড়ির উঠোনে, গাছের পাতায়, ফুলের বাগানে, পুকুরের জলে, শিশির ভেজা ঘাসের ওপর যেন সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়। নীল আকাশে পাতলা পেঁজা তুলোর মতো হালকা মেঘ খেয়াল-খুশীতে আনমনা সমীরণে ভেসে বেড়াতে থাকে। খাল-বিলগুলিতে শাপলা আর পদ্মের মাতামাতি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়; কোথায় কোন গাছের ফাঁকে নাম-না-জানা পাখী যখন ডাকতে থাকে, তখন কি অমিল আর ঝগড়ার কথা মনে আসে? আপনা থেকেই মনে জাগে মিতালীর কথা, সবাই মিলে আনন্দ করার কথা, অচেনা বনে পথ হারিয়ে যাবার কথা।

কিন্তু জল-বিছুটি গাঁ ক্ষণিক ঝগড়ার কথা ভুললেও—অনেকক্ষণ ভুলে থাকতে পারে না। ওদের রক্তে রয়েছে অমিল!

এই দুর্গা পূজোর কথা থেকেই সুরু হল বিদ্বেষ! কেমন করে সেই কথাই আজ বলি ঃ

ময়নাচাঁদ সেদিন ফাল্গুনের ঘরে বসে আসর জমিয়েছে। কিভাবে গাঁয়ের লোকদের চৌধুরীবাড়ির ভোজ থেকে বঞ্চিত করে গাঙ্গুলীবাড়ির যাত্রাগানের আসরে ভুলিয়ে এনেছিল, তারই মজাদার কাহিনী রসালো করে বলছিল। শেষকালে সে টিপ্পনী কেটে বললে "ভোজের জন্যে চৌধুরীবাড়ি যে মাছ, মাংস আর ক্ষীরের আয়োজন করে ছিল — সব গরমে পচে গিয়েছিল। বাড়ির লোক কত খেতে পারে বল?"

ফাল্গুন তার গাবে উত্তর করলে, 'কিন্তু ময়নাচাঁদ, তোর সেদিনের ব্যাপারে যতই বাহাদুরী দি.ত চাস — জিৎটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদেরই হয়েছে।'

ময়নাচাঁদ যে. একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।

—"ওদের আবার জিৎ হল কি করে শুনি?"

ফাল্গুন টিপ্পনী কাটলে, 'জিৎ হল না'? এমন জমজমাট যাত্রাগানের আসরটা ভেঙে দিলে, সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দিলে, অমন দামী ঝাড়-লণ্ঠনগুলো গুড়িয়ে গেল....ভাগ্যিস কারো মাথা ফাটেনি। তাহলে ত' আবার থানায় ছুটোছুটি করতে হত!'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফাল্গুন আবার বললে, এতগুলি লোককে তিড়িংলাফ করালে — আর তোর বলছিস ওদের জিৎ হয়নি? এর চাইতে হার কিসে হয় তা ত' আমার জানা নেই।

ময়নাচাঁদ মুচকি হেসে উত্তর করলে, এক মাঘেই ত' শীত পালায় না, আমার মাথায় এক্ষুণি একটা ভালো বুদ্ধি এসেছে।

উদাসভাবে ফাল্গুন বললে, তোর বুদ্ধি ত' তবেই হয়েছে! ময়নাচাঁদের বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে গেলে — গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে হবে না!

আ-হা-হা! শোনোই না আমার মগজের কলটা কেমন করছে!

ময়নাচাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় পোকাগুলি সব একসঙ্গে কিলবিলিয়ে ওঠে।

কড়িকাঠের দিকে চোখদুটো আটকে তাচ্ছিল্যের স্বরে ফাল্গুন জবাব দিলে, আচ্ছা, বলো তোমার মগজের বুদ্ধির ঢেঁকির কাহিনী।

ময়নচাঁদ ভালো হয়ে উঠে বললে, 'কথাটি খুব গোপনে রাখবে। ফাঁস হয়ে গেলেই চালটা একেবারে বাতিল হয়ে যাবে।'

ফাল্গুন এইবার চটে উঠে বললে, তুই শুধু ভনিতা করবি না আসল কথাটা ভাঙবি?

তখন ময়নাচাঁদ আস্তে আস্তে কথাটা ভাঙে। পেটুক মানুষ যেমন নেমন্তন্নবাড়ি খুব ভালো খাবার একটু একটু করে চেখে চেখে খায় — পাছে সেটা ফুরিয়ে যায়। বলবার ঠিক সেই রকম তার ঢঙ।

চৌধুরীবাড়ির চিরকালের গর্ব যে, ওদের দুর্গাপ্রতিমা গ্রামের সব চাইতে উঁচু।

এখন ধরো, তোমরা যদি কাউকে কিছু না জানিয়ে, খুব গোপনে চৌধুরীবাড়ির প্রতিমার চাইতেও গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা আধ হাত বড়ো করে গড়ে তোলো, তা হলে চৌধুরীবাড়ির থোঁতা মুখ একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে, — ওরা আর গাঁয়ের লোকেদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

ফাল্গুনের কথাটা খুব মনে লাগলো। এইবার সে ভালোভাবে নড়ে-চড়ে বসলো আর কড়িকাঠ থেকে চোখ দুটো নামিয়ে সার্চ লাইটের মতো ময়নাচাঁদের দিকে চোখ ফেরালে।

— হ্যাঁ জব্দ করবার মতো একটা কথা বলেছিস বটে। তোকে আমি সত্যি ভরপেট্ মিষ্টি খাওয়াবো। ডাক এক্ষুণি কুমোর ব্যাটাকে —

ময়নাচাঁদ তার ঠোঁট দুটোর ওপর তর্জনীটি বসিয়ে ফিস্ ফিস্ গলায় বলে --- হি-স-স্! দেওয়ালেরও কান আছে! এমন হাঁকডাক দিয়ে কাজ করতে গেলে সব ভেস্তে যাবে!'

— ঠিক! ঠিক! অতি খাঁটি কথা বলেছিস তুই! মাথা নেড়ে মন্তব্য করলে জমিদার-নন্দন-ফাল্গুন।

— জব্দ যদি করতে হয় তবে ধূর্ত শেয়ালের মতো চুপিসাড়ে পা টিপে টিপে আমাদের এগুতে হবে — যেন কাকপক্ষীতেও না টের পায়!

এই প্রস্তাবটি সত্যি ফাল্গুনের খুব মনে ধরেছে। যাত্রাগানের আসরের পরাজয়ের কথাটা সর্বক্ষণ তার মনে ছুঁচের মতো বিঁধছে।

চিৎকার করে হাঁকডাক দিয়ে নয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে ফাল্গুনকে কাজ করতে হবে। যদি শেষ রক্ষা করতে পারে, তবে গাঁয়ের লোকের কাছে চৌধুরীরা যে অপদস্থ হবে সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশই থাকবে না।

সেইদিনই একটু বেশী রাত্তিরে ময়নাচাঁদ গাঁয়ের কুমোরপাড়াতে গিয়ে হাজির হল।

এরই মধ্যে কুমোরপাড়ায় সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। নানারকম প্রতিমার কাঠামো তৈরী হয়েছে। খড় দিয়ে প্রতিমা তৈরীর কাজেও লেগে গেছে অনেকে দলবদ্ধ ভাবে। সিংহ আর অসুরের ক্যারামতিটা কতভাবে দেখানো যেতে পারে, তাই নিয়ে আলোচনা চলছে কুমোরদের মধ্যে। কুমোরপাড়ার ছোট ছেলেরাও এ বিষয়ে খুব ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। কেউ বলছে সিংহ লাফিয়ে উঠবে — একেবারে অসুরের বুক কামড়ে ধরবে।'

আর একজন ঠাট্টা করে বলছে, দূর বোকা! সিংহ কি করে অসুরের বুকে কামড়ে ধরবে? সেখানে ত' মা দুর্গার ত্রিশূল এসে বিঁধবে! কামড়াতে যদি হয় --- তবে অসুরের হাতে কিম্বা পায়ে।

আর একজন জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, অসুরটা যদি সিংহকে দু'হাতে দিয়ে

জাপটে ধরে তা হলে কি রকম হয়? মা-দুর্গার একটু বিপদ হোক না? তা হলে যুদ্ধটা জমবে ভালো। সব সময়ই অসুর ব্যাটা চারদিক থেকে মার খাবে এটা কি ভালো দেখায়?

একদল ছেলে-ছোক্‌রা কুমোর খুব সায় দিলে তাতে। কেউ কেউ বললে, মা দুর্গা যখন অসুরের কাঁধে পা চাপিয়ে দেবে তখন আর বাছাধনকে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না। সিংহ হচ্ছে পশুরাজ — তার সঙ্গে অসুর বেটা কখনো এঁটে উঠতে পারে?

গল্প চলছে মুখে — আর হাতে কুমোরের দল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

এমনি সময় ময়নাচাঁদ গিয়ে হাজির হলো সেখানে। কুমোরপাড়ায় যে মোড়ল —গাঁয়ের সেরা প্রতিমা তৈরী করবার ভার তার ওপরে। বংশানুক্রমে তারা এই কাজ করে চলেছে সেই হিসেবে বর্তমান মোড়ল কৈলাশচন্দর দুই জমিদার — চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা তৈরী করে থাকে। মুন্সিয়ানা আছে এই প্রতিমা তৈরীর কাজে। কৈলাশচন্দর খুব ভালো করে জানে যে, এই দুই জমিদার বাড়ির প্রতিমা দেখ্‌তে সাত গাঁয়ের লোক ঝুঁকে পড়বে।

কোনো রকমে কুমোরের যদি নাম খারাপ হয়ে যায় আর লোকেরা যদি দেখে বলে, কৈলাশচন্দর এবার ভালো প্রতিমা তৈরী করতে পারে নি, তাহলে লজ্জা রাখবার আর ঠাঁই থাকবেনা! শুধু তাই নয়, জমিদার বাড়ির কাজ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আবার কখনো এর উল্টো ব্যাপারও দেখা গেছে। যদি লোকের মুখে মুখে রটে গেল যে, চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা অন্যান্য বছরের তুলনায় আরো ভালো হয়েছে, তাহলে জমিদার কুমোরদের মজুরী ছাড়াও বিশ, পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বক্‌শিস্ দেন।

সেইটেই প্রতি বছর আশা করে কৈলাশচন্দর। সেইজন্যে রাত জেগে সে গাঙ্গুলীবাড়ি আর চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা তৈরী করে।

সে যখন শুনলো গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনবাবু তাকে এত্তেলা দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন — তখন সে মহা খুশী হয়ে গেল। ভাবলে নিশ্চয়ই কোনো উপরি পাওনা আছে। তাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে, আচ্ছা বাবু চলুন, আপনার সঙ্গেই যাই।

ফাল্গুনের কাছে গিয়ে কিন্তু আসল কথা শুনে কৈলাশচন্দরের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল! চিরকাল চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা গাঁয়ের সব প্রতিমার চাইতে বড় হয় —একথা কাকপক্ষীতেও জানে। আজ সে কি করে তার অদল-বদল করে দেয়!

ফাল্গুন তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ওকে খুশী করবার জন্যে বললে, আরে কৈলাশচন্দর, প্রতিমা তৈরীর ব্যাপারে তোমার কত নামডাক! সেই দূর-শহরের

লোক পর্যন্ত তোমার হাতের কারুকার্য্যের কথা শুনেছে । আমার কলেজের বন্ধুরা আসছে তোমার হাতের তৈরী প্রতিমা দেখতে । চাই কি খুশী হলে তারা তোমায় অনেক বক্‌শিস্‌ করে যাবে। কিন্তু ওই একটি সর্তে । চৌধুরীদের বাড়ির প্রতিমা থেকে গাঙ্গুলীদের বাড়ির প্রতিমা এ বছর আধ হাত বড়ো হবে । কেমন রাজী ত' ?

নিজের প্রশংসা শুনলে কে-না খুশী হয় ! কৈলাশচন্দরের মনটা নরম হল ।

ফাল্গুন বুঝলে, এই সুযোগ । Strike the iron while it is hot !

ওর হাতে পাঁচটি দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ফাল্গুন বললে, তোমার মজুরী নয়। আমি খুশী হয়ে আগাম তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছি—না বললে কিছুতেই শুনবো না। লোভে পড়ে কৈলাশচন্দর টাকা নিয়ে বাড়ি চলে এলো । কিন্তু সে ভয়ানক অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলো । ধর্মভীরু লোক সে—চিরটাকাল সে দুই জমিদার বাড়িরই নিমক খেয়ে আসছে । প্রত্যেক বাড়িরই একটা কুলপ্রথা থাকে । সেটা সে কী করে উল্টে দেবে ?

কৈলাশচন্দর খেতে পারে না, শুতে পারে না, ঘুমতে পারে না···আপনমনে কিভাবে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে । কৈলাশচন্দরের বৌ ক'দিন লক্ষ্য করে বললে, তোমার কি কাণ্ড বলতো ? সামনে পূজো···এখনো তোমার কাজে মন নেই···এত প্রতিমা তুমি শেষ করবে কি করে ? দাওয়ায় বসে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেই কি মা দুর্গা হেঁটে এসে কাঠামোর ওপর দাঁড়াবেন ?

কৈলাশচন্দরের মনের ওপর যে বোঝা চেপে আছে সেটার কথা প্রাণ খুলে কাউকে বলা চলে না। নিজের বৌকেও নয় ।

কি জানি যদি কথাটা ফাঁস হয়ে যায়, তবে প্রাণ নিয়ে টানাটানি আর কি ।

কাজেই সে বোকার মতো কেবলি তাকিয়ে থাকে, আর ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ে ।

কিন্তু ফাল্গুনবাবু তাকে আগাম পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে রেখেছেন । একরকম রাজীই হয়ে এসেছে, সে কথারই বা খেলাপ কি করে করে ?

শেষকালে একদিন গভীর রাতে দুর্গার নাম স্মরণ করে সে গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা বড় করে তৈরী সুরু করে দিল।

কিন্তু কি বিধাতার খেলা—সেইদিনই শেষরাত্তিরে সুরু হল—কৈলাশচন্দরের একমাত্র ছেলের ভেদ-বমি ! ছেলে যেন দুবার বমি করেই একেবারে নেতিয়ে পড়লো ।

কৈলাশচন্দরের কেবলি মনে হতে লাগল—সে একটা ভীষণ পাপ করেছে। টাকা খেয়ে চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা ছোট করে—গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা যে বড়

করে তৈরী করার কাজ সুরু করেছে তাতেই মা দুর্গা তার ওপর রুষ্ট হয়ে এইরকম বিপদে তাকে ফেলেছেন ।

সে একবার রুগ্ন ছেলের কাছে ছুটে যায়···আর একবার বাইরে প্রতিমার কাছে এসে—হাঁটু গেড়ে বলে, হে মা দুর্গা, আমার একমাত্র বংশধরকে তুমি ত' বাঁচিয়ে দাও ।

কৈলাশচন্দরের বৌ তাকে এইরকম ছুটোছুটি করতে দেখে কাছে এসে শুধোলে, কি ব্যাপার হয়েছে বলতো ? নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছ ! সব আমাকে খুলে বলো, আমি বুঝতে পারছি—আমাদের সংসারে কোনো পাপ ঢুকেছে—নইলে বাছা আমার এমন করে নেতিয়ে পড়বে কেন ?

কৈলাশচন্দর তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, বৌয়ের কাছে নিজের লোভের কথা সব কিছু খুলে বললে ।

কুমোর-বৌ খানিকক্ষণ স্তব্দ হয়ে বসে রইল । তারপর বললে, তুমি সামান্য টাকার লোভে ধর্মকে ভুলতে বসেছিলে ? সেইজন্যই আমার একমাত্র শিবরাত্তিরের সল্‌তে নিভতে বসেছে ! —আমি তোমার আর কোনো কথাই শুনবো না । বাছাকে যদি বাঁচাতে চাও তবে—এক্ষুণি গিয়ে তুমি গাঙ্গুলীবাড়ির টাকা ফেরত দিয়ে এসো ।

কৈলাশচন্দর ভয়ে ভয়ে বললে, কিন্তু ফাল্গুনবাবু যদি পাইক দিয়ে আমায় আট্‌কে রাখে ? আমায় মারধর করে ? তবে আমার কি উপায় হবে ?

কুমোর-বৌ তাকে সাহস দিয়ে বললে, তোমার কোনো ভয় নেই । মা দুর্গার নাম স্মরণ করে তুমি চলে যাও—। বললে আমি অধর্ম করতে পারবো না । অধর্ম করতে গিয়ে আমার ছেলের এই দশা হয়েছে । আপনারাও ত' ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন—আপনিও ভেবে দেখুন বাবু—

কৈলাশচন্দর লাফিয়ে উঠে বললে, তুমি ঠিক কথা বলেছ বৌ ! কিসের এত ভয় ? যাই আমি ওদের টাকা ফেরত দিয়ে আসি—

দ্রুতবেগে সে নোট পাঁচটি নিয়ে বেরিয়ে গেল ।

কুমোর-বৌ মা দুর্গার নামে একটি সিকি মাথায় ঠেকিয়ে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখল । মনে মনে বললে, বাছা আমার ভালো হয়ে উঠলে হরিলুট দেবো ।

এই সময় ছেলের মুখে অনেকক্ষণ বাদে কথা ফুটলো । ক্ষীণকণ্ঠে বললে, আমায় একটু জল দাও না মা—

।। ছয় ।।

গাঙ্গুলীদের বাড়ির ফাল্গুনের মনে খুব আশা ছিল যে শ্রীদুর্গার মূর্ত্তি তৈরীর

ব্যাপারে চৌধুরীবাড়িকে আচ্ছা করে জব্দ করে দেবে। ওরা যখন শেষ মুহূর্তে জানতে পারবে যে গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা আধহাত বড় হয়ে গেছে, তখন রাতারতি সংশোধনের আর কোনো উপায়ই থাকবে না। কালো হয়ে যাবে চৌধুরীমশায়ের মুখ।

গাঁয়ে কুমোর কৈলাশচন্দর তার সব প্ল্যান মাটি করে দিলে! এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না। বহু টাকার প্রলোভন সে দেখিয়ে ছিল কৈলাশচন্দরকে। কিন্তু ব্যাটা শুধু চোখের জল ফেলে আর বলে, বাবু, ছেলের প্রাণের চাইতে ত' টাকা আমার কাছে বড় নয়। ছেলেপুলে নিয়ে আপনারও ত' বিরাট সংসার বাবু...আমায় ও আদেশ করবেন না।

লোকটা কেবলি চোখের জল ফেলে সব মাটি করে দিলে। নইলে ফাল্গুনের সর্বশরীর রাগে কাঁপছিল। ইচ্ছে হয়েছিল—চাপকে কৈলাশচন্দরকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কিন্তু কিছুই করা হল না ফাল্গুনের। ওই ছেলেপুলে নিয়ে বিরাট সংসারের উল্লেখ করতেই সে যেন কেমন বিপদে পড়ল।

লোকটা নির্বিবাদে পঞ্চাশ টাকার নোট ওর পায়ের কাছে রেখে দিব্বি বাড়ি ফিরে গেল। সে তার এতটুকু অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারলে না!

ফাল্গুনের একটা কিছু অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু কি যে সে করবে সেটা ঠাওর করে উঠতে পারছে না। কে জানে, হয়ত এতক্ষণ তার প্ল্যানের কথা ওই কৈলাশচন্দই চৌধুরীবাড়িতে জানিয়ে দিয়েছে, আর তারা সেই কথা শুনে কত হাসাহাসি করছে! কৈলাশচন্দরকেও হয়ত সেখানে অত চোখের জল ফেলতে হয়নি! বেশ মোটা বক্‌শিস্ নিয়ে সে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

যত এইসব কথা তার মগজে আনাগোনা করে তত বেশী সে মরিয়া হয়ে ওঠে!

নাঃ—এমন একটা কাণ্ড তাকে করতেই হবে—যাতে চৌধুরীবাড়ির লোকেরা বুঝতে পারে যে, পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুন বলে কেউ আছে।

দুই উপায়ে মানুষকে সচেতন করা চলে।

এক—মিত্রভাবে ভজনা করে, আর শত্রুভাবে তার সম্মুখীন হয়ে। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দুই দ্বারী ছিল, জয় আর বিজয়। তারা দুজনে কি একটা সাঙঘাতিক অপরাধ করে; ফলে তাদের ওপর অভিশাপ আসে যে মর্তলোকে গিয়ে বাস করতে হবে। বিষ্ণুর মিত্রভাবে থাকলে শত জন্ম পৃথিবীতে বাস করতে হবে। আর যদি শত্রুভাবে বাস করে তবে তিন জন্মেই তারা শাপমুক্ত হতে পারবে। জয় আর বিজয় শত্রুভাবেই বাস করতে চেয়েছিল। কেননা—বৈকুণ্ঠ আর বিষ্ণুর কাছ থেকে নির্বাসন তারা সহ্য করতে পারেনি। তাই তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে আসবার জন্য বরণ করে নিয়েছিল শত্রুভাবে ভজনা করবার তপস্যা।

কিন্তু আমাদের এই ঘোর কলিকালে ফাল্গুন আর চন্দনের মনে কি ছিল তারাই ভালো বলতে পারে। তবে ঘটনার পর ঘটনা যে ভাবে ঘটে যাচ্ছিল তাতে মনে হয় যে ওরা দুজন পরস্পরকে পরম ও চরম শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল। তবে একটি কথা হচ্ছে এই যে, ওদের আভিজাত্য আর শিক্ষা একেবারে সামনাসামনি মারামারি করতে দুজনকেই বাধা দিচ্ছিল।

ফলে উভয়েই উভয়কে কিভাবে জব্দ করতে পারে, রাতদিন কেবলি সেইসব ফন্দি-ফিকির আঁটছিল।

চৌধুরীবাড়ির চন্দনের মনটা স্বভাবতই খুব খুশী ছিল। কেননা— গাঙ্গুলীবাড়ির যাত্রায় বেশ দক্ষ-যজ্ঞের পালা গাওয়ানো হয়েছিল। যদিও ভোজের গুজবকে ভিত্তি করে অকারণে তাদের অনেক অপব্যয় হয়ে গিয়েছিল, তবু তারা প্রাণখোলা প্রতিশোধ নিতে পেরেছিল—যাত্রার সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

কাজেই গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের মনটা তুষের আগুনের মত জ্বলছিল। বাইরে চিৎকার করে, রাগ দেখিয়ে, —গালাগাল দিয়ে রাগ প্রকাশ করবার উপায় ছিল না।

মানুষের রাগ হলে যদি খুব খানিকটা চ্যাচামেচি করতে পারে, দশজনকে ডেকে ধমক দিতে পারে, কিম্বা বেশ কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে পায়— তবে সেই দারুণ রাগ কমে যায়।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের যে ক্রোধ, তা সে না পারছে গিলতে—না পারছে ফেলতে। ফলে সেই রাগটা বেলুনের মতো ফুলে বড়ো হয়ে উঠেছে— একেবারে ফেটে না যায় এই শুধু ভয়।

ছলে-বলে-কৌশলে যে করে হোক চন্দনকে গাঁয়ের লোকের কাছে খেলো করতে হবে—তাহলে যদি রাগটা একটু পড়ে।

গ্রামদেশের জমিদারের ছেলেরা যখন রাগে, তখন একদল লোক তাতে ইন্ধন জুগিয়ে আনন্দ পায়। ফাল্গুনের আশেপাশেও সেইরকম একদল ছেলে-ছোক্‌রা এসে ভীড় জমিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সব সময় ফাল্গুনকে তাতিয়ে রাখা। তাহলে তাবা ওর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারবে—সেই সঙ্গে সকাল-বিকেল থালাভর্তি খাবারও জুটবে।

ফাল্গুনের বন্ধুর দল তাকে এই বোঝালে, যে চৌধুরীবাড়ির সঙ্গে গাঙ্গুলীবাড়ির এই প্রতিযোগিতায় তাকে জয়ী হতেই হবে। নইলে সে সারা গাঁয়ে মুখ দেখাবে কি করে?

সেদিন সন্ধেবেলা গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের ঘরে ময়নাচাঁদ জুটেছে সকলের আগে।

তারপর একে একে এসে হাজির।—নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক, ঘুগনী।

এই যে সব অদ্ভুত নামগুলি—এর একটিও কিন্তু বাপমায়ের দেয়া নয়।

অতি ছেলেবেলা থেকে বন্ধুমহলে এই সব মজাদার নাম জুটে গেছে ওদের। হা-ডুডু খেলায় সুযোগ পেলেই সবাই লাথি মারত। সেইজন্য ছেলেটির বদনাম রটে 'লাথু' থেকে হয়েছে নাথু। এখন সমস্তটা গ্রাম ওকে নাথু বলেই জানে। তারপর নাথু আসল নাম যে কোথায় তলিয়ে গেছে সে হদিশ কেউ দিতে পারবে না। ওর বাবা-মাও বোধকরি সেজন্যে দুঃখিত নন। কেননা—তারাও এখন নিজেদের ছেলেকে 'নাথু' বলেই ডাকেন। ইস্কুলের পাকা খাতায় একটা নাম ছিল বটে—তবে সে নামটা যে কার সেটা বহু কষ্টে গবেষণা করে বের করতে হয়। কাজটা মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের মতই বিস্ময়কর।

হোঁৎকা অবশ্য তার চেহারার সঙ্গে কোনো মতেই বিশ্বাসঘাতকতা করে না। হা-ডুডু খেলার সময় যখন সে বিরুদ্ধ পক্ষে ডাক দিতে যায়—নিজের পক্ষের লোকেরা তখন সব সময়ই খরচের খাতায় নাম লিখে রাখে। বিরুদ্ধ পক্ষও ভালো করে জানে যে, এইবার এই বড় মোষ বলি হবে—সেইজন্য সবাইকার আর উল্লাসের পরিসীমা থাকে না।

ট্যাপা ছেলেটি ট্যাপা মাছের মতই দেখতে। তার কোন্ বালকবন্ধু এই নামকরণ করেছিল মনে নেই। তবে নামটি কিন্তু অমর হয়ে আছে বন্ধুর দান হিসেবে। কিন্তু ট্যাপা-টোপা হলে কি হবে?—গায়ে তার খুব শক্তি। কাজেই খেলার মাঠে সবাই তাকে রীতিমত ভয় করে চলে।

শামুক যার নাম—সে তার নামের অর্থকে সুন্দরভাবে সার্থক করে তুলেছে। ছেলেটি অতি কুঁড়ে, শুয়ে থাক্‌তে পারলে উঠে বস্‌তে চায় না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ভাত খেতে বসে সে দিব্যি ঢুলছে! তার মা এই বয়সেও তাকে টানাটানি করে বিছানায় ঠেলে নিয়ে শুইয়ে দেয়। কিন্তু শামুক কুঁড়ে হলে কি হবে? মগজ ভর্তি তার দুষ্টু বুদ্ধি কিল্‌বিল্ করছে! কথা সে খুব কম বলে। কিন্তু যখন মুখ খোলে—একেবারে মোক্ষক অস্ত্র ছাড়ে। সুতরাং পরামর্শ দেবার ব্যাপারে তার অনেকটা দাম আছে বৈকি!

আর ঘুগ্‌নী হচ্ছে শামুকের ঠিক উল্টো। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে দিব্যি চলে যায়। সব তাতেই অনর্গল কথা বলে চলে। তার ইচ্ছাটা, আর কেউ কথা না বলুক— সে একাই আসরটা জমিয়ে তুলুক। নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে মুখরোচক কথা পরিবেশন করতে পারে বলেই তার নাম দেয়া হয়েছে 'ঘুগ্‌নী'।

সন্ধ্যেবেলাকার গোপন পরামর্শ সভা বেশ জমে উঠলো। ময়নাচাঁদ, নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগ্‌নী।

ময়নাচাঁদ বললে, চন্দনকে জব্দ করবার একটা কৌশল আমি আবিষ্কার করেছি, কিন্তু এখন কিছুতেই ভাঙছি নে ; ঝোপবুঝে এমন কোপ দেব যে বাছাধন আর তাল সামলাতে পারবে না।

নাথু চোখ ঘুরিয়ে জবাব দিলে, ও সব কৌশল-টৌশলের ধার আমি ধারি নে। এমন এক লাথি মারবো যে স্বর্গের দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে ছাড়বো—

ফাল্গুন ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে, তোমাকে আর স্বর্গের দক্ষিণ দুয়ার দেখাতে হবে না। গোঁয়ার গোবিন্দের মতো এমন কাজ করে বসবে যে, আমাদের মুখ দেখানোই ভার হয়ে উঠবে ! তার চাইতে কৌশলেই কাজ হাসিল করতে হবে।

ট্যাপা সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়ন দিলে, তা যাই বলো বাপু, গায়ের জোর না থাকলে সবই যেন আলুনি বলে মনে হয়। কেমন যেন ঢিলেঢালা! এক্ষুণি হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে এমনি অবস্থা ! মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটো—জোর-জোর নিঃশ্বাস ছাড়ো—কোনো ব্যাটা কিচ্ছু করতে পারবে না।

ফাল্গুন কেবলি মাথা নাড়তে থাকে। প্রস্তাবটা তার আদৌ মনের মতো হয় না!

হোঁৎকা বললে, আচ্ছা, আমি একদিন আমার বাড়ি ওকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনি। তারপর তোরা সবাই হুড়মুড় করে আমাদের বাড়ি ঢুকে চন্দনকে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিবি। তখন বুঝবে ঠ্যালা কাকে বলে!

ময়নাচাঁদ হাসতে হাসতে উত্তর করলে, হ্যাঁ যেমন তোর নাম হোঁৎকা তেমনি উপযুক্ত প্রস্তাব হয়েছে। তুই আর আসরের মধ্যে কথা বলতে আসিস নি। তোর বাড়িতে চন্দন যদি মার খায় তবে চৌধুরীবাড়ির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে তোর ওপর। সেটা কি খুব স্বাস্থ্যকর হবে? একটু ভেবে দেখেছিস কিছু?

ময়নাচাঁদের রসিকতা শুনে হোঁৎকা সচেতন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটোও হয় বড় বড়!

—তাইত! তাইত! তাইত! ভাই, খুব আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিস ময়নাচাঁদ! এক্ষুণি আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি।

ময়নাচাঁদ বললে, তা হলে আমি তোর প্রাণরক্ষা করেছি। এক্ষুনি আমাকে গরম গরম রসগোল্লা দু'সের খাইয়ে দে।

হোঁৎকা বুঝলে, মানুষের প্রশংসা করেও নিস্তার নেই। তাই সে ডান হাতের তর্জনীটি ঠোঁটের ওপর চেপে চুপি-চুপি বললে, খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। আর আমি একটি কথাও কইছি নে!

ঘুগনী কি যেন একটা নতুন প্রস্তাব করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর পরামর্শের ওপর ফাল্গুনের খুব বেশী আস্থা ছিল না। তাই সে শামুকের গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, আচ্ছা, শামুক, তুই সারাক্ষণ এমন চুপচাপ বসে আছিস কেন? একটা যা-হোক পরামর্শ দে—

শামুক চোখ বুজে ঝিমুচ্ছিল কিনা—তাই বা কে বলবে? ফাল্গুনের কথায় বোধ করি তার হুঁস হল। সে অপার আলস্যে একবার প্রকাণ্ড একটা হাই তুললে ; তারপর ডান হাতটা মুখের কাছে নিয়ে গোটাকয়েক তুড়ি দিলে। এইবার বোধকরি তার চোখ মেলে তাকাবার ফুরসৎ হল! অর্ধ-নিমিলিত নয়নে সে শুধু কইলে, ও! তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইছ ? আমি এতক্ষণ ওদের বিদ্যের দৌড়টা দেখছিলাম। পরামর্শ আমি তোমায় দিতে পারি আর এমন পরামর্শ আমার বুদ্ধির ভাঁড়ে আছে যে চন্দন ত' চন্দন—ওই চৌধুরীবাড়ির সবাই হকচকিয়ে যাবে।

ফাল্গুন যেন বিরাট মরুভূমির মধ্যে এতক্ষণে একটা মরূদ্যান খুঁজে পেল, তৃষ্ণায় যার ছাতি ফেটে যাচ্ছে—এমন মনোরম আশ্রয় সে কখনো ছাড়তে পারে? তাই সে শামুকের কাছ ঘেঁষে বসে শুধোলে, হ্যাঁরে শামুক, তোর ক্ষিদে পেয়েছে? খানিকক্ষণ আগে খবর পেয়েছি—পায়েস রান্না হচ্ছে। খাবি তুই এক বাটি?

পায়েসের নামে হোঁৎকা একেবারে বেসামাল হয়ে উঠল! মুখ চটকে চোখ দুটো বড় বড় করে মন্তব্য করলে, গরম পায়েস খেতে কিন্তু ভারী মজা! তা আমরাও যখন রয়েছি—শুধু শুধু একা শামুকই বা খেতে যাবে কেন? তা ছাড়া ওর কি প্ল্যান তা আমরা ত' কিছুই শুনতে পারলাম না। সেটা কাজের নাও ত' হতে পারে।

মনে হল শামুক বেশ খানিকটা চটেছে। কিন্তু চটলেও বাইরে থেকে তা বোঝবার কোনো যো থাকে না। শুধু আর একবার চোখটা গোটাগুটি খুলে ফেলে বললে, তাহলে নেহাৎই আমার প্ল্যানটা তোরা শুনবি ? কিন্তু শুনে বুঝতে পারবি কিনা—তাই শুধু ভাবছি আমি—

ফাল্গুন জবাব দিলে, আচ্ছা বল না তুই। তারপর আমি আঁচ করতে পারব সেটা কাজের না অ-কাজের!

শামুক মহা আরামে আর একটি মাঝারি হাই তুলে নিলে, তারপর বললে, আচ্ছা তোরা ত' জানিস—চৌধুরীবাড়ির প্রথা হচ্ছে ধুমধাম করে দুর্গোৎসব করা। ওদের বাড়িতে কালী পূজোর নেমন্তন্ন কখনও খেয়েছিস?

শামুকের প্রশ্ন এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। কালীপূজোর সঙ্গে জব্দ করার কোন পন্থা লুকিয়ে আছে ?

আর একটু হলেই শামুক আবার চোখদুটো পরম আরামে বন্ধ করে ফেলেছিল আর কি!

কিন্তু সেই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিল ফাল্গুন। সে বললে, না-না চৌধুরীবাড়ির কুলপ্রথা নেই কালীপূজো করবার। বহুদিন আগে একবার নাকি চৌধুরীবাড়িতে

কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির কর্তা ভেদবমি হয়ে মারা যেতে ওরা চিরদিনের জন্যে কালীপূজো বন্ধ করে দিয়েছে।

শামুক ফাল্গুনের কথা শুনে মিটিমিটি হাসতে থাকে। তারপর কৌতুকের সুরে বলে, এখন ব্যাপারটা বুঝে দেখ। আসছে কাল অমাবস্যা—কালীপুজো। গাঁয়ের অনেক বাড়িতেই যথারীতি কালীপূজো হবে। কিন্তু চৌধুরীবাড়িতে তার কোনো আয়োজনই নেই। কারণ এ পূজো তারা করে না! এখন ধরো, রাত্তিরের অন্ধকারে কেউ যদি চৌধুরীবাড়ির দোরগোড়ায় একটি কালী-প্রতিমা রেখে আসে তাহলে কি কাণ্ড ঘটে ? প্রতিমা বাড়িতে এলে পূজো না করেও উপায় নেই.— অথচ কালীপূজো করলে চৌধুরীবাড়ির সমূহ বিপদ!

ময়নাচাঁদ এতক্ষণ চোখদুটো বড় বড় করে শামুকের পরামর্শ শুনছিল। এইবার তুড়ি মেরে বললে, ঠিক কথা ! এগুলেও বিপদ, পেছুলেও বিপদ।

ফাল্গুনও পরামর্শটাকে একেবারে লুফে নিলে। মুখরোচক মন্তব্য করে বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক! একেই বলে জলে কুমীর···ডাঙ্গায় বাঘ!

ঘুগ্‌নী এতক্ষণে একটা মন্তব্য করবার সুযোগ পেলে।

টেবিলের ওপর জোরালো একটা চাপড় মেরে বললে, ঠিক-ঠিক! এইবার ঠ্যালা সামলাক চৌধুরীবাড়ি!

সেইদিন গভীর রাত্রে ময়নাচাঁদ, নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগ্‌নীর দল অতি সন্তর্পণে একটি ছোট্ট নৌকা বেয়ে নিয়ে এলো চৌধুরীবাড়ির খিড়কীর পুকুরের কাছে। নৌকোতে রয়েছে একটি কালীমূর্তি।

পা টিপে টিপে তারা নৌকা থেকে নামলে, তারপর নৌকোটাকে ভালো করে একটি গাছের ডালেব সঙ্গে বেঁধে, সবাই মিলে ধরাধরি করে কালীমূর্তিটি নামিয়ে নিয়ে এলো খিড়কীর দরজার সামনে। প্রতিদিন ভোরবেলা চৌধুরী-গিন্নি এই দরজা খুলে খিড়কীর পুকুরে স্নান করতে আসেন।

পরদিন অমাবস্যার প্রভাতে দরজা খুলেই একটি কালীমূর্তি দেখে, চৌধুরী গিন্নীর মুখের অবস্থাটা কেমন হবে, সেকথা ভেবে মনে সবাই কৌতুক অনুভব করলে।

হোঁৎকা ফিস্‌ফিস করে বললে, তাড়াতাড়ি নৌকা খুলে দে ভাই। কখন কি বিপদ ঘটে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া চৌধুরীবাড়িতে একটা ডাল কুত্তা আছে শুনেছি।

ভয়ের কথাই বলতে হবে।

নিঃশব্দে গভীর অন্ধকারের মধ্যে ওদের নৌকা কোন পথে মিলিয়ে গেল কেউ তার হদিশ দিতে পারে না!

।। সাত ।।

ক'দিন ধরে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির লোকদের আস্ফালনে গাঁয়ে পথ চলা দায় হয়ে উঠল!

তাদেরই প্যাঁচে পড়ে নাকি পুবপাড়ার চৌধুরীরা কালীপুজো করতে বাধ্য হয়েছে।

কেমন জব্দ!

গ্রাম-দেশে এই জব্দ করবার জন্যে যে কত অভিনব পন্থা খুঁজে বের করা হয় তার আর লেখা-জোখা নেই।

সাম্‌না-সামনি মুখে কেউ স্বীকার করবে না যে, এই ফন্দি-ফিকির আমার,—তবে আড়ালে-আবড়ালে-পথে-ঘাটে বাহাদুরী নেবার অন্ত নেই!

হয়ত দেখা যাবে—ময়নাচাঁদ, নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগ্‌নীর দল একটা পুকুরের ধারে জমায়েৎ হয়ে বসেছে। হাতে আছে ছোট বড়শী—টপটপ পুটি-মাছ তুলছে আর জড় করে রাখ্‌ছে।

হাতে জরুরী কাজ চালাচ্ছে বলে মুখ তাদের আদপেই বন্ধ নেই।

মুখরোচক গল্প চলছে—কিভাবে তারা নিশুতি রাতের অন্ধকারে নৌকা করে কালী-প্রতিমা চৌধুরীবাড়ির খিড়কীর দরজার কাছে নামিয়ে রেখে এসেছিল। চৌধুরীবাড়ির কর্তা-গিন্নী ফলে মুখ চুণ করে কালীপুজো করতে পথ পায়নি!

একেই বলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

জব্দ যদি করতে হয়—ত' এমনি মজাদার প্যাঁচই মগজ থেকে বের করা চাই। চৌধুরীদের বাড়ির ওপর যাদের রাগ আছে তারা এই জাতীয় ঝাল-মশলা দেয়া মুখরোচক আলোচনায় যোগ দিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসে। আসল কথা হচ্ছে, বেশ খানিকটা জল-ঘোলা করে সময় কাটিয়ে দেয়া।

পাড়াগাঁয়ে ত' সিনেমা, ক্রিকেট, খেলা আর চায়ের দোকানের আড্ডা নেই—তাই যে কোনো উপায়ে হোক—কানকথা বলবার আর গলাবাজি করবার উপায় খুঁজে বের করে নিতে হয়। সেই একটি কথাকে কেন্দ্র করে দিব্যি একটা মাস কাটিয়ে দেয়া চলে! যতক্ষণ পর্যন্ত না আর একটি নতুন উপলক্ষ্য পাওয়া যায়—সবাই নলেন গুড়ের পাটালীর মতো সেই একটি বিষয়কেই চুষে-চুষে রস টেনে নেয়।

চৌধুরীবাড়ির লোকেদের ঘোল খাইয়ে গাঙ্গুলীবাড়ির লোকেরা তাদের শ্যামা পুজো করাতে বাধ্য করেছে, পল্লীঅঞ্চলে এটা সত্যি দামী কথা। তা নিয়ে গাঁয়ের বৌরা যদি ক'দিন কোন্দল না করল, ছেলেরা গুলতুনি না পাকালো তবে গাঙ্গুলীবাড়ির এই 'ক্যারদানী' যে একেবারে মাঠে মারা যায়।

পাঁচফোড়ন ছড়িয়ে দিতে লাগলো ছেলের দল। কাজেই সল্‌তে উস্‌কে দিলে যেমন নিবু-নিবু প্রদীপ আবার দপ্‌-দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে—তেমনি কিছুদিন আগে ঝিমিয়ে-পড়া গ্রাম আবার দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠল।

সত্যে আর মিথ্যেয় মিশিয়ে যখন চৌধুরীবাড়ির পিণ্ডি চটকাচ্ছে সবাই মিলে—তখন যদি হঠাৎ দেখা গেল যে, সেই চৌধুরীবাড়ির কোনো গোমস্তা এই পথ ধরে আসছে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ছেলেদের ভোল পাল্‌টে যায়।

কেননা আড়ালে মুখরোচক আলোচনায় কারো আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে সামনা-সামনি অপ্রিয় কথা বলে কেউ তাদের বিষ নজরে পড়তে চায় না! তাছাড়া আরও একটি গোপন কারণ আছে। চৌধুরীদের বাড়ি পালা-পার্বণ, বিয়ে, চুড়োতে ভোজটা দেয় ভালো ; তাদের কি বোকার মতো কটু কথা বলে চটাতে আছে ?

সেইজন্যে সঙ্গে সঙ্গে কথাবর্তার ঢঙ পাল্‌টে দিতে হয়। চৌধুরীদের গোমস্তা কাছা-কাছি এলেই তার কানে যায় ছেলেরা পুঁটি মাছ ধরতে ধরতে চৌধুরীবাড়ির ভোজের গুণকীর্তন সুরু করছে আর কেবলি মুখ চোটকাচ্ছে।

জলবিচ্ছুটি গাঁয়ে এইভাবে নল্‌চে আড়ালে দিয়ে তামাক খাওয়া চলে হরদম।

গাঁয়ের দু'টি পাড়ায় এত দলাদলি—আর এত মনান্তর যে কেউ কারো বাতাস সইতে পারে না।

কিন্তু তা সত্বেও মজা এই যে, পাঠাশালা কেবলমাত্র আছে ওই পশ্চিম-পাড়ায়। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে একটি চলতি আইন আছে আর একটি সর্বজন পরিচিত মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রটির কথা হচ্ছে :

"লিখিব, পড়িব মরিব দুখে
মৎস্য মারিব খাইব সুখে।"

সাধারণ গেরস্ত ঘর—যাদের গোলায় সারা বছরের ধান মজুদ থাকে সেই বাড়ির ছেলেরা অধিকাংশই ওপরের মন্ত্রটি বড়ো নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ি কিম্বা চৌধুরীবাড়ির ছেলেদের ত' সেই সোজা সড়কে পথ চললে চলে না। কাজেই বিদ্যে ভাল হোক বা হোক না হোক পাঠশালায় তাদের যেতেই হয়।

অনেকদিন থেকে জলবিছুটি গাঁয়ের পশ্চিমপাড়ারওই পাঠশালাটি আছে। গাঙ্গুলীদের ক'পুরুষ আগে কোন জমিদার যে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেকথা লোকে একরকম ভুলেই গেছে। যারই ছেলে পড়াবার দরকার হয়—দিব্যি চোখ বুজে সামন্ত পণ্ডিতের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। গ্রামের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে সামন্ত পণ্ডিত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করতে পারেন।

অনেক বয়েস সামন্ত পণ্ডিতের। পড়ানোর চাইতে ঢুলতে তিনি বেশী ভালোবাসেন। তারপর আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেলে বেতটা অবলীলাক্রমে সকলের পিঠেই পায়চারী করে বেড়াতে থাকে। কিন্তু বেড়াবার সময়ও সে বেত কিন্তু খুব সাবধানী। বড়লোকের বাড়ির ছেলেদের পিঠে সে কিছুতেই পড়ে না। কেন না সেখান থেকে পালাপার্বণে টাকাটা, সিকিটা, গাছের ফলটি, গরুর দুধটুকুন— পাবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে।

নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে কে খোঁড়া হতে চায়? চৌধুরীদের বাড়ির আর গাঙ্গুলীদের বাড়ির কয়েকটি ছেলে বরাবরই সামন্তমশায়ের পাঠশালায় পড়ে।

যখন তারা একটু সেয়ানা হয়ে ওঠে—আর অভিভাবকেরা মনে করেন যে, এখন ছেলেদের ইংরেজী লেখাপড়া ধরিয়ে দেয়া উচিত—তখুনই তাদের জিয়োনো কই মাছের মতো ওখান থেকে তুলে নিয়ে দু'খানা গ্রামের পর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়।

সামন্ত পণ্ডিতের এজন্য অনুতাপের অন্ত নেই। তিনি সব সময়ই গাঁয়ের লোকের কাছে কাঁদুনী গান—আমি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করি আর বড় ইস্কুল তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায়—ইংরেজী পড়াবে বলে! কিন্তু আমার কাছে থাকলে যে ছেলেটা নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি পেত সেদিক কারো হঁস নেই। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, না—না, এ একেবারে ঘোর কলিকাল, কারো উপকার এখানে করতে নেই। কষ্ট করে দুধ জ্বাল দিয়ে বাটিতে ঢেলে রাখবো—আর কেউ ওপর পড়া হয়ে এসে সরটুকু তুলে খেয়ে নেবে। একি সহ্য করা যায়?

সামন্ত পণ্ডিতের আদর আর শাসনে জলবিছুটি গাঁয়ের ছেলেরা শশীকলার মতো বাড়তে আর বিদ্যালাভ করতে থাকে। সেই পাঠশালার গণ্ডীতে চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়ির কুচো-কাচার দল হুল্লোড় করে নামতা পড়ে আর কড়াকিয়া মুখস্থ করে। বাড়ির দলাদলিটা ওরা ঠিকমতো বুঝতে পারে না! একসঙ্গে খেলাধূলা করে, দরকার হলে কোমর বেঁধে কুস্তিও লড়েছে, আবার সামান্য একটা পেন্সিল নিয়ে এমন ঝগড়ার সৃষ্টি যেন পৃথিবী একেবারে রসাতলে যায়।.....

একটি সুবিধে এই আছে যে, পাঠশালার মধ্যে যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, পাঠশালার গণ্ডীর মধ্যেই সেটা শেষ হয়ে যায়। কারো বাড়ি পর্যন্ত সেটা আর পৌঁছতে পারে না।

সামন্ত পণ্ডিত এ ব্যাপারে খুব সেয়ানা। তাকে শ্যাম আর কুল দুই-ই বজায় রাখতে হবে। তিনি একথা বেশ ভালো করেই জানেন যে চৌধুরী আর গাঙ্গুলী-বাড়ির কুচো-কাচার দল যদি তার পাঠশালায় এসে বিবাদ করে আর সেই বিবাদের

সূত্র তাদের বাড়ি অবধি চলে যায়—তবে শেষ পর্যন্ত এমন জট পাকিয়ে যাবে যে, তাকে খোলা শক্ত হয়ে উঠবে।

কাজেই তোরা ঝগড়া মারামারি কর তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু পাঠশালা থেকে বেরোবার আগে সব *"শোধ-বোধ ঘরে চলো।"* এ কথাটি পরিষ্কার করে যেতে হবে।

আর সত্যি কথাই তো।

ছেলেপুলের ঝগড়া শরৎকালের বৃষ্টির মতোই ক্ষণস্থায়ী। আসে আবার একটুখানি জল ছিটিয়ে চলে যায়।

এই খানিকক্ষণ আগে মারামারি করে কথা বন্ধ হয়ে গেল—আবার পর মুহূর্তেই দু'জন একসঙ্গে বসে খোস্ গল্প করছে আর চানাচুর চিবুচ্ছে।

ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি, আড়ি আছে—কিন্তু দলাদলি আর সঙ্গ ছাড়াছাড়ি নেই। দু'পাক ঘুরে বেড়িয়ে এসেই গলা জড়িয়ে ধরে কথা বলে ওরা।

আড়ি আর ভাবের এই যে লুকোচুরি খেলা সেটা দিব্যি চলেছিল—সামন্ত পণ্ডিতের পাঠশালায়।

সেদিন পাঠশালা ছুটির পর ছেলের দল হল্লোড় করে—বই-খাতা-পত্তর নিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল এমন সময় দেখা গেল যে, উল্টো দিক থেকে সখের বাজার করে ফিরছেন—গাঙ্গুলীমশাই।

মস্তবড় একটা মাছ চাকরের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে খোস-মেজাজে আসছিলেন গাঙ্গুলীমশাই। তার সামনে পড়ে গেল—চৌধুরীবাড়ির পল্কু।

তিড়িং-লাফ লাফাতে লাফাতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল, খালের ধারের দিকে। সেখান থেকে সবাই দল বেঁধে নৌকা করে বাড়ি ফিরবে।

গাঙ্গুলীমশাই রসিকতা করে বললেন, কিরে পল্কু, টাট্টু ঘোড়ার মতো ত' খুব লাফাচ্ছিস—পরীক্ষা হয়ে গেছে? পল্কু জবাব দিলে হ্যাঁ, আমাদের পরীক্ষা শেষ। এইবার হবে প্রমোশন।

গাঙ্গুলীমশাই চোখ নামিয়ে বললেন, আরে শোন্-শোন্—

পল্কু উত্তর দেয়, আমি যে খাল ধারে যাচ্ছি,—

নৌকোয় চড়ে বাড়ি যাবো সবাইকার সঙ্গে—

গাঙ্গুলীমশাই মুচকি হেসে জবাব দিলেন, তা ত' যাবি, বুঝলাম, কিন্তু প্রমোশনের দিন নম্বর নিবি কিসে করে?

এইবার পল্কু থমকে দাঁড়ায়।

সে নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। তাই নম্বর কি করে নিতে হয় তা জানে না—খটকা লাগে তার মনে।

সে শুধোয়, তাই তো! কি করে নম্বর নেবো? আপনি বলে দিন না!

গাঙ্গুলীমশাই হাসতে থাকেন।

তারপর জবাব দেন, কি বোকা ছেলেরে তুই পল্কু! প্রমোশনের দিন বস্তা নিয়ে এসে নম্বর ভর্তি করে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়—এ কথাটাও তোকে কেউ বলে দেয় নি? আজকে বাড়ি গিয়েই ঠাকুদ্দার কাছ থেকে একটি চটের থলে চেয়ে নিবি। নইলে ছেলেমানুষ তুই,....এত নম্বর বয়ে নিয়ে যাবি কি করে?

পল্কু মাথা নেড়ে উত্তর করে, ঠিক কথাই তো বলেছেন আপনি, যে করেই হোক বস্তা একটা জোগাড় করতেই হবে।

গাঙ্গুলীমশাই তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, এই ত' ছেলের বুদ্ধি হয়েছে!

তারপর হাসতে হাসতে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

এদিকে পল্কুর মনে বস্তার কথাটা ভারী ধরেছে।

তাই ত'! অনেক নম্বর পাবে সে—৭০—১০০—৫০০ কত পাবে কে জানে। এত নম্বর বয়ে নিয়ে যাওয়া ত' সোজা কথা নয়!

সত্যি! একটা ভাববার কথাই হল।

পথে আর কাউকে তার দুর্ভাবনার কথা জানালো না—পাছে সবাই তাকে বোকা ঠাউরে বসে।

নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে সে সরাসরি চলে গেল—তার ঠাকুর্দা চৌধুরীমশায়ের বৈঠকখানায়—

—ঠাকুদ্দা, আমায় একটা চটের বস্তা কিনে দিতে হবে কিন্তু—

চৌধুরীমশাই দুপুরবেলাকার ঘুম থেকে উঠে বেশ আমেজ করে তামাক টানছিলেন। শুধোলেন, হ্যাঁরে পল্কু, পাঠশালা থেকে ফিরেই তোর বস্তার কি দরকার হল, শুনি? আমাদের বাজার সরকারের সঙ্গে বাজার করতে বেরুবি নাকি?

পল্কু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে, বারে, তা কেন? পাঠশালার প্রমোশনের দিন নম্বরগুলো বয়ে নিয়ে আসতে হবে না? যদি বড় বস্তা নিয়ে না যাই তবে কি করে অতগুলি নম্বর বয়ে নিয়ে আসবো?

নাতির মজাদার কথা শুনে চৌধুরীমশাই হো-হো করে হাসতে থাকেন। বললেন, হুঁ। অনেক বিদ্যে পেটে গিয়েছে, কিন্তু বস্তায় পুরে নম্বর আনবার পরামর্শটা কে দিলে শুনি?

পল্কু হাসি-খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উত্তর করলে বা-রে! আমাদের পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীমশাই। তিনিই ত' আমায় ডেকে বললেন, তোর ঠাকুদ্দার কাছ থেকে একটা বড় চটের থলি চেয়ে নিস···নইলে প্রমোশনের দিন নম্বরগুলো বয়ে নিয়ে যাবি কি করে?

মাথা দুলিয়ে পল্‌কু শুধোলে, গাঙ্গুলীমশাই ঠিক কথাই বলেছেন ? না ঠাকুদ্দা ? বস্তা কিন্তু একটা না হলে চলবে না।

মুহূর্তে চৌধুরীমশায়ের মুখখানা ভারী হয়ে গেল। তিনি আড়চোখে একবার তার পাশে বসা নায়েবের দিকে তাকালেন। নায়েবমশাইও ইতিমধ্যে পল্‌কুর মুখের কথা শুনে—নড়েচড়ে বসে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন।

চৌধুরীমশাই হাত থেকে গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর নায়েবের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ব্যাপারটা নিজের কানেই শুনলে ত' নায়েব?

—আজ্ঞে তা শুনলাম বৈ কি।

সবিনয়ে উত্তর করে নায়েব। এরই মধ্যে তার চোখদুটো কুতকুতে ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটা ঝড়ের সঙ্কেত পাওয়া গেল যেন চৌধুরীমশায়ের গম্ভীর গলায়।

চৌধুরীমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, বেশ বুঝতে পাচ্ছি—এ ইচ্ছে করে আমাকেই অপমান করবার জন্যে।

নায়েব হাত জোড় করে ইঙ্গিতে ইন্ধন জুগিয়ে বললে, আজ্ঞে তা ছাড়া আর কি। মানীর মান নষ্ট করাই ত' ওদের একমাত্র কাজ।

তারপর এদিক-ওদিক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে উত্তর করলেন, এর একটা মুখের মতো জবাব আমিই দিতে পারি—

পল্‌কু কিন্তু ঠাকুদ্দা আর নায়েবমশায়ের কথা কিছুই বুঝতে পারে নি। তাই অসহিষ্ণু হয়ে আবার বললে, আমার বস্তাটা একটু তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিও কিন্তু—

এইবার চৌধুরীমশাই গর্জন করে উঠলেন। বললেন যা—যা—আমার সমুখ থেকে দূর হয়ে যা! বাচ্চা ছেলেকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে আমায় অপমান করা! কিন্তু আমার নামও পুবপাড়ার চৌধুরী। বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায় আমার হুমকিতে।

চৌধুরীমশায়ের হুমকিতে পল্‌কু সত্যি ভয় পেয়েছিল ঠাকুদ্দার এ মূর্তি দেখতে ওরা অভ্যস্ত নয়। তাই তাড়াতাড়ি বই-খাতা-পত্তর নিয়ে একেবারে পালিয়ে গেল অন্দর মহলে মায়ের কাছে।

চৌধুরীমশাই গম্ভীর গলায় ডাকলেন,—নায়েব—

ঘাড় কাৎ করে নায়েব বললেন, আজ্ঞা করুন—

এবার আদেশ করলেন চৌধুরীমশাই।

বললেন, সাত দিনের মধ্যে পুবপাড়াতে আমার এলাকায় একটি পাঠশালা বসাতে হবে। আমার কথার যেন নড়চড় না হয়।

।। আট ।।

চৌধুরীমশায়ের রাত্রে ঘুম নেই!

সাতদিনের মধ্যে একটি পাঠশালা পুবপাড়ায় বসাতে হবে। নায়েব জীবনে অনেক কাজ করেছে, আর এজন্যে তার হাতযশও আছে খুব।

রাতারাতি প্রজার বাড়ি ভেঙে দিয়ে তাকে চষা ক্ষেত তৈরী করা, কারণে-অকারণে লোকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া, নদীতে নতুন-ওঠা চর দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে দখল করা, গোপনে কারো সম্পত্তি নিলেম করে নেয়া।...এ সমস্ত ভালো-ভালো কাজে চৌধুরীবাড়ির নায়েব এত বেশী দক্ষতা ইতিপূর্বে দেখিয়েছে যে, দেশে গুণের আদর থাকলে কবে সে অশান্তি-সৃজনের নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেত।

কিন্তু ভাঙ্গা আর গড়া...এই দুই জাতীয় কাজ একই পথ ধরে চলে না। একজন যদি চলতে চায় ডাইনে—তবে আর একজন যায় বাঁয়ে।

দু'জনের সঙ্গে নাকি চিরকালের আড়ি। নায়েব মহা বিপদে পড়ে গেল।

নায়েবের এক দুষ্কর্মের সাথী ছিল। তার নাম হচ্ছে ফিচ্‌কেরাম। ফিচ্‌কেরামের একটি চোখ। কানা লোকে বলে যে, ওই কানা চোখের ভেতরই নাকি যত কুমতলব লুকিয়ে থাকে।

অনেক সময় ফিচ্‌কেরামই নায়েবকে নাচিয়ে তোলে মানুষের ক্ষতি করবার জন্যে।

নায়েব ভাবলে, ওরই সঙ্গে আগে একটি পরামর্শ করা দরকার। নায়েব গিয়ে সন্ধ্যের মুখে ডাক দিলে, ওহে ফিচ্‌কেরাম বাড়ি আছ ?

সে নিজের দাওয়ায় বসে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিল। আচমকা নায়েবের হাঁক শুনে হুঁকো-কলকে ফেলে কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে ছুট দিলে। ওদিকে যে কলকের আগুন ছড়িয়ে পড়ে বেড়াতে তখুনি আগুন ধরে যাচ্ছিল সেদিকে ফিচ্‌কেরামের এতটুকু হুঁস নেই।

ভাগ্যিস তার মেয়ে এসে সেটা ধরে আর ঝাঁট দিয়ে আগুন দাওয়ার নীচে ফেলে। নইলে একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল আর কি !

অবিশ্যি এতে দুঃখের কোনো কারণ ছিল না। কেননা এর আগে বহু লোকের বাড়ি ফিচ্‌কেরাম রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

নায়েব গম্ভীর গলায় বললে, ফিচ্‌কে, তোর বাইরের দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দিতে বল—দরকারী কথা আছে!

দরকারী কথা থাকলেই ফিচ্‌কেরামের দুটো পয়সা উপরি লাভ হয়। সন্ধ্যেবেলায় যখন নায়েব নিজেই ছুটে এসেছে,—ডেকে পাঠায় নি, তখন নিশ্চয়ই জরুরী কথাই হবে।

অন্ধকারের মধ্যে তাই ওর একটি চোখ আপনা থেকেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল; নায়েব কিন্তু তা দেখতে পেলে না।

ফিচ্‌কেরামের হাঁক-ডাকে ওর ছোট মেয়েটা এসে একটা মাদুর বাইরের দাওয়ায় পেতে দিয়ে গেল।

ফিচ্‌কেরাম বললে, হুঁকোর জল বদলে নায়েবমশাইকে তামাক দে—

মেয়েটা ছুটোছুটি করে তামাক দিয়ে গেল।

মাদুরে বসে নায়েব আপনমনে তামাক টেনে চলেছে—তার গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ কানে শোনা যাচ্ছে।

নায়েবমশায়ের চোখ, মুখের ভাব যে কি রকম হচ্ছে সেটা অন্ধকারের মধ্যে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

ফিচ্‌কেরাম মনে মনে আঁচ করে নিলে যে, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বিশেষ সাঙ্ঘাতিক হবে। নইলে নায়েবমশাই শুধু তামাকই টেনে চলেছে···মুখ খুলছে না কেন?

বাইরে একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে—দূর জঙ্গলা অঞ্চলে আচমকা শেয়ালের চিকন-সুরের গানের কলিও শোনা যাচ্ছে···আশেপাশে মশার ভ্যান্‌ভ্যানানিরও বিরাম নেই। এইরকম অসহ্য অবস্থায় চুপচাপ আর কতক্ষণ বসে থাকা চলে?

নায়েবমশাই ঘুমিয়ে পড়ল না তো? না, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কেননা গুড়ুক গুড়ুক শব্দ ঠিক একভাবেই কানে এসে ঢুকছে।

এমন সময়ে নায়েবমশাই অন্ধকারের মধ্যে কথা কয়ে উঠল। শুধোলে, হ্যাঁরে ফিচ্‌কে, চট্‌পট একটা পাঠশালা বসাতে পারিস?

নায়েবমশায়ের প্রশ্নে শুনে ফিচ্‌কেরাম যেন অগাধ সমুদ্রে পড়ে গেল।

ব্যাপার কি?

মামলা, মোকদ্দমা, জাল, জুয়াচুরি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চর দখল, অবাধ্য প্রজাকে শায়েস্তা করা, কারো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া···এর কিছুটাই নয়—একেবারে কিনা নিরামিষ পাঠশালা।

নায়েবমশায়ের হঠাৎ মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায় নি'ত'? কেউ সুযোগ বুঝে ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে দিল নাকি? দিয়েছে—চাষাদের গাঁয়ের কত নৈশ বিদ্যালয় পাইক লাগিয়ে দিয়েছে গুঁড়িয়ে।

আজ হঠাৎ ভূতের মুখে রাম নাম কেন?

ফিচ্‌কেরামকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে নায়েব হঠাৎ চটে উঠে বললে, কি রে? কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে বড়ো? ভারী মাতব্বর হঁয়ে উঠেছিস নয়?

অন্ধকারে বসে মশার কামড় খেতে খেতে কি জবাব দেবে সে? তাই কোনো

রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধোলে, আজ্ঞে পাঠশালা সে ত' কবে চুকে বুকে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে নায়েব খ্যাক খ্যাক করে ওঠে।

আরে বোক্‌চন্দর, তোর জন্যে পাঠশালা বসাচ্ছি নাকি? চৌধুরীমশায়ের হুকুম—সাতদিনের মধ্যে পুবপাড়ায় একটি পাঠশালা খুলতে হবে। কাজ যদি হাসিল করতে না পারি—তবে কি বুড়ো বয়সে চাকুরী খুইয়ে ঘরে বসে থাকবো?

—ওরে বাবা কি সর্বনেশে কথা।

ফিচ্‌কেরাম মনে আঁচ করার চেষ্টা করতে থাকে।

নায়েবের চাকুরী যাওয়া মানে, তার সংসারে একেবারে হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

পাঠশালা নিয়ে যে এত জ্বালা সে কথা ত' আগে জানা ছিল না।

নায়েব আবার বললে, আরে, জায়গার জন্যে ভাবিনে। বাইরের অতিথিশালাটা পরিষ্কার করে নেওয়া। কর্তাকে বলে ওটা করা যাবে।

ছোটলোকের ছেলেদের জন্যে গোটাকয়েক চ্যাটাই কিনে দেবো'খন—আর ভদ্দরপাড়ার ছেলেমেয়েদের জন্যে খান-কয়েক বেঞ্চ- সে একরকম ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি পণ্ডিতের কথা।

এরপর নায়েব আচমকা এমন একটা প্রশ্ন করে বসল—যার ফলে ফিচ্‌কেরাম দাওয়া থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

নায়েব শুধোলে, হ্যাঁরে ফিচ্‌কে, তুই না হয় ছেলেছোকরাদের পড়া, গায়ে একটা চাদর দিয়ে—টিকি রেখে পণ্ডিত হয়ে বোস।

আঁৎকে উঠে ফিচ্‌কেরাম উত্তর করলে, ওটি আদেশ কোরো না নায়েবমশাই। ওরে বাবা, পাঠশালার পণ্ডিত! হতে হবে বিদ্যেব জাহাজ। কিন্তু মাইনে জুটবে নগদ পাঁচটি তঙ্কা।

নায়েব দাওয়ায় একটা থাবড়া মেরে হুঙ্কার দিয়ে উঠে কইলে, হুঁ। বিদ্যের জাহাজ। ওই যে ও পাড়ার সামন্ত-পণ্ডিত। এমন আর কি বিদ্যে-দিগ্‌গজ ধনুর্ধর শুনি?

কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, নামতা—এই ত' সব পড়াতে হয়। তোর কি ছাই কিছু মনে নেই?

ফিচ্‌কেরাম মনে মনে বললে, তোমার সঙ্গে চলাফেরা করে মা সরস্বতীর কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিলাম সব বেমালুম ভুলে গেছি!

নায়েব ওকে ঠ্যালা মেরে বললে, যা হোক একটা কিছু বলনা তাড়াতাড়ি। আমার আবার মরবার ফুরসৎ নেই!

ফিচ্‌কেরাম উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, ছেলেদের পিঠে যদি বেমালুম বেত চালালে কাজ হয়—তবে আমি রাজি আছি নায়েবমশাই। ও কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া,

নামতা, ধারাপাত, ব্যাকরণ—কিছুই আমাকে দিয়ে হবে না। পেল্লাদ 'ক' অক্ষর শুনেই 'মুচ্ছো' গিয়েছিল—আমার আবার পাঠশালার নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে।

নায়েবমশাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জবাব দিলে, তবেই তোকে দিয়ে হয়েছে। ছেলেদের পিঠে বেমালুম বেত চালাবি। জানিস, ওখানে চৌধুরীবাড়ির ছেলেরাও পড়বে। চাই কি চৌধুরীমশাই হয়ত নিজেই গিয়ে হাজির হবেন—কেমন পড়াশুনো চলছে দেখতে!

—ওরে বাবা তাহলে আর আমাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না নায়েবমশাই। কে আর সাধ করে হাঁড়িকাঠে মাথা গলিয়ে বসে থাকে?

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বললে ফিচ্‌কেরাম। তারপর একটুখানি থেকে উত্তর দিলে, আমি কিন্তু একটা বুদ্ধি বাৎলে দিতে পারি।

নায়েব মশাই নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলে, কি শুনি?

ফিস্ ফিস্ করে ফিচ্‌কেরাম বলতে শুরু করলে,—বেশ বুঝতে পারছি চৌধুরীমশাই পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীদের সঙ্গে রেষারেষি করেই এই পাঠশালা খুলতে চাইছেন। এখন আমাদের এমন কাজ করা উচিত, যাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়।

নইলে পৃথিবীতে এত ভালো ভালো কাজ থাকতে— শেষকালে কিনা পাঠশালা।

এই নায়েব মশায়ের ইঙ্গিতে সে কত পাঠশালা পুড়িয়ে দিয়েছে।

নায়েবমশাই বিরক্ত হয়ে বললে, একটা কথা বলতে গিয়ে তুই বড় ভনিতা করিস ফিচ্‌কে। যা বলতে চাস্ চটপট্ বলে ফেল।

ফিচ্‌কে মুখটা চোট্‌কে নিয়ে একটা আনন্দের ধ্বনি করে উঠল। উত্তর দিলে, আমি সেই কথাই ত' খোলসা করে বলতে চাইছি নায়েবমশাই। তুমি একটু ধৈর্য্য ধরে আমার কথাগুলি শোনো।

—বল।

চলো, আমরা সরাসরি সামন্তপণ্ডিতের কাছে চলে যাই।

—সামন্ত পণ্ডিত? সে রাজি হবে কেন?

নায়েবমশায়ের কণ্ঠে দারুণ বিরক্তি।

—আরো মন স্থির কর শোনো তাহলে। আমরা যদি সামন্ত পণ্ডিতকে রাজি করাতে পারি তাহলে চৌধুরীমশায়ের পাঠশালা ত' খোলা হলই—আবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা যায় উঠে! একেই বলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা।

নায়েবমশাই ফিচ্‌কেরামের কথা শুনে হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মাদুরের ওপর একটু নড়েচড়ে বসে গদগদ কণ্ঠে বললে, এটা ত' তুই খুব ভালো বুদ্ধি মগজ থেকে বার করেছিস। সামন্ত পণ্ডিতকেই হাত করতে হবে। পশ্চিমপাড়ার

পাঠশালা যাতে উঠে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে—পূবপাড়ার পাঠশালা। এই কাণ্ডটা যখন ঘটবে—চৌধুরীমশাই নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

ফিচ্‌কেরাম ফোড়ন দিয়ে উত্তর করলে, চাই কি কর্তা খুশী হয়ে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারে, আর শাল-দোশালা বক্‌শিস্ দেওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

নায়েব মনে মনে খুশী হলেও মুখে সেটা গোপন করে বললে, যা-যা, তোকে আর মেলা বকতে হবে না! চল্ দেখি—সামন্ত পণ্ডিতের কাছে আজ রাত্তিরেই যাবো—

ফিচ্‌কে অবাক হয়ে শুধোলে, এক্ষুনি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—শুভস্য শীঘ্রম্। তুই যে কথা বলেছিস তাই ঠিক! একেবারে যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখী!

দাওয়া থেকে নেমে পড়ে নায়েবমশাই।

ফিচ্‌কেরাম উত্তর দেয়, তাহলে একটু অপেক্ষা করো নায়েবমশাই, আমি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে আসি—

ফিচ্‌কেরামের ঘাটের ডিঙি নিয়ে দুজনে যখন সামন্ত-পণ্ডিতের বাড়ি উপস্থিত হল—তখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে!

সামন্তপণ্ডিত বাইরের ঘরে বসে একটি মিট্‌মিটে তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজের ভাইপোকে পড়াচ্ছিলেন।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—চৌধুরীমশায়ের নায়েব আর সেই সঙ্গে ফিচ্‌কেরামকে দেখে তিনি একেবারে হকচকিয়ে গেলেন।

পণ্ডিতমশাই সত্যি নির্বিবাদী মানুষ!

কারো সাতেও নেই...পাঁচেও নেই।

সংসারে অভাব প্রচুর, তবু কোন ঝামেলায় তিনি যেতে চান না। নিজের পাঠশালাটি নিয়ে দিন কাটান। মনে মনে এই ধারণা আছে যে, যদি কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ত' এই পাঠশালাই পারবে। পাঠশালায় পড়ানো তার কাছে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর আরাধনা করা।

ছেলেদের কাছে কলাটা মুলোটা পান—আর আছে গাঙ্গুলীদের দেয়া বৃত্তি। ঝঞ্ঝাটে পা বাড়াতে তাঁর একান্ত আপত্তি। কিন্তু মূর্তিমান দুটো ঝঞ্ঝাট যখন এত রাত্তিরে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে হাজির হল—তিনি সত্যি প্রমাদ গুনলেন।

সামন্ত পণ্ডিতমশাই বেশভাল করেই জানেন যে, চৌধুরীবাড়ির নায়েবের কোন কাজ তার কাছে নেই।

কথায় বলে—একা রামে রক্ষা নেই—সুগ্রীব তার দোসর। সেই নায়েবের সঙ্গে আবার ফিচ্‌কেরাম।

আজ না জানি কার মুখ দেখে তাঁর ঘুম ভেঙেছিল। তবু মনে যে কথা জাগে, সব সময় মুখে সে কথা কোনো মতেই প্রকাশ করা চলে না। তাই সামন্ত পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে শুধোলেন, এই যে নায়েবমশাই, তা' এত রাত্তিরে বিশেষ আবার কি মনে করে ?

নায়েবমশাই বললে, আজ্ঞে আপনার সঙ্গে আমাদের একটু পরামর্শ আছে, কুটিরে জরুরী। সামন্ত পণ্ডিতমশাই তাঁর ভাইপোকে বই-শ্লেট-পেন্সিল গুছিয়ে নিয়ে ভেতরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে বললেন। ছেলেটি কিন্তু ভারী অবাক হয়ে গেল।

রোজ রাত্তিরে পড়াশুনোর শেষে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসে। আজ আবার এ নতুন নিয়ম কেন?

সে বললে, এক সঙ্গেই না হয় খাবো'খন—

শেষকালে পণ্ডিতমশাই ধমক দিতে সে মুখ ভার করে উঠে চলে যায়।

চৌধুরীমশায়ের নায়েব ভণিতা করতে ভালবাসেন না। সোজা-সুজি নিজের মনের কথা জানিয়ে একটি দশটাকার নোট সামন্ত পণ্ডিতের হাতে গুঁজে দেয়।

লোকে সাপ দেখলে যেমন ভয়ে তিন হাত লাফিয়ে পেছু হটে যায় তেমনিভাবে সামন্ত পণ্ডিত আঁৎকে উঠলেন, বললেন, দেখুন নায়েবমশাই ;আমি চিরটাকাল গাঙ্গুলীবাড়ির নুন খেয়ে আসছি ! পাঠশালার ছেলেরা ভালোবেসে যে যা দেয়—হাত পেতে নিয়ে থাকি। তাতে আমার কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু তাই বলে এ অধর্ম আমি করতে পারব না।

নায়েব ফিস্‌ফিস্ করে বললে, দেখুন, আপনি পশ্চিমপাড়ায় পাঠশালা চালিয়ে মাসে পনেরো টাকা পেয়ে থাকেন। আপনি যাতে এখন থেকে আরও দুটাকা বেশী পান, আমি চৌধুরীমশাইকে বলে সেই ব্যবস্থা আপনার করে দেবো।

তাছাড়া চৌধুরীবাড়ির ছেলেদের সকাল-সন্ধ্যে পড়িয়ে আরো কিছু পাবেন—

সামন্ত-পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে উত্তর করলেন, আপনি আমায় লোভ দেখাতে এসেছেন?

—এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

ফিচ্‌কেরাম ফোড়ন দিয়ে বললে, এমন সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লেন পণ্ডিত মশাই, কাজটা কি ভালো হল—?

পণ্ডিত সত্যি চটে গেলেন ; আগে আপনারা নামুন আমার দাওয়া থেকে।

নায়েব রাগে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলে, ছেলেপিলে নিয়ে আপনি ঘর করেন পণ্ডিতমশাই, একটা বিপদ-আপদ হতে কতক্ষণ? খুব সাবধানে থাক্‌বেন। এই বলে ফিচ্‌কেরামের হাত ধরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

।। নয় ।।

আগেকার দিনে সারা দেশময় আড়কাঠির দল ঘুরে বেড়াত। নিরক্ষর গেঁয়ো লোক পেলেই তাকে নানারকম টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে চা-বাগানে কুলি করে চালান দিত! আড়কাঠির মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনে যারা তার ফাঁদে পা দিত —সারা জীবনেও তাদের মধ্যে অনেকে দেশে ফিরে আস্‌তে পারত না! রোগে ভুগে, না খেতে পেয়ে, খেটে খেটে ঐ চা বাগানেই বহু লোক মারা পড়ত। দেশের আত্মীয়-স্বজন তাদের আর কোন সন্ধানই জানতে পারত না।

ফিচ্‌কেরাম এইরকম ছোটখাটো আড়কাঠির কাজ শুরু করে দিলে জলবিছুটি গাঁয়ে।

ওর কাজ অবশ্য চা বাগানে কুলি চালান দেওয়া নয়! ওর মহান্ উদ্দেশ্য হল— নাযেবের আদেশমতো চৌধুরীদেব পাঠশালার জন্য পড়ুয়া জোগাড়। যেন তেন প্রকারেণ পড়ুযা ওকে সংগ্রহ করতেই হবে, নইলে নায়েবের কাছে দাঁত-মুখ খিঁচুনি খেতে হবে।

চৌধুরীমশাযের একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। ফিচ্‌কেরামের বরং একবেলা খাওযা বন্ধ থাক্‌তে পারে, কিন্তু চৌধুরীমশায়ের পাঠশালা ঠিক যথা সময়ে খুলতেই হবে।

চন্দ্র-সূর্য গো-ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে কাজ। চৌধুরীবাড়ির বাইরের অতিথিশালা একবকম ইঁদুর-বাদুড়ের আস্তানা হয়েছিল। কর্তার হুকুমে নতুন করে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ঘরামীরা তাতে মাটি লেপে দিয়েছে চমৎকার করে। পাশের ডোবা থেকে মাটি তুলে ভিটেটাকে বেশ উঁচু করা হয়েছে। আল্‌কাত্‌রা বুলিয়ে দেওয়া হযেছে খুঁটিগুলোর ওপর। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে লেপে দিয়েছে দাওয়া। সেইগুলো শুকিয়ে এমন সুন্দব দেখাচ্চে যে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

চৌধুরীবাড়ির সবাই বলাবলি করছে,—মা সরস্বতী এমন নিরিবিলি জায়গায় আপনি হেঁটে এসে বিদ্যে দান করে যাবেন।

চৌধুরীমশায়ের নিজের উৎসাহ সব চাইতে বেশী। তিনি বাড়ির মালিদের বলে দিয়েছেন—পাঠশালার দুধারে রজনীগন্ধার ঝাড় লাগিয়ে দিতে হবে। আর ঢোকবার মুখে থাকবে—দুটো কামিনীফুলের গাছ। যখন গন্ধ বেরোবে চারদিক একেবারে ম' -ম' করতে থাক্‌বে।

সুগন্ধ না হলে নাকি বিদ্যেদেবী পাকাপাকি আসন করে বসেন না। সর্বশুক্লা দেবী সরস্বতী, তাই তাকে সাদা ফুলে তুষ্ট করতে হবে।

কিন্তু গোলমাল বেঁধেছে আসল ব্যাপার নিয়ে। ঘোড়া যদি জোটানো যায় তাহলে লাগামের জন্য আটকায় না। পাঠশালার ঘর ত' বেশ তৈরী হল।

যত ভাবনা এখন পড়ুয়া নিয়ে।

পড়ুয়া যদি না জোটে তবে মা সরস্বতী এসে চরণযুগল রাখবেন কোথায়?

সারা ঘর ভরে যাবে ··· ছেলেদের নামতা পড়ার শব্দে, সারাটা বাড়ি গম্‌গম্ করতে থাক্‌বে—তবে ত' পাঠশালা? নইলে নিঝুমপুরীতে বিদ্যা দেবেই বা কে নেবেই বা কে?

এই জরুরী কাজের ভার পড়েছে ফিচ্‌কেরামের ওপর। এ গরু, ভেড়া, ছাগল নয় যে, তাড়িয়ে এনে গোয়ালে আট্‌কে দিলেই দিনের কাজ শেষ হয়ে গেল।

মানুষের বাচ্চা নিয়ে কারবার। তার ওপর তারা পড়তে শুনতে রাজি হয় তবে ত'। ধূর্ত শেয়ালের কাজ নয় যে—সন্ধ্যের আঁধারে গেরস্ত বাড়ির আনাচে—কানাচে ঘুরে বেড়াবে, তারপর সুযোগ বুঝে হাঁসটা মুরগীটার ঘাড়ে কামড় দিয়ে চুপিসারে পালিয়ে আসবে।

শিকার করতে হবে মানুষের বাচ্চা। তাও শুধু একদিন কোনো রকমে এনে খোঁয়াড়ে ঢোকালে হবে না; রোজ রোজ আসে, পাততাড়ি বগলে আসে, আগ্রহ করে লেখাপড়া শিখতে আসে—এমন ছেলে চাই একপাল।

রাগে-দুঃখে ফিচ্‌কেরামের নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে হল। ওর আছে শুধু একপাল মেয়ে! যদি অপোগণ্ড একদল ছেলেও থাকত — তাহলে তাদের পাঠশালায় ঢুকিয়ে দিয়ে নায়েবমশায়ের কাছ থেকে দিব্যি বাহবা কুড়োতে পারত।

ঘরে যখন ব্যবস্থা নেই—তখন ঘরের খেয়ে বনের মোষই তাড়াতে হবে। যেতে হবে আশেপাশের বাড়িগুলিতে—কামার, কুমোর, ছুতোর পাড়ায় যদি সেখানকার শিশুপাল বধ করতে পারে!

দাওয়ায় বসে বেশ খানিকক্ষণ ধরে তামাক খেয়ে কোমরে গামছা জড়িয়ে ফিচ্‌কেরাম অভিযানে বেরুলো।

প্রথমেই দেখা খালের ধারে মাছ ধরে যে কুসমী বুড়ী তার সঙ্গে —

কুসমী-বুড়ী আপনমনে বিড়বিড় করে কাকে যেন গাল দিচ্ছিল আর খালের অল্প জলে [illegible] মাছ ধরছিল।

ফিচ্‌কেরাম গিয়ে খালের ধারে দাঁড়ালো। তারপর শুধোলে, হ্যাঁগো বুড়ী, তোমার ছেলে কোথায়?

কুসমী-বুড়ী আবার কানে দিব্যি খাটো। সে শুনল, জেলে কোথায়? ভাবলে তার সোয়ামীর কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তাই মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, জেলে? হাটে গেছে মাছ বিক্রি করতে। আমি দেখছি—কুঁচো মাছ কিছু ধরতে পারি কিনা। নেবে নাকি তাজা কিছু কুঁচো মাছ? সস্তায় দেবো'খন।

ফিচ্‌কেরাম দেখলো সমূহ বিপদ। সে জিজ্ঞেস করলে ওর ছেলের কথা।

পাঠশালার জন্যে শিকার করা যায় কিনা এই মতলব নিয়ে আর বুড়ী কিনা টেনে নিয়ে এলো জেলেকে। তার ওপর আবার বলছে মাছ কিনতে। এই রকম ফ্যাসাদে পড়লেই পড়ুয়া জোগাড় হয়েছে আর কি!

ফিচ্‌কেরাম তাই তাড়াতাড়ি ওর পাশ কাটাবার জন্যে বললে, তোর ছেলে ফুটি কোথায়? তাকেই ত' খুঁজছি আমি—

কুসমী-বুড়ী আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে উত্তর দিলে, ও। পুঁটিমাছের কথা বলছ তুমি? তা-ও রয়েছে আমার চুপড়ীতে। বেশ তাজা পুঁটিমাছ। ক'গণ্ডা নেবে তাই তুমি বলনা! আমি বেছে বেছে বড়ো বড়োগুলো তোমায় দিচ্ছি। কিন্তু পয়সাটা এক্ষুনি নগদ দিতে হবে। আমার পান-দোক্তা ফুরিয়ে গেছে কিনা—তাই অবেলায় মাছ ধরতে বেরিয়েছি। তোমাদের জেলেবুড়ো কোন রাত্তিরে ফিরবে কে জানে?

কুসমী-বুড়ী আপনমনেই বিড় বিড় করে বকে চলে। ফিচ্‌কেরাম দেখলে, এখানে বুড়ীর সঙ্গে যত কথা বলতে যাবে ততই মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়বে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে একেবারে জবাব না দিয়ে সরে পড়া।

যেমন ভাবা অমনি কাজ।

কুসমী-বুড়ী কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। সে খালের জলে দাঁড়িয়েই চিৎকার করতে লাগলো, ও বাবু, মিছিমিছি রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? না হয় একগণ্ডা মাছ ফাউ দেবো। নিয়ে যাও—একেবারে জলজ্যান্ত লাফাচ্ছে।

জলজ্যান্ত লাফানো মাছ দেখবার কামনা ফিচ্‌কেরামের আদৌ ছিল না। সে এখন বুড়ীর হাত থেকে নিস্তার পেলে বাঁচে।

বকের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে সে এইবার সত্যি খাল ধার থেকে পালিয়ে এলো অনেক দূরে।

হাঁটতে হাঁটতে ফিচ্‌কেরাম ছুতোর পাড়ায় এসে হাজির হল। সঞ্জয় ছুতোর শক্ত আর মোটা কাঁঠাল গাছের ওপর র‍্যাঁদা চালাচ্ছিল। তাকে যোগান দিচ্ছিল তারই দশ বছরের ছেলে বিষ্টু।

ফিচ্‌কেরাম বেশ আয়েস করে গিয়ে দাওয়ায় বসল। বললো, একটু ভালো করে তামাক সেজে খাওয়াও ত' ছুতোরের পো—

জলবিছুটি গাঁয়ে ফিচ্‌কেরামের নাম-ডাক ত' বিশেষ ভালো নয়। সবাই ওকে ভয় করে চলে। নায়েবের মোসাহেব বলে কেউ প্রাণ খুলে ওর সঙ্গে মিশতে চায় না। কি বলতে কি বলে ফেলবে—শেষকালে প্রাণ নিয়ে টানাটানি লাগুক আর কি?

দেশে-গাঁয়ের লোকেরা আড়ালে আবডালে বলে, ওরা হচ্ছে কাঁচা-খেকো দেব্‌তা—ভালো করতে পারে না কিন্তু মন্দ করবার গোঁসাই ঠাকুর। পেন্নাম ঠুকে ওদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

কাঁচা-খেকো দেবতাদের ভয় আছে বলেই তাদের খাতির যত্নটা একটু বেশী করে জানাতে হয়।

তামাকটা সেজে দিয়ে সঞ্জয় ছুতোর আবার নিজের কাজে মন দেয়। ফিচ্‌কেরাম এইবার আস্তে আস্তে আসল কথাটা পাড়ে। বললে, হ্যাঁগো ছুতোরের পো, বিষ্টুকে লেখাপড়া শেখাবে না?

সঞ্জয় যেন এবার সত্যি অবাক হল। এত কথা থাকতে কাঁচা-খেকো দেব্‌তা লেখাপড়ার কথা তোলে কেন? ও যদি সোজাসুজি উঠোনে ঢুকে বলত ছুতোরের পো, তোমার লাউয়ের মাচায় দিব্যি লাউ ঝুলছে আমি একটা নিয়ে যাব,—কিম্বা তোমার কলাবাগানে দিব্যি পুরুষ্টু সবরী কলা নেমেছে, এক কাঁদি কেটে দাও, বাড়িতে পুজো আছে কিনা—

তবে সঞ্জয় ঠিক ঠিক বুঝতে পারত কথাটা। কিন্তু এত কথা থাকতে একী কাণ্ড। ওর ছেলে বিষ্টুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে ফিচ্‌কেরামের রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না? নিশ্চয়ই কু-মতলব আছে লোকটার মনে মনে।

মনে যে কথাই উঠুক কিন্তু মুখে একটা জবাব দিতেই হয়। তাই অতি বিনয় করে সঞ্জয় ছুতোর বললে, আজ্ঞে আমাদের ছেলেদের আবার লেখাপড়া! আমার কাঠের কাজে হাতে হাতে একটু সাহায্য করলে দু'পয়সা ঘরে আসে। পাঠশালায় যে পাঠাবো মাইনে জোগাবো কোথেকে? ছেলেটা গায়ে দেবে এমন একখানা জামা কিনে দিতে পারিনে। গরীবলোকের ঘোড়া রোগ হলে কি চলে? লেখাপড়া শিখবে আপনাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা।

ইচ্ছে করেই ছুতোর ফিচ্‌কেরামকে একটু আকাশে তুলে ধরল তাতে যদি শনির কোপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়!

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

এঁটেল মাটির মতো লেগে রইল ফিচ্‌কেরাম।

বললে, এটা কি একটা কথা হল ছুতোরের পো? আমি থাকতে তোমার ছেলের লেখাপড়া শেখা হবে না? একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবোই।

সঞ্জয় মনে মনে ঠিক করে নিলে পায়ে যখন জোঁক ধরে—তখন তার হাত থেকে বাঁচবার সহজ উপায় হল সেই জোঁকের মুখে নুন লাগিয়ে দেয়া!

তাই হঠাৎ বলে বসল, আচ্ছা বাবু, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে তোমার হাতেই ছেড়ে দেব। তবে কি জানো বাবু, সংসারে এখন বড় টানাটানি চলছে। তুমি গোটা দশেক টাকা না হয় আমাকে দাও। আমি তোমার বাড়ি কাঠের কাজ করে শোধ দেবো।

ফিচ্‌কেরাম দেখলে এ বড় শক্ত ঠাঁই।

এই হাটে ছুঁচ বেচা তার কর্ম নয়। তাই ওর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে

হুঁকোটা খুঁটির সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে এক-পা দু-পা করে ছুতোর বাড়ির বাইরে চলে এল।

এইবার ফিচ্‌কেরাম সত্যি মহা ভাবনায় পড়ল।

চৌধুরীবাড়ির পাঠশালার জন্যে পড়ুয়া জোগাড় করতে গিয়ে যদি তাকে পুঁটি মাছ কিনতে হয় কিম্বা ছুতোরকে দশটাকা ধার দিতে হয় তবে সে অতল জলে ডুবল বলে।

নাঃ, মানে-মানে এই কাজের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে দেওয়াই ভালো।

ফিচ্‌কেরাম ঠিক করলে আজই সন্ধ্যেবেলা গিয়ে সে সব কথা নায়েবমশাইকে বলে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইবে।

এর চাইতে প্রজার ঘর জ্বালানো, লোকের মাথা ফাটানো, রাতের অন্ধকারে ঘর দখল করা প্রভৃতি ভালো ভালো কাজ সত্যি অনেক আরামের।

তাতে একটা উত্তেজনা আছে আর ট্যাঁকেও বেশ দু'পয়সা আসে। পাঠশালার পড়ুয়া সংগ্রহ করার মতো নিরিমিষ কাজে সে আর আদপেই যাবে না।

মনে মনে কথার জাল বোনে—আর বিনা উদ্দেশ্যে পথ চলে সে।

হঠাৎ পথের বাঁকে দুখীরামের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে তার ছেলে শ্যাম। ফিচ্‌কেরাম ভাবলে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব নাকি? তাই অতি উৎসাহে হাঁক দিলে, ওহে দুখীরাম শোনো শোনো, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম—

দুখী প্রথমটা ভারী হক্‌চকিয়ে গেল। গাঁয়ে এত মানুষ থাকতে বাবু তার কথা ভাবতে যাবে কেন?

তারপর ভক্তিভরে প্রণিপাত করে বললে, তা আজ্ঞে কর্তা হুকুম করুন। আমার নাম দুখীরাম—কাজেও দুখীরাম। দু'বেলা পেট পুরে খেতে পারি না। ছেলেটাকেও খাওয়াতে পারি না, বৌয়ের পরনে ছেঁড়া ত্যানা। আপনি আমার কথা ভেবে পথ চলছিলেন কেন? লোকে ত' ঠাকুর-দেবতার কথা ভেবেই কোনো কাজে এগিয়ে যায়।

ফিচ্‌কেরাম মুখে মধু ঢেলে উত্তর করলে, দ্যাখ দুখী, তোর ছেলেটা বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়, লেখাপড়া কিছু শেখে না, এই দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। কতদিন ভেবেছি শ্যাম ছোঁড়াটাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেব। আজ একেবারে মনস্থির করে তোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। তা জানিস ত' শুভ কাজে ভগবান সহায় হন। পথেই তোকে পেয়ে গেলাম। একটু দম নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলে, তা দ্যাখ, আমি সব ঠিক করেই রেখেছি। চৌধুরীদের বাড়ি নতুন পাঠশালা হচ্ছে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সেইখানে শ্যামকে ভর্তি করে দেব, দেখবি দু'দিনের মধ্যে ও একেবারে বিদ্যের জাহাজ হয়ে উঠবে।

দুখীরাম আর একবার ফিচ্‌কেরামকে মাথা নীচু করে প্রণাম জানিয়ে বললে, তা দেখুন কর্ত্তা, কথাগুলো ত' আপনার ভালোই। শ্যামকে আপনি নিয়ে বিদ্যের জাহাজ করে দেবেন। অত ভরসা আমি করি না। বিদ্যের একটা ছোটখাটো ডিঙি নৌকো করে দিলেই হবে বাবু। তারপর গলা খাটো করে শুধোলে, তা বাবু, কত করে আপনি রোজ দেবেন সেইটে বলুন। অবাক হয়ে ফিচ্‌কেরাম জিজ্ঞেস করে, তুমি বলছ কি দুখীরাম? লেখাপড়া শেখানো হবে—তারমধ্যে আবার রোজের কথা ওঠে কি করে?

দুখীরাম মাথা নীচু করে জবাব দেয়, আজ্ঞে বাবু সবই ত' বুঝলাম, কিন্তু পেটের কথা ভুললে ত' চলবে না? গাঙ্গুলীবাড়িতে আমরা বাপ-ব্যাটাতে খেটে আট আনা করে রোজ পাচ্ছি। ওকে রোজ না দিলে ত' আমি পাঠশালায় দিতে পারবো না। আপনি না হোক ভেবে-চিন্তে যা হয় ঠিক করে আমায় পরে জানাবেন। আচ্ছা, তাহলে এখন আসি বাবু, সারাদিন মুড়ি ছাড়া কিছু জোটেনি, সন্ধ্যের পর দুটো চাল ফুটোনো হবে তবে বাপ-ব্যাটায় কিছু মুখে দিতে পারবো।

দুখীরামও পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল। ফিচ্‌কেরাম একেবারে অসহায়। দাঁত কিড়িমিড়ি করে আর সাপের মন্তর আউড়ে পথ চলে। সেই দিন সন্ধ্যের পর নায়েবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তার কি শলা-পরামর্শ হল তা কেউ জানে না।

গভীর রাত্রে জল-বিছুটি গাঁয়ের লোক 'আগুন' 'আগুন' চীৎকারে জেগে উঠল। আকাশ যেন একেবারে লালে লাল হয়ে উঠেছে। কার বাড়িতে আগুন লাগলো? এমন করে কপাল ভাঙ্‌ল কার?

সবাই ছুটলো—কারো হাতে কলসী, কারো হাতে ঘটি, কেউবা নিয়েছে বালতি—। হাতে দা নিয়ে ছুটলো কেউ কেউ। চালা কেটে যদি বাঁচানো যায়। কিন্তু বৃথা।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে—সামন্ত পণ্ডিতের বাড়িতে আর পাঠশালায়। যারা আগুন নেভাবে বলে ছুটে এসেছিল তারা একেবারে অসহায়ের মতো হায় হায় করতে লাগলো। আগুন এমনভাবে জ্বলে উঠেছে যে কিছু বাঁচানোর যো নেই।

সবাই পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে এই সর্বনাশটা দেখতে লাগলো।

পণ্ডিতের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিচ্‌কেরাম বললে, এইবার পড়বার লোকের অভাব হবে না; আর পাঠশালার জন্যে পণ্ডিতও দিব্যি জুটে যাবে। নায়েব হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ এক ঢিলে দুই পাখী।

।। দশ ।।

পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের চোখে ঘুম নেই। পূবপাড়ার চৌধুরীবাড়ি ক্রমাগত তাদের উঁচু মাথা হেঁট করে দিচ্ছে, কিছুতেই ওদের মনের মতো জব্দ করা যাচ্ছে না।

একি কম লজ্জার কথা।

গাঙ্গুলীবাড়িতে যাত্রা-গানের আসরে ওরা কেমন বাড়ি-চড়াও হয়ে কৌশলে সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর আবার এই পাঠশালা নিয়ে বিবাদ। গাঙ্গুলীবাড়ির আশ্রিত সামন্ত পণ্ডিতের বাড়ি আর পাঠশালায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া মানে ওদের মুখ লোকসমাজে পুড়িয়ে দেওয়া।

যে ক'রে হোক চৌধুরীবাড়ির ওপর এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কোন্ পথে যে প্রতিশোধ নেবে ফাল্গুন কোনো মতেই তার হদিশ পায় না।

রাগে দুঃখে ফাল্গুন নিজের ঘরের ভেতর খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, আর নিজের আঙ্গুল নিজেই কামড়াতে থাকে।

আঙ্গুল কামড়াতে কামড়াতে তার ভেতর থেকে যে রক্ত বেরিয়ে গেল সেদিকেও তার এতটুকু হুঁস নেই।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলো ময়নাচাঁদ।

ময়নাচাঁদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। কোনো রকমে দম নিয়ে বললে, চন্দনের কাণ্ড দেখেছিস্ ফাল্গুন?

আবার কি নতুন ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসল ছেলেটা? ফাল্গুন এমনিতেই ত' তপ্ত খোলায় গরম বালি হয়েছিল, ময়নাচাঁদের কথায় যেন খৈ ফুটে উঠল।

বললে, কি আবার নতুন কাণ্ড করেছে চন্দন শুনি? ময়নাচাঁদ চোখে মুখে কৌতুক আর বিস্ময় ছড়িয়ে বললে, শোন তবে মজাটা। আমি গিয়েছিলাম ওপাড়ার একটা কাজে। আমায় ডেকে হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁরে ময়না, পূবপাড়ার সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার নৌকো বাচ দিবি? আমিই বা পেছু হটে আস্‌বো কেন? বললুম, পশ্চিমপাড়া সবসময়ই প্রস্তুত। লড়তে রাজি আছিস? ও বললে, নিশ্চয়। তা হলে আসছে কালই হয়ে যাক্ নৌকো বাচের লড়াই? আমিও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এলাম।

উত্তেজনায় ময়নাচাঁদের গোটা দেহ দুলতে লাগলো।

একটা সাঙ্ঘাতিক সঙ্ঘর্ষই এখন ফাল্গুন চায়। এমন একটা কাণ্ড অবিলম্বে হওয়া দরকার যাতে বেশ খানিকটা রক্তপাত হয় কিম্বা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে—যেমন নাকি ওর মনের মধ্যে জ্বলছে।

নৌকো বাচের প্রতিযোগিতা? বেশ তাতেই বা আপত্তি কি?

ফাল্গুনের ইচ্ছে হচ্ছিল পূবপাড়ার লোকদের সবাইকে ওদের একেবারে জলের

অতল তলে তলিয়ে দেয়। তাতে যদি তার রাগ খানিকটা পড়ে। ময়নার্চাদ চন্দনের কথায় সায় দিয়ে এসেছিল বটে .... কিন্তু মনে তার একটা ভয় ছিল—যদি ফাল্গুন রাজি না হয় তবে চন্দনের কাছে ওর মুখ থাকবে কি করে? উঁচু গলায় সে জবাব দিয়ে এসেছে।

এখন ফাল্গুনের সম্মতি পেয়ে ময়নার্চাদের উৎসাহ আর উদ্দীপনা শতগুণ বেড়ে গেল।

বললে, তা হলে কাকে-কাকে খবর দেওয়া যায়—বল ত' ভাই ফাল্গুন,—আমি এখুনি ছুটবো।

ফাল্গুনও বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জবাব দিলে, নৌকো বাচের ব্যাপারে আর ভয়টা কি শুনি? চিরটাকালই ত' পশ্চিমপাড়া পূবপাড়াকে হারিয়ে দিয়েছে। তুই এখুনি চলে যা ভাই ময়নার্চাদ,—ডেকে নিয়ে আস্‌বি—নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগ্‌নীকে। তারপর আর সবকিছু ঠিক করে নিতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হবে না।

ময়নার্চাদ ত' এই-ই চায়।

ঝড়ের বেগে সে বেরিয়ে গেল সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকে আনবার জন্যে।

এইবার ফাল্গুনের উত্তপ্ত মগজে যেন ভোম্‌রা বন্‌বন্‌ করে উড়তে লাগলো। যে করে হোক পূবপাড়ার দর্প চূর্ণ করতেই হবে। সে যেন চোখের ওপর দেখতে লাগলো—খালের দুধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেছে—পূবপাড়ার আর পশ্চিমপাড়ার নৌকা বাচ দেখ্‌তে। যে দল জিতবে তার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মাতিয়ে দেবে গাঁয়ের লোক।

একদলের দলপতি চন্দন আর একদলের অধিকর্তা ফাল্গুন। খালের এক পারের দল পূবপাড়াকে আর এক পারের দল পশ্চিমপাড়াকে গলা ফাটিয়ে উৎসাহিত করে তুলছে। কেউ কেউ অতি উৎসাহে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটতে সুরু করে দিয়েছে। ঐ তো পশ্চিমপাড়ার ছিপখানি বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে চলেছে। ছিপের ওপর বসে মাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক, ঘুগ্‌নী ও আরো কয়েকটি ছেলে। পেছনে হাল ধরেছে—ময়নার্চাদ।

আনন্দে ও উল্লাসে পশ্চিমপাড়ার লোক উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, পূবপাড়ার ছিপখানির আর কোনো আশাই নেই। বেশ খানিকটা পেছনে পড়ে গেছে তারা। ফাল্গুনের শিরায় যেন রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। এমনি ভাবেই পূবপাড়াকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে—প্রতি কাজে, সকল প্রতিযোগিতায়।

বাড়ির ভেতর থেকে চাকর এসে বললে, দাদাবাবু, রাত অনেক হয়ে গেছে ... মা ঠাকরুণ আপনাকে খেতে ডাকছেন।

ফাল্গুনের হুঁস ফিরে এলো।

সত্যি সত্যিই নৌকোবাচে পশ্চিমপাড়া এখনো জয়লাভ করতে পারে নি। সে এতক্ষণ মনে মনে আকাশ কুসুম রচনা করছিল।

কিন্তু আকাশ কুসুমই বলো আর দিবাস্বপ্নই বলো—একে জাগ্রত, জীবন্ত আর সত্যে পরিণত করে তুলতে হবে।

অন্যমনস্ক ভাবে ফাল্গুন অন্দর মহলে খেতে চলে যায়। আনমনে সে শুধু খাবার নাড়াচাড়া করতে থাকে। আগ্রহ নিয়ে খাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

মা তার আনমনা ভাব লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে খোকন, পাতের ওপর ত' শুধু আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিস্— ওগুলো কি মুখে তুলতে হবে না?

ফাল্গুনের মনে ভেতর তখন সত্যি যেন আগুন জ্বলছে, মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। সে শুধু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, ক্ষিদে নেই মা।

কিন্তু তার মা ক্ষিদে না থাকবার কোনো কারণই খুঁজে পেলেন না। কেননা প্রতিদিন এর অনেক আগেই ফাল্গুন রাত্তিরের খাবার খেয়ে থাকে। আর তাছাড়া সে যে সব রান্না পছন্দ করে সেদিন রাত্তিরে তাই তৈরী করা হয়েছিল।

আপনমনে মা ভাবতে থাকেন ছেলের কোনো অসুখ করল কিনা! কিন্তু তখন যে ছেলের মগজে নৌকো তীরবেগে ছুটে চলেছে … আর রাশি রাশি বৈঠা পড়েছে খালের জলে—তা তিনি কি করে জানবেন!

রাত্তিরের খাওয়ার পালা শেষ করে ফাল্গুন নিজের ঘরে ফিরে এলো।

মনে মনে তার এ বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে ময়নাচাঁদ আর একবার তাকে খবর দিয়ে যাবে—তা যত রাতই হোক না কেন!

একটি চাঞ্চল্যকর ডিটেকটিভ উপন্যাস হাতে নিয়ে সে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে।

খানিকক্ষণ পাতা ওল্টাবার পর তার মনে হল যে, উপন্যাসের ঘটনা তার মগজে ঢুকছে না … সে শুধু অকারণেই বইয়ের পাতার ওপর চোখ মেলে রেখেছে!

এইবার সে বুঝতে পারলে যে, তার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে—কিভাবে পূবপাড়াকে জব্দ করা যায়! সেখানে ডিটেকটিভের গল্প, গোয়েন্দার কাহিনী চেষ্টা করেও ছুঁচ গলাতে পারছে না; ও বইটা ফেলে দিয়ে ফাল্গুন আর একটা ভুতুড়ে গল্প টেনে নিলে।

যে ভুতুড়ে ব্যাপার পেলে ফাল্গুন দুনিয়াতে আর কিছুই চায় না—তাকেও খানিকবাদে একদম আলুনি বলে মনে হল!

ভূতও যাকে ভয় পায় … সেটা হচ্ছে প্রতিহিংসা। সত্যি … বার বার হেরে

গিয়ে ফাল্গুন আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। পূবপাড়াকে যে কোনো রকমে হোক শায়েস্তা করতেই হবে।

ময়নাচাঁদ কখন আসবে কে জানে!

এমনও ত' হতে পারে যে আজ রাত্তিরে সে আসবে না, কাল সকালবেলা এসে—খবর দিয়ে যাবে। ঘড়ির দিকে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়তেই দেখলে যে, বারোটা বেজে গেছে।

ময়নাচাঁদ এত রাত্তিরে এসে হয়ত ওর ঘুম ভাঙাতে চাইবে না। এই মনে করে ফাল্গুন গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

ঠিক সেইসময় ময়নাচাঁদ নৌকো করে পশ্চিমপাড়ার বিভিন্ন ঘাঁটিতে নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজ রাত্তিরের মধ্যে সবাইকে খবর তাকে দিতেই হবে। কথা ছিল, দলের সবাইকে জুটিয়ে নিয়ে আজই হাজির হতে হবে ফাল্গুনের বৈঠকখানায়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলে, ইতিমধ্যে রাত অনেক হয়েছে। এই গভীর রাত্তিরে দলবল নিয়ে বোধ করি আর গাঙ্গুলীবাড়ি যাওয়া চলবে না। আসছে কাল সকালেই গিয়ে জুটতে হবে। কিন্তু তার আগে সককে খবর দেওয়া চাই।

গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ময়নাচাঁদ জোরে জোরে নৌকোর বৈঠা টানে।

তর্ তর্ করে এগিয়ে চলে ময়নাচাঁদের নৌকো। ঠিক এই সময় চৌধুরীবাড়ির চন্দনের ঘরে ফিস্‌ফিস্ করে কয়েকটি ছেলে অতি গোপনে কি যেন শলা-পরামর্শ করছিল। তারা সবাই মিলে এতগুলি মাথা একসঙ্গে করে কি আলোচনা করছিল সেকথা কিছুই শোনা গেল না। শুধু একজনের গলা একটু উঁচু পর্দায় উঠল।

সে শুধলো, রাজী হবে?

জবাব—রাজী আবার হবে না।

—কিন্তু ভার নেবে কে?

তখন সবাই চুপচাপ।

কেউ সে কাজের ভার নিতে রাজী নয়।

ঘরের মাঝখানে ছুঁচ পড়লেও শোনা যায় এমনি একটা স্তব্ধতা থমথম করতে লাগলো।

একজন বললে, বেশ তোরা রাজী না থাকিস আমি নিজে যাব—

সবাই অবাক হয়ে বললে, তুই।

উত্তর শোনা গেল,—হ্যাঁ আমি।

তারপর সেই গোপন-সভা ভেঙে গেল।

অনেক রাত্তিরে ময়নাচাঁদ বাড়িতে ফিরে এলো। একটা হিজল গাছের ডালে তার ডিঙি -নৌকাটি বেঁধে রেখে গুন-গুন করে গান গাইতে সে বাড়ির দিকে এগোল।

এমন সময় অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা ছায়ামূর্তি ওর দিকে এগিয়ে এলো। ভূতের ভয় ময়নাচাঁদের নেই।

রাত-বিরেতে শ্মশানে-মশানে বাজি রেখে ঘুরে বেড়াতে সে ওস্তাদ। কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই।

সে হাতের বৈঠেটা জোর করে বাগিয়ে ধরলে। তারপর মনের ভয়টা কাটিয়ে ফেলবার জন্যে হাঁক দিলে, কে তুই ··· আগে নাম বল।

চাপা-গলায় জবাব শোনা গেল,—ওরে ভয় নেই রে, আমি—

এ যে ভূতের চাইতে ভয়ানক!

এত রাত্তিরে চৌধুরীবাড়ির চন্দন—একা—তার কাছে !

সত্যি ভারী ভড়কে গেল ময়নাচাঁদ।

প্রথমটা তার মুখ দিয়ে কথাই বেরুলো না। তারপর আমতা আমতা করে বললে, অ্যাঁ। চন্দন! তুই!

চন্দন হেসে ফেললো।

বললো, তবু ভালো যে ভূত ভেবে ভয় পেয়ে আমার মাথায় বৈঠে বসিয়ে দিসনি।

ময়নাচাঁদের মনে সাহস ফিরে এলো।

জবাব দিলে, ভয় আমি পাইনে। কিন্তু তোর ব্যাপার কি বলত! নিশ্চয়ই গুরুতর একটা কিছু।

—হ্যাঁ খুব জরুরী কথা আছে—আয় আমার সঙ্গে।

দু'জনে বন-পথে একটু এগিয়ে গেল।

ময়নাচাঁদের একবার মনে হল—চন্দন হয়ত ঝোপের আড়ালে লোকজন লুকিয়ে রেখেছে—ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। চন্দন বললে, দ্যাখ ময়না, তুই ত' বাচের সময় হালে থাকবি, তোকে একটা কাজ করতে হবে।

ময়নাচাঁদ রাগ করে উত্তর দিলে, কি কাজ শুনি?

চন্দন বললে, আগে থেকে চটছিস্ কেন ? আমার কথাটাই না হয় মন দিয়ে শোন। কাল বাচের সময় দুটো নৌকাই যখন তীরবেগে ছুটে চলবে, তখন সবাইকে গোপন করে নৌকোর তলাটা দিবি ফাঁসিয়ে। তুই ত' থাকবি সবাইকার পেছনে—তাই ব্যাপারটা কেউ জানতেও পারবে না। এই নে ধারালো ছোট্ট একটা কুড়ুল—দিব্যি পকেটে রেখে দিতে পারবি।

ময়নাচাঁদ তেড়ে মেরে রেগে উঠে একটা শক্ত কথা শোনাতে যাচ্ছিল—এমন সময় চন্দন তার হাতটা টেনে নিয়ে পাঁচটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলে।

গাছের ফাঁক দিয়ে আসা ক্ষীণ চাঁদের আলোতে ময়নাচাঁদ ব্যাপারটা বুঝে নিল। তবু নিজের পাড়ার সুনাম তার হাতে। এই কথা ভেবে সে মাথা নেড়ে বলে উঠল, না ভাই, আমায় লোভ দেখিও না। পশ্চিমপাড়ার সুনাম আমাকে বজায় রাখতে হবেই।

চন্দন কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না। শুধু আরও পাঁচটি নোট নিঃশব্দে ওর হাতে গুঁজে দিল।

এইবার সাপের মাথায় যেন মন্তর পড়া ধূলো ছিটিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল অবশেষে প্রলোভনই জয়লাভ করল।

ময়নাচাঁদের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো না, একবেলা চলে ত' আর একবেলা উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। এই খবর চন্দন বেশ ভালো করেই জানত।

দারিদ্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাত্তিরের অন্ধকারে চন্দন অতি নীরবে ময়নাচাঁদকে জয় করে নিল।

বুঝলে এইবার যুদ্ধ-জয় সুনিশ্চিত।

তাই আর কোন কথা না বলে ছোট্ট কুড়ুলটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে চন্দন যেমন এসেছিল, ঠিক তেমন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন নৌকোবাচের সময়।

ফাল্গুন যেমন অনুমান করেছিল ঠিক তেমনি।

খালের দুই পারে অগণিত লোক।

একদল পশ্চিমপাড়াকে বাহবা দিচ্ছে, আর একদল পুবপাড়াকে তারিফ করছে।

দুই-দলেরই লোকজন উৎসুক আর নৌকোবাচের ছিপ তৈরী। দুটো নৌকোর সামনের গালুইতে তেল-সিন্দুর মাখিয়ে জবাফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধূপ, ধুনা জ্বালিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছে।

শঙ্খ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বেগে দুটো নৌকো ছুটবে। সারা গাঁয়ের লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে।

কাচ্চা-বাচ্চা থেকে সুরু করে বুড়ো-বুড়ী পর্যন্ত কেউ আর বাড়ির ভেতরে নেই। সবাই এসে জড় হয়েছে, এই খালের দু'ধারে। সবাইকার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, এরই ওপর যেন তাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

এমন সময় একসঙ্গে বহু শঙ্খ ধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেতভাবে উল্লাস ধ্বনি—আর তার পরেই দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে পশ্চিমপাড়ার ছিপখানি পুবপাড়ার ছিপকে পিছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল।

ফাল্গুনের আনন্দ দেখে কে।

সে একটা নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে পাগলের মতো লাফাতে শুরু করে দিলে।

কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, কেউ ভালো করে বোঝবার আগেই পশ্চিম-পাড়ার ছিপখানি খালের জলে কাৎ হয়ে পড়ে ডুবে গেল। যারা বৈঠা চালাচ্ছিল, তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পারের দিকে সাঁতরাতে সুরু করে দিলে।

ছুটে এল সাহায্যকারীর দল, প্রাথমিক চিকিৎসার দল আর ডাক্তারেরা। গায়ে যাদের শক্তি আছে—তারাও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবসন্ন অনেককে টেনে তীরে নিয়ে এল।

ইতিমধ্যে জয়-পরাজয়ের চরম মীমাংসা হয়ে গেছে। পশ্চিমপাড়ার দল পরম লজ্জায় মুখ নীচু করে নিজেদের পাড়ায় ফিরে এল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই।

কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দেবারও ব্যবস্থা ছিল।

বিকেলের দিকে একদল লোক সং সেজে বেরুল। তারা নৌকা করে খাল দিয়ে দুই পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সঙ্গে তাদের কয়েকটা ঢাক, ঢোল আর কাঁসি!

বাদ্যি বাজিয়ে, চ্যাচামেচি করে আর ছড়া কেটে তারা জলবিছুটি গাঁটাকে তোলপাড় করে তুলল।

পূবপাড়ার ছোট ছোট ছেলেরাও সেই ছড়া কাটায় যোগ দিলে—

আগা গলুই পাছা গলুই
নড়বড় করে—
পশ্চিমেরি নাওখানি ভাই
তলা খসে মরে!
মরি হায়—হায় রে!

।। এগারো ।।

ফাল্গুন যে নৌকাবাচে অমনভাবে হেরে যাবে—সে কথা আদপেই ভাবতে পারেনি।

ওর মনে একটা অহঙ্কার আর গর্ব ছিল।

আর সে গর্ব ফাল্গুন করতে পারে। কেননা, নৌকোবাচের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমপাড়া চিরকাল জিতে এসেছে। এবারও যে সে জিতবে, সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কি করে যে হঠাৎ ওদের নৌকোটা এমনভাবে ডুবে গেল—সে কথা এখনও সে ধারণা করতে পারছে না।

অন্যান্য বন্ধুরা এসে অবশ্য ওকে সান্ত্বনা জানাচ্ছে, আর কেউ কেউ এ পরামর্শও দিচ্ছে যে আবার নতুন করে নৌকোবাচের ব্যবস্থা করা হোক, দেখি তখন কে জেতে। বারেবারেই ত' আর পশ্চিমপাড়ার নৌকো ডুবে যাবে না।।

এ পরামর্শটা যে মন্দের ভালো সেকথা ফাল্গুন বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু নতুন করে নৌকো বাচের ব্যবস্থা করার মতো উৎসাহ সে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ তার কি খেয়াল হল।

সে তাদের কয়েকজন চাক্‌রাণ-মাঝিকে ডেকে পাঠালো।

তারা এসে হাজির হতেই বলল, দেখ্‌, তোরা এক কাজ কর। ওদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল, কি কাজ হুজুর?

ফাল্গুন বলল, এক্ষুণি তোরা কয়েকজন খাল ধারে চলে যা। নৌকোবাচে যেখানে আমাদের ছিপটা ডুবে গেছে, সে জায়গাটা দেখেছিলি ত'?

ওদের মধ্যে যে মোড়ল সে জবাব দিলে, আজ্ঞে কর্তা দেখেছি বৈকি। আমি খালের ধারে সেই জায়গায় সোজাসুজি একটি খোঁটা অবধি পুঁতে এসেছি—

ফাল্গুন ওর কথা শুনে খুশী হল।

উত্তর দিলে, তা হলে ত' কাজ অনেকটা এগিয়েই রেখেছিস। এখন তোরা এক কাজ কর।

—কি হুজুর? ওদের কাছ থেকে সাগ্রহে প্রশ্ন আসে।

কেন-না, এই যে পরাজয়—সেটা ত' ওদেরও মনে লেগেছে। পশ্চিমপাড়ার সকলেরই এই হার। সবাই এই পরাজয়ের গ্লানি সমান-ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। এ সম্পর্কে যে কোনো কাজে তারা এগিয়ে আসতে চায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত রেখে সকল রকমে সহযোগিতা করতে ওরা উৎসুক। কিন্তু নিজেদের আন্তরিকতার কথা গুছিয়ে বলতে পারে না।—তাই অনেক সময় নির্বাক থাকে।

ওদের প্রাণ আছে, নিষ্ঠা আছে আর আছে মিলেমিশে কাজ করবার আগ্রহ। তাই ফাল্গুন যখন ওদের এগিয়ে এসে একটা কাজের ভার নিতে বললে—তখন যেন ওরা সত্যি কৃতার্থ হয়ে গেল।

ওদের মোড়ল আবার বললে, আপনি শুধু হুকুম করুন কর্তা, আমরা জান-প্রাণ দিয়ে খেটে আপনার কাজ উদ্ধার করে দেবো।

ফাল্গুনের মুখে আবার হাসির রেখা দেখা গেল। বললে, হ্যাঁ এইরকম কাজ পাগ্‌লা মানুষই ত' আমরা পছন্দ করি।

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে দ্যাখ এক কাজ কর তোরা।

খাল থেকে—ওই নৌকোটা তুলে ফেল্। কোনো অসুবিধে হবে না ত' তোদের। অবশ্য আমি সবাইকে বক্‌শিস দেবো।

ওরা গরীব হতে পারে কিন্তু বুকের পাটা আছে ওদের—তাই মন ওদের দিলদরিয়া।

ওদের দলের হয়ে মোড়ল বললে, দেখুন কর্তা, এ ত' আমাদের পাড়ার ইজ্জতের কাজ। আপনি কিন্তু কিন্তু হয়ে বলছেন কেন? আপনি শুধু হুকুম করে যাবেন—আর আমরা সেই হুকুম তামিল করব।

—আচ্ছা বেশ। খুব ভালো কথা। তোরা নৌকোটাকে জল থেকে তুলে ফেল্। আমি আসছি।

খুব খুশী মনে সবাই কোমরে গামছা বেঁধে খালের দিকে চলে গেল।

ফাল্গুন খালি ঘরে বসে আপনমনে ভাবতে লাগল, কেন তাদের এই পরাজয়? ওদের দলে যারা বৈঠে ধরেছিল,—সারা গাঁয়ে তাদের মতন জোরদার মানুষ আর সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বৈঠে চালানোর পদ্ধতিও তাদের চমৎকার। এত সহজে তাদের হারিয়ে দেয়া সোজা কথা নয়। আর ওই নৌকো ডুবে যাওয়ার ব্যাপারটা। ছিপটা একেবারে নতুন ছিল। তলা ফেঁসে যাবে কিংবা নৌকোয় জল উঠবে এমন কোনো সম্ভাবনাই ত' নেই। তবু কেন এই গোলমেলে কাণ্ডটা ঘটল?

বাড়ির ভেতর খবর পাঠালো এক কাপ গরম চায়ের জন্য। নইলে কিছুতেই মগজে বুদ্ধি আসছে না।

একটু বাদেই ওর খাস্-চাকরটা ধূমায়িত এক কাপ চা দিয়ে গেল।

ফাল্গুন একটু একটু করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর বুদ্ধির জট-ছাড়াবার চেষ্টা করছে—এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে মাঝির দলের মোড়ল এসে হাজির হল ওর সামনে।

কাপ থেকে মুখ তুলে ফাল্গুন জিজ্ঞেস করলে, কিরে এমন ছুটতে ছুটতে আসছিস্ কেন? নৌকো খুঁজে পাওয়া গেল না?

—নৌকো পাওয়া যাবে না কেন কর্তা? সে আমরা সবাই মিলে সাঁতরে টেনে টেনে তুলেছি।

—তবে?

একটা গোলমেলে কাণ্ড যে দেখলাম হুজুর। সেই কথা বলতেই ত' আপনার কাছে ছুটে এলাম।

—গোলমেলে কাণ্ড? ব্যাপার কি খুলে বলত।

—আজ্ঞে, নৌকোর তলা কে কুড়ুল দিয়ে ফাঁসিয়ে দিল ?

—কর্তা, একটা কথা বলব ?

—বল না রে! কিছু জানিস নাকি ?

—আজ্ঞে না। জানি নে কিছুই। তবে এইটুকু বুঝতে পারছি যে, পশ্চিমপাড়ার দলের কেউ বেইমানী করেছে।

—ঠিক বলেছিস। নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পাড়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু কি করে জানা যাবে—কে সেই বেইমান?

—জানবার উপায় আছে হুজুর।

—উপায় আছে ? কি উপায় বল ত'? আমি ত' কিছুই আন্দাজ করতে পারছি নে।

—হুজুর সেই ছোট কুড়ুলটা আমি নিয়ে এসেছি।

—কিন্তু ওটা কার কুড়ুল কি করে জানা যাবে? নাম খোদাই করা ত' আর নেই।

—আজ্ঞে, গাঁয়ে একজনই কামার আছে। বসন্ত কামার। আমরা সবাই অনুমান করছি—এ কুড়ুল বসন্ত কামারেরই হাতের তৈরী। তাকে কর্তা এত্তেলা দিয়ে ডেকে পাঠান। কে এই কুড়ুল ফরমাস দিয়ে তৈরী করেছিল—সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জানা যাবে তাহলে!

ফাল্গুন ওর কথা শুনে ভারী খুশী হল। বললে, আরে! তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি! লেখাপড়া শিখলে যে তুই নামকরা গোয়েন্দা হতে পারতিস্! মাঝিদের মোড়ল ফাল্গুনের মুখে এই প্রশংসা শুনে ভারী লজ্জা পেল।

মাথা নীচু করে উত্তর দিলে, কি যে বলেন কর্তা! আমরা শিখব লেখাপড়া—আর আমরা হব গোয়েন্দা ? হুজুরদের পায়ের তলায় পড়ে আছি—সেই আমাদের সাত পুরুষের ভাগ্যি।

ফাল্গুন আর সময় নষ্ট করতে চায় না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, তোর বকশিসের ব্যবস্থা আমি পরে করছি। আমাদের একটা পেয়াদাকে ডেকে দে'ত ? আর ওকে ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে দে; যাতে সে বসন্ত কামারকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসে। কোনো ওজর—আপত্তি শুনে যেন ওকে ছেড়ে আসে না।

মাঝিদের মোড়ল উত্তর দিলে, সেজন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না কর্তা! আমি একজন পেয়াদাকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক্ষুণি বসন্ত কামারের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মোড়ল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফাল্গুন অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগ্‌লো নিজের ঘরে। নিজেদের দলের মধ্যে এই রকম বেইমান সে পুষে রেখেছে? সেখানে জয় একেবারে সুনিশ্চিত—সেখানে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল।

আচ্ছা, কুড়ুল নিয়ে এসে এমনভাবে নৌকোর তলা ফাঁসিয়ে দিলে কে?

এক এই হতে পারে যে, নৌকা বাচ সুরু হবার আগে পুবপাড়ার দলের কেউ গোপনে এসে সবার অজান্তে এই কাণ্ডটি করে গেছে। আর না হয়. পশ্চিমপাড়ার দলের কেউ শত্রুপক্ষের টাকা খেয়ে দুষ্কর্ম করেছে।

এখন কাকে সে সন্দেহ করবে?

ফাল্গুন তার ছোক্‌রা চাকরকে ডাকলে।

বললে, দেখ, নৌকা-বাচের সময় যারা নৌকা চালিয়েছিল—সবাইকে আমার নাম করে ডেকে এক্ষুনি নিয়ে আয়, বলবি খুব জরুরী কথা আছে। ফাল্গুনবাবু এক্ষুণি আপনাদের সবাইকে ডেকেছেন।

ছোকরা চাকর মনিবের হুকুম তামিল করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মাঝিদের মোড়ল বসন্ত কামারকে নিয়ে হাজির হল ওর কামরায়

বসন্ত কামার ফাল্গুনকে প্রণাম করে ঘরের এক কোণে দাঁড়ালো। ও ঠিক বুঝতে পারে নি—কর্তা কেন অসময়ে আসতে তলব করেছেন। মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞেস করলে, হুজুর আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ? নতুন কিছু দা-কুড়ুল তৈরীর ফরমাস আছে নাকি?

ফাল্গুন একবার ওর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, কামারের পো, আজকাল নতুন ধরণের কি সব তৈরী করছ তুমি? অনেকদিন তোমার হাতের কোনো জিনিস তৈরী করাই নি। ভাব্‌ছি ফরমাস দিতেও পারি।

ফাল্গুনের কথা শুনে বসন্ত কামার আনন্দে গদ্‌গদ্‌ হয়ে উঠল। উত্তর দিলে. তা কর্তা, একটা নতুন ধরনের জিনিষ তৈরী করে দিয়েছি চৌধুরীবাড়ির চন্দনবাবুকে।

—জিনিষটা কি তাই আগে বল না।

—আজ্ঞে ছোট্ট একটি কুড়ুল। খুব ধার, পাগাল দেওয়া কিনা। বাগানের কাজে, গাছ গাছলা কাট্‌তে, জঙ্গল সাফ করতে সব সময় হাতে রাখা চলে। খুব হালকা মোটেই ভারী নয়।

ফাল্গুন শুধু বললে, হুঁ।

খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা মাঝির পো, কুড়ুলটা তুমি বসন্তকে একবার দেখাও ত'?

মাঝিদের মোড়ল তখন কুড়ুলটা বের করে বসন্ত কামারের সামনে ধরলে।

বসন্ত খুশী হয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে কর্তা এই ত' সেই কুড়ুল—চৌধুরীবাড়ির চন্দনবাবুকে আমি নিজে হাতে তৈরী করে দিয়েছি। বাবু বুঝি আপনাকে দেখতে পাঠিয়েছেন ?

মাঝিদের মোড়ল চোখদুটো বড় বড় করে কামারের পো কে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ফাল্গুন চোখের ইসারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ঠিক এইরকম একটি কুড়ুল আমাকে কিন্তু তৈরী করে দিতে হবে বসন্ত। এর চাইতেও তার ধার যেন বেশী থাকে।

বসন্ত কামার আনন্দে গলে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে উত্তর দিলে, আজ্ঞে, তৈরী করে দেবো বৈকি ! ওটার চাইতেও সুন্দর আর ধারালো হবে আপনার কুড়ুলটি। ইচ্ছে করলে আপনি পকেটে ফেলেও যাতায়াত করতে পারবেন।

—বেশ তাই করে দাও। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চাই। এই নাও পাঁচ টাকা আগাম।

ফাল্গুন পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলে।

—আজ্ঞে আপনাদের খেয়েই ত' মানুষ। এ আপনি পরে দিলেও পারতেন।

এই বলে নোটখানি সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে আর একবার ভক্তিভরে প্রণাম করে বসন্ত কামার বেরিয়ে গেল।

ফাল্গুন এইবার মোড়লের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ ভাই মোড়ল, আমি যে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছি—সে কথা এই কামারের পো কে বুঝতে দিতে চাইনে।

মোড়ল উত্তর দিলে, আজ্ঞে সে কথা ত' সত্যই। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—সব সময় কি সব কথা বুঝতে পারি ?

ফাল্গুন বললে, আচ্ছা ঠিক আছে। এইবার তোমরা গিয়ে সবাই বিশ্রাম কর গে, ও বেলা তোমায় আমি আবার ডেকে পাঠাবো।

—আজ্ঞে ডেকে পাঠাতে হবে না। হুজুরের কাছে আমি নিজেই এসে হাজির হব।

এই বলে প্রণাম জানিয়ে মাঝিদের মোড়ল ফাল্গুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ততক্ষণে নৌকা বাচের দলের সকলেই এসে হাজির হয়েছে।

ফাল্গুন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওর ঘরের দরজা বন্ধকরে দিলে, তারপর একে একে সব কথাই তাদের খুলে বলল।

সেই ছোট্ট কুড়ুলটা. দেখাতেও ভুললে না।

দলের সবাই এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে একেবারে গুম হয়ে গেল।

সকলেই ভাবছে— কেউ আমাকে সন্দেহ করছে না ত'?

ঐই জাতীয় পরিস্থিতি সত্যিই কষ্টদায়ক! মন খুলে কেউ কথা বলতে পারে না—অথচ একটা অসহ্য বেদনা বুকের ভেতরে গুমরে ফিরতে থাকে।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, তাইত! আমরা সবাই রয়েছি, কিন্তু ময়নাচাঁদকে ত' দেখা যাচ্ছে না।

সত্যিই ত' ! এইবার সকলেই সচেতন হয়ে উঠল। ময়নাচাঁদ আসেনি কেন?

ফাল্গুন ভাবলে, তাইত । হঠাৎ ময়নাচাঁদের কি হল? সে তার ছোকরা চাকরকে ডেকে পাঠালে।

চাকর এসে উত্তর দিলে, আজ্ঞে বাবু, ময়নাচাঁদবাবুকে তাঁর বাসায় পাইনি। তিনি কোথায় গেছেন—বাড়ির লোকজন বলতে পারলে না। সবাই কেমন যেন আমতা আমতা করতে লাগল।

আম্‌তা-আম্‌তা ?

এক মুহূর্তে সকলেই যেন কিসের গন্ধ পেয়ে সজাগ হয়ে উঠল। এই যে পশ্চিমপাড়ার পরাজয়—এতে সকলের মনেই দারুণ আঘাত লেগেছে—আর সেই পরাজয় যে বিশ্বাসঘাতকতা করে ডেকে এনেছে, তাকে ত' কোনো মতেই ক্ষমা করা যেতে পারে না।

ফাল্গুন বললে, ওর বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। প্রলোভনে পড়ে ও চন্দনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বসে নি ত'?

ফাল্গুনের কথা শুনে সকলেরই চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সবাই বললে, না, না, ময়নাচাঁদকে কিছুতেই ক্ষমা করা চলে না।

ফাল্গুন বললে, এখন আমার খেয়াল হচ্ছে । সেই নৌকাবাচের পর থেকে ময়নাচাঁদ আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে । তারপর আর একববারও সে আমার কাছে আসে নি । ব্যাপারটা কি?

একজন বলে উঠল,—যার মনে পাপ আছে সে ত' পালিয়ে বেড়াবেই। আমিও কাল ওর বাসায় একবার গিয়েছিলাম। ওর ভাই বললে, কোথায় যেন নেমন্তন্ন আছে।

নেমন্তন্ন।

আরো সচকিত হয়ে উঠল সকলে!

কে বললে, আবার চন্দনদের বাড়িতে লুকিয়ে নেই ত'? ভেবেছে সত্যি কথা ত' একদিন বেরিয়ে আসবেই । তখন সে আমাদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? ফাল্গুন এইবার চটে মটে লাফিয়ে উঠল। বললে, ওর কথা আমি একবারও ভেবে দেখিনি । এখন মনে হচ্ছে এই বেইমানী ওরই। আমার হয়েছে একচক্ষু হরিণের দশা। যেদিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কাই করিনি—তীর এসে লেগেছে সেই অঞ্চল থেকে।—যা হবার ত' হয়ে গেছে । কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না । ওকে ধরে আনতেই হবে। তোমরা সবাই প্রতিজ্ঞা কর—যে করেই হোক্—চন্দনের খপ্পর থেকে ময়নাচাঁদকে ছিনিয়ে আনতে হবে।

—হ্যাঁ, আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করলাম।

।। বারো ।।

চৌধুরীবাড়ির একটি গোপন কক্ষ।

সদর আর অন্দরের মাঝখানে এই নিরিবিলি গোপন ঘর। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে, ভেতরে একটি সুন্দর ঘর আছে। চারদিকে ধানের মড়াই এমনভাবে সাজানো যে, মনে হবে—মড়াই ছাড়া এখানে আর কিছু নেই।

কথা হচ্ছিল চন্দন আর ময়নাচাঁদে।

ময়নাচাঁদ এরই মধ্যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে।

সে বললে, ভাই চন্দন, এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে আমি ক'দিন থাকবো? বাড়ি যেতে পারছিনে, ভাই-বোনদের কি দুর্দশা হল তা জানতে পারছিনে, বন্ধু-বান্ধবরা আর কেউ আমার মুখ দর্শন করবে না। কী কুক্ষণেই টাকার লোভে তোর কথায় আমি রাজি হলাম। নিজের কোলের ওপর সে মাথা নীচু করে অসহায়ের মতো বসে রইল।

চন্দন ওর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল, অত অস্থির হয়ে উঠলে কি চলে ভাই? আমি কি চুপ করে বসে আছি? তোর কোনো চিন্তা নেই—সব ব্যবস্থা আমি এর মধ্যে করে ফেলেছি। তোর বাড়িতে গোপনে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। তোর ছোট বোনটা জ্বরে ভুগছে—সে এমন কিছু নয়। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। তাছাড়া তুই যে আমার এখানে লুকিয়ে আছিস—তা ফাল্গুন ত' ফাল্গুন—গাঁয়ের কাকপক্ষীতেও জানতে পারবে না।

একটু থেমে চন্দন বললে, দিব্যি আরাম করে এখানে খা' দা' থাক— তারপর দিন দশেক বাদে একদিন ভুস্ করে বেরিয়ে গিয়ে বলবি—মাসির বাড়িতে ঘুরে এলাম। তখন তোকে কে কি বলতে পারে—আমি দেখ্‌বো।

ছোট বোনটার জ্বর হয়েছে শুনে কিন্তু মন ভারী খারাপ হয়ে গেল। ছোট বোনটা ওর ভারী ন্যাওটা। ওকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারেনা। ওর সঙ্গে সকাল-বিকেলে বেড়ানো চাই। আবার ওর সঙ্গে দুবেলা না খেলে ভোম্‌রীর পেটই ভরে না।

ভোম্‌রী নামটা ময়নাচাঁদের দেয়া।

দেখ্‌তে কালো হলে কি হবে?

চোখ দুটো ভোম্‌রীর ভারী সুন্দর। ভ্রমরের মতই সারাদিন ঘুরঘুর করছে— আর গুনগুন করে গান গাইছে। ওর ছোটবোন কখনো চুপচাপ বসে থাক্‌তে পারে না। হয় গল্প করবে—না হয়—গুন-গুন করে গান গাইবে।

একটি পুরো গান সে কক্ষনো গায় না।

এ গানের এক কলি, ও গানের দু-লাইন, কোনো গানের আবার শুধু দুটি কথা এইভাবে এক গান থেকে আর এক গানে সে কেবলি লাফিয়ে চলে।

কিন্তু একটি ব্যাপারে ভোম্‌রীর প্রশংসা করতেই হবে। গানের সুরে কক্ষনো তার ভুল হয় না।

কীর্তন থেকে গজল—আবার গজল থেকে ভজন—ভজন থেকে টপ্পা—কিন্তু সুর ঠিক আছে।

সাধে কি আর ময়নাচাঁদ ভোম্‌রী নাম দিয়েছে ? নানা ফুলে ঘুরে বেড়ায় বটে কিন্তু মধুটুকু ঠিক সংগ্রহ করে নিতে জানে। গানের বনেও দিশেহারা হয়ে পড়ে না। প্রত্যেকটি সুর ঠিক—ঠিক গলায় তুলে নিতে পারে। তাই ত' কীর্তনের আসরে, যাত্রায়, কথকতায়, পাঁচালীর আসরে কবিগানে—ওকে নিয়ে যেতেই হবে। নইলে কেঁদে কেটে একে অনর্থ করবে ।

তার সেই ছোট্ট ভোম্‌রী-বোনটি জ্বরে পড়ে আছে—ময়নাচাঁদের মন কিছুতেই বশ মানছে না। হয়ত একা-একা বিছানায় শুযে ওর ভালো লাগছে না, এপাশ-ওপাশ করছে আর কেবলি সুন্দরদাকে ডাকছে।

ভোম্‌রী ময়নাচাঁদকে সুন্দরদা বলে ডাকে।

ভোমরী তার সুন্দরদাকে গান শোনাবে, নানারকম গল্প বলবে, গাঁয়ের সব খবব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনবে—তবে যদি তার মনে একটু স্বস্তি আসে।

ভোম্‌রীর ম্লান মুখখানির কথা ভেবেই ময়নাচাঁদ আরো বিমর্ষ হয়ে গেল।

চন্দন শুধোলে, এত আকাশ পাতাল কি ভাবছিস রে ময়নাচাঁদ ?—আমি ত' বলেছি তোর কোনো চিন্তা নেই। আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছি—সব কিছু ঠিক করে দেবো। শুধু গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনকে আমি উচিত শিক্ষা দিতে চাই।

তারপরে আপন মনেই হো হো কবে হেসে উঠল চন্দন ।—অবিশ্যি এর মধ্যেই তার বেশ শিক্ষা হয়ে গেছে । পশ্চিমপাড়ার ছিপটা যে অমন ভুস করে ডুবে যাবে—সে কথা বেচারী একবারও ভাবতে পারে নি । তুই বেশ করেছিলি ময়নাচাঁদ। এমনভাবে নৌকোর তলাটা ফাঁসিয়ে না দিলে আমাদের পক্ষে জেতা খুব শক্ত হত । ব্র্যাভো—ময়না—ওয়েল ডান। তোর গা কেউ ছুঁতে পাববে না—একথা তুই জেনে রাখ।

হঠাৎ ময়নাচাঁদের মাথাটা চন্‌ করে ধরে গেল।

চন্দনের অমন প্রশংসায় সে এইবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারল যে, তার নিজের পাড়ার প্রতি কতটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । সত্যিই ত' কেবলমাত্র তারই দোষে গোটা গাঁয়ের লোকের সামনে পশ্চিমপাড়ার মুখে অমন চুণ-কালি লাগলো ! সে যদি কয়েকটি টাকার লোভে চন্দনের কাছে হাত না পাততো তাহলে পশ্চিমপাড়া নৌকাবাচে নিশ্চয়ই জিতে যেত—আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত তাদের পাড়ায়। কতকগুলি লোকের মনে সে ব্যথা দিয়েছে, বন্ধুদের মনঃক্ষুণ্ণ কবেছে—সারাটা পাড়ার শত্রু হযে দাঁড়িয়েছে সে ! অথচ মজা এই যে,

যাদের সুখের জন্যে ও প্রলোভনকে জয় করতে পারে নি—ভিক্ষুকের মতো টাকা চেয়ে নিয়েছে—তাদের কাছেও সে যেতে পারছে না। চোরের মতো পালিয়ে রয়েছে একেবারে শত্রু-পুরীর মাঝখানে।

ফাল্গুন তাকে বিশ্বাস করতো বোধকরি সব চাইতে বেশী। আর সেই বিশ্বাসের মূলে সে কুঠারাঘাত করেছে।

কাজটা যে কত গর্হিত হয়েছে—সেকথা এখন ময়নাচাঁদ বুঝতে পারছে।

ময়নাচাঁদকে এমনভাবে ঝিমিয়ে পড়তে দেখে চন্দন বুঝতে পারল, বাড়ির জন্যে ওর সত্যি মন খারাপ হয়েছে।

তাই সে আর ওকে বেশী ঘাটাল না। শুধু মৃদুস্বরে বললে, তুই একটু শান্ত হ' —আমি তোর চা-জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চারদিকে ধানের মড়াই—তাই দিনের বেলাতেও ঘরটিকে অন্ধকার দেখায়।

ময়নাচাঁদ সেই ঘরে একা চুপচাপ বসে রইল।

চন্দন অবিশ্যি ওকে পড়বার জন্যে অনেকগুলি গল্পের বই আর ডিটেকটিভ উপন্যাস দিয়েছে—কিন্তু একে অন্ধকার—তাতে ওর মন খারাপ—সেইজন্যে কিছুতেই যেন মন বসছে না। ওর বাড়িতে এখন কি হচ্ছে, সেই কথা ময়নাচাঁদ ভাবতে চেষ্টা করে। সকাল থেকে কি ওর কম কাজ ছিল?

অভাবের সংসার, তাই অনেক কিছু ভাবতে হতে ওকে।

খুব ভোরে উঠে এর বাড়ি থেকে লাউ, ওর বাড়ি থেকে কুমড়ো, এক বাগান থেকে কচি বেগুন, অন্য মাচা থেকে ঝিঙে সে সংগ্রহ করে বেড়াতো। তারপর কি রান্না হবে—রান্নাঘরে বসে মায়ের সঙ্গে তাই আলোচনা চলত। ময়নাচাঁদ যে চুরি করে সংসার চালাচ্ছে—একথা ওর আদপেই মনে হত না। ওর দরকার, কাজেই যে সব প্রতিবেশীর বাড়তি আছে, তাদের বাগান থেকে নিলে ক্ষতি কি? বরং ওইটেই যেন ছিল তার ন্যায্য পাওনা!

ময়নাচাঁদের মা-ও ছেলের আনাজ সংগ্রহের ইতিহাসটা জানেন, কাজেই তিনিও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেন না—এ সব তরি-তরকারী কোত্থেকে এলো।

প্রশ্ন করলেই যখন অবাঞ্ছিত কথা শুনতে হয়—বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করা।

ময়নাচাঁদ মেয়েলী-কাজ করতে খুব ভালবাসে। আনাজ কুটে দেওয়া, মশলা বেটে দেওয়া, জল তুলে মাকে সাহায্য করা—এইসব কাজ করতে ওর ভারি ভালো লাগে। [illegible]

[illegible]। সেই সংসারের [illegible] কোল থেকে সে হল নিবাসিত।

[illegible]নী।

ময়নাচাঁদ আপনমনে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে; কোনোখানেই কূলকিনারার হদিশ পায় না।

খানিক বাদে চন্দনের একটি ছোকরা চাকর এসে মোহনভোগ, ক্ষীরের ছাঁচ, নারকেল নাড়ু, চিড়ের মোয়া এইসব দিয়ে গেল, তখন আবার নতুন করে ভোম্‌রীর শুক্‌নো মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ভোম্‌রীর জ্বর হয়েছে—হয়ত দু'দিন না খেয়ে আছে। চোখে হয়ত তার জল, 'সুন্দরদা' ডাক সে শুনতে পেল।

এইসব রাজভোগ তার গলা দিয়ে কিছুতেই যাবে না। কাউকে কোন কথা না বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

তারপর চুপিচুপি গোপন পথ দিয়ে একেবারে খিড়কীর পুকুরের ধারে হাজির হল।

তার ভাগ্যি ভাল। ছোট্ট একটা ডিঙ্গি-নৌকা দড়ি দিয়ে একটি গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। একটি বৈঠের হাতল উঁকি মারছে পাটাতনের তলা থেকে।

ময়নাচাঁদ আর আগু-পাছু কিছু ভাবলে না। ডিঙ্গি-নৌকোয় উঠে—দড়িটা খুলে দিয়ে বৈঠা হাতে নিয়ে বসে পড়ল।

কিছুতেই সে আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ছুটে গিয়ে ভোম্‌রীকে কোলে নেবে। রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে জিজ্ঞেস করবে, আজ কী পোস্ত দিয়ে ঝিঙে চচ্চড়ি করবে মা?—পোস্তটা না হয় আমিই বেটে দিচ্ছি—

নৌকো চালাতে চালাতে ময়নাচাঁদ যেন মায়ের রান্নাঘরের পোস্ত-চচ্চড়ির গন্ধ পেলে।

আশেপাশের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। একমনে বৈঠে চালিয়ে সে চলেছিল খালের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ ঝোপের আড়ালে ফিস্‌ফিস্ কথা শুনে তার চমক ভাঙল।

ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই পশ্চিমপাড়ার ছেলেদের কয়েকটি নৌকা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাকে ঘিরে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বৈঠে ওঠল তার মাথার উপরে। কে যেন বলল, ভালো চাস্ ত' এই নৌকোয় উঠে আয়—নইলে মাথা ফেটে দু'খানা হয়ে যাবে।

আরেকজন ফোড়ন দিল, চন্দনের চৌদ্দপুরুষ এসেও তখন প্রাণ বাঁচাতে পারবে না।

ময়নাচাঁদ মরিয়া হয়ে উত্তর দিল, ভাই, আমি তোদের সঙ্গেই যাবো—কিন্তু আমাকে একবার বাড়ি যেতে দে। ভোম্‌রীর জ্বর হয়েছে, তাকে শুধু একবার চোখের-দেখা দেখে যাবো।

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

—ওসব ছেঁদো কথায় ভুলছি নে।

—কেন, আজকাল কি তোর টাকার অভাব?

—চন্দন ত' টাকা খরচ করে ডাক্তার এনে ভোম্‌রীকে দেখিয়েছে।

—সব খবর আমরা রাখি, আর কোনো ফাঁকি চল্‌বে না চাঁদ। ময়নাকে এবার আমাদের দাঁড়ে গিয়ে বসতে হবে। অবশ্য আমরা ছোলা খেতে দেব।

একজন ফস্‌ করে এসে ময়নাচাঁদের চোখ বেঁধে ফেলল।

তারপর ওদের একখানি ছিপ—শো-শো শব্দে কোথায় যে উড়ে চললো—ময়না-চাঁদ কিছু ঠাহর করতে পারল না।

যখন ওর চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল—ময়নাচাঁদ অবাক হয়ে দেখল—তারা একটি গভীর বনের ধারে এসে পৌঁছে গেছে।

ময়নাচাঁদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি?

খালের ধারে একটা বড় বটগাছের তলায় দুটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ফাল্গুন নিজে।

সে রসিকতা করে উত্তর দিল, এই বনের মধ্যে ডাকাতে-কালী মন্দির। সেইখানে গেলেই বুঝতে পারবি—কেন তোকে এখানে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

ময়নাচাঁদের মুখে তখন আর কোন বাক্যি নেই।

শান্ত-সুবোধ ছেলের মতো সে ধীরে ধীরে নৌকো থেকে নামলো। গিয়ে দেখলে, সেদিন যারা নৌকোবাচে অংশ গ্রহণ করেছিল, তারা প্রত্যেকেই তার আশে-পাশে আছে।

এমন ঘৃণার সঙ্গে সবাই ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল যে, লজ্জায়—ময়নাচাঁদের মুখ আপনা থেকে নীচু হয়ে এল।

ফাল্গুনই প্রথম এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

বললে, বেইমানীটা করেছিলি ভালই। কিন্তু তোর নতুন মনিব চন্দনের দেয়া এই ছোট কুড়লটা নৌকোর ভেতর না ফেলে যদি বাইরে খালের জলে ফেলে দিতিস্—তবে এমন করে নিশ্চয়ই ধরা পড়তিস্ না। ময়নাচাঁদ ওর কথায় কোন জবাব দিল না, চুপ করে রইল।

আর একজন ফোঁড়ন কাটলে, ও কথাটা ওর মনিব সময় মত শিখিয়ে দিতে একদম ভুলে গিয়েছিল।

আর একজন টিপ্পনী কাটল, আর তাতেই ত' এই বিপত্তি।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে
যদি না পড়ে ধরা
আর ধরা পড়লেই মরা।

সবাই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল।

সেই হাসির শব্দে বনের গাছের কাকগুলি কা-কা শব্দে উড়ে পালিয়ে গেল।

সরু পায়ে চলা পথ।

দু'ধার থেকে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে সেই সরু পথকেও প্রায় ঢেকে ফেলেছে। হাতের বৈঠে দিয়ে ঘাস সরিয়ে সরিয়ে ওরা পথ চলছিল।

একটা সাপ সর্-সর্ করে আড়াআড়ি ভাবে সেই পথের ওপর দিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ এমনভাবে সাপ দেখে দলের সবাই থম্‌কে দাঁড়ালে, ময়নাচাঁদকে সাজা দিতে এসে ওরা না সাপের বিষে প্রাণ খোয়ায়।

আরো বেশ খানিকটা পথ।

যত যাচ্ছে তত ঘন বন।

শেষকালে মিললো সেই জরাজীর্ণ কালীমন্দির।

সত্যি জায়গাটা দেখলে ভয় করে।

দিনের বেলাতেই একটা থম্‌থমে ভাব। যেন কত অশরীরী-প্রাণী আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে দেখা যায় না বটে,—কিন্তু একটু চুপচাপ থাকলেই নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

কয়েকজন পুরোহিত এরই মধ্যে পুজোর কাজে লেগে গেছে। নৈবিদ্যি, ফুল, নানারকম পুজোর উপকরণ সব প্রস্তুত। মন্দিরের সামনে হাঁড়িকাঠ পাতা। তাতে আবার তেল-সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে ময়নাচাঁদ শুধোলে, ব্যাপার কি ভাই ফাল্গুন?

ফাল্গুন জবাব দিল, তুই ভেবেছিস আমরা এখানে বন-ভোজনের জন্যে তোকে নেমন্তন্ন করে এনেছি? মোটেই তা নয়। আজ এই ডাকাতে-কালীর সামনে নরবলি হবে।

সেকথা শুনে শিউরে উঠল ময়নাচাঁদ।

সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ময়নাচাঁদ যদি কারো কাছ থেকে কোনো আশ্বাসবাণী পাওয়া যায়।

কিন্তু সবাই ওর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌তে লাগলো।

—চন্দনের দেওয়া টাকাগুলি ভারী মিঠে?

—কত হাজার টাকা দিয়েছে তোকে? তাই নিয়ে সারাজীবন চল্‌বে?

—এইবার নতুন মনিব তোর প্রাণ বাঁচাতে পারবে?

ময়নাচাঁদ বুঝলে, এ একেবারে ধূ-ধূ মরুভূমি। এখানে একবিন্দু করুণার বারি বর্ষিত হবে না।

ফাল্গুন হাঁক্‌লে, এইবার বলিটাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আয়—উচ্ছুগ্যু করতে হবে।

ময়নাচাঁদ নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলে না। ভয়ে কেঁদে উঠল! বললে, আমার ভোম্‌রী বোনকে তোরা একবার শুধু দেখতে দে, তারপর মেরে ফেলিস্‌ আমাকে—

সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির ওপর মুখ ঢেকে বসে পড়ল।

ফাল্গুন বললে, মরণ-যন্ত্রণা ওর হয়ে গেছে। সত্যি ত' আমরা ওকে প্রাণে মারতে চাই নে!

আর একজন বললে, কিন্তু সবাইকার সামনে ওর শাস্তি হওয়া দরকার। ভুরু কামিয়ে বেইমানকে ছেড়ে দাও। সেই চেহারা ও গ্রামের লোককে দেখাক্‌।

ফাল্গুন বললে, সেই ভালো। বেইমানের সাজা হচ্ছে—ভুরু কামিয়ে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চাপিয়ে একেবারে গ্রামের মাঝখানে পৌঁছে দেওয়া।

।। তেরো ।।

ময়নাচাঁদের লাঞ্ছনাকে চন্দন নিজের অপমান বলে মনে করল। তাই ও যখন ভুরু কামানো আর মাথা মোড়ানো অবস্থায় গ্রামে ফিরে এলো—চন্দন সেটাকে নিজের লজ্জা বলে ভাবল।

সে ময়নাচাঁদকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠালো।

কিন্তু মজা এই যে, ময়নাচাঁদ আর ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে না।

সে ভাবলে অপমানের ত' চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

এখন আবার এই মুখ লোকের সামনে বের করি কি করে? সে নিজের অন্দরে বসে ভোম্‌রীর সঙ্গে খেলা করে, তার খেলার ঘোড়া হয়, মায়ের রান্নাঘরে আনাজ তরকারী কুটে দেয়, বাট্‌না বাটে—কিন্তু কখনো বাড়ির বাইরে আসে না।

চন্দন কিন্তু ভয়ানক চটে গেল।

সে বললে, ভালোরে ভালো। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর—ময়নাচাঁদের অপমানে আমি ভেবে মরছি—আর সে একবার আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে পারল না? এত দেমাক ওর।

ময়নাচাঁদ কিন্তু এর মধ্যে সার কথা বুঝে নিয়েছে—আমার ফাল্গুন প্রীতিরও দরকার নেই, আর চন্দনের ভালোবাসারও প্রয়োজন নেই। তোমরা আমাকে রেহাই দাও—একটু শান্তিতে নিরিবিলি থাকতে দাও।

আর তাছাড়া ভুরু কামানো আর ন্যাড়া-মাথায় ও বেরুবেই বা কোথায়? লজ্জা ওর সকল দিক দিয়ে।

পর পর তিন দিন চন্দনের কাছ থেকে লোক গিয়ে ফিরে এলো; কিন্তু ময়নাচাঁদের এক কথা। আমি এখন বাড়ি থেকে কিছুতেই বেরুবো না। রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। তোমরা তোমাদের জেদ বজায় রাখতে যা খুশী করো, আমি আর ওর ভেতর নেই। ওই যে কথায় বলে না—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আমার হয়েছে সেই অবস্থা।

চন্দন সব কথা শুনে উত্তর দিল, ময়নাচাঁদ এতগুলি কথা একসঙ্গে বলতে পারল? তাজ্জব ব্যাপার বলতে হবে।

চন্দনের এক বন্ধু ওর পাশেই বসেছিল, সে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে উঠল ভাবের আবেগে—

"পঙ্কে বদ্ধ কর করী—
পঙ্গুরে লঙঘাও গিরি—
কারে দাও ইন্দ্রত্ব পদ মা,—
কারে কর অধোগামী—!
সকলি তোমারি ইচ্ছা—
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

চন্দন তখন সত্যি চটে গেছে।

ভালো-ভালো কথা আর তার মগজে ঢুক্‌বে না।

দাঁত কিড়মিড় করে উত্তর দিল—দাঁড়াও। ইচ্ছাময়ী তারার ইচ্ছার খেলাটা একবার দেখাচ্ছি। আগে শায়েস্তা করবো ময়নাচাঁদকে, তারপর দেখে নেবো—পশ্চিমপাড়ার ফাল্গুনকে। দেখি, ওর মগজে কত বুদ্ধি ধরে।

বন্ধুটি বলল, ময়নাচাঁদের ওপর তোর মিছে রাগ। ওর যা শাস্তি হবার তা ত' যথেষ্টই হয়েছে—আবার মরার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন বাপু?

চন্দন ফোঁস করে উঠ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে।

বলল, ও যে শাস্তি পেয়েছে মূর্খমীর জন্যে সেইখানেই ত' আমার আপত্তি। ওর লাঞ্ছনা আমার অপমান হয়ে গায়ে বিঁধছে। ময়নাচাঁদ ছিল আমার আশ্রয়ে। দিব্যি ছিলি বাপু, খাওয়া-দাওয়া, প্রচুর বিশ্রাম, ওর সংসারের ভার আমি নিজে নিয়েছিলাম। রাশি রাশি গল্পের বই দিয়েছিলাম—দিব্যি পড় না কত পড়বি।

তা ওর ভালো লাগলো না।

আমাকে লুকিয়ে ও চলে গেল বাড়ির বাইরে। তাতেই ত' ফাল্গুনের খপ্পরে পড়ল। ওরা ময়নাচাঁদের এই যে মাথা মুড়িয়ে, ভুরু কামিয়ে, ঘোল ঢেলে গাঁয়ে এনে ঘোরালে—এ অপমান কি আমার গায়ে লাগে না? একেই বলে সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোয়।

রাগে আর অপমানে ফোঁস-ফোঁস করতে লাগলো চন্দন।

আর একটি বন্ধু হাসি গোপন করে শুধোয়, তা কি ঠিক করলি চন্দন? ময়না-চাঁদেরই বা কি শাস্তি দিবি। আর ফাল্গুনেরই বা কি শাস্তি বিধান করবি শুনি?

অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল চন্দন।

হঠাৎ ওর প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফিরিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। বলল, ময়নাচাঁদের এত সাহস যে, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে? তিন-তিন-বার লোক পাঠালাম—আর কিনা তাদের ফিরিয়ে দিলে?

একটুখানি দম নিয়ে চন্দন বলল, ময়নাচাঁদের কি শাস্তি দেবো জানিস্? ওর ঘরে দেবো আগুন লাগিয়ে। দেখি সে কত বড় মানুষ হয়েছে যে আমার কথায় কান দেয় না!

ওর বন্ধুটি কাঁচু-মাচু করবার ভাব দেখিয়ে দুটি হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বলল, দোহাই তোর চন্দন, এইবার নতুন কোনো প্যাঁচ দেখা। ঘরে আগুন দেওয়া যথেষ্ট হয়েছে! পণ্ডিতমশায়ের ঘরে আগুন দিয়েছিস, যাত্রার আসরে সামিয়ানার টিকের আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলি—আবার সেই আগুন? এখন থেকে যে গাঁয়েরলোকে তোকে ঘর পোড়া হনুমান বলে ডাক্‌বে!

চন্দনের চোখে যেন হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

ধপ্ করে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলে তা হলে আমি কি করি বলত?

—একটা পরামর্শ দেব শুন্‌বি?

—কি বল না।

—দিন কয়েকের জন্যে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয়, মনটাও ভালো হবে আর শরীরটাও সুস্থ থাক্‌বে। এই রেষারেষির ভাব নিয়ে—দাঁত কিড় মিড় করছিস্—রাত্তিরে ঘুমুতে পারছিস নে, নিজের চেহারাটা কি হয়েছে আয়নায় মুখটা ভালো করে দেখেছিস একবার?

তপ্ত-বালিতে খৈয়ের মতো ছিটকে উঠে চন্দন উত্তর দিল, সৎ-পরামর্শ দিচ্ছিস্ তুই আমাকে! একেবারে যাকে বলে খাঁটি বন্ধুর কাজ করছিস। আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাই, আর ওরা রটিয়ে দিকে যে চন্দন হেরে গিয়ে লজ্জায় পালিয়ে বেঁচেছে। সেটি আমি কিছুতেই সইব না!

—তবে কি করবি শুনি? মানুষের ঘরে আগুন দিবি? ক্রমাগত লোককে শত্রু সৃষ্টি করবি? আর এইরকম ঝামেলা করে নিজের ঘুম নষ্ট করবি আর শরীরটাকে জাহান্নামে দিবি? তোর মতলব কি শুনি?

চন্দন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, শুধু আক্রোশ ফুলতে থাকে। তাই বলে পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার দলাদলিতে সে কিছুতেই পরাজয় বরণ করে নিতে রাজী নয়।

—আচ্ছা, একটা দিন তুই শুধু ভেবে দেখ, আমার পরামর্শ নিবি কিনা। এই

একটা দিন কোনরকম ঝগড়াঝাটি আর দলাদলির মধ্যে তুই যাবি নে, আমায় কথা দে। কাল সন্ধ্যেবেলা আমি আবার আসবো। তখন আমাদের খোলাখুলি আলোচনা চলবে।

—বেশ কথা। রাজি হলাম।

চন্দনের সম্মতি পেয়ে সেদিনকার মতো বন্ধুটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চন্দন একটা দিন বসে বসে ভাবতে থাকুক,—ততক্ষণে ফাল্গুনের বৈঠকখানা একবার ঘুরে আসি। দেখি সেখান আবার কেমন কালনেমীর লঙ্কা-ভাগ হচ্ছে।

ফাল্গুনের বৈঠকখানা ঘরে ঘন ঘন গরম চা আসছে—আর বন্ধুর দল কুড়মুড় পাঁপরভাজা মজা করে চিবিয়ে খাচ্ছে। তার মানে আসর একেবারে জমজমাট।

ফাল্গুন বলল, সেদিন কিন্তু ভারী মজা হয়েছিল। ময়নাচাঁদ মনে করেছিল আমরা ওকে সত্যি-সত্যিই ডাকাতে-কালীর সামনে বলি দেবো।

ঘুগ্‌নী ফোঁড়ন দিয়ে এক কামড় পাঁপর খেয়ে মন্তব্য করল, শ্রীমানের মুখখানি কেমন আমশীর মতো শুকিয়ে গিয়েছিল সেটা তোরা লক্ষ্য করেছিলি?

হোঁৎকা বললে, লক্ষ্য আবার করিনি। আচ্ছা বল ত' তোরা, ময়না তখন কার নাম জপ্ করছিল?

—ডাকাতে-কালীর।

—উঁহু। হলো না। নিশ্চয়ই মনে মনে চন্দনকে ডাক্‌ছিল তখন। বিপদহারী মধুসূদন রক্ষা করো।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

—বিপদহারী মধুসূদন দ্বাপরযুগে দ্রৌপদীর মান রক্ষা করেছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে চৌধুরীবাড়ির চন্দন শরণার্থী ময়নাচাঁদকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারল না—এটা কি কম দুঃখের কথা? হ্যাঁ, একেবারে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য কাহিনী। কিন্তু ময়নাচাঁদের কাণ্ডটা দেখেছিস? সেই থেকে আর ঘরের বার হয়নি।

—কোন্ মুখে ন্যাড়া মাথা আর কামানো ভুরু মানুষকে দেখাবে?

—ঠিক কথা। হয় ঘোম্‌টা দিক্, আর না হয় অন্দরমহলে গিয়ে আশ্রয় নিক্।

—কাজেই সে একটা পথ ধরেই চলেছে। ওকে কোনোমতেই আর দোষ দেওয়া যায় না।

—আহা, বেচারী। কি কুক্ষণেই কয়েকটা টাকার লোভে পূবপাড়ার কাছে নিজেকে বিক্রী করে দিলে।

—শুধু বিক্রী করে দিলে? পশ্চিমপাড়ার মান-ইজ্জত একেবারে ফাঁসিয়ে দিলে।

—একটা কুড়ুল দিয়ে ফাঁসালে সে কথাটাও বল্। নইলে আলোচনা জমে কি করে?

—একটা কথা কিন্তু তোরা কেউ ভাবিস্ নে। ময়নাপাখীকে যে যা পড়ায়—সে তাই পড়ে।

—ঠিক। ঠিক। যতদিন ফাল্গুনের কাছে ছিল—ফাল্গুন বলতো পড়ো ময়না পড়ো।—

—আর ঠিক পড়ে যেত।

—তারপর কি কুক্ষণে শ্রীমান চন্দনের হাতে গিয়ে পড়ল। আর সে ছোট্ট কুড়ুলখানা হাতে দিয়ে বললে, পড়ো ময়না পড়ো—অমনি সে ফাল্গুনের শেখানো ছড়া ভুলে গিয়ে চন্দনের নতুন ছড়া পড়তে শুরু করলে।

পরদিন চৌধুরীবাড়ির চন্দনের খাস-কামরায় তার বন্ধুটির সঙ্গে কথাবার্তা চল্‌ছিল।

বন্ধুটি বললে, কিরে চন্দন। পুরো একটা দিন ত' ভাববার সুযোগ পেলি। ভেবে ভেবে কি ঠিক করলি, তাই আগে শুনি।

চন্দন খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল, ওর কথার জবাব দিলে না। তারপর হঠাৎ সকল দ্বিধা দূর করে দিয়ে বললে, না রে, ভেবে দেখলাম তোর কথাই সত্যি: দিনকতক আমার বাইরে থেকে ঘুরে আসাই উচিত। ক'দিন থেকে রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না। কেবলি মগজের ভেতর প্ল্যান ভেসে বেড়াচ্ছে কি করে ফাল্গুনকে প্যাঁচে ফেলে জব্দ করা যায়। ভালো করে ক্ষিদে হচ্ছে না, সারারাত এপাশ-ওপাশ করছি; তার ফলে শেষ রাত্তিরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ছি। রোদ্দুর উঠে গেলে বিছানা থেকে উঠছি। সারাদিন শরীরটা ম্যাজ-মাজ করছে আর হাই উঠছে। এভাবে কিছুদিন চললে আমার শরীরটা সত্যি ভেঙে পড়বে। তাই ভেবে দেখলাম, তোর কথাই সত্যি।

বন্ধুটি শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, তাহলে আর দেরী নয়—শুভস্য শীঘ্রম্—

চন্দন জিজ্ঞাসু-চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর শুধোলে, কি বলতে চাস্ তুই?

—আমি বলতে চাই আর একটা দিনও দেরী করা নয়। কাল খুব ভোরেই নৌকা করে বেরিয়ে পড়ো। দাঁড় টেনে গেলে মাঝিরা ঠিক সময়মতো ষ্টীমার ধরিয়ে দিতে পারবে।

—একেবারে শেষ রাত্তিরেই? আর একটা দিনও সময় দিতে চাস্‌না নাকি?

—সময় নিয়ে লাভ কি? মিছিমিছি অনিদ্রা রোগটাকে বাড়িয়ে তোলা। আমি বাড়ির ভেতর গিয়ে মাসীমাকে বলে দিচ্ছি সব গুছিয়ে-টুছিয়ে দেবার জন্যে।

—বলিস্ কিরে? একেবারে পত্রপাঠ পার্শেল পাঠানো? পশ্চিমপাড়ার দল হয়ত' আমার চলে যাওয়ার খবর পেলে, মিটিমিটি হাসবে আর টিপ্পনী কেটে বলবে, চন্দন চৌধুরী ময়নাচাঁদের দশা দেখে আর গাঁয়ে থাকতে সাহস পায়? তাই রাতারাতি চম্পট দিয়েছে।

—আরে রেখে দে তোর পশ্চিমপাড়ার টিপ্পনী। যদি যুদ্ধ ঘোষণাই করতে হয় ত' ফিরে এসে একেবারে দুন্দুভি বাজিয়ে সুরু করে দিবি। তার জন্যে তোর এখন যাওয়া আটকাচ্ছে কিসে? চল মাসীমার কাছে, গিয়ে বলি আপনার গুণধর পুত্রকে আর একদিনও গাঁয়ে রাখবো না। সটান পাঠিয়ে দিচ্ছি কলকাতায় তার পিসির বাড়ি।

—আচ্ছা তাই চল। তোর ব্যবস্থাপত্র মেনে নিয়ে দেখি ব্যাধি সারে কিনা।

এই বলে চন্দন উঠে দাঁড়ালো। তারপর বন্ধুকে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল।

চন্দনের মা সব কথা শুনে বললেন, এতে আমার খুব মত আছে, এখানে দিন-রাত্তির গেঁয়ো দলাদলি আমার আদপেই ভালো লাগে না। খালি কে কার মাথায় ডাণ্ডা মারবে, কে কার সর্বনাশ করবে এই চিন্তা। তুমি ভালো বুদ্ধি দিয়েছ বাবা। আসুক পিসির বাড়ি থেকে দিনকয়েক ঘুরে।

—ঠিক বলেছেন মাসিমা। আপনার এ রায়ের ওপর আর আপীল চলবে না। চন্দন, তুই সুটকেসটা গুছিয়ে নে। একা মানুষ—কি-ই বা এমন দরকার পড়বে?

এইবার চন্দনের মা একটু কিন্তু-কিন্তু করে উঠলেন।

—একথা বললে ত' চলবে না বাছা।

—কেন মাসিমা, আবার কি হল?

—চন্দন যাচ্ছে ওর পিসির বাড়ি। অমন খালি হাতে গেলে কি চলে? তাহলে চৌধুরীবাড়ির নিন্দে রটবে যে—।

—ও। বুঝতে পেরেছি। মিষ্টির হাঁড়ি গুছিয়ে দিতে চাইছেন? তা বেশ কথা। দিন না সব ব্যবস্থা করে। ইচ্ছে করলে ষ্টীমার-ঘাট থেকেও ও মিষ্টি কিনে নিতে পারে।

—সে হয় না বাছা। আচ্ছা, সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না, আমি সবকিছু গুছিয়ে দিচ্ছি। ওর পিসির বাড়িতে লোকজন ত' ষষ্ঠীর আর্শীবাদে কম নয়—তাই এমন করে গুছিয়ে দিতে হবে যাতে কুটুম্ববাড়ি নিন্দে না রটে!

তারপর শুরু হল—চন্দনের মা'র গুছিয়ে দেবার পালা। এক হাঁড়ি ক্ষীরের সাজ, তিলের নাড়ু টিনভর্তি, গাওয়া ঘি আধ মনটাক, নারকেল নাড়ু এক হাঁড়ি, খোয়া ক্ষীর বৈয়ম ভর্তি, বাগানের নানাজাতীয় ফল দুই ঝুড়ি, মর্তমান কলা দুই

কাঁদি। চন্দনের পিসি আচার ভালোবাসে সেজন্য কয়েকটি বৈয়ম ভর্তি কুলের আচার, আমের আচার, জলপাইয়ের আচার, টোমাটোর আচার, পেয়ারার চমৎকার মিষ্টি জেলি, তাছাড়া পুকুর থেকে সেই রাত্তিরে জাল ফেলে দুটো বড় রুই মাছ ধরা হল।

ক্রমাগত এইসব জিনিষ সারারাত ধরে নৌকায় ভর্ত্তি হতে থাকলো—খিড়কির পুকুরের ঘাটে।

চন্দনের মার এক একবার এক একটি জিনিষের কথা মনে পড়ে আর তিনি ছুটে ভাণ্ডার ঘরে গিয়ে হাজির হন। ওর পিসি বঁটি চেয়ে পাঠিয়ে ছিল। গাঁয়ের কামারের তৈরী দুটি ভালো বঁটি নৌকোয় তুলে দেওয়া হল।

এইভাবে ডালা, কুলো, ঝাঁটা, বারকোস, ধামা, মাটির খেলনা ছেলে-মেয়েদের জন্যে কিছুই বাদ গেল না! গাছের তেঁতুল অবধি নৌকোতে উঠল এক হাঁড়ি।

শেষ রাত্তিরে চন্দনের মা দুর্গা নাম জপ করতে করতে ছেলেকে ডেকে তুললেন। মঙ্গলঘটে যাত্রা করানো হল, মণ্ডপ প্রণাম হল, চৌধুরীমশায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে এলো।

তারপর মা-ব্যাটাতে লণ্ঠন হাতে নিয়ে খিড়কীর পুকুরের ধারে এসে হাজির হলো।

মা বললেন, দাঁড়া ;সব জিনিষগুলি মাঝিরা গুছিয়ে নিয়েছে কিনা আমি একবার চোখ বুলিয়ে দি।

নৌকোয় উঠে চন্দনের মায়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত যে খাবার জিনিষ তিনি সারারাত ধরে নৌকোয় তুলে দিয়েছেন—তার ছিঁটেফোঁটাও নেই! শুধু ঝাঁটাগুলো পড়ে আছে নৌকোয় সামনের গলুয়ের কাছটায়!

চন্দনও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর ওপরে এসে উঠেছিল। সে লণ্ঠনটা ঘুরিয়ে নিয়েই সব বুঝতে পারলে।

হঠাৎ তার চোখ-মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল। বললে, নৌকো থেকে নেমে এসো মা! আমি সব বুঝতে পেরেছি। একাজ পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের দল ছাড়া আর কেউ করেনি। নিশ্চয়ই তারা কোনো উপায়ে আমার যাবার খবর পেয়েছে। তাই রসিকতা করে গেছে। বুঝতে পারলাম মা, এখন আমার গ্রাম ছেড়ে যাবার উপায় নেই! ওদের শায়েস্তা করে তবে আমার অন্য কথা। যেমন কুকুর তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা করছি আমি।

মা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে শেষ রাত্তিরে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে রইলেন।

।। চৌদ্দ ।।

জল-বিছুটি গাঁয়ের ওপর কালো মেঘ এমন ঘন হয়ে উঠল যে, মাতব্বরেরা দেখে অনুমান করলেন, খুব শিগ্‌গীরই একটা দারুণ বর্ষণ হবে।

প্রবল বারিপাতের আগে—আকাশের যে অবস্থা হয় ঠিক সেই রকম। একেবারে থমথমে—এতটুকু হাওয়া নেই—গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না।

পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার নট্‌ঘটি বারো মাসে তের পার্বণের মতো ত' লেগেই ছিল ছিঁটে-ফোঁটা—এখন এক পশলা বৃষ্টির মামলা।

এবার যা ঘনঘটা করে গোটা আকাশ ছেয়ে এলো তাতে বুড়োর দল অনুমান করলে,—গোটা গাঁ বন্যায় না ভেসে যায়।

এক একটা পাড়া ধরে মেঘ জমাট বেঁধে উঠল।

এ পাড়ার কেউ—ও পাড়ার কোনো লোককে দেখলে কথা ত' বলবেই না, উপরন্তু মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে।

হাটে বাজারে যদি গায়ে ছোঁয়া লাগে তবে দুজনেই এমন ভাব দেখায় যে দেহটা বুঝি অশুচি হয়ে গেল—এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে স্নান করে ফেলে গোবর খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে। চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়িকে কেন্দ্র করে পাকাপোক্ত রকম দুটি দল গড়ে উঠল।

এ যেন একেবারে মানের মামলা।

চৌধুরীবাড়ি হেরে গেলে গোটা পূবপাড়ার মান খোয়া যাবে, আর গাঙ্গুলীবাড়ি পিছু হটলে গোটা পশ্চিমপাড়ার মাথা কাটা পড়বে এমনি সবাইকার মনের অবস্থা।

বারুদ জমানোই আছে শুধু ছোট্ট একটি দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিলেই হয়।

বর্ষণই বলো আর ভূমিকম্পই বলো—সেটা যে কোন দিক দিকে আচমকা শুরু হবে—সে কথা কেউ বলতে পারে না।

ভেতরে ভেতরে তোড়জোড় চলছে, কান-কথা আর ফিস-ফিস কথা হচ্ছে—এ বাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির। কোন পাড়া যে অপর কোন পাড়াকে কি প্যাঁচে কাৎ করবে—তারই কসরৎ চলছে—লোকচক্ষুর অন্তরালে—একেবারে গোপনে।

ছোট্ট গ্রামখানি হঠাৎ টলমল করে উঠল ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে কিন্তু সেই চাঞ্চল্য এমন একদিক থেকে এলো যা এ অঞ্চলের বাসিন্দারা আগেও ধারণা করতে পারে নি।

খবরের কাগজ ত' এ গ্রামের লোকেরা পড়তে পারে না—তাই বাইরের জগতের সংবাদ বিশেষ রাখে না।

হঠাৎ দেশে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে—যাতে ছোট-ছোট বিরোধ আর দ্বন্দ্ব একেবারে ধামা-চাপা পড়ে গেছে।

ব্যাপার সত্যি গোলমেলে।

কল্‌কাতায় জাপানী বোমা পড়েছে।

লোক ছুটে পালাচ্ছে ভেড়ার পালের মতো—

উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে।

তাই-বা বলি কি করে?

যে দিকে দু'চোখ যায় মানুষ ছুটেছে প্রাণের ভয়ে।

প্রাণ বাঁচাতে পালাতে গিয়ে কত লোক যে প্রাণ খোয়াচ্ছে তার হিসেবই বা কয়জন রাখছে?

আণ্ডা-বাচ্চা, জরু-গরু, বোঁচকা-বুঁচকি, ধামা-কুলো, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় নিয়ে যে যেদিকে পারে মুক্ত কচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছে—কলকাতায় আর থাকা নয়।

হাতিবাগান না খিদিরপুর—কোথায় যেন বোমা পড়েছে।

জাপানী বোমা!

ওরে বাবা! কলকাতায় প্রাণ কি তাহলে আর থাকবে?

যার ঘরবাড়ি আছে সে প্রতিবেশীর হাতে সঁপে দিয়ে বল্‌ছে, তুমিই বসবাস কোরো দাদা। যদি ফিরে আসি তবে ফেরৎ দিও, নইলে এবাড়ি তোমার। কিন্তু দোহাই দাদা, দেখো, বাড়ির জিনিষপত্তর যেন খোয়া না যায়।

চাকরী ছেড়ে কেরানী পালাচ্ছে, ঠেলাগাড়ী ফেলে মুটে ছুটছে, গাই ফেলে গোয়ালা ছুট্‌ছে, ছেলে ফেলে মা পালাচ্ছে, রোগী ফেলে ডাক্তার পালাচ্ছে, ইস্কুল ফেলে মাষ্টার পালাচ্ছে, আদালত ফেলে হাকিম পালাচ্ছে, কাগজ ফেলে সম্পাদক ছুট্‌ছে, ঘোড়া ফেলে জকি পালাচ্ছে, গাড়ী ফেলে গাড়োয়ান পালাচ্ছে, মাছ ফেলে মেছুনি ছুট্‌ছে। এমনিভাবে কলকাতা শহরে একটা পালানো আর ছোটার ধূম পড়ে গেছে! আগে কলকাতা শহরে হাঁটা-চলা যেত না।

মানুষগুলি সব পোকার মতো কোটরে কোটরে বাস করতো। একেবারে ছারপোকার মতোও বলা চলে।

কিন্তু এই পালানোর হিড়িকে একদিকে কলকাতা শহর যেমন খালি হয়ে গেল—বাঙলাদেশের গ্রামগুলি তেমনি ভর্তি হয়ে উঠতে লাগলো!

যারা জীবনে হাওড়া ব্রীজের এপাশে আসেনি—তারা অবধি সইয়ের-বউয়ের-বকুলফুলের-বোনপো-বউয়ের-বোনঝি-জামাইকে ধরে, যে কোন অজপাড়াগাঁয়ে পিঁপড়ের মতো চলে এলো বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি কাঁধে করে।

হোক ম্যালেরিয়া, তবু বোমার হাত থেকে মাথাটা ত' বাঁচবে।

এইভাবে জলবিছুটি গাঁয়ের অনেক অচেনা মানুষ এসে হাজির হল।

সাময়িক ভাবে এসে নীড় বাঁধলে তারা—কেউ পুবপাড়ায় কেউ পশ্চিমপাড়ায়।

জলবিছুটি গাঁয়ের লোকেরা এই সব কাণ্ড দেখে হক্‌চকিয়ে গেল।

যে গ্রামের নাম ভূগোলে লেখা নেই, যার এতটুকু কদর নেই, খবরের কাগজে যে গ্রামের সংবাদ ছাপা হয় না—সেই অজ পাড়াগাঁয়ে আসছে কিনা কলকাতার সব নামকরা ব্যবসায়ীরা, বড় ডাক্তাররা, আর একডাকে চেনা বনিয়াদী বড়লোকেরা।

গাঁয়ের মাতব্বরেরা সকাল বিকেল হুঁকো টানে আর বলে, এ হল কি? কালে কালে আরো কত দেখ্‌বো।

যে সব বড়লোক জীবনে এই প্রথম পাড়াগায়ে এসেছে, তাদের হাতে কোনো কাজকর্ম নেই। কাজেই সখ করে সব বাজার করতে বেরোয়।

দু'চোখে যা দেখে তারই দর করে।

পল্লী অঞ্চলের চাষীদের মুখে যে দাম শোনে তাতেই আনন্দে আর উল্লাসে বত্রিশপাটি দাঁত বিকশিত হয়ে ওঠে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে, বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে, ড্যাম চিপ্‌।

এইভাবে হাটে-বাজারে ওদের নামই হয়ে গেল 'ডেঞ্চিবাবু'।

—ওরে ডেঞ্চিবাবুরা এসেছে, ভালো মাছ দেখা—।

স্থানীয় লোকেরা ওদের দু'চোক্ষে দেখ্‌তে পারে না। জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। কোনরকম দরদস্তুও করে না—মুখে বলে 'ড্যাম্‌ চিপ্‌' আর পকেট থেকে পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

গাঁয়ের মাতব্বরেরা দেখ্‌লে, ভালো রে ভালো। না হয় তোদের পকেটে কিছু কাঁচা পয়সাই আছে। তাই বলে জিনিষপত্রের দর এমনভাবে চড়িয়ে দিবি?

এত খাঁটি দুধ জীবনে ওরা দেখেনি।

ছয় পয়সা করে দুধের সের শুনে—কলসী কলসী দুধ কিনে নিয়ে যায়—পায়েস খাবে, আইসক্রীম করবে, ক্ষীরের বরফি তৈরী করবে, ছানা খাবে—বাটি। বাটি।

ওদের ওপর বিশেষ করে চটল বুড়োরা।

তাদের চিরকালের অভ্যেস—সন্ধ্যের মুখে আফিম খায়। কাজেই রাত্তিরে এক বাটি করে দুধ না খেলে তাদের চলে না।

স্থানীয় বাসিন্দারা দুধের দাম দেয় নামমাত্র। তা-ও কত মাসের বাকি পড়ে থাকে কেবা হিসেব কষছে। গোয়ালারা সেজন্য আপত্তি করত না, ধীরে সুস্থে শোধ দিলেই হবে।

এখন আর সেটি হবার যো নেই।

ডেঞ্চিবাবুরা বাজারে এসে নগদ দাম দিয়ে কলসী কলসী দুধ কিনে নিয়ে ঘরে চলে যায়—সে ক্ষেত্রে কি আফিম-খোর বুড়োদের ধারে দুধ দেয়া চলে? গোয়ালার দল এখন বেশ চালাক হয়ে গেছে।

সোজাসুজি মাথা নেড়ে বললে, ধারে হবে না কর্তা,—এগিয়ে দেখুন।

—আরে এগিয়ে আর কোথায় দেখবো ঘোষের পো? একেবারে খালের জলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ব নাকি?

শুধু কি দুধ?

ওদের জ্বালায় মাছ কেনবার যো নেই।

পাকা রুই, বড় চিতল, গলদা ও বাগদা চিংড়ি—সব কিছু সর্ব্বভুকের মতো ঝুড়ি ভর্ত্তি করে নিয়ে চলে যায়।

—ওলাউঠো হোক ব্যাটাদের—খেয়ে খেয়ে সব সাফ করে ফেললে।

আড়ালে-আবড়ালে বুড়োরা গালাগালি দেয় আর চলতে গিয়ে পথের দুপাশে থু-থু ফেলতে থাকে।

সত্যযুগের মতো ব্রাহ্মণদের চোখে যদি আগুন থাকতো, তবে এই ডেঞ্চিবাবুর দল কবে ভস্ম হয়ে যেতো।

কিন্তু ঘোর কলিকাল।

এ যুগে শকুনের শাপে গরু মরে না। ভাগাড়ে শুধু শকুনদেরই মরা-কান্না ওঠে।

ডেঞ্চিবাবুরা দিব্যি খেয়ে দেয়ে, বহাল তবিয়তে ভুঁড়ি বাগিয়ে সন্ধ্যেবেলা নৌকো করে হাওয়া খেতে বেরোয়। কোনো কোনো দল আবার হারমোনিয়াম আর বাঁয়া-তবলা নিয়ে নৌকোর ওপর দিব্যি গানের মজলিস বসায়।

অত চ্যাঁচালে আর ক্ষিদে হবে না?

রাত্তিরে আবার দিস্তে-দিস্তে লুচি-পরোটা-মাংস ওড়াবে 'খন।

এই পঙ্গপালের দল যে কবে পল্লী অঞ্চল থেকে আবার শহরে চলে যাবে, সেই কথাই শুধু ভাবতে থাকে গাঁয়ের মাতব্বরেরা।

আফিম যারা খায়—তারা ত' মারমুখী হয়ে আছে।

সুযোগ পেলেই অন্ধকার পথে দু-ঘা বসিয়ে দেবে। কিন্তু ডেঞ্চিবাবুরা যে নৌকো ছাড়া চলাচল করে না।

কেউ কেউ পানসী ভাড়া করে আবার জলের ওপরেই বসবাস শুরু করছে। নিত্যি পাঁঠা কাটছে, খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের পোলাও চাপাচ্ছে। গন্ধে সারা গ্রাম ম'—ম' করছে।

ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনম্ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

—খেয়ে নে ব্যাটারা যত পারিস, কলকাতার শহরে ত' শুধু ভেজাল তেল আর ডালদা খেয়ে থাকিস। খাঁটি দুধ-ঘিয়ের মর্ম তোরা কি করে জানবি?

ভট্চাজমশাই সেদিন নাকে গামছা চেপে বললেন, আর বল কি বাঁড়ুয্যে, রাত্তিরের কাণ্ড ত' শোনোই নি।

পরনিন্দার গন্ধ পেয়ে বাঁড়ুয্যেমশাই সচকিতে হয়ে ওঠেন। —কি—কি? রাত্তিরে ব্যাটরা কি করে শুনি?

ভট্‌চাজমশাই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন—তারপর একবার থু-থু ছিটিয়ে বললেন, আরে ভাই, সে কথা আর মুখে বলবার নয়। বুঝলে, ব্যাটারা একেবারে ম্লেচ্ছ। জাত-জন্ম আর রইল না। সারাটা গাঁ কে একেবারে অশুচি করে দিলে।

বাঁড়ুয্যে কৌতূহল চাপতে না পেরে ভট্‌চাজমশায়ের কাছে আরো এগিয়ে আসেন।

—বলো না ভট্‌চাজ বলো না। কি কাণ্ডটা করে ব্যাটারা। ভট্‌চাজ নিজের দর আরও একটু বাড়িয়ে নিয়ে উত্তর দেয়,—কিচ্ছু শোনোনি বুঝি? ম্লেচ্ছেরা বেশী রাত্তিরে নৌকার ওপর মুরগী জবাই করে। কলের উনুনে শোঁ-শোঁ শব্দে রান্না চাপিয়ে দেয়। আমার বাড়িটা আবার খালের ধারে, ভক্ করে জানালা দিয়ে এমন বেমক্কাভাবে গন্ধ গিয়ে ঢোকে—আমি ত' বমিই করে ফেললাম কাল রাত্তিরে।

কে যেন ফোঁড়ন কাটলে—ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং।

বাঁড়ুয্যেমশাই উটের মতো তার গলা বাড়িয়ে চারদিকে চোখদুটো একবার ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে—কে বললে এমন কথা?

কিন্তু কে যে টিপ্পনী কাটলে ভিড়ের মধ্যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

জল-বিছুটি গাঁয়ে অনেকগুলি পোড়োবাড়ি ছিল। বহুকালের জীর্ণ পুরোনো দালান। এখন আর কেউ বসবাস করে না। চারদিকে ঘন আশ-স্যাওড়ার বন হয়ে গেছে।

দিনের বেলাতেই সেইসব বাড়ির ভেতর ঢুকতে লোকে ভয় পায়। কথায় বলে গরজ বড় বালাই।

কলকাতায় বাবুদের এখন থাকবার আস্তানা দরকার। কাজেই সেই সব পোড়োবাড়ি সাফ্ করে ফেলা হল, সাপের গর্ত বুজিয়ে দেওয়া হল, কিছু কিছু মাটি ঢেলে উঠোনের ডোবাগুলি ভরাট করা হল, আর চুণকাম করা হল বাড়িতে।

তখন আশেপাশের জ্ঞাতিরা মালিক হিসেবে দেখা দিলেন—কলকাতার ডেঞ্চিবাবুদের সামনে।

কাজে-কাজেই সেইসব বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। এইভাবে লোকদের গাঁয়ের দিব্যি একটি আয়ের পথ খুলে গেল। কত গেরস্থ যে ঢেঁকিঘর আর গোয়াল ভাড়া দিয়ে পয়সা পিট্‌তে লাগলো—তার হিসেব কেউ দিতে পারে না।

এইভাবে আরো দশটি পরিবারের সঙ্গে পূবপাড়ায় এলো—শশীরা আর পশ্চিমপাড়ায় এলো শ্যামলেরা।

একদিন নদীর ধারে বসে দুটি ছেলে মাছ ধরছে।

কেউ কাউকে চেনে না—জানে না।

ছোট ছেলেটি চট্‌পট মাছ তুলছে। মাছগুলি অবশ্যি ছোট, কিন্তু খাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি' ওর খালৈ প্রায় ভর্তি হয়ে এলো।

একটু বড় ছেলেটি শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে। ওর ফাৎনায় এতটুকু টান্ পড়ছে না।

বেচারী আর কাহাতক অন্যের বঁড়শীতে মাছ ওঠা দেখে।

শেষকালে অধৈর্য্য হয়ে উঠল বড় ছেলেটি।

আপনমনেই বলে উঠল, ধুত্তোর। আর ভালো লাগে না—এইবার পালাই—

ছোট ছেলেটি নিজের ফাৎনার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলে, তোমার বঁড়শীতে বুঝি একটিও মাছ ওঠে নি?

বড় ছেলেটি হতাশভাবে জবাব দিলে,—না।—

ছোট ছেলেটি সেই ফাঁকে আর একটি বড় পুঁটিকে ঘায়েল করে ফেলেছে। ওটাকে ডাঙ্গায় তুলতে তুলতে বললে, তাতে কি হয়েছে? বোসো তুমি। আমার মাছ থেকে তোমাকে ভাগ দেবো 'খন—

বড় ছেলেটি লজ্জা পেয়ে উত্তর দিলে, না-না, তা কেন? তোমারটার ভাগ দিতে যাবে কেন ? তুমি একে আমার চাইতে বয়সে একটু ছোট ; তার ওপর এই এতক্ষণ রোদ্দুরে বসে এত কষ্ট করে মাছ ধরলে, আমাকে মিছিমিছি ভাগ দিতে যাবে কেন? আর আমারও ত' তোমার কাছ থেকে নেওয়া ঠিক হবে না।

ছোট ছেলেটি এইবার ফিক্ করে হেসে ফেললে, বড় ছেলেটি শুধোলে, তুমি হাস্‌লে যে?

ছোট ছেলেটি উত্তরে বললে, বিরাট রাজ্যি ত' আর ভাগ করে দিচ্ছি নে। শুধু গোটাকয়েক মাছ ত'। আর তাছাড়া এখানে মাছের কোনো দরকারও নেই। সময় কাট্‌তে চায় না, তাই মাছ ধরে একটু সময় কাটানো। এর থেকে তুমি কিছুটা নিলে আমার ভারও কমবে—আর আমি খুশীও হব।

ছোট ছেলেটির কথা শুনে বড় ছেলেটির ভারী ভালো লাগলো। উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে ও। তোমার বুঝি সময় কাট্‌তে চায় না? তা আমার সঙ্গে অনেক গল্পের বই আছে। এসো না একদিন আমাদের বাসায়—

—কোথায় থাকো তুমি? প্রশ্ন করলে ছোট ছেলেটি। বড় ছেলেটি একদিকে আঙ্গুলে নির্দেশ করে উত্তর দিলে, ওই যে এখানে থেকে দেখা যাচ্ছে—চিলে কোঠাটি—ওই জলার ধারের পোড়া-বাড়িটা জঙ্গলে একেবারে ভর্তি হয়েছিল। আমার কাকাই ত' সাফ্ করিয়ে নিয়েছে। সাপই মারা পড়েছে গোটা কুড়ি, মশা-টশা সব খতম করে দেয়া হয়েছে। একটা ইন্দারা ছিল। সেটাকে পরিস্কার করে নেওয়া হয়েছে। চমৎকার জল। যেমন ঠাণ্ডা তেমনি হজমী, খেলেই

খিদে পায় । আমার কাকা নামকরা ডক্টর কিনা—তাই সব কিছু তার জানা আছে ।

কাকার গর্ব্বে ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ।

বড়ছেলেটি শুধোলে, তোমার নাম কি ভাই ?

ছোট ছেলেটি উত্তর দিলে—শশী—

—আর আমার নাম শ্যামল ।

।। পনেরো ।।

সে দিন সকালবেলা শশী গেল শ্যামলদের বাড়ি বেড়াতে ।

শশী অবাক হয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল । যত দু'চোখ মেলে দেখছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল ।

শ্যামল এতটুকু বাড়িয়ে বলে নি ।

জঙ্গলে-ভর্তি জীর্ণ বস্তিটার ওরা একেবারে চেহারা পাল্‌টে দিয়েছে ।

বাজে জঙ্গল সব সাফ্ হয়ে গেছে, ঝক্-ঝক তক্-তক্ করছে উঠোনটা, সামনে কঞ্চির বেড়া দিয়ে বাগান তৈরী করা হয়েছে । কোনোটাতে ফুল ফুটেছে, কোনটাতে এখনো ফোটেনি।

ওপাশে একটু তফাতে একটা গোয়ালঘর তৈরী করা হয়েছে। দুটি গাই—একটি ঝি দুধ দোয়াচ্ছে। ফ্যানায় ভর্তি হয়ে গেছে বাল্‌তিটা। দেখে দেখে মজা লাগলো শশীর।

উঠোন পেরিয়ে প্রথমেই বেশ বড় কামরাটা—সেখানে একটা ডিস্‌পেন্‌সারী সাজানো হয়েছে। কত ঢঙের শিশি-বোতলে ভর্তি আলমারী আর তাক্‌গুলো। কতরকমের ওষুধ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শশী মনে মনে ভাবে, মানুষের রোগের যেমন অন্ত নেই, তেমনি ওষুধেরও নেই শেষ।

ওর কিন্তু ওষুধ-বিষুধ খেতে ভারী ভয়।

ছুটোছুটি করেই সে শরীরটাকে ভালো রাখতে চায়। ওর নিজের স্বাস্থ্যটাও ভারী সুন্দর। রোগ-ব্যামো তার ধারে-কাছে আসতে সাহস পায় না। খুব ছুটোছুটি করে খেলে, মোটেই কুঁড়ে নয় সে। কাজেই ক্ষিদে পায় প্রচুর। শশী খেতেও পটু।

ওই যে তপ্ত দোয়ানো দুধ। ওর হাতে দিলে এক্ষুণি চোঁ-চোঁ করে শেষ করে দেবে।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন পেছনকার ঘর থেকে।

জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই তোমার খোকা?

তিনি হয়ত মনে করেছিলেন শশীও একটা রোগী। কেননা ঘরের ভেতরকার বেঞ্চে অনেকগুলি লোক—ছেলে-বুড়ো বসেছিল।

শশী এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে শ্যামল এই বাড়িতে থাকে!

—শ্যামল? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার ভাইপো। ওরে শ্যামল তোকে কে ডাকছে দেখবি আয়—

বলেই ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে সেই পিছনকার ছোট কুঠরির ভেতরে ঢুকে গেলেন। বোধ করি ওখানেই ওষুধ তৈরী করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে শ্যামল এসে হাসিমুখে হাজির হল। ওকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ওর দু'খানি হাত জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি যে আমাদের বাসায় চলে আসবে তা আমি ভাবতেই পারি নি।

শশীও হাসতে হাসতে জবাব দিলে, তুমি যা লোভ দেখিয়ে এসেছ, না এসে আর উপায় কি বলো?

—লোভ? শ্যামল আর কিছু খুঁজে পায় না। তোমায় খেতে নেমন্তন্ন করেছিলাম নাকি? আমার ত' মনে নেই। তা হলে কাকিমাকে খবর দিতে হয়।

এইবার হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে শশী। এরই মধ্যে ভুলে গেলে শ্যামল? তুমি যে বলে এলে তোমার অনেক বই আছে। নিয়ে চলো আমাকে সেই বিরাট ভোজের আসরে—

শ্যামলের এতক্ষণ মনে পড়ে যায়। বইয়ের কথা শশীকে বলেছিল বটে।

—তাই বলো। আমি ত' ভেবেই পাইনে— কি লোভ দেখিয়ে এসেছিলাম।

একটু লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর করে শ্যামল।

তখন দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

ভেতরে ঢুকতেই ডানহাতি রান্নাঘরে একটি মহিলা রান্না করছিলেন। তিনি ওদের দু'জনকে একসঙ্গে আসতে দেখেই মুচকি হেসে বললেন, তাহলে এতদিনে আমাদের শ্যামলের একটা বন্ধু জুটল। যে মুখচোরা ছেলে—তোর সঙ্গে সেধে কে আলাপ করতে আসবে শুনি?

—আমি এসেছি কাকিমা!

এই বলে শশী এগিয়ে গিয়ে কাকিমাকে ঢিপ্ করে এক প্রণাম ঠুকে দিলে।

—বারে! খুব মিশুকে ছেলে ত'। কি করে জানলে আমি কাকিমা? শশীকে প্রশ্ন করেন তিনি।

শশী হাসতে হাসতে উত্তর করলে, সে কথা জানেন না বুঝি কাকিমা? আমি যে একজন নামজাদা গোয়েন্দা,—রবার্ট ব্লেকের মাসতুতো ভাই। বাড়িতে ঢুকেই গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারি। এমন কি রাজ-জ্যোতিষী দেখে ভিরমি খেয়ে পড়বে।

—বাঃ! ভারী মজাদার বন্ধু জুটেছে ত' শ্যামল তোর। কিন্তু তুই যা মুখচোরা ছেলে—শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারবি ত'? আমার কিন্তু ছেলেটিকে ভারী ভালো লাগছে। তা আর কি কি গুণ আছে তোমার? আগে শুনি কি তোমার নাম?

কাকিমা হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন। শশী চট্‌পট্ উত্তর দিলে, নাম আমার শশী। আমাকে ওই নামেই ডাকবেন। কেননা এখন ঘন ঘন আমাকে এই বাড়িতে দেখতে পাবেন কিনা। এমন একটি কাকিমা ছেড়ে খুব দূরে দূরে থাকা যাবে না—সেকথা বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পারছি। আর গুণের কথা জিজ্ঞেস করছেন? গোয়েন্দার গুণের পরিচয় এই মুহূর্তে আমি দিতে পারি। এই শুরুন আজকে আপনি কি কি রান্না করছেন?

কাকিমা হাসিভরা মুখে শুধোলেন, ধন্যি ছেলে বাপু তুমি। বাড়িতে ঢুকেই বলে দিতে পারবে—আমি কি রান্না করছি? হাত দেখাতে হবে নাকি?

শশী কৌতুকের সুরে উত্তর দিলে, না-না, হাত দেখাতে হবে কেন? আপনার শাড়ীর পাড় দেখেই আমি বলে দিতে পারবো, আজ কি কি রান্নার ব্যবস্থা করছেন।

—আচ্ছা বলত শুনি। বলতে পারলে খাইয়ে দেবো তোমাকে।

কাকিমা আশ্বাস দেন।

শশী বললে, তাহলে মন দিয়ে শুনুন। নানারকম তরকারী দিয়ে একটা ঝাল চচ্চড়ি, লাউয়ের শাক, পুকুরের পোনা মাছের ঝোল। আমড়ার টকও থাক্‌তে পারে।

কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠলেন।—নিশ্চয়ই তুমি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছ। নইলে ঠিক ঠিক বললে কি করে।

সত্যি বলছি কাকিমা। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি আমি আদৌ মারি নি। আপনাদের শ্যামলের সঙ্গেই এই প্রথম আমি এ বাড়ি ঢুক্‌ছি—

শ্যামল এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আর কাকিমার সঙ্গে ওর মজার কথা-বার্তা শুন্‌ছিল।

এইবার সে এগিয়ে এসে শুধোলে, আচ্ছা শশী, তাহলে ঠিক-ঠিক রান্না কি হবে—তুই কি করে বলতে পারলি? সত্যি করে বলত, তুই গুনতে জানিস?

তেমনি কৌতুকের সুরে চোখদুটি নামিয়ে শশী জবাব দিল মোটেই না।

কি করে রান্নার কথা বলতে পারলাম—সেই কৌশলটি এইবার জানিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কাকিমা মন দিয়ে শুনুন।

প্রথম কথা এই যে, আপনাদের যে ঝিটি দুধ দুইছে—আমি আসবার সময় দেখলাম যে তার সামনে একটি ঝুড়ি রয়েছে এবং সেটা সদ্য-তোলা লাউশাকে ভর্তি। অনুমান করা শক্ত নয় যে, বাড়ির গৃহিণীর আদেশেই এই লাউশাক কাটা হয়েছে এবং আজ তা রান্না হবে।

ওদিকে আপনাদের বাড়ির সামনেকার পুকুরে একটি ছোক্‌রা চাকর—সেটা অবশ্য আন্দাজে বলছি—এইমাত্র একটি পোনা মাছ বঁড়শীতে টেনে তুলেছে। ডাক্তারের বাড়ি যখন, তখন শরীরের পক্ষে অপকারী সরষে বাটা চলবে না। কাজেই মাছের ঝোল হবে—বিশেষ করে তাজা মাছের ঝোল, সেইটেই অতি সহজে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। এইবার ঝোল-চচ্চড়ির কথা। আমি অন্দরমহলে ঢুকবার মুখেই ঝাল-চচ্চড়ির গন্ধ পেয়েছি। মনে হয় কাকীমার নিজের মনের মতো তরকারী, তারপর আমড়ার টক। রান্নাঘরের চৌকাঠের সামনে কয়েকটি আমড়া পড়ে আছে—ঢোকবার মুখে দেখেছি। কাজেই ওটা দিয়ে যে টক্ হবে সেটা গবেষণা করে বলতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। আপনি কি বলেন কাকিমা?

শশীর কথা শুনে কাকিমার চোখদুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি এগিয়ে এসে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, এত যখন তোমার বুদ্ধি, তখন তুমি লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে জজ হবে। আর্শীবাদ করছি আমি।

শশী কাকিমার পায়ের ধূলো নিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিলে— জজ হতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু আজ ত' নগদ-নগদ কাকিমার স্নেহ পেলাম তাঁর দাম আমার কাছে অনেক বেশী।

এতক্ষণে শ্যামলের মুখে কথা ফুট্‌ল।

সে অনুযোগের সুরে বললে, বারে! আমার বন্ধুকেকি তুমি আটকে রাখবে? আমার সঙ্গে কথা বলতে দেবে না? আমার গল্পের বইগুলি ওকে দেখাবো যে।

কাকিমা মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, তাহলে বন্ধুর ছোঁয়া লেগে তোর মুখেও বোল্ ফুটেছে বল। ভালো লক্ষণ বলতে হবে। আচ্ছা। ওকে নিয়ে তোর ঘরে বসা। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—

শশী বলে উঠল, এর ওপর আবার খাবারও আছে। নেমন্তন্ন শুধু বই দেখবার। ফাউ জুটল খাবার।

কাকিমা উত্তর দেন, শুধু খাবারই বা খাবে কেন? গোয়েন্দাগিরি করে যে সে রান্নার নাম করলে তাও চেখে যেতে হবে তোমায়। অবিশ্যি চাকরটা যদি মাছ সত্যি ধরে থাকে। নইলে মিছিমিছি নিরামিষ রান্না খেতে তোমায় বলবো না।

—মাছ যে ধরা পড়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমি কি ভাবছি বলুন ত' কাকিমা?

কাকিমা শুধোলেন,—কি ভাবছ শুনি? আমি আর তোমার মতো গুন্‌তে জানি নে।

শশী-শ্যামলের সঙ্গে ওর ঘরে যেতে যেতে উত্তর দিলে, ভাবছি আজ কার মুখ দেখে আমার ঘুম ভেঙেছে? গল্পের বই পাবো, কাকিমা পেলাম,—আর সেই সঙ্গে পেলাম পাইকারী হারে নেমতন্ন।

—দুষ্টু ছেলে।

এই বলে কাকিমা গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। শশীর জন্যে দু' একটি বেশী পদ রান্না করতে হবে। অন্ততঃ ওর গণনা যে ভুল সেটা প্রমাণ করবার জন্যে।

একজন লোভী লোককে যদি চোখ বেঁধে, নানাবিধ ভোজ্য-দ্রব্যে পূর্ণ একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া যায়—তার মুখের অবস্থা যেমন হয়—শ্যামলের পড়বার ঘরে ঢুকে শশীর চোখ মুখের ভাবও অনেকটা সেইরকম হল।

তাইত। গল্পের বইয়ের কথাই সে শুনেছিল। কিন্তু এই অজ-পাড়াগাঁয়ে যে তার এমন বিরাট আয়োজন আছে, সে কথা শশী আদপেই ভাবতে পারে নি।

যেদিকে চোখ যায় শুধু বই আর বই।

আর কত রঙ-চঙে মজাদার বই।

শশী যে বইয়ের শুধু নাম শুনেছে, কিম্বা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখেছে, সেইরকম কত মজাদার বই যে সারে সারে তাকে সাজানো আছে—হিসেব করতে গেলে একেবারে হিম্‌সিম্ খেতে হয়।

যাকে বলে—একেবারে "বাঁশবনে ডোম কানা।"

কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা নেবে?

আর শুধু কেবল গল্পেরই বই?

কত মজার বিদেশী বই, দেয়ালে নানা দেশের ম্যাপ, গ্লোব, কত বাঁধানো বই, লুডো, স্নেকস্ এণ্ড ল্যাডার প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম।

শশী উল্লসিত হয়ে বললে, শ্যামল, তোমার কাকা তোমাকে সত্যি ভালোবাসেন। নইলে এমন উজাড় করে বইপত্তর কিনে দিতে পারতেন না। আচ্ছা ভাই, তোমার বাবা নেই?

শ্যামলের চোখ দুটো ছলছলিয়ে এলো। সে উত্তর দিলে, না ভাই। বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। খুব ছেলেবেলা থেকেই কাকিমার কোলে মানুষ। কাকিমারও কোনো ছেলে-পুলে নেই। একটা ভাই বা একটা বোন থাকলে আমারও এমন একলা ঠেকত না।

শশী ওকে ভোলাবার জন্যে বললে, আর মন খারাপ করতে হবে না আমি রোজ আসবো তোমার কাছে—আর এই বইগুলি গিলতে থাকবো। তোমার ছোট ভাই নেই বলে দুঃখ করছিলে শ্যামল? আচ্ছা ধরো, আমিই তোমার ছোট ভাই হয়ে গেলাম। তাতে আপত্তি নেই ত'?

আপত্তি? শ্যামলের মনটা পুলকে ঝিল্‌মিল্ করে ওঠে।

তুই যদি আমার ভাই হোস্ ত' আমরা দু'জনে মিলে অনেক বই পড়তে পারবো। আচ্ছা তুই কবিতা লিখতে পারিস্?

এই কথাটা জিজ্ঞেস করেই শ্যামল ভারী লজ্জা পেয়ে গেলে।

শশী চালাক ছেলে, অমনি ধরে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করলে, ও। বুঝতে পেরেছি, তুমি বুঝি কবিতা লেখো লুকিয়ে লুকিয়ে? যাচ্ছি আমি এক্ষুণি কাকিমার কাছে, সব তাঁকে বলে দেবো।

শ্যামল যেন হঠাৎ অথৈ জলে পড়ে যায়।

প্রায় আঁৎকে উঠে বলে, না-না। কক্ষনো নয়। দোহাই তোর, কাকিমাকে কিছু বলতে পারবি নে। তাহলে কিন্তু আড়ি হয়ে যাবে।

—হুঁ! আড়ি অমনি হলেই হল।

ফোড়ন কাটে আর মুখ টিপে হাসতে হাসতে থাকে শশী।

এইবার শ্যামলের একটু সাহস ফিরে আসে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ভাই শশী তুই কবিতা লিখিস না? কেউ আবার কবিতা না লিখে থাকতে পারে নাকি?

শশী জবাব দেয়, না রে, আমি কবিতা লিখি না। আমি ছবি আঁকি। ছবি আঁকতে আমার ভারী মজা লাগে।

শ্যামলের আনন্দ আর ধরে না। বললে, তাহলে ত' মজা হল। আমি কবিতা লিখবো, আর তুই ছবি আঁকবি। বড় হলে আমাদের এই হবে আসল কাজ। কেমন?

শশী বললে, কথাটা ত' মন্দ নয়। তুমি লিখবে কবিতা আর আমি আঁকবো ছবি। দেশের কত লোকে সেই কবিতা পড়বে, মুখস্থ করবে, সেই ছবি দেখবে— আর আমাদের সুখ্যাতি করবে।

—শুধু সুখ্যাতি?

ওর মুখের কথা শ্যামল টেনে নেয় ভবিষ্যতের মধুর-স্বপ্নে।

—দেশে-বিদেশে যাবে সেই কবিতা আর ছবি। বিদেশের লোকেরাও কিনবে সে ছবি আর কবিতা। কত অর্থ হবে আমাদের। দেশ-বিদেশ থেকে আহ্বান আসবে। আমরা বিমানে করে চলে যাবো—সেই সব অজানা দেশে। ভারতের মর্মবাণী ছড়িয়ে দেবো সবাইকার দ্বারে দ্বারে।

শশী আবার ওর কল্পনা নিজের কাছে টেনে নেয়—

—হ্যাঁ, ভারতের মর্মবাণী এক তরুণ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠবে। পৃথিবীর গুণীজনেরা তোমাকে দেবে নোবেল পুরস্কার। দেশের বুকে বিদ্যুৎবেগে আসবে সেই খবর। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ছাপা হবে সেই সন্দেশ। ধন্য ধন্য পড়ে যাবে দেশে আর বিদেশে।

শ্যামল বললে, আর ভারতের শিল্পীর আঁকা সেই অপরূপ চিত্রগুলি স্থান পাবে বিদেশের সব আর্ট গ্যালারীতে। সেখান থেকে নতুন সম্মানলাভ করবে

সেই তরুণ শিল্পী। একটা ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। শিল্পী নিজে যাবে তার সঙ্গে। সব দেশে পাবে বিপুল সম্বর্ধনা। সেরা শিল্পীর সেরা সম্মান নিয়ে আবার ফিরে আসবে জন্মভূমির বুকে।

হঠাৎ কাকিমার আবির্ভাব ঘটলো সেই ঘরে। তিনি মুচকি হেসে বললেন, তোমরা রূপকথা তৈরী করছ বুঝি মুখে-মুখে? কিন্তু রূপকথার প্রথম কথাই ত' পক্ষীরাজ ঘোড়া। সেটা আগে জুটেছে ত' তোমাদের?

শশী উত্তর দিলে, এই বিমানের যুগে পক্ষীরাজ ঘোড়ার আর ঠাঁই নেই কাকিমা। সে তার ডানা গুটিয়ে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশে পালিয়ে গেছে।

—তাহলে খুব বিপদ বলতে হবে। কাকিমা মন্তব্য করেন।

—না-হয় এক কাজ করো তোমরা। এই খাবারগুলো আগে শেষ করে ফেলো। এই বলে তিনি দুটি রেকাবী রাখলেন ওদের সামনে।

—জানো ত' খালি পেটে শুধু আকাশকুসুমই রচনা করা যায়—কিন্তু পেটের ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে। কাজেই সেই আগুনটাকে নিভিয়ে ফেলা দরকার।

শশী তাকিয়ে দেখলে রেকাবীর ভেতর ক্ষীরের সন্দেশ, নারকেল কুচি, চিঁড়ের মোয়া আর খানিকটা ছানা ও চিনি। সে বললে, আপনি ঠিক বলেছেন কাকিমা। তাহলে কল্পনার রাজ্যি থেকে একেবারে বাস্তব জগতে ফিরে আসা যাক্। এইরকম মুখরোচক খাবার সামনে রেখে কোনোরকম আকাশকুসুমই রচনা করা চলে না।

বলেই গপাগপ্ দক্ষিণ হস্তের কাজ সুরু করে দিলে।

সারাটা দিন শশীর কেটে গেল শ্যামলের বাড়িতে। শ্যামলের কাকাবাবু কাকিমার কাছ থেকে সব শুনে ওদের বাসায় চাকর দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শশী কিন্তু দুপুরবেলা খেতে বসে অবাক। লাফিয়ে উঠে বললে, একি কাকিমা। আমার গোয়েন্দাগিরি সঙ্গে কিছুই মিলছে না যে! রুইমাছের ঝাল, চিংড়ির কালিয়া, মুগের ডালে মাছের মুড়ো,—ওটা আবার কি—পায়েসের বাটি? তাহলে আপনি বলতে চান, গোয়েন্দাগিরিতে আমি ফেল করলাম? তারপর হতাশার সুরে বললে, হায় হায়, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে!

ওর কথা বলবার ধরণে কাকা আর কাকিমা হেসে উঠলেন।

।। ষোল ।।

একমাত্র দুখিনী মা ছাড়া শশীর সংসারে আর কেউ নেই। সাধারণ ছেলের চাইতে শশী অনেক বেশী মেধাবী।

শশীর এক মামা ওর পড়ার খরচ চালাতেন।

কলকাতা শহরে বোমা পড়তে, সেই মামাই উদ্যোগী হয়ে শশী আর তার মাকে এই জলবিছুটি গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির সঙ্গে ওর মামার পরিচয় আছে। তিনিই এখানে থাকবার যোগাযোগ করে দিয়েছেন।

এখানে এসে একটি ছোট খড়ের ঘর ভাড়া নিয়ে শশীর মা আছেন। মা আর ছেলে নিয়ে সংসার।

বারান্দার একটি দিকে ঝাঁপ আট্‌কে একটা ছোট কুঠুরীর মতো করা হয়েছে। সেইখানেই দুজনের রান্না। কোনো ঝামেলা নেই তাদের। কতকগুলো শিকে ঝুলিয়ে নেওয়া হয়েছে। দুপুর বেলাটা মা ইচ্ছে করেই একটু বেলায় রান্না করেন। সেই ডাল-তরকারী সন্ধ্যেবেলার জন্যে তোলা থাকে শিকেতে। শুধু সন্ধ্যার পর খানকয়েক আটার রুটি করে নেন। এখানে অবশ্য দুধ খুব সস্তা, তাই দুধ দিয়ে রুটিও খেতে পারে।

মায়ের একমাত্র কামনা ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক।

শশী তার মায়ের মনের কথা বুঝতে পারে। ক্লাসে লেখাপড়ায়ও খুব ভালো ছেলে। তা ছাড়া আঁকার দিকে শশীর খুব ঝোঁক। এখানে এসে কলকাতার মতো রঙ্ জোগাড় করতে পারেনি, তাই নানারকম ফুল তুলে, অনেক রকম ফল কুড়িয়ে এনে, এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে—বহুরকম পরীক্ষা করে নানা রঙ্ সে আবিষ্কার করেছে। তাই দিয়েই সে আজকাল ছবি আঁকে।

ছবি আঁকার কাজটা সে কিছুতেই বন্ধ করে না।

সকালবেলার পর সে হয়ত ছবি আঁকতে বসল—

তখন আর তার নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না।

কোনো রকমে ছেলেকে টেনে তুলে নাইয়ে দেন মা। আবার সে তুলি নিয়ে যেই বসে—কখন সন্ধ্যে হয় জানতেও পারে না।

ছবি আঁকতে বসে শশী একবারে তন্ময় হয়ে যায়।

সন্ন্যাসীরা যেমন ধ্যান করতে বসে এ-ও ঠিক তেমনি। একই রসে সাধনা।

শশীর মা শশীকে কেন্দ্র করে কত স্বপ্ন দেখেন।

এই ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে—দশজনের একজন হবে। এক ডাকে সবাই তার নাম বলতে পারবে—তবেই ত' তার বুকখানা ভরে উঠবে। সত্যিকারের শান্তি পাবেন তিনি জীবনে।

মায়ের একটিমাত্র কামনা তিনি ছেলের উপার্জ্জনে ঘুরে ঘুরে তীর্থ করবেন।

সেই আকাঙ্খার দিন কি তাঁর জীবনে সত্যিই আসবে? তত দিন কি তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন?

তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মা স্বপ্ন দেখেন। দুপুরবেলা যখন সারাটা গাঁ ঘুমিয়ে ঝিমোয়,—রোদ্দুর খা-খা করতে থাকে, খুব উঁচু আকাশে যখন একটি

চিল ডেকে চলে যায়—মায়ের মনে হয়—তার ছেলে সুনাম অত উঁচুতেই চলে যাবে, মেঘ ছাড়িয়ে সেই সূয্যিমামার কাছাকাছি।

হয়ত তারও নাগালের বাইরে।

তা হোক। তবু তার ছেলে বড় হোক, জ্ঞানী হোক, সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে যাক্ তার মাথা। সবাই আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করবে,—ওই শশীবাবুর মা যাচ্ছেন। সেই গর্ব বুকে নিয়ে তিনি মারা যেতে চান। শশীর মনে-মনে রয়েছে কত কামনা। কিন্তু সে মুখ ফুটে কাউকেই কিছু বলে না। তার মাকেও নয়। যদি সে কামনা না ফলে।

ছবি আঁকার ঝোঁক আছে বলে বই পড়ার নেশাও তার বড় কম নয়। যেই শুনেছে শ্যামলের বাড়িতে নানারকম বই আছে অমনি ছুটে গেছে সেখানে। নইলে ছেলে হিসাবে সে একটু কুঁড়ে।

বাগান করছে ত' তাই নিয়েই মেতে আছে। ছবি আঁকার বেলাতেও সে বিশ্ব সংসার ভুলে যায়। আবার যখন বই নিয়ে বসে—মনে হয় সারা দুনিয়াকে সে একদিকে সরিয়ে রাখতে পারে।

মা অনেক সময় গভীর রাত্রিরে উঠে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এই ছেলে কি তার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারবে? ওর বাবার যা আশা-আকাঙক্ষা ছিল তা সফল করে তুলতে পারবে জীবনে?

আপনমনে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে মা তবু ভাবেন।

তাঁর বুক ঠেলে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

মা তাঁর মনের বাসনা মুখ ফুটে ছেলেকে বলতে পারেন না,—ছেলের নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের রাঙা-ছবি মায়ের কাছে তুলে ধরতে লজ্জা পায়।

এইভাবে হাসি-কান্নার দোলায় সুখে-দুখে এগিয়ে চলেছে মা আর ছেলের প্রাত্যহিক জীবন।

এখানে এসে মা লক্ষ্য করেছেন যে, কলকাতার চাইতে শশীর শরীরটা ভাল আছে। খাঁটি দুধটা পড়ছে তাতে ওর স্বাস্থ্যটা বেশ একটু উন্নতির দিকেই যাচ্ছে বলে মনে হয়।

আর ছেলে ভাবছে, কলকাতার মতো ঘিঞ্জি-শহরে মায়ের ত' দিন কাটত অন্ধকূপ রান্নাঘরে।

এখানে বেশ খোলামেলা।

হোক্‌না খড়ের ঘর তবু তাতে আলো-হাওয়া খেলছে প্রচুর। ঘরের সামনেই একটা পুকুর আছে।

মা কাজে-অকাজে বারবার ওই পুকুরঘাটে যাচ্ছে—তাতে একটা হাঁটা-চলা পড়ছে। ওখানে মায়ের ক্ষিদেই হতো না। এখানে সেকথা বলবার যো নেই।

ঘর-গেরস্থালির কাজ ছাড়াও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেক বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে বেড়াতে আসেন ; আবার মাকেও সেইসব বাড়িতে যেতে হয়।

সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটাহাটি, মাটির সঙ্গে একটা যোগ, তাছাড়া কাঁচা আনাজ-তরকারী, খাঁটি দুধ, ভালো গাওয়া ঘি, এইসব জড়িয়ে মায়ের স্বাস্থ্যটা যে এখানে ভালই আছে—তা দেখে শশীর সন্তোষের সীমা নেই।

মাকে বলেছে, তুমি সকাল-সন্ধ্যে সময় করে যদি মাইল দুয়েক পথ হাঁটতে পারো, তাহলে তোমার শরীর বেশ ভালো হয়ে যাবে।

মা হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছেন, পাগল ছেলে। সকালবেলা ঘর-গেরস্থালীর কাজ ফেলে, আমি বুঝি সাহেব-মেমেদের মতো ছড়ি-ছাতা হাতে হাওয়া খেতে যাবো ? সে সব তোরা কর। আমাদের তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে—এখন ত' গঙ্গার দিকে পা বাড়িয়েই আছি—

শশী জবাব দেয়, তুমি যদি পা বাড়িয়ে থাকো, তবে আমাকেও সঙ্গে নিতে ভুলো না। আমাকে ফেলে একা-একা রাত্তিরে তোমার ঘুম হবে না যে।

—অমন অ-কথা— কু-কথা বলিস নে শশী।

ধমক্ দিয়ে উঠে শশীর মুখের কথা বন্ধ করে দেন মা । ও-ই যে তার একমাত্র শিব-রাত্রের সল্‌তে । মায়ের চোখে অকারণেই জল এসে যায়।

সেদিন সকালবেলা পড়াশুনো শেষ করে, শশী তাদের ঘরের সামনে তার ছোট জমিটিতে কতকগুলি ফুলগাছ লাগাচ্ছিল। এমন সময় তার পিছনে পায়ের শব্দ শুনে সে ফিরে তাকালো, একটি ছেলে এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

শশীকে ফিরে তাকাতে দেখে সে হেসে বললে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—বেশ ত'। এসো না। আমার ত' একা একাই দিন কাটে। শশী আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিলে।

—কি ফুলগাছ লাগাচ্ছ তুমি ?

—বেলফুল আর দোপাটি। ফুটলে পরে কেমন চমৎকার দেখাবে। ফুলের বাগানে বসে ছবি আঁকতে ভারী মজা লাগে। তা এখানে ত' খুব বেশী জমি নেই। যেটুকু আছে সেইখানে আমি নানারকম ফুলগাছ লাগাচ্ছি।

ফুলের বাগানে তোমার এত সখ তা একদিন চৌধুরীবাড়ি বেড়াতে এসো না। ওরা হচ্ছেন গাঁয়ের জমিদার। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা ওখানে আমাদের কেমন মজলিস বসে। চৌধুরীবাড়ির ছেলে চন্দনের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই ?

—না ভাই, আমার মামার সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির জমিদারের আলাপ আছে। তাঁদের চেষ্টাতেই ত' আমরা এই ঘরখানি পেয়েছি থাকবার জন্যে। চন্দনের নাম শুনেছি—কিন্তু তার সঙ্গে এখনো আমার আলাপ হয় নি।

—তাহলে বলি শোনো, একটা দরকারী কথা জানাতেই আমি এসেছি।

—কি দরকার শুনি? ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে শশী।

—দেখ, আমার নাম হচ্ছে খঞ্জা। আমাকে বেশ ভালো করে চিনে রাখো। চন্দনই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

—চন্দন পাঠিয়েছে? ওদের বাগান দেখতে বুঝি। তা একদিন যাবো'খন বেড়াতে।

—বেড়াতে ত' বটেই। তাছাড়া আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে আমরা জুটি।

—সে ত' ভারী মজার কথা। আমারও অনেকগুলি বন্ধু জুটবে।

আরো একটা দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বলনা শুনি। তোমার নাম হচ্ছে খঞ্জা,—কেমন মজাদার নাম, তবু তুমি এমন কিন্তু-কিন্তু করে কথা বলছ কেন?

—বলি শোন। তুমি হচ্ছ পূবপাড়ার লোক,—খালের ওধারের পশ্চিমপাড়ার লোকের সঙ্গে মোটেই মেলামেশা করবে না।

কথাটা শুনে শশীর ভারী মজা লাগলো।

তবু কৌতূহল গোপন করে জিজ্ঞেস করলে, এই গ্রামের বুঝি দুটি পাড়া আছে?

—হুঁ।

—পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়া?

—হুঁ?

—এ-পাড়ার লোকের সঙ্গে বুঝি ও-পাড়ার লোকের কথা বন্ধ?

—হুঁ।

—আচ্ছা ভাই, কোন্ পাড়াটা ভালো?

—সে কথা আর জিজ্ঞেস করতে? পূবপাড়া।

—গাঁয়ের নামটা কি ভাই?

—কী মুস্কিল। এখানে বাস করছ…তাও জানো না?

—ও। মনে পড়েছে জল-বিছুটি।

—হুঁ। জল-বিছুটি। গায়ে লাগলেই চুলকোয়।

—তোমাদের সকলেরই বুঝি চুলকানি হয়েছে—তাই ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া থাকতে পারো না?

—ঝগড়া কি আর আমরা বাঁধাই?

—তবে?

—ওই পশ্চিমপাড়ার লোকগুলোই দুষ্টু। সব সময় ওরা গোলমাল আর

মারামারি বাঁধাবার চেষ্টায় থাকে। তাই ত' আমরা কেউ ওদের সঙ্গে মিশিনে। তুমি যখন পূবপাড়ার লোক,—তুমিও মিশবে না।

—কিন্তু ভাই ও-পাড়ায় যে আমার এক বন্ধু আছে। সে পূবপাড়ারও নয় পশ্চিমপাড়ারও নয়,—সে হচ্ছে কলকাতার ছেলে।

—তা হোক। জল-বিছুটি গাঁয়ে এসে বাস করলে একটা দলে যোগ দিতেই হবে। হয় পূবপাড়া, না হয় পশ্চিমপাড়া।

—ঠিক বলেছ তুমি। মাছ মারতে গেলে গায়ে কাঁদা লাগাতেই হবে।

—হ্যাঁ ভাই, এইবার বুঝে নিয়েছ তুমি। আচ্ছা আজ যাই, আমি আর একদিন আসবো। আমার নাম হচ্ছে খঞ্জা ।

মহানন্দে হেলতে-দুলতে খঞ্জা চলে গেল।

সেইদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরই শশী এক পা দুপা করে শ্যামলের বাড়ি হাজির হলো। প্রথমেই দেখা কাকিমার সঙ্গে। তিনি ওকে দেখেই একগাল হেসে ফেললেন।

—এই ত' আমার নতুন ছেলে এসে হাজির হয়েছে ! বোকা ছেলে ! কাকিমার কাছে আসতে হলে খাওয়া-দওয়ার আগে আসতে হয়। নইলে মনে হবে—ছেলে পর হয়ে যাচ্ছে।

—তাই নাকি কাকিমা, প্রথমদিন সেইরকম এসে খুব জিতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা জানা রইল। এইবার ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করতে করতে সিধে আসব কাকিমার বাড়ি।

—ঠিক কথা। মা আর কাকিমাতে কি কিছু তফাৎ আছে? যখন খুশী এসে পাতা পেতে বসে যাবে।

—কিন্তু কাকিমা, সেদিন ত' ঝক্‌ঝকে থালা পেয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো কথা মনে পড়েছে । সেদিন যে বাড়ি ঢোকবার মুখেই মৎস্যযাত্রা হয়েছিল। পুকুরের ধারেই দেখলাম—আপনাদের ছোকরা চাকর দিব্যি বঁড়শিতে একটি পোনা মাছ তুলে ফেলেছে ।

—তা আফশোসের কিছু নেই। আজকেও ঘণ্টা একটা বড় কাতলা মাছ ধরেছে।

—অ্যাঁ। তাই নাকি? ঘণ্টা বুঝি ওর নাম? তাহলে ওর সঙ্গেই পাকাপাকি একটা যোগাযোগ করতে হবে। বঁড়শিতে মাছ উঠলেই শ্রীমান ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে জানিয়ে দেবে। আর আমি খালের ওপারে পূবপাড়ায় বসে দিব্যি শুনতে পারবো। বুঝবো, আজ কাকিমার ওখানে দিব্যি খ্যাঁট্ জুটবে।

—না বাছা, ঘন্টা বাজাবার দরকার হবে না। মন চাইলেই সোজা চলে আসবে। তোমার কাকিমার ভাঁড়ারে শশীর কোনদিনই অভাব ঘটবে না।

—সেকথা আমি প্রথমদিনই বুঝতে পেরেছি কাকিমা। আসবো বৈকি! ক্ষিদে পেলেই একেবারে চোঁ-চোঁ দৌড়।

—আচ্ছা যাও, শ্যামলের ঘরে গিয়ে গল্প করোগে। কিন্তু বিকেলে যাবার আগে দেখা না করে যেও না।

শশী উত্তর দিলে, সে কথা আর বলতে।

শশীকে দেখতে পেয়ে শ্যামল ফস্ করে উঠে দাঁড়ালো।

শশী মুখটিপে হেসে বললে, হুঁ বুঝতে পেরেছি।

—কি বুঝলি শুনি?

—নিশ্চয়ই কবিতা লিখছিলে।

—তোর কাছ থেকে লুকোবার যো নেই। আচ্ছা, তোকে শুনিয়ে দেবো, কি লিখছিলাম।

—কবিতা শুনবো পরে। তার আগে দরকারী কথা আছে।

—কি কথা?

—এ গাঁয়ের নাম কি জানো ত'?

—হ্যাঁ, জল-বিছুটি।

—সেই জল-বিছুটির আস্বাদ পেয়েছি।

—কি রকম?

—পূবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির জমিদার তনয়-চন্দন, তার এক চ্যালা এসেছিল আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে।

—কি বাণী দিয়ে গেল শুনি?

—বললে, জল-বিছুটি গাঁয়ের নাকি একটা আইন আছে। পূবপাড়ার লোক পশ্চিমপাড়ার মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে না।

—আর কিছু?

—হ্যাঁ, জমিদার তনয়ের সঙ্গে অবিলম্বে গিয়ে দেখা করতে হবে, এবং তার বাগান দেখতে হবে—আর সেই সঙ্গে নতুন উপদেশ গ্রহণ করে আসতে হবে।

শ্যামল এইবার হেসে ফেললে।

—হাসছ যে?

—তুমি কি মনে কর জমিদার-নন্দন শুধু পূবপাড়াতেই আছে? পশ্চিমপাড়ায় নেই।

—তোমার কাছেও লোক এসেছিল নাকি?

—নিশ্চয়ই, নইলে আমার মান-সম্মান থাকে কি করে? লোক এসেছিল গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের কাছ থেকে।

—কি উপদেশ লাভ হলো?

—অবিকল এক। ভদ্রলোকের এককথা যে। পূবপাড়ার মানুষের সঙ্গে মেলা-

মেশা আদপেই চলবে না। যোগ দিতে হবে ফাল্গুনের দলে—আর দলাদলিটাকে জাঁকিয়ে তুলতে হবে।

এইবার শশী একটু চুপ করে রইল।

তারপর শ্যামলের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে, আসল ব্যাপারটা কি জানো শ্যামল। আমাদের বাঙলাদেশের গ্রাম-অঞ্চলে সত্যিকারের শিক্ষার একান্ত অভাব। তাই এইসব পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া-বিবাদ এমন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

—ঠিক কথা বলেছিস ভাই শশী।

শ্যামল উৎসাহিত হয়ে উঠল।

—এইখানে আমরা যদি পাঠাগার গড়ি, নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করি, ছেলেদের একসঙ্গে করে ব্যায়ামাগারের কাজ শুরু করি—তাহলেই পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া মিটিয়ে দিতে পারি।

শশী বললে, আয় আমরা দু'জনে চুপচাপ এই কাজ হাতে নি। তাহলেই জল-বিছুটি গাঁয়ের নাম মধুচন্দন হতে পারবে।

শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, কাজের মতো কাজ। প্রতিটি ঘরে আর প্রতিটি মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে।

উৎসাহে আর উদ্দীপনায় ওরা পরস্পরের হাত চেপে ধরেছে। মুখে কিন্তু ওদের দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ।

।। সতেরো ।।

কাউকে কিছু না জানিয়ে, কোনোরকম প্রচার না করে শশী ও শ্যামলের অতি গোপনে তাদের সংগঠনের কাজ সুরু করে দিলে।

স্থান নির্বাচন সম্পর্কেও ওরা খুব সচেতন ছিল।

একেবারে ভদ্রপল্লীকে বাদ দিয়ে পাড়ার বাইরে এক কোণে বাগ্‌দীদের অঞ্চলে ওরা রাতারাতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় খুঁলে বসল।

ইতিমধ্যেই বাগ্‌দীদের মোড়লদের সঙ্গে শশীর বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

তাদেরই একটা খড়ের ঘরের বারান্দায় বিদ্যালয় বসল। প্রথম শুধু ছেলেদের নিয়েই কাজ সুরু হল। তারপর কয়েক রাত যেতেই বুড়োরাও হুঁকো হাতে এসে জাঁকিয়ে বসল।

যখন বুঝল শশী আর শ্যামলের আন্তরিকতার অভাব নেই, আর পূবপাড়া ও পশ্চিমপাড়ার দলাদলির ভেতর এ দুটি ছেলে যেতে অকান্ত অনিচ্ছুক-তখন বড়রাও বর্ণ পরিচয় নিয়ে বসে গেল লেখাপড়া শিখতে। বাপ প্রতিযোগিতা শুরু করল ছেলের সঙ্গে-আর ঠাকুর্দা পাল্লা দিয়ে পড়তে লাগলো নাতির সঙ্গে।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই এমন আশ্চর্য্য উন্নতি দেখা গেল যে, শশী ও শ্যামল দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে উঠল। নিরক্ষর মানুষের এমন একটি ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতা থাকে যে, ওরা অতি সহজেই লোকের আন্তরিকতা বুঝতে পারে আর তাদের কাছ থেকে ডাক এলে সবাই পোষাপাখির মতো ধরা দেয়।

এইভাবে শশী ও শ্যামল অতি অল্পদিনের মধ্যেই গাঁয়ের তথাকথিত ছোটলোক আর নিরক্ষরদের মধ্যে এত বেশী আপনার হয়ে উঠল যে, কথাটা এ-কান থেকে ও-কান হয়ে শেষ পর্যন্ত পূবপাড়ার চৌধুরীবাড়ি এবং পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়িতেও পৌঁছলো। এই খবর পেয়ে চৌধুরীবাড়ির চন্দন আর ফাল্গুন— উভয়েই বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠল।

বিশেষ করে চন্দনের রাগ ত' হবারই কথা।

তারা অনেক চেষ্টা করেও চৌধুরীবাড়িতে পাঠশালা বসাতে পারে নি। আর এ'দুটো বাইরের ছেলে বিনা গাঁয়ে এসেই ছোটলোকদের একজোট করে নিয়েছে।

এতেও যদি রাগ না হয় ত' হবে কিসে?

শেষকালে উড়ে এসে জুড়ে বসে, ওই দুই চ্যাংড়া ওদের গাঁয়ের ওপর মোড়লী করবে? তখন ছোটলোকেরা কি আর জমিদারবাড়ির কথা শুনতে চাইবে?

এরই মধ্যে এমন আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার ফলে গাঁয়ের ছোটলোকেরা আরো শশী-শ্যামলের মুঠোর মধ্যে এসে গেল।

গাঁয়ের ভদ্রপল্লী যেখানে শেষ হয়ে গেছে—আর বাগ্‌দীপাড়া শুরু হয়েছে, ঠিক সেইখানে বহুকালের একটি এঁদো-পুকুর আছে। যত রাজ্যের জঞ্জাল লোকে সেইখানে ফেলে। তবু বাগ্‌দীপাড়ার বৌ-ঝিরা সেই পুকুরের জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে।

ফলে বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা নিত্যি তিরিশদিন নানারকম অসুখে ভোগে।

বুড়ো বাগ্‌দীরা দুঃখ করে বলে, আগে এরকম ছিল না বাবু। আমাদের পাড়ার সকলকার স্বাস্থ্যই বেশ ভালো ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে ভদ্রপাড়ার ঝি-চাকরেরা এই পুকুরে জঞ্জাল ফেলতে শুরু করেছে, তখন থেকেই এর জলটা খারাপ হয়ে গেছে! অথচ আমাদের আর কেনো উপায় নেই! ভদ্রপল্লীর পুকুর ত' আমাদের ছুঁতে দেবে না। কাজেই এই পুকুরের জলই সবাই কলসী ভর্ত্তি করে নিয়ে যায়। তাই অসুখ-বিসুখও ছোটদের আর ছাড়ে না।

এই পচা নোংরা জল যে ওরা দিনের পর দিন খেতে দিচ্ছে, আর নিজেরাও ব্যবহার করছে সে জন্যে বাগ্‌দীপাড়ার কারো এতটুকু নালিশ নেই!

যেন এইটেই ওদের প্রাপ্য। বিধাতাপুরুষ ওপর থেকে তাদের জন্যে এই পচা জলই বরাদ্দ করে দিয়েছেন। ভালো জলের আশা করা ওদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র!

ব্যাপারটা যে গোটা গাঁয়ের একটা অবিবেচনার কাজ তাই নয়, এতে ভদ্রপল্লী নির্মমতাও অতি কুৎসিৎভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

শশী আর শ্যামল এই ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে আলোচনা করলে, কি করে এই নরক থেকে ওদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

শশী বললে, পুকুরটা পরিষ্কার আমাদের করতেই হবে। তাতে বাগ্‌দীপাড়ার সবাই স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পাবে। আর নিজেদের চেষ্টায় যে ছোটদের স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়, তারও একটা প্রমাণ হাতে নাতে ওরা বুঝতে পারবে।

মোটামুটি একটা পরিকল্পনা ওদের তৈরী হয়ে গেল যে, একদিন বাগ্‌দীপাড়ার সবাই মিলে অনেকগুলি নৌকো নিয়ে ওই জঞ্জাল ভর্তি-পচা পুকুরটাই ঢুকে পড়বে। তারপর গোটা পুকুরটাকে পরিষ্কার করে ফেলবে, শশী আর শ্যামলও এই কাজে হাত লাগাবে। তা হলেই সকলে উৎসাহিত হয়ে এই কাজে যোগ দিতে আর আপত্তি করবে না।

একদিন খুব সকালবেলা গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে দেখলে যে, শশী-শ্যামলের পরিচালনায় গোটা বাগ্‌দীপাড়া এসে পুকুরটার চারপাশে জড় হয়েছে। জোয়ানরা সরাসরি পুকুরে নেবে গিয়ে জঞ্জাল সাফ করতে লাগলো, নৌকো ভর্ত্তি জঞ্জাল নিয়ে এসে পুকুরপারে ফেলতে লাগলো, আর মেয়েরা ঝুড়ি করে সেইসব জঞ্জাল আর পাঁক মাঠের মাঝখানে ফেলতে লাগলো। এতে নাকি জমির সার হবে।

ওরা কেউ কাজকে ভয় করে না ; সবাই গায়ে খেটে খায়। তাই একটা পুকুরকে পরিষ্কার করতে তাদের খুব বেশী বেগ পেতে হল না।

শশী পুকুরের জলে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ছড়িয়ে বললে, সাতদিন এই পুকুরের জল কেউ খেতে পারবে না। জলটা থিতিয়ে যাক, তারপর তোমরা সবাই এই পুকুরের জল ব্যবহার করে দেখো—কেমন সুন্দর আর পরিষ্কার হয়।

পাড়ার মোড়ল বললে, তুমি বলছ বটে দাদাবাবু, কিন্তু এই সাতদিন বাগ্‌দীপাড়া বেঁচে থাকবে কি করে? দু'দিন খালি পেটে থাকা যায়—কিন্তু জল ছাড়া ছেলেপুলেরা বাঁচবে কি করে?

শ্যামল তখন এগিয়ে এসে উত্তর দিলে, সেজন্যে তোমাদের কোনো ভাবনা নেই। আমরা যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি তার সামনে ত' বিরাট পুকুর রয়েছে—এই সাতদিন তোমরা সেই জল কলসি করে নিয়ে আসবে।

পাড়ার মোড়ল জিব কেটে বললে, আরে রাম রাম! তুমি বলছ কি দাদাবাবু, তোমাদের বাড়ির পুকুরের জল কি আমাদের বাড়ির বৌ-ঝিরা নিয়ে আসতে পারে? আরে ছুঁতেই বা দেবে কে?

শ্যামল উত্তর দিলে সেজন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার কাকা আর কাকিমা আছেন। আমি আর শশী গিয়ে যদি সব কথা বুঝিয়ে বলি তবে নিশ্চয়ই তারা অনুমতি দেবেন।

শশী এইবার উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে, কাকা আর কাকিমা একেবারে মাটির মানুষ। কেউ পুকুর থেকে খাবার জল নিয়ে গেলে যে, সেই পুকুর অপবিত্র হয় না—একথা তারা জানেন। বরং তৃষ্ণার জল দিলে পুণ্যি হয় এই কথাই তাঁরা বিশ্বাস করেন। কাজেই এ নিয়ে তোমরা আর ভাবনা চিন্তা কোরো না।

শশী-শ্যামল যে পরামর্শ দিয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত তাই হল। কেননা শ্যামলের কাকা আর কাকিমার কাছে সব কথা খুলে বলতে তারা দুজনেই হাসতে লাগলেন।

—আমাদের পুকুর থেকে জল নিয়ে যাবে ওরা এত' ভালো কথাই রে। আমরা কেন মিছিমিছি আপত্তি করতে যাবো?

কাকাবাবু এই কথা বলে নিজের কাজে চলে গেলেন। আর কাকিমা রসিকতা করে বললেন, বরং ভালই হল। এত লোক যদি কলসি ভর্তি করে তৃষ্ণার জল নিয়ে যায়—তবে হিসেব করলে অনেকখানি পুণ্যিই জমা হবে। মৃত্যুর পর যখন যমরাজার বিচারশালায় নিয়ে গিয়ে হাজির করবে—জোড়হাত করে বলবো, আগেই নরকে পাঠিও না প্রভু, আমাদের শশী-শ্যামলের বুদ্ধি পরামর্শে আমরা তৃষ্ণার জলদান করেছিলাম। কাজেই নিশ্চই কয়েক মণ পুণ্যি হিসেবে জমা হয়ে আছে।

যমরাজ অমনি চিত্রগুপ্তকে আদেশ দেবেন, —ওহে চিত্রগুপ্ত, তোমার হিসেবের খাতা বের কর দেখি··· ।

নাকের ডগায় কলম লাগিয়ে সূচিপত্র দেখে বহু কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া হিসেব করে চিত্রগুপ্তকে বলবেন···হ্যাঁ কিছু পুণ্যি জমা আছে বটে। তাহলে আর বুড়োবুড়িকে নরকে পাঠানো চলে না ।

ধর্মরাজ বলবেন, হুঁ। স্বর্গরাজ্যেই ওদের জন্যে দুটি আসনের ব্যবস্থা করে দাও।

অমনি কৌতুক আর আনন্দের মাঝখান দিয়ে কাকা-কাকিমার অনুমতি পেয়ে, শশী ও শ্যামলের খুশীমনে বাগ্‌দীপাড়ায় খবরটা দিতে গেল।

ওখানে পৌঁছে আর এক বিপত্তির কথা তাদের কানে এলো।

কোনো বাড়ির ঝি এসে নাকি একরাশ পুরোনো কাঁথা পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে গেছে। খবর নিয়ে জানা গেল—সেগুলি এক বসন্ত রোগীর বিছানার কাঁথা।

শশী বললে, আগেই লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে, সোজা পথে কাজ করবার চেষ্টা করা যাক। শ্যামল কিন্তু ভারী চটে গিয়েছিল।

সে জিজ্ঞেস করলে, সোজা পথটা কি শুনি?

শশী বললে, সোজা পথটা কি দেখবে? আচ্ছা দেখাচ্ছি তোমায়। এই বলে

একটা ভাঙা টিন সে জোগাড় করলে। তারপর আলকাৎরা দিয়ে তার ওপরে লিখলে ঃ

পানীয় জলের পুকুর।
কেউ আবর্জনা ফেলিবেন না।

এই ব্যবস্থা করে সে চুপচাপ বসে রইল না। বাগ্‌দীপাড়ার একদল ছেলে জোগাড় করলে। দু'জনেরই কাঁধে চাপিয়ে দিলে ঢোল। তাদের একটি নৌকোয় তুলে নিয়ে সারা গ্রাম প্রদিক্ষণ করে আসবে ওরা। সারা পথ ওরা ঢোল বাজাবে আর বলবে—

বাগ্‌দীপাড়ার পুকুর পরিষ্কার করা হয়েছে···
ওখান থেকে ছেলে বুড়ো সবাই খাবার জল নিচ্ছে—
কেউ আর ওখানে জঞ্জাল ফেলবেন না—
ডুম-ডুম-ডুম-ডুম

এই ঘোষণা শোনবার জন্যে খালের দুপাশে মানুষ জমে গেল।

কেননা জলবিছুটি গাঁয়ে এইজাতীয় ঘোষণা এই প্রথম। ভদ্রপল্লীর বৃদ্ধেরা বলতে লাগলো, অ্যাঁ। কালে কালে এ কি হল। ওদের এত বুকের পাটা যে, নোংরা পুকুরে জঞ্জাল ফেলতে নিষেধ করে ? চিরকাল দেখে আসছি—ভদ্রপল্লীর সব জঞ্জাল ওইখানে ফেলা হয়,—আজ ওরা হঠাৎ এমন কি মাতব্বর হয়ে উঠল শুনি?

কিন্তু শশী-শ্যামলের ব্যবস্থা অতি পাকা।

এই ঘোষণার পর ওদের আদেশে দু'জন করে বাগ্‌দী পালা করে রাত-দিন পুকুরটি পাহারা দিতে লাগলো। হাতে রইল ওদের তেলপাকানো বাঁশের লাঠি।

ইচ্ছায় হোক—অনিচ্ছায় হোক কোন বাড়ির ঝি-চাকর আর জঞ্জাল ফেলবার জন্যে সে পথ মাড়ালো না।

তখন নতুন করে সেই রোগীর কাঁথা পুকুর থেকে তুলে ফেলে আবার প্রতিষেধক ওষুধ ঢেলে দেওয়া হল। বাগ্‌দীপাড়ায় আবার জানিয়ে দেওয়া হল—একমাস যেন কেউ এই পুকুরের জল ব্যবহার না করে।

পানীয় জলের সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান হয়ে গিয়েছিল।

শ্যামলের কাকা আর কাকিমা ঘাটে বসে দেখেন বাগ্‌দী-বৌরা ঘোমটা দিয়ে ওদের পুকুরে আসছে আর কলসী-ভর্তি জল নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

কিন্তু বাগ্‌দীদের বারণ আছে···খালি হাতে পাড়ায় বৌরা যেন কেউ শ্যামলদের পুকুরের জল নিতে না যায়।

তখন দেখা গেল কেউ লাউটা, কেউ কুমড়োটা, কেউ বা শাক, কেউ এক সের দুধ, কেউ ঘরের তৈরী গুড় নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

কাকিমা ওদের স্নেহের অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেন, বললে, তোমাদের বাছা কাউকে কিছু দিতে হবে না। পুকরের জল নেবে নাওনা। আবার কলা, মুলো, শাক, লাউ এসব নিয়ে আসছ কেন?

বৌরা ঘোমটা ফাঁকে জবাব দেয়, না-না দাদাবাবুরা খাবে। আমাদের ছেলে-পুলেরা ভালো হোক্, এই আর্শীবাদ করো মা। আমরা যা হাতে করে এনেছি—তা পায়ে ঠেলে দিও না।

এর ওপর আর কোনো কথা চলে না।

বাগ্‌দীদের জল নিয়ে পথ-ঘাট দিয়ে হাঁটাচলা করতে দেখে গাঁয়ের লোকেরা অস্বস্তিবোধ করে।

গাঁয়ের বুড়োর দল হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে টিপ্পনী কাটে—

" পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে"।

কিন্তু মজা এই যে, ওরা প্রতিবাদও করে না—আর জল নেওয়াও বন্ধ করে না।

ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে এঁটে উঠবে কে?

ওদিকের পুকুরের পাহারাও শশী-শ্যামল উঠিয়ে নেয় নি।

বাগ্‌দীপাড়ায় লোকের অভাব নেই,—আর ওরা খাটতেও নারাজ নয়। পালা করে দু'জন লোক রাত দিন লাঠি হাতে ঠায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এইবার ফেল কে জঞ্জাল ফেলবি!

ওদের মন্ত্র হচ্ছে—আমরা কারো সঙ্গে ঝগড়া করবো না, কিন্তু আমরা অন্যায়ও কিছু হতে দেবো না। এ মন্ত্র ওদের শিখেয়েছে শশী আর শ্যামল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবধি মুখস্থ করিয়েছে—কবিগুরুর বাণী—

"অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—
তবু ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।"

পুকুর পরিষ্কারের কাজ তাই বলে বন্ধ থাকে নি।

জঞ্জাল সাফের পর পঙ্কোদ্ধার।

একাজেও বাগ্‌দীরা ছেলে-বুড়ো মিলে এগিয়ে এসেছে আনন্দের সঙ্গে। এমন আপনার করে এর আগে ত' আর কেউ তাদের ডাক দেয় নি। তাই ত' দুটি বিদেশী ছেলের মিষ্টি কথায় ওরা বশ হয়ে গেছে।

ওদের মনে হচ্ছে,— এ এক নতুন খেলা।

বাগ্‌দীপাড়ার সবাই কাজের নেশায় মেতে গেছে যে। একদিন পাড়ার কয়েকজন মাতব্বর মিলে শশী-শ্যামলকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে বললে, দাদাবাবু, পুষ্করিণীটাকে ত' তোমরা উদ্ধার করে দিলে। এইবার আমাদের ছেলেপিলেদেরও উদ্ধার করে দাও। শূয়োরছানার মত ওরা ঘুরে বেড়ায়!

শশী আর শ্যামল তো হেসেই খুন।

শশী বললে, আমরা কি নিমাই যে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করবো?

মোড়ল বললে, আমি সে উদ্ধারের কথা বলি নি। ওদের এমন করে মানুষ করবার ব্যবস্থা করে দাও যে, লোকে ওদের আর ঘৃণা না করে। আমাদের জীবন ত' একরকম কেটে গেল। ওরা লেখাপড়া শিখুক, দশজনের একজন হোক—মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখুক। দোহাই দাদাবাবু, তোমাদের পায়ে পড়ি, একটা ব্যবস্থা তোমরা করে দাও। আমরা সারাজীবন যেমন—দূর-দূর ছাই-ছাই শুনে সকলের কাছ থেকে দুরে সরে রইলাম—ওদের ভাগ্যে যেন তেমন অবহেলা না জোটে।

শ্যামল বললে, আচ্ছা মোড়ল ভাই, একটা আলাদা খোলামেলা খড়ের ঘর আমাদের তৈরী করে দিতে পারিস? তাহলে তোদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের একটা ব্যবস্থা করা যায়।

মোড়ল ওদের কথা শুনে খুশী হল। বললে, এ আর বেশী কথা কি দাদাভাই? আমরা আলাদা ভিটে করে একটা সুন্দর খড়ের ঘর তৈরী করে দিচ্ছি।

যে জঞ্জাল ভর্তি পুকুরটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল তারই দক্ষিণ পাড়ে বাগ্‌দীরা নিজেদের পরিশ্রমে প্রথমে মাটি তুললে সেই পুকুর থেকে। বিরাট একটা উঁচু ভিটে করা হল।

এইখানে উঠবে ছোটদের জন্যে একটি সুন্দর খড়ের ঘর। মোড়ল বলে, এমন ঘর তৈরী করে দেবো যে, সবাই দালান ফেলে এইটের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

বাগ্‌দীপাড়ার মোড়ল মিছে গর্ব করে নি।

প্রথমেই মোড়ল পাড়ায় জানিয়ে দিলে যে, দুইজন করে 'মানুষ' সব বাড়ি থেকে এসে এই ঘর তোলার ব্যাপারে খাটবে।

মোড়লের কথা কেউ অমান্য করতে পারে না। তাছাড়া এটা হচ্ছে ছোটদের কাজ। সব বাড়িতেই ছেলে-পুলে আছে। সকলেই কোমরে গামছা জড়িয়ে মোড়লের কাছে এসে বলে, কি কাজ দেবে দাও।

খাটবার লোকের অভাব নেই। সকলেই জানে আমার ঘরের কাজ। মজুরী জুটবে না বটে কিন্তু মনের মতো জিনিষটি গড়ে উঠবে। এই ঘরেই পাড়ার সব ছেলে মানুষ হবে। সেটা হবে ওদের তীর্থস্থান। ওরা গয়া, কাশী, বৃন্দাবন যেতে চায় না, ওদের নোংরা পাড়ার মধ্যেই গড়ে তুলতে চায় একটি সুন্দর আস্তানা যেখানে পাড়ার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে আর ফোটাফুলের মতোই বেড়ে উঠবে।

মোড়ল দেখলে, জন খাটবার লোকের অভাব নেই। সে তখন শশী আর

শ্যামলকে নিয়ে আর একদিন বসল। বললে, দাদাবাবু, তোমাদের মনে কি রয়েছে···সব আমাকে খুলে বলো। শুধু একখানি ঘর কেন? ঘর, বাগান, খেলার জায়গা সবকিছু আমরা মেহনৎ করে গড়ে দেবো—তোমরা শুধু বসে একটা মোটামুটি ছক করে আমার হাতে ফেলে দাও।

শশী আর শ্যামল দেখলে মোড়ল নিরক্ষর হলে কি হবে—খুব দামী কথা সে বলেছে। প্ল্যান করে একটি সুন্দর "শিশু-কেন্দ্র" ওরা গড়ে তুলতে পারে, কেননা সবাই খাটতে আর পরিশ্রম করতে উৎসুক। বনের জন্তু-জানোয়ারের সাহায্যে রামচন্দ্র সাগর বন্ধন করে ছিলেন, এরা ত' মানুষ।

দু'জনে তখন খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসল শিশু কেন্দ্রের পরিকল্পনা করতে হবে।

।। আঠারো ।।

দু'রাত্তির জেগে—অনেক ভেবে-চিন্তে, গোটা কয়েক নক্সা এঁকে শশী একটি চমৎকার পরিকল্পনা করে ফেললে।

শশী ত' এমনিতেই ছবি আঁকতে ওস্তাদ। তাই তার পক্ষে নক্সা আঁকার কোনো অসুবিধাই হয়নি। সেই নক্সাটি সে শ্যামলকে বোঝাচ্ছিল।

মাঝখানে হবে একটি লম্বা হলঘর। চারদিক খোলা ; সেই ঘরে পাঠশালা বসবে। এই ঘরের পাশে আর একটি হলঘর হবে। সেই ঘরে পাঠাগার স্থাপন করা হবে। খুব সামান্য ভাবে এই পাঠাগারটি শুরু করা হবে। ছড়ার বই, রূপকথার কাহিনী, ছোট ছোট গল্পের বই। এইসব নিয়েই কাজ আরম্ভ করা হবে। সারা গাঁয়ের লোকের কাছেই চাঁদা চাওয়া হবে, সে ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করা হবে না। খুশী হয়ে সে যা দেবে তাই সাদরে গ্রহণ করা হবে। কেউ যদি দিতে না চান—তার ওপরও জুলুম করা হবে না।

মাঝখানকার ঘরের একপাশে থাকবে যেমন পাঠাগার—অন্যদিকে আর একটি খোলামেলা ঘর উঠবে—সেটা হবে ব্যায়ামাগার। সাধারণতঃ খোলা মাঠেই ছোটদের খেলাধূলা আর ব্যায়াম করানো হবে। তবে বৃষ্টি হলে এই খোলামেলা ঘরে ছেলেরা ব্যায়াম করতে পারবে। একটি ছোট কুঠুরীমতো থাকবে—তাতে ব্যায়ামের সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখা হবে। এ ছাড়া গাছের ডালে ছোটদের জন্যে দোলনা বেঁধে দেওয়া হবে। প্যারালাল বার ইত্যাদি কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরী করে দেওয়া যেতে পারে। রাত্রে পাঠশালায় নৈশ বিদ্যালয় বসবে।

এই তিনটে ঘরকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি বাগান তৈরী করতে হবে। বাগানের কাজে ছেলেমেয়েরাই সকাল-সন্ধ্যে খাটবে।

শুধু যে ফুলের গাছই এখানে হবে তা নয়, একপাশে শাক-সব্জী, লাউ-কুমড়ো ইত্যাদিরও ফলন হবে। সেইগুলি গ্রামে বিক্রি করে যে পয়সা পাওয়া যাবে তা পাঠাগারের উন্নতির জন্যে ব্যয় করা হবে। মেয়েরা এখানে বসে সমবেতভাবে ঝুড়ি, বেতের মোড়া, ডালা, কুলা ইত্যাদি তৈরী করবে। সেগুলো বিক্রি করে যে আয় হবে তা-ও শিশুকেন্দ্রের উন্নতির জন্য খরচ করা হবে।

যে পুকুরটি পরিষ্কার করা হয়েছে—সকলের উপকারের জন্যে তার জল যাতে আরো পরিষ্কার হয় এবং নির্ভাবনায় সবাই যাতে পানীয় জল হিসাবে তা ব্যবহার করতে পারে সেজন্যে সকল রকম সাবধানতা অবলম্বন করা হবে এবং প্রতিষেধক ঔষুধও ব্যবহার করা হবে। এই পুকুরটি এখন বেশ বড় হয়েছে। এখানে মাছের পোনাও ছেড়ে দেওয়া যায়। সেই মাছ যখন বড় হবে—পাড়ায় পাড়ায় তা বিক্রি করা যাবে, সেই আয় থেকে শিশুকেন্দ্রের অনেক উন্নতি বিধান করা চলবে।

পুকুরের চার পাড়ে আম, কাঁঠাল, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। এখন সাত ভূতে এসব লুটে-পুটে খায়। কারও এদিকে দৃষ্টি নেই। শিশুকেন্দ্র গড়ে উঠলে এখানকার ছেলেরাই সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবে। এই ফল বিক্রি করেও প্রতি বছর একটা আয় হবে। কেন্দ্রেব তহবিলে সেই টাকা জমা পড়বে।—আর প্রয়োজন মত খরচ করা হবে।

আরও একটি পরিকল্পনা শশী করেছে। একটি তাঁতঘর বসানোর ব্যাপাবে। কিছু অর্থ সংগৃহীত হলেই একটি তাঁত বসানো যেতে পারে। সেজন্যে একটি আলাদা ঘর তৈরী করতে হবে। মেয়েরা নিজেদের অবসর সময়ে এই তাঁতঘরে এসে কাপড় গামছা বুনবে। সেগুলোও লোকের কাছে বিক্রি কবে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারবে।

শ্যামলের ভারী পছন্দ হল নক্সাটা।

তখন তারা দুজনে মিলে মোড়ল গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে।

মোড়ল আপন মনে মাথা নেড়ে বললে, এ ত' সবই ভালো কাজ দাদাবাবু, আচ্ছা, আমরা কোমর বেঁধে লাগছি। তোমরা যে নক্সা এঁকেছ—আমরা ঠিক-ঠিক সেই রকম ঘর তুলে দেবো। তারপর তোমাদের কাজ তোমাদের হাতে।

মোড়লের সম্মতি পেয়ে সাড়া পড়ে গেল গোটা বাগ্দীপাড়ায়। একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ চললো দুবেলায়।

একদল ঝুড়ি করে মাটি বয়ে নিয়ে এসে ফেলছে। একদল সেই মাটি দুরমুজ দিয়ে পিটিয়ে ভিটে তৈরী করছে, একদল পাড়ার বিভিন্ন বাঁশ-ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে বয়ে নিয়ে আসছে আর একদল সেই বাঁশ কেটে খুঁটি তৈরী করছে।

একটি লোক যদি ওদের কাজের পদ্ধতি দাঁড়িয়ে দেখে, তবে সত্যি অবাক হয়ে যাবে সমস্ত কিছুর শৃঙ্খলা আর সুব্যবস্থায়।

যে সব মাটি ঝুড়ি ভর্তি করে ওপরে এনে ফেলা হচ্ছে—মেয়েরা আবার দলবদ্ধভাবে তার ভেতরে জল ঢালছে—যাতে ভিটেগুলি খুব শক্ত আর মজবুত হয়।

বিভিন্ন ঘরের যে বেড়া হবে— তারই কাজে লেগে গেছে একদল ছেলে। তারা বাঁশকে বেশ সুন্দর করে ছেঁচে পাতলা করে ফেলছে—তারপর এমন সুন্দরভাবে বাঁশের বেড়া তৈরী করছে যে, তার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

গোটা বাগ্‌দীপাড়ায় যেন একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে। যারা প্রত্যহ জন খাটতে যায় তারাও ফিরতি মুখে এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা এই শিশুকেন্দ্রে মেহনত করে খুশী মনে বাড়ি ফিরে যায়।

ওদিকে বাগ্‌দীপাড়ায় কাজ এগিয়ে চলছে—ঠিক তার উল্টো পিঠ হিসেবে সারা গাঁয়ে একটা আলোচনা উঠেছে পাড়ায় মাতব্বরদের মুখে মুখে।

—ছোট লোকদের 'লাই' দিয়ে মাথায় তোলা।

—জলবিছুটি গাঁয়ে এইরকম কাণ্ডকারখানা আর কখনো হয় নি।

—হুঁ। দুটো বাইরের ছোঁড়াই যত অনিষ্টের মূল। নইলে আমাদের গাঁয়ের ছেলেদের কখনো ছোটলোকদের মাথায় তুলে ধেই-ধেই করে নাচতো না।

—বুঝতে পেরেছি। পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।

—কিন্তু এ ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হবে।

—যারা কখনো মাথা তুলে আমাদের মুখের দিকে চাইতে পারত না—তারা টকা দিয়ে ইস্কুল পাঠশালা বসাচ্ছে। আবার কুস্তির আখড়াও নাকি খুলছে।

—পথ দিয়ে হাঁটবার সময় একপাশে সরে দাঁড়াতো সব। এখন কনুয়ের ধাক্কা মেরে চলে যাবে।

—হুঁ। আর বারণ করলে কুস্তির প্যাঁচ লাগিয়ে দেবে।

—ঠিক কথা। আগুন আর শত্তুরকে কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিতে নেই। পায়ের নীচে শেষ করে দিতে হয়।

গ্রামের বৈঠকখানা ঘরগুলিতে ক্রমাগত হুঁকোর ওপর কলকে পুড়ছিল আর এই জাতীয় আলোচনা লাফালাফি করে ফিরছিল একের মুখ থেকে অন্যের মুখে।

বাগ্‌দীপাড়ার এইসব সংগঠনমূলক কাজ সব চাইতে চক্ষুশূল হয়েছিল চৌধুরীবাড়ির চন্দনের। কেননা তারা পাঠশালা গড়তে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারে নি।

ফলে হল কি—পশ্চিমপাড়ায় পাঠশালা পুড়ে গেল ;কিন্তু ওরাও আর নতুন পাঠশালা স্থাপন করাতে পারলে না।

সামন্ত পণ্ডিতের অবস্থা দেখে আর কেউ এগিয়ে এল না পাঠশালার গুরুমশাইগিরি করতে। হয়ত দু-চারজন একাজের উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু গাঁয়ের সবাই ভালো করে জানতো যে, পূবপাড়ার আক্রোশে যদি পশ্চিমপাড়ার পণ্ডিতের বাড়ি পোড়ে—তবে পূবপাড়ায় যে নতুন করে গুরুমশাইগিরি করতে যাবেন—পশ্চিমপাড়ার ক্রোধাগ্নিতে আবার কবে নতুন পণ্ডিতের ঘরও ভস্মে পরিণত হবে।

কথায় বলে,—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। দরকার নেই পণ্ডিতিতে, বরং বাজারে আলুপটল বিক্রি করা ভালো তবু এদের রেষারেষির মাঝখানে পড়ে কোনদিন পৈতৃক প্রাণটা চলে না যায়।

গাঁয়ে সেই পাঠশালা হল, তবু পূবপাড়ায় নয়—হল কিনা একেবারে বাগ্‌দীপাড়ায়।

এ লজ্জা চৌধুরীবাড়ির চন্দন কোথায় লুকিয়ে রাখবে? একদিন সন্ধ্যার মুখে ঘাটের নৌকা করে খাল ধরে গিয়ে সেই পাঠশালা দেখে এলো চন্দন।

কি চমৎকার করে গড়ে তুলেছে ওরা পাঠশালার ঘর। যেন একেবারে ছবির মতো।

চারদিকে বাগান, কাছেই পুকুর। সেই এঁদো-পচা পুকুর বলে চেনাই যায় না! পাঠশালার ভিটে আর মেঝে এমন সুন্দর করে গোবর নিকানো যে, মনে হয় মা সরস্বতী বুঝি একান্তে এসে এইখানে তাঁর চরণযুগল রেখেছেন।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে এলো সঙ্গী-সাথী নিয়ে চন্দন।

চন্দনের সঙ্গী-সাথীরা একদিন শশীকে ডেকে নিয়ে এলো চৌধুরীবাড়ি। অবশ্য খাবারের নেমন্তন্ন করেই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসা হল। শশীর মামা চৌধুরীবাড়ির পরিচিত ব্যক্তি, কাজেই শশীর ওপর ওদের একটা জোর আছে বৈকি।

চন্দন শশীকে তার নিজের বৈঠকখানাঘরে খাতির করে বসালে। নানারকম আলাপ-আলোচনা চলল।

দেশের হালচাল, কলকাতায় জাপানী বোমা, লোকের মনোভাব, ফুটবল প্রভৃতি আলোচনা যখন কিছুতেই জমল না—তখন চন্দন জলবিছুটি গাঁয়ের কথা তুললে।

দেখ ভাই শশী—

চন্দন শুরু করলে একটা অনুরোধের সুরে।

— ছোটজাতের লোকেরা আমাদের গাঁয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারত না। তোমাকে আমরা আপনার লোকই বলব, কেননা তোমার মামা বহুবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন—একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন! তুমিও

পুবপাড়াতেই এসে তোমার মাকে নিয়ে বসবাস করছ। অন্য পাড়ায় লোকেরা কে কি করছে আমার দেখার দরকার নেই। কিন্তু তোমাকে ত' আমি বন্ধুভাবে কাছে ডাকতে পারি—

শশী বললে, নিশ্চয়ই পারো ভাই। সব চাইতে বড় কথা আমরা সমবয়সী। আমরা যদি চাই তবে অনেক কিছু ভালো কাজ করতে পারি এই গাঁয়ে—

—ভালো কাজ করতে চাও করো না—

নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলে চন্দন।

—কিন্তু তোমাকে ভাই ওই বাগ্‌দীদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। ওদের সঙ্গে মিশে তুমি পাঠশালা বসাচ্ছ, পুকুর পরিষ্কার করছ, বাগান তৈরী করছ, পাঠাগার স্থাপন করছ…কিন্তু কেন? এতে কি ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে না? তুমি পাঠশালা গড়তে চাও বেশ ভাল কথা। আমার বাড়ির ঘর তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। একটা শুভদিন দেখে তুমি কাজ শুরু করে দাও।

এই কথা বলে চন্দন ওর মুখের দিকে সঙ্গে আগ্রহের তাকিয়ে রইল।

শশী প্রথমটা কিছু উত্তর দিতে পারল না। খানিকক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিলে, দেখ ভাই চন্দন, আমরা এ যুগের ছেলে। কেউ যদি আপনার জন মনে করে কাছে ডাকে আর হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায়—তবে কি তাকে বিমুখ করতে পারি? আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হবে পেছনে যে পড়ে আছে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া আর প্রাণপণে তাকে টেনে তোলা। নইলে সেই যে একদিন পেছনপানে টেনে আমায় কাদায় ফেলে দেবে। আর শুভদিনের কথা বলছ? আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিনই শুভদিন—যদি আমরা শুভ সঙ্কল্প নিয়ে কাজ শুরু করতে পারি। আমাদের নিষ্ঠার ওপরই নির্ভর করে সে কাজ জয়যুক্ত হবে কিনা।

শশীর কথা শুনে চন্দনের চোখ দুটো এক মুহূর্তে জ্বলে উঠল। তবে সে যথাসম্ভব চেষ্টা করলে তার রাগটাকে বাগে আনতে।

ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বললে, তাহলে তুমি ওই বাগ্‌দীদের সঙ্গ ছাড়তে রাজী নও?

শশী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, বাগ্‌দী বলে কোনো কথা নেই। ওরা যদি বাগ্‌দী না হয়ে ব্রাহ্মণ হত তাহলেও আমি একই কথা বলতাম। যাদের নিয়ে একটা কাজ শুরু করেছি মাঝপথে তাদের ছেড়ে আসি কি করে ভাই? আমরা এই কাজে সকলেরই সাহায্য চাই। আর তুমি নিজেও জানো যে, এই কাজটা যদি ভালোভাবে রূপ নিতে পারে তবে গোটা গাঁয়ের তা থেকে উপকার পাবে।

এইবার চন্দন তার রাগটাকে আর চেপে রাখতে পারলে না। চড়া গলায় উত্তর দিলে, তুমি কি বলছ শশী, তুমি নিজেই ভেবে দেখ নি। তুমি কি মনে

কর যে, ভদ্রপাড়ার ছেলেমেয়েরা ওই বাগ্‌দীদের সঙ্গে ওই পাঠশালায় পড়তে যাবে? শহর থেকে নতুন এসেছ কিনা, তাই পল্লী অঞ্চলের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। তুমি কি জানো, ওদের পাড়ার কাউকে ছুঁলে আমাদের স্নান করতে হয়?

মৃদু হেসে শশী উত্তর দিলে, সে তোমাদের কুসংস্কার। এই পৃথিবীতে সবাই সমান—সবাই মানুষ। ওরাও যদি লেখাপড়া শেখে তবে দেশের উন্নতিবিধান ওদের দ্বারাও সম্ভবপর হবে। শুধু একটি কথা ভেবে দেখ চন্দন, ওই বাগ্‌দীপাড়ার একটি ছেলে যদি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে এই জেলারই শাসক হয়ে আসে—তবে কি তুমি তাকে জমিদার হিসাবে সম্মান দেখাবে না?

মানুষ যখন যুক্তির কাছে হেরে যায় তখন চটে যায় আরো বেশী।

চৌধুরীবাড়ির চন্দনেরও সেই দশা হল।

সে শশীর খাঁটি কথাগুলোর উপযুক্ত জবাব দিতে পারলো না বলেই আরো বেশী তপ্ত হয়ে উঠল।

চেয়ারের হাতলে একটা ঘুঁষি মেরে চন্দন বললে, আমি তোমার অত তত্ত্ব কথা শুনতে চাইনে। এই জল-বিছুটি গাঁয়ের পুবপাড়ায় থেকে তুমি আমার কথা মানবে না—এই কি তুমি বলতে চাও? এখনো তুমি ভালো করে ভেবে দেখো শশী—

এক মুহূর্তের জন্য শশীর মুখখানা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। চোখের কোণে আগুনের ঝিলিকও দেখা গেল।

কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে নিলে। তারপর ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, দেখ ভাই চন্দন, এইমাত্র তুমি যে কথার ইঙ্গিত করলে আমি তার প্রতিবাদ করি। তুমি বললে জল-বিছুটি গাঁয়ের পুবপাড়ায় বসবাস করলে তোমার কথা মেনে চলতেই হবে। কিন্তু আমি যদি বলি,—এটা বাংলাদেশ এখানে সকলেরই সমান অধিকার আছে—তবে তুমি কি উত্তর দেবে? তাছাড়া আমি তোমার ভিটে বাড়ির প্রজা নই। জলবিছুটি গাঁয়ের পুবপাড়ায় বসবাস করছি বটে; তবে যে কুঁড়ে ঘরে আমি থাকি তার ভাড়া দিই মালিকের কাছে। দেশে একটা আইন কানুন আছে। তুমি আমাকে চোখ রাঙিয়ে ওভাবে কথা বলতে পারো না। স্বাধীনভাবে চলাফেরার আর দশের উপকার যাতে হয় এমন কাজ করার অধিকার সকলেরই আছে। হুমকি দিয়ে মানুষকে বশ করা যায় না। এ যুগের মানুষ প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে। একটা কথা তুমি ভুলে গেছ যে আজ আমাকে তোমার বাড়ি আমন্ত্রণ করে এনেছিলে। বাড়িতে ডেকে এনে অতিথিকে অপমান করার প্রথা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই—আমাদের ভারতবর্ষে ত' নয়ই। আচ্ছা ভাই নমস্কার।

মাথা উঁচু করে ধীর মন্থর গতিতে শশী চৌধুরীবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।
চন্দন কিংবা তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কারো কিছু বলবার সাহস হল না।

শশীকে এত দেরী করে পাঠশালা ঘরে পৌছতে দেখে শ্যামল ত' রেগেই অস্থির।

—হুঁ, জমিদার বাড়ির নেমন্তন্ন বলে এত দেরী করে আসতে হয়। এদিকে যে আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ। লোকজন সব ঠায় বসে আছে। নক্সা কে বুঝিয়ে দেবে শুনি?

শশী মৃদু হেসে উত্তর দিলে, জমিদার বাড়ি গিয়ে যে রাহুগ্রাসে পড়ে গিয়েছিলাম ; আর একটু হলে আমাকে ওরা বন্দী করে রাখতো।

অ্যাঁ। একেবারে বন্দী। তারপরেই যুদ্ধ ঘোষণা? কি বলিস?

মোড়ল পাশেই বসে ছিল। বললে, না না হাসি ঠাট্টার কথা নয়। কি হয়েছিল আমায় সত্যি করে বলতো দাদাবাবু? ওই জমিদারের জুলুম আমরা সাত পুরুষ ধরে সহ্য করছি। তোমার ওপর কোনো অত্যাচার হলে আমরা আর কিছুতেই চুপ করে বসে থাকবো না। গোটা বাগ্‌দীপাড়া গিয়ে হাজির হবো ওই চৌধুরীবাড়ির সামনে।

—না-না অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই।

শশী শান্ত করে মোড়লকে। তারপর ধীরে ধীরে সব কথা শ্যামল আর মোড়লকে খুলে বলে।

শ্যামল উত্তর দিলে ও। আমরা এতগুলো মানুষ যে কাজ করছি সব বুঝি ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে! তোদেব ওই চন্দনের সঙ্গে আমার একদিন হয়ে যাবে—তা কিন্তু বলে দিচ্ছি!

ওর কথার ঢঙ দেখে শশী হো হো করে হেসে উঠল। বললে, কিন্তু গায়েব জোরে ওর সঙ্গে তুই পেরে উঠবিনে। শ্যামল আমরা শুধু ভস্মে ঘি ঢালছি আর ও রোজ গরম ভাতে ঘি ঢালছে। কাজেই বুকের পাটা ওর বড়।

ওই কথায় মোড়লও হো হো করে হেসে উঠল। এমন সময় বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা ধামা ভর্তি গরম মুড়ি, গুড়ের বাতাসা আর নারকেল নিয়ে এসে হাজির।

বললে, দাদাবাবু, তোরা খাবিনে?

শশী লাফিয়ে উঠে উত্তর দিলে, খাবো আবার না? জমিদারবাড়ি নেমন্তন্ন করে খেতে দেয়নি। তার ওপর ঝগড়া করে রীতিমত ক্ষিদে পেয়ে গেছে। দে শিগ্‌গীর কি-কি এনেছিস। এই বলে একটা মুড়ির ধামা নিজের কাছে টেনে নিলে।

।। উনিশ ।।

সেদিন শ্যামল সন্ধ্যেবেলায় হাসতে হাসতে পাঠশালার আটচালায় এসে উপস্থিত হল।

তাকে অমনভাবে হাসতে দেখে শশী জিজ্ঞেস করলে, মিছি-মিছি একা-একা হাসছ যে ?

শ্যামল এইবার হো হো করে হেসে উঠল।

বললে, মিছিমিছি তোকে কে বললে? আচ্ছা তুই জলছবি দেখেছিস ?—জলছবি আর দেখবো না কেন? আরো যখন ছোট ছিলাম—বইয়ের পাতায় কত জলছবি লাগিয়েছি—

শশী উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দেয়।

শ্যামল বললে, জলছবি যখন কাগজে ছাপা যাবে, তখন তার জৌলুষ বিশেষ ধরা পড়ে না। কিন্তু জল দিয়ে ভিজিয়ে যখন বইয়ের পাতায় সেই জলছবি লাগানো হয়। তখন তার রঙ একবারে ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে দেখেছিস ত' ?

শশী অসহিষ্ণু হয়ে উত্তর দেয়, তা আর দেখবো না কেন? কিন্তু জলছবির সঙ্গে তোমার হাসির সম্পর্কটা কোথায় তা ত' বুঝতে পারছিনে ।

—আরে বোকা সেই কথাই ত' বলতে চাইছি।

অতি পুলকে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে শ্যামল।

শশী বললে, তা হলে ভূমিকা না করে সোজাসুজি জলছবির রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করো দেখি—

শ্যামল মুখ টিপে একটু হাসলে। তারপর বললে, তোকে ত' পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির চন্দন নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত শাসিয়ে দিলে, এ অঞ্চলের বাগ্‌দীদের সঙ্গে না মিশতে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা হল ঠিক জলছবির মত—

—কী হেঁয়ালি করো মানে বুঝি না। শশী বললে আপন মনে।

—মানে এক্ষুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাকে গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুন কিন্তু নেমন্তন্ন করে নি। সে চুপি চুপি বাড়িতে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

উত্তর দিলে শ্যামল।

শশী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, অ্যাঁ ফাল্গুন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? তা কি বললে শুনি? খুব বুঝি নিন্দে করলে বাগ্‌দীদের? আর বললে, ওর দলে যোগ দিতে? নাঃ দেখছি বাগ্‌দীদের কপাল নেহাৎই মন্দ। কেউ ওদের ভালো দেখতে পারে না।

শ্যামল কিন্তু শশীর কথা শুনে মুচকি মুচকি হাস্‌তে লাগলো। [illegible] দিলে, উহুঁ। তুই যা ভেবেছিস—মোটেই কিন্তু তা নয়।

—তবে?

শ্যামল বললে, বাগ্‌দীদের প্রস্তাব ঠিক ওর উল্টো। সে বললে, বাগ্‌দীদের নতুন করে পাঠশালা খুলছে—তাতে আমার খুব সহানুভূতিআছে। যদি টাকার প্রয়োজন হয় আমি দেবো। এই রকম ভালো কাজে সকলেরই সাহায্য করা উচিত।

আমার হাতে সে একশ টাকার দু'খানি নোট চাঁদা হিসেবে দিয়ে গেছে।

শশী অবাক হয়ে বললে, অ্যাঁ সত্যি?

তারপর খানিকটা ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে, হ্যাঁ অঙ্ক মিলে গেছে। এইবার আসল কারণটা জলের মতো বোঝা গেল।

শ্যামল শুধোলে, অঙ্ক মিলে গেছে কিরে? না হয় খোলাখুলি সব কথা খুলে বল।

শশী উত্তর দিলে, তা হলে বলি শোনো। পুবপাড়ার চৌধুরীরা পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা পুড়িয়ে দিয়েছিল। সে জন্যে ফাল্গুনের মনে মনে দারুণ রাগ আছে, এখন যখন সে দেখলো যে, বাগ্‌দী এক জোট হয়েছে—আর নতুন করে পাঠশালা গড়ে তুলেছে, তখন তার আনন্দ হবারই কথা। সত্যি একটা ভালো কাজ বলে ওর আনন্দ হয় নি। হয়েছে চন্দনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করে। সেই জন্যেই ফাল্গুন এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

শ্যামল উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই। আমরা ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে যাব। যার খুশি দেবে যার ইচ্ছে দেবে না। ভিক্ষের চালে ত' কোনো বাছ-বিচার নেই।

ওরা এই সব আলোচনা করছে, এমন সময় বাগ্‌দীপাড়ার মোড়ল এসে হাজির হল।

শ্যামল আর শশী মোড়লকে সব কথা খুলে বললে।

মোড়ল সব শুনে মাথা নাড়তে লাগল।

বললে, ঠিক আছে দাদাবাবু। চাঁদা দিলে আমরা সকলকার কাছ থেকেই মাথা পেতে নেবো। দশের কাজে আমাদের না নেই।

শশী উত্তর দিলে, ঠিক কথা। আমিও ত' সেই প্রস্তাবই করছিলাম।

শ্যামল ফোঁড়ন কেটে বললে, কিন্তু আমার ভাই মন সাড়া দিচ্ছে না। ফাল্গুনের আসল উদ্দেশ্যটা ভেবে দেখতে হবে। ও চায় বিরোধ। দুর্যোধন যখন কর্ণকে রাজ্য দান করেছিল—তখন দয়াপরশ হয়ে একাজ করেনি। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে একজন জোরালো সাথী পাওয়া গেল এই হল দানের একমাত্র কারণ।

—সে তুমি যাই বল না কেন—শশী মন্তব্য করলে—দশজনের কাছ থেকে

চাঁদা নেওয়াই যখন ঠিক হয়েছে, তখন কারো সাহায্য আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি নে। কারো মনের কথা জেনে আমাদের কি লাভ? আর সেটা জানা ত' সব সময়ে সম্ভবপর নয়। যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করে একটা পয়সা দিচ্ছে, তাও আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবো। যে কাজে আমরা হাত দিয়েছি, তা' শোধ করতে হবে।

মোড়ল কিন্তু হাসতে লাগলো। বললে, পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার রেষারেষিতে যদি আমাদের কাজ হয়ে যায় হোক না। এমনিতে ত' জমিদারেরা ভালো কাজে এক পয়সা খরচ করতে চায় না, না হয় ঝগড়াঝাঁটিতে কিছু খসুক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যামল মন্তব্য করলে, আচ্ছা তাহলে তাই হোক। শশী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, এই যে পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার দলাদলি—এক পাড়া আরেক পাড়াকে কোনমতেই সহ্য করতে পারে না, এর কারণ কি জানো?

শ্যামল প্রশ্ন করলে কি কারণ শুনি? শশী বললে, আমার মনে হয়—বিভেদ সৃষ্টি করেছে গ্রামের মাঝখানকার খালটি। এই খালটি গ্রামটাকে চিরে দুভাগ করে দিয়েছে। এপাড়ার মাটি ওপাড়ার মাটিকে ছুঁয়ে বাঁচতে পারে না। তাই এপাড়ার মানুষ ও পাড়ার মানুষের মনের নাগাল পায় না। দুটো খালের মাঝখানে যদি একটা বাঁশের সাঁকো তৈরী করা যায়, তবে এপাড়ার লোক সহজে ওপাড়ায় চলে যেতে পারে। এপাড়ার পায়ের ধূলি ওপাড়ায় গিয়ে পড়বে। আপনা থেকেই মানুষের একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাতে পূবপাড়ার লোক পশ্চিমপাড়ার মানুষকে অতখানি পর বলে ভাবতে পারবে না।

মোড়ল মাথা নেড়ে উত্তর করলে, সে কথা ত' সত্যি দাদাবাবু, কিন্তু কি জানো, এ গাঁয়ের রক্তে রয়েছে বিরোধ, দাঙ্গা আর মারামারি, তুমি আমি বললে কেউ শুনবে?

কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

শশী আপন মনেই বললে, কার আত্মত্যাগে যে এই বিরোধের অবসান হবে—সে কথা একমাত্র অন্তর্যামীই বলতে পারেন। আমরা মিছে ভেবে মরি। শুভক্ষণ এলে দুই পাড়ার মনের মিল হতে বাধ্য।

মোড়ল বললে ঠিক কথা দাদাবাবু, আমরা সামান্য মনিষ্যি, অত আর ভেবে কি হবে বলো? তার চাইতে চলো, কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়ি।

সেদিনকার আলোচনা ওইখানেই শেষ হয়ে গেল।

প্রথমে দেখা গেল একমাত্র বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরাই পাঠশালায় পড়তে আসছে।

শশী আর শ্যামল দুজনে পড়াতে সুরু করলে।

তখন দেখা গেল—ভদ্রপল্লীর ছেলেরাও দু-একজন করে আসছে। কিন্তু

সেই সঙ্গে অভিভাবকদেরও আনাগোনা শুরু হল। কেউ কেউ গোপনে শশী কিংবা শ্যামলকে ডেকে বললেন, বাবাজি তোমরা পাঠশালায় যত্ন নিয়ে পড়াচ্ছ এত' গাঁয়ের ছেলেদের ভাগ্যের কথা। কিন্তু একটা ব্যাপারের দিকে তোমরা যদি নজর না রাখো, তবে ছেলেমেয়েদের ওখানে পাঠানো মুস্কিল।

ওরা প্রশ্ন করে কি ব্যাপার?

অভিভাবকদের মধ্যে কেউ উত্তর দেন, এই বাগ্‌দীদের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে বসার কথা। হাজার হোক—ওরা ছোট জাত ত'। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা কি ও ওদের সঙ্গে বসতে পারে? একবারে গন্ধে ভূত পালায়। যে করে হোক্—তোমরা কথা দাও—আলাদা আলাদা ওদের বসার ব্যবস্থা করবে—তাহলেই আমরা ছেলেমেয়ে পাঠাতে পারি। পড়াশুনো না করে ওরা সবাই গরু হয়ে গেল যে।

শশী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, দেখুন বিদ্যাস্থানে আলাদা ব্যবস্থা করা ত' সম্ভবপর নয়। সবাইকে একই আসনে পড়াশুনা করতে হবে। অবশ্য ছেলেরা একদিকে বসবে—আর মেয়েরা একদিকে বসবে—এই রকম বন্দোবস্তই করা হয়েছে। একটি কথা আপনাদের জানাতে পারি—ছেলেমেয়েরা যাতে সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে।

ধীরে ধীরে ভদ্রপল্লীর অভিভাবকেরাও এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। এদিকে মোড়লের সঙ্গে আলোচনা করে শশী-শ্যামল বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দিলে যে, সবাইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পাঠশালায় আসতে হবে।

এই ঘোষণায় খুব ভালো ফল পাওয়া গেল।

ছেলেমেয়েরা নিজেদের জামা-কাপড় নিজেরাই ক্ষার অথবা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা শিখে নিলে। আস্তে আস্তে ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেল যে, ঘামে ভেজা জামা, ফ্রক ভিজে গেলে—ওরা নিজেরাই গরজ করে কেচে নিত। সেজন্য আর বড়দের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হত না।

বাইরে থেকে এসে যাঁরা এই গ্রামে বসবাস করছিলেন—তাঁরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অভাবটা খুবই অনুভব করছিলেন। পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া তাঁদের মনে বিশেষ দাগ কাটতে পারে নি।

পশ্চিমপাড়ার পাঠশালাটা পুড়ে যেতে গাঁয়ের লোকেরাও বুঝেছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আর কোন উপায়ই গ্রামে রইল না।

এখন শশী আর শ্যামলের চেষ্টায় যখন এমন সুন্দর একটি পাঠশালা তৈরী হল, ওরা দু'জন যত্ন করে ছোটদের পড়াতে লাগলো—তখন ছেলেমেয়ে পাঠাতে কারো আর আপত্তি থাকল না।

দেখতে দেখতে প্রচুর ছেলেমেয়ে এসে পাঠশালায় ভর্তি হয়ে গেল।

শশী আর শ্যামল দেখলে, ওদের দু'জনের পক্ষে এত ছেলেমেয়েকে পড়ানো সম্ভব নয়। তাতে পড়াশুনা ভালো হবে না—আর বাধ্য হয়েই শেখানোর কাজে ফাঁকি দিতে হবে।

তখন ওরা দু'জনে পরামর্শ করে—শ্যামলের কাকিমা আর মাকে নিয়ে একটি গোপন আলোচনা সভা বসালে।

শশী বললে, কাকিমা, আপনাদের কোন কথাই আমরা শুনতে রাজী নই। পড়ানোর লোকের অভাবে এমন সুন্দর পাঠশালাটা উঠে যাবে?

শ্যামলের কাকিমা হাসতে লাগলেন।

—তাই বলে আমরা পাত্‌তাড়ি বগলে করে তোদের ইস্কুলে গিয়ে হাজির হবো নাকি?

শশী উত্তর দিলে, তা কেন? তোমরা কেন পাত্‌তাড়ি নিতে যাবে? সে ত' নেবে ছেলেমেয়েরা। তোমরা শুধু ওদের দু'ঘণ্টা করে পড়াবে। খুব ছোট যারা তাদের অ-আ—ক-খ শেখাবে আর ১-২ পড়াবে।

শশীর মা বললেন, তোদের দুজনের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এটা কি কলকাতা শহর? আমরা দুজন যদি পাঠশালায় পড়াতে যাই, তবে এই পাড়াগাঁয়ে একেবারে টি-টি পড়ে যাবে। তখন আমরা এ অঞ্চল ছেড়ে পালাতে পথ পাবো না।

শশী ফোঁস করে উঠে উত্তর দিলে, হুঁ। তা বৈকি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ালে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? আর গাঁয়ের বৌ-ঝিরা যে পরনিন্দা আর পরচর্চা করে, পাড়া বেড়ায়—সেটা বুঝি খুব ভালো কাজ?

শ্যামলও চুপ করে বসে থাকলো না। নিজের যুক্তির তূণ থেকে চোখা-চোখা বাণ ছুঁড়তে লাগলো।

বললে, আচ্ছা কাকিমা, যদি প্রয়োজনের সময় বিদ্যাদানই করতে না পারবে, তবে দিন-রাতে এত বই পড়ো কেন? নিজের বাড়িতে এতবড় একটা পাঠাগারই বা গড়ে তুলেছ কেন? ছেলেবেলায় কি পড়নি—

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

কাকিমা শ্যামলের বক্তৃতা শুনে হাসতে লাগলেন। বললেন, তুই আবার কবে এত কথা বলতে শিখলি? শশীর ছোঁয়া লেগে একেবারে বক্তা হয়ে উঠলি যে?

শশীর মা ফোঁড়ন কাটলেন, ঠিক বলেছ বোন। শশীর মুখে যেন সব সময় খৈ ফোটে। ও শ্যামলটাকে পর্যন্ত বাচাল করে তুলেছে।

—তা বাচালই করি, আর যাই করি—তোমাদের কিন্তু নীচু ক্লাশের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার নিতে হবে।

উত্তর করে শশী।

শ্যামল আবার এই সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব যোগ করে দেয়—আচ্ছা কাকিমা, তুমি যে আমাদের পাঠশালায় কতকগুলো শ্লেট দেবে বলেছিলে সেকথা কি একেবারে ভুলে গেলে?

কাকিমা বললেন, শ্লেট না হয় কিনে দিচ্ছি, কিন্তু পড়ানোর কাজ আমাদের রেহাই দিতে হবে। শশীর মা মন্তব্য করলেন, আমার মনে হয়—এইসব কুবুদ্ধি শশীর মগজ থেকেই বেরিয়েছে। নইলে শ্যামলের মাথায় এসব কখনো আসে না।

শুনে কাকিমা হাসতে লাগলেন।

বললেন, হ্যাঁ আপনি যা বলেছেন দিদি। প্রথমদিনই আমাদের বাসায় গিয়ে ও যা গোয়েন্দাগিরির কসরৎ দেখিয়েছিল—তখনই আমি আঁচ করে নিয়েছিলাম— বড় হলে শশী জজ্ হবেই। বিচারবুদ্ধি ওর মাথায় একেবারে গজ্‌গজ্ করছে। এত বুদ্ধি সামাল দিয়ে মগজে লুকিয়ে রাখতে পারলে হয়।

শশী উত্তর দিলে, সবই আমি স্বীকার করে নিচ্ছি কাকিমা। না হয় আপনার কথা রাখবার জন্য আমি হাইকোর্টের জজই হবো। কিন্তু আপনারা দুজনে আমার কথা রাখুন। পাঠশালায় পড়ানোর ভার নিতেই হবে। কোনো ওজর-আপত্তি এ ব্যাপারে শুনবো না।

ওদিকে পূবপাড়ায় চৌধুরীদের চন্দন রাগে নিজের হাত কামড়াতে থাকে। এই পাঠশালার ব্যাপারে তার কোনো কথাই থাকছে না।

সে যখন বুদ্ধি করে পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা পুড়িয়ে দিয়েছিল—তখন তার এইটুকু মনের জোর ছিল যে, পূবপাড়ায় চৌধুরীবাড়িতে একটি সুন্দর পাঠশালা বসাতে পারবে।

কিন্তু পরে দেখা গেল যে, জোর করে একটি জিনিষ পুড়িয়ে দেওয়া খুব সোজা। কিন্তু একটা কিছু গড়ে তোলার মতো শক্ত কাজ আর নেই।

যতই সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে পাঠশালাটি গড়ে তোলবার জন্যে ততই সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। হাজার ফন্দি-ফিকির করেও সে পড়ুয়া সংগ্রহ করতে পারে নি।

চৌধুরীমশাই অতিথিশালাটি যেভাবে সুন্দর করে সারিয়ে দিয়েছিলেন—তাতে চন্দনের আশা ছিল যে, পড়ুয়াদের নামতার শব্দে সারাটা বাড়ি গম্‌গম্ করতে থাকবে। কিন্তু এখন সেই ঘরটি ইঁদুর-বাঁদর আবার চামচিকের আড্ডা হয়েছে। রাত্তিরে কতকগুলো ঘেয়ো-কুকুর সেখানে গিয়ে আস্তানা করে।

এ পরিকল্পনাও চন্দনের মনে ছিল না। তাই বাগ্‌দীপাড়ায় যখন প্রথম পাঠশালা গড়বার কথা হল—সে আড়ালে থেকে বরাবর বাধা দেবার চেষ্টা করেছে⋯কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হতে পারে নি।

আজ যখন সে দেখতে পেলে যে, বাগ্‌দীপাড়ার সেই পাঠশালায় শুধু যে পশ্চিমপাড়ার ছেলেমেয়েরাই যাচ্ছে—তা নয়। তার কথা অমান্য করে পূবপাড়ারও বহু অভিভাবক তাদের বাড়ির ছোটদের সেইখানে ভর্তি করে দিচ্ছে—তখন সে নিজের রাগ লুকিয়ে রাখবার ঠাঁই পায় না। একবার সে ভেবেছিল যে তার অমোঘ অস্ত্র ছাড়বে।

তার মানে নায়েবকে পাঠিয়ে ওই নতুন গড়া পাঠশালাটা পুড়িয়ে দেবে। তা হলেই তার সমস্ত রাগ শান্ত হবে।

এজন্য যে গোপনে গভীর রাত্রে লোক না পাঠিয়েছিল তাও নয। কিন্তু শশী-শ্যামল আগে থেকেই এই আশঙ্কা করে বরাবর পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে।

বাগ্‌দীপাড়ার লোকেরা বহু পরিশ্রম করে এই পাঠশালাটি গড়ে তুলেছে। একেবারে বুকের রক্ত দিয়ে তৈবী করেছে বললেও চলে।

শশী-শ্যামলেব পরামর্শে ওরা সারারাত জেগে পাহারা দেয়। চারজন করে দলে থাকে। একদল দু'ঘণ্টা ঘোরে, তারপর আর একদল এসে ওদের জায়গা দখল করলে—তারা পাঠশালার মেঝেতে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। এইভাবে সাবারাত পাহাবার কাজ চলে।

নায়েব বুঝলে, এটা পশ্চিমপাড়াব পাঠশালা নয যে, ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই হল।

দু'তিন দিন চেষ্টা করে ব্যর্থ-মনোরথ ফিরে এসেছে নায়েব। একদিন ত' অন্ধকারে বাগ্‌দীদের লাঠিব ঘাও খেযেছে।

চন্দন কি কববে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এইভাবে গ্রামে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নষ্ট হতে বসেছে। ফাল্গুনকে শায়েস্তা কববার জন্যেই সে গ্রামে বয়ে গেল। কিন্তু যখন শুনতে পারলে যে, সেই ফাল্গুনই গোপনে বাগ্‌দীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছে, তখন সে নিজের মাথাব চুল ছিঁড়তে শুধু বাকি রাখলে।

যে করেই হোক পশ্চিমপাড়ার ওপর পূবপাড়ার টেক্কা মারতেই হবে।

চন্দন নতুন ফন্দি-ফিকির ভাবতে থাকে।

।। বিশ ।।

শশী আর শ্যামলের পড়ানোর সুখ্যাতি চারদিকে এত ছড়িয়ে পড়েছে যে, শুধু জলবিছুটি গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাই নয়, আশেপাশের গ্রামগুলি থেকেও অনেক পড়ুয়া এসে জুটেছে।

এখানে একে পড়ানো ভালো হয়, তার ওপর নামমাত্র মাইনে নেওয়া হয়ে

থাকে। যারা খুব গরীব শশী ও শ্যামলের ব্যবস্থায় তারা বিনা মাইনেতেই ভর্তি হয়ে যায়।

ওদের দু'জনের তাগিদে শশীর মা ও শ্যামলের কাকিমা রীতিমত ছোটদের পড়াতে শুরু করেছেন। এখন তাঁদের এই কাজে এত মন বসে গেছে যে, একদিন পাঠশালায় না এলে তাঁদের একটুকুও ভালো লাগে না ; মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি এখানে আসবেন মনে করে খুব সকাল থেকেই ঘরের কাজ সারতে শুরু করে দেন।

ইতিমধ্যে শশী-শ্যামলের পরামর্শে ও মোড়লের সাহায্যে আর একখানা আটচালা ঘর তোলা হয়ে গেছে। কারণ, এঘরে আর ছেলেদের ধরছিল না।

পাঠশালায় শশীর মা ও শ্যামলের কাকিমার নাম হয়ে গেছে বড়-মাসিমা, আর ছোট-মাসিমা, পড়াশুনার সময় মার খেতে হয় না, পিঠে বেত পড়ে না— সেটা এ অঞ্চলের এক তাজ্জব ব্যাপার।

এর আগে পশ্চিমপাড়ার পাঠশালায় সামন্তপণ্ডিত সব সময়ই বেশ বেতের ব্যবহার করতেন। সেজন্যে অনেক ছেলে পাঠশালায় যাচ্ছি বলে বেরিয়ে সারাটা দিন আমবাগানে আর লিচুতলায় কাটিয়ে ঠিক সময়মতো গিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হতো। মায়েরা মনে করতো—ছেলেরা না জানি কত বিদ্যের ঝুলি ভর্ত্তি করে নিয়ে এলো।

কিন্তু এখন ব্যাপাব দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো। বড় মাসিমা আর ছোট মাসিমা এমন সাপের গল্প, আর বাঘের গল্প আর পক্ষিরাজের গল্প বলেন যে, ছোটরা কোনোদিন পাঠশালায় না আসতে পারলে পা ছড়িয়ে বসে কান্নাকাটি সুরু করে দেয়।

সেইজন্যে ছোটদের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিয়ে বাপ-মায়েরাও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকেন।

এখন দুটি আটচালা তৈরী হতে—ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাদের খেলাধূলা, হুল্লোড় আর নামতা পড়ায় সেখানে কানপাতা দায় হয়ে উঠেছে।

আরো মজার ব্যাপার হয়েছে এই যে, সবাই বড়মাসিমা আর ছোটমাসিমার কাছে পড়তে চায়। এর অবশ্য আরো একটা গোপন কারণ আছে। মাসিমারা মাঝে মাঝে নানারকম পিঠে তৈরী করে এনে ছেলেমেয়েদের খাওয়ান। এই বাল্য-ভোগ দেখবার জন্যে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা এসে ভীড় জমায়। সত্যি তখন এক আনন্দের হাট বসে যায়।

একদিন শশী পাঠশালার দাওয়ায় হতাশ হয়ে বসে পড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেল আমার।

না জানি কি ঘটেছে ভেবে শ্যামলের কাকিমা ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোর আবার কি হল শশী?

শশী কপালে করাঘাত করে উত্তর দিলে, আর আমার চাকরি বুঝি আর থাকে না,—সবাই বলে বড় মাসিমা আর ছোট মাসিমার কাছে পড়ব।

ওর ওই রকম হতাশ ভাব আর কথা বলবার ধরণ দেখে—যারা আশে-পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ছোট মাসিমা কিন্তু কৌতুক করতে ছাড়লেন না। বললেন, আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি জানি। আজ আমরা কিছু পিঠে পাঠশালায় নিয়ে এসেছিলাম—ছেলেমেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ করে দিয়েছে, এককণাও আর পড়ে নেই। এর জন্যে শশীর এত দুঃখ। নিজের লোভের কথা ত' মুখ ফুটে বলতে পারে না—চাকরির জন্যে হা—হুতাশ হচ্ছে।

আবার একটা হাসির ধুম পড়ল।

এরই দিন কয়েক পরের ঘটনা।

শশী আর শ্যামল সন্ধ্যের দিকে পাঠশালার পাশের পুকুরটার ধারে চুপচাপ বসে ছিল। শ্যামল যে শুধু কবিতা লিখতে পারে তা নয়, বাঁশি বাজাতেও সে ওস্তাদ। সুন্দর একটি পূরবী সুর ধরেছিল সে, আর সেই সুর কাঁপন লাগিয়েছিল নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে।

এমন সময় মোড়ল এসে চুপচাপ বসল ওদের পাশে। বহুক্ষণ ধরে সুরের ঝঙ্কার আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে রাখলো।

বাঁশি থেমে গেলেও দীর্ঘকাল তিনজনে চুপচাপ বসে রইল। কারো মুখে যেন আর কোনো কথা জোগাচ্ছিল না।

হঠাৎ শান্ত পুকুরের বুকে একটা ঢিল ছুঁড়লে যেমন আচমকা শব্দ হয়—ঠিক সেই রকম নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে মোড়লই প্রথম কথা শুরু করলে।

—দাদাবাবু একটা দরকারী কথা ছিল যে।

শশী রসিকতা করে বললে, এই বাঁশি শুনেও কি সন্ধ্যে দরকারি কথা ভুলতে পারলে না মোড়ল ভাই?

মোড়ল হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, উহুঁ। ছেলেমেয়েদের তাগিদ যে। তোমাদের কাছে বলবার সাহস নেই—তাই আমাকে গিয়ে সব ছেঁকে ধরেছে।

—ব্যাপার কি বল ত' মোড়ল ভাই? বড় মাসিমা আর ছোট মাসিমার কাছে নতুন করে পিঠে-পায়েসের হামলা শুরু করতে হবে নাকি?

—উহুঁ। এবার আর পিঠে পায়েসের হামলা নয়। এবারের আবদার আরও একটু বেশী বলে মনে হচ্ছে।

—খুলেই বলো না মোড়ল।

—বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা বায়না ধরেছে ওরা পাঠশালায় সরস্বতী পূজো করে অঞ্জলি দেবে। সারা গাঁয়ে কোথায়ও' ওদের উঠতে দেয় না। অঞ্জলি দেওয়া ত' দূরের কথা।

শশী উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, এটা ত' বড় ভালো প্রস্তাব করেছ মোড়ল। দেবী সরস্বতীর পূজো করবে ছেলেমেয়েরা, এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?

শ্যামল বললে, বিদ্যাপীঠে সরস্বতীদেবীর পূজো হবে না ত'আর হবে কোথায়? কিন্তু একটি সর্তে সবাইকে রাজি হতে হবে।

—সর্তটি কি শুনতে পাইনে?

প্রশ্ন করে শশী।

শ্যামল জবাব দিলে, পূজোর সমস্ত আয়োজন ছেলেমেয়েদের নিজে হাতে করতে হবে। প্রতিমা তৈরী থেকে সুরু করে পূজো করা পর্য্যন্ত।

মোড়ল আঁতকে উঠে উত্তর দিলে, সেটা কি করে হবে দাদাভাই? বাগ্‌দীর ছেলেমেয়েরা ত' আর বামুনের কাজ করতে পারে না। পূজোর সময় পুরোহিত তোমাদের আনতেই হবে।

শ্যামল রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলে, তাহলে শোন মোড়ল, আমি এর ভেতরে নেই।

—কেন দাদাভাই, তুমি এত রাগ করছ কেন? ভয়ে ভয়ে মোড়ল শ্যামলের অভিমান দূর করতে চেষ্টা করে।

শ্যামল বললে, রাগ করছি কি আর সাধে? তুমি মুখেই ত' বললে, গ্রামের কোনো মন্দিরে বাগ্‌দীদের ছেলেমেয়েদের উঠতে অবধি দেয় না। অঞ্জলি দেওয়া ত' দূরের কথা। পূজোর জন্যে সেই পুরোহিতের পা ধরেই যদি সাধাসাধি করতে হয়, তবে তোমাদের পাড়ায় ছেলেমেয়েদের বিদ্যার অর্চ্চনা করে লাভ কি শুনি?

মোড়ল জিজ্ঞেস করলে, তাহলে আমাদের পাঠশালায় পূজো কি হবে না দাদাভাই?

—কেন হবে না?

শশী এইবার মোড়লকে শান্ত করতে এগিয়ে আসে।

—আসলে তুমি শ্যামলের কথাটাই ধরতে পারো নি। শ্যামল বলতে চাইছে, নিজের চেষ্টায় যেমন লেখাপড়া শেখা যায়—ঠিক তেমনি বিদ্যার দেবী বাণীর পায়েও অঞ্জলি দেওয়া চলে। সেজন্য কোনো পাণ্ডার দরকার হয় না। জানো ত' জাতির জনক মহাত্মাজী বহুভাবে দেশের লোকের কাছে একথা বলে গেছেন যে, মানুষ সবাই সমান। কেউ বড়ো, কেউ ছোট নয়। ভগবান ডাকবার

অধিকার সকলেরই আছে। তিনিই ত' মন্দির প্রবেশের আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

মোড়ল বললে আমরা মুখ্য মানুষ, অত কথা ত' বুঝিনে দাদাভাই, তাহলে কি করতে হবে সেইটেই আমাকে বুঝিয়ে বলো। ছেলেমেয়েদের বড় ইচ্ছে তারা পাঠশালায় সরস্বতী পূজো করে, মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়। কিন্তু ভয়ে সেকথা তোমাদের কাছে বলতে সাহস করছে না। আমি মাসিমাদের কাছে কথাটা পাড়তে বলেছিলাম। ওরা তাও এগুচ্ছে না, বললে ভয় করে।

শশী উত্তর দিলে, আসল কথাটা কি জানো মোড়ল, মন থেকে এই ভয়কে দূর করতে হবে। মা সকলের কাছেই সমান। বড়লোকের ছেলেরাই তাদের মাকে খুব ভালোবাসে, ভক্তি করে? কেন, গরীব ছেলে-মেয়েরা কি তাদের মাকে ভালবাসে না? স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি ভালোবাসা এসব ত' শুধু ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া অধিকার। এই কথাগুলি আগে তোমাদের ভেবে দেখতে হবে। তবেই মা বীণাপাণির অর্চ্চনা করবার অধিকার জন্মাবে।

—ঠিক কথা বলেছ দাদাভাই। তোমরা কত লেখাপড়া করেছ। কত পুঁথি পড়েছ। শক্ত কথা সোজা করে আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারো। আমরা মনে মনে যদি বা বুঝি মুখ ফটে কিছু বলতে সাহস পাইনে। সাধে কি লোকে আমাদের বাগ্‌দী বলে?

মোড়ল যখন এই কথাগুলি বললো, তখন তার দু'চোখে জলে ভরে উঠেছে।

শ্যামল বললে, উহুঁ। আবার তুমি গলদ করে বসলে মোড়ল! 'মানুষ' বলে নিজেদের ভাবো, মনের দ্বিধা সব দূর হয়ে যাবে।

মোড়ল এইবার শুধোলে, আচ্ছা তা না হয় ভাবলাম। কিন্তু আমি ওই কাচ্চা বাচ্চাদের কি বলবো? কাল সকালে এসেই ত' আমায় ছেঁকে ধরবে। তখন আমি ওদের কি জবাব দেবো?

শশী উত্তর দিলে, ওদের যখন ইচ্ছে হয়েছে—মা সরস্বতীর পূজো নিশ্চয়ই হবে। তবে শ্যামল যে প্রস্তাব করেছে, আমারও সেই মত। প্রতিমা তৈরী করা, পূজোর আয়োজন করা, পাঠশালা সাজানো, পূজো করা, অঞ্জলি দেওয়া, ভোগ রান্না করা, সব ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে করতে হবে। রাজি আছ?

মোড়ল মুখ কাচ-মাচু করে বললে, তা তোমরা যখন বলছ—তখন ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক রাজি হতেই হবে। কাল সকালে বাচ্চা-কাচ্চাদের—সেই কথাই বলি—

গাঁয়ের বামুনরা যখন শুনলে যে, বাগ্‌দীপাড়ায় পাঠশালায় সরস্বতী পূজো হবে, আর বাগ্‌দীর ছেলেমেয়েরাই পূজো করবে—তখন তারা একেবারে শিউরে উঠল।

বাঁড়ুয্যে বললে, শুনছ ভট্চাজ? ঘোর কলি যে ঘনিয়ে এসেছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। নইলে কেউ কোথাও, কখনো শুনেছ যে বাগ্‌দীরা মায়ের পূজো করবে? এ বিধান ওদের দিলে কে?

ভট্চাজ উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই কলকাতার সেই বখা ছেলে দুটো। নইলে এত বড় বুকের পাটা কার যে, আমাদের এই জলবিছুটি গাঁয়ের বুকের ওপর বসে ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টার-তামাসা করে ?

বাঁড়ুয্যে বললেন, না-না। এই সব অনাচার আর কিছুতেই সহ্য করা উচিত না। চল, আজই আমরা সবাই মিলে চৌধুরীবাড়ি যাই। চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করা দরকার।

পেরাণ মুখুজ্জে বললে, কেন, আমাদের পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীমশাই রয়েছেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তার সঙ্গেও পরামর্শ করা যেতে পারে।

বাঁড়ুয্যে চটে-মটে উঠে উত্তর দিলে, দেখ মুখুজ্জে যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। বলি খবর কিছু রাখো? ওই বাগ্‌দীপাড়ার পাঠশালা তোলার ব্যাপারে গাঙ্গুলীমশায়ের ছেলে ফাল্গুন কত টাকা গোপনে ঢেলেছে, খালি ওই চৌধুরীদের সঙ্গে রেষারিষি করে। এখন ঠ্যালা সামলাও। ওরা ব্রাহ্মণের কেমন মান-মর্যাদা রাখলে নিজের চোখের ওপর দেখলে ত'?

মুখুজ্জেমশাই লজ্জিত হয়ে বললেন, সে কথা ত' সত্যি। কথা ত' যথার্থ।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এক গোপন বৈঠক বসল চৌধুরীবাড়িতে। চৌধুরীমশাই এ ব্যাপারে হুঁ-হাঁ বিশেষ কিছুই বললেন না। কিন্তু চন্দন এগিয়ে এসে সমস্ত ভার নিল। বললে, গ্রামের বুকের ওপর বসে বাগ্‌দীদের এই অনাচার কিছুতেই সহ্য করা হবে না। দরকার হয় দাঙ্গা করেই এই পূজো বন্ধ করতে হবে। চন্দন ওদের সামনেই হলধর পাইককে ডেকে তৈরী থাকতে বললো।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল খুশী হয়ে চন্দনকে আশীর্বাদ করে, যে যার ঘরে ফিরে এলো।

ওদিকে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের চ্যালা ঘুগ্‌নী গোপনে বাগ্‌দী পাড়ার মোড়লের সঙ্গে দেখা করল। বললে তুমি কিচ্ছু ঘাবড়ে যেওনা মোড়ল। ফাল্গুনবাবু সব খবর পেয়েছেন। চৌধুরীরা যদি তোমাদের পূজো বন্ধ করতে আসে তবে ফাল্গুনবাবু লাঠিয়াল দিয়ে সব হটিয়ে দেবেন। তোমরাও বাগ্‌দীপাড়ার সবাই তৈরী থেকো। যত টাকা লাগে ফাল্গুনবাবু দু'হাতে খরচ করবেন। তবু তিনি পূবপাড়ার চৌধুরীদের একহাত দেখে নেবেন।

ঘুগ্‌নী তেমনি গোপনে চলে যাচ্ছিল, আবার কি ভেবে ফিরে এলো। তারপর ফিস্-ফিস্ করে বললে, কিন্তু একটি কথা। কাক-পক্ষীতেও যেন একথা জানতে না পারে। দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপার কিনা। একেবারে চুপচাপ থাকাই ভালো।

মোড়ল উত্তর দিলে, সে ত' ঠিক কথাই। তবে আমার দুই দাদাবাবুকে ত' জানিয়ে রাখতে হবে।

ঘুগ্‌নী দু'হাত নেড়ে বারণ করে বললে, না, না। ওরা বাইরের লোক। পাঠশালা নিয়ে আছেন, ভালো কাজ করছেন, সেই ভালো। গাঁয়ের দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে ওদের জড়িয়ে লাভ কি?

মোড়ল তখন মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, সেকথা ঠিক।

ওদিকে পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেছে। এমন আনন্দের সন্ধান ওরা জীবনে পায়নি।

দেবদারু পাতা দিয়ে গোটা পাঠশালাটা সাজাচ্ছে, লাল নীল হলদে সবুজ কাগজ দিয়ে শেকল তৈরী করছে, একটা সালুর ওপর তুলো দিয়ে 'স্বাগতম্' লেখা হচ্ছে।

আর একদিকে একদল ছেলে—এঁটেল মাটি ছেনে নিয়ে মূর্তি গড়ছে। মূর্তি ওরা ভালোই গড়তে পারে কিন্তু এতদিন এ গাঁয়ে সে অধিকার তাদের ছিল না। একটু-খানি গড়া হচ্ছে আর সবাইকে ডেকে দেখাচ্ছে—দেখুন ত' মাসিমা, কেমন হল? এই হাতে মা সরস্বতী বীণা ধরে থাকবে ত'? পায়ের নীচে থাকবে—শ্বেতপদ্ম আর রাজহাঁস। হাতে চলছে কাজ আর মুখে চলছে নানারকম আলোচনা।

বড় মাসিমা আর ছোট মাসিমা দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের দিয়ে উনুন তৈরী করাচ্ছেন। শ্যামল বলেছে ওদেরই ভোগ রান্না করতে হবে। আর সেই ভোগ দেবীকে উৎসর্গ করে—প্রসাদ সকলকে পরিবেশন করা হবে। ওদের হাতের রান্না যে এ গাঁয়ের কেউ ছোঁবে—একথা বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা বিশ্বাসই করতে চাইছে না।

শশী আর শ্যামল সবাইকে কাজ ভাগ করে দিয়েছে। কে কে ফুল জোগাড় করবে, কে কে নৈবিদ্যি সাজাবে, কারা বাসন মাজবে, কে পুজো করবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। পুজো শেষ হয়ে গেলে সব ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেবীর চরণে অঞ্জলি দিতে হবে।

ওরা এবার মায়ের চরণে অঞ্জলি দেবে—ভাবতেও সবাইকার দেহে-মনে শিহরণ জাগছে।

গভীর রাত। শশী নিজে একটি কাজের ভার নিয়েছে। সেটা ছেলেরা পারবে না।

নিজের দাওয়ায় বসে সে মা বীণাপানির একটি চালচিত্র তৈরী করছে। মনের মতো করে সে কারুকার্য করছে। ছবি আঁকতে বসলে ত' ওর নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকে না। তাই বুঝতে পারছিল না রাত কত হয়েছে। ওদিকে

তার পাশে বসে শ্যামল মহাপুরুষদের 'বাণী' গুলি বড় বড় অক্ষরে লিখছিল। পুজোমণ্ডপের চারদিকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হবে।

দুই ছেলের কাণ্ড দেখে শশীর মা হতাশ হয়ে দাওয়ায় আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো বাগ্‌দীপাড়ার একটি ছেলে। বললে, দাদাবাবুরা, শিগ্‌গীর এসো, পুবপাড়ার চৌধুরীবাবুরা লোকজন নিয়ে আমাদের পুজোর প্রতিমা ভাঙতে আসছে। এদিক থেকে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির পাইকেরাও খালের ধারে জমায়েত হয়েছে।

মোড়লও লোকজন আর লাঠি-সোটা নিয়ে হাজির হয়েছে খালের ধারে। এক্ষুণি একটা দাঙ্গা বাঁধবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শশী আর শ্যামল এই কথা শুনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল খালের ধারে।

চিৎকার করে উঠল, তোমরা কেউ মারামারি করো না, থামো সব—শান্ত হও—

হঠাৎ চৌধুরীবাড়ির চন্দন হুকুম দিলে, এই ছোঁড়াদুটোই যত অনিষ্টের গোড়া। হলধর, চালাও সড়কি—

কেউ কিছু ভালো করে বোঝবার আগেই, তীরবেগে দুটি সড়কি এসে শশী-শ্যামলকে আমূল বিদ্ধ করল। খালের দু'পারের লোক হায়-হায় করে উঠল।

ওদের দু'জনের রক্তে জল-বিছুটি গাঁয়ের জল রাঙা হয়ে গেল। মায়ের বোধনের আগেই অকালে বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল।

কয়েক বছর কেটে গেছে।

জল-বিছুটি গাঁয়ের বাগ্‌দীরা সেই রক্ত-রাঙা খালের ওপরে বেঁধে দিয়েছে এক বাঁশের সাঁকো। এ পাড়ার মাটি ও পাড়ার মাটিকে এখন স্পর্শ করে আছে। শশী আর শ্যামলের আত্মোৎসর্গে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। এখন ও পাড়ার ছোট্ট একটি ছেলে এই সাঁকোর ওপর দিয়ে এই পাড়ার পাঠশালায় পড়তে আসে পাত্‌তাড়ি বগলে নিয়ে।

বলে, শশী-শ্যামলের সাঁকো আছে—ভয় কি?

জল-বিছুটি গাঁয়ের সব বিরোধের উৎস—সেই দুই জমিদার বংশ এখন গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। যেখানে ঝগড়া আর মারামারি নেই—সেই গ্রামে তাঁদের আর মন বসে না।

প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর আগের রাত্রিরে গ্রামের বৌ-ঝিরা শশী-শ্যামলের নাম করে খালের জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়। তাদের একান্ত আশা, এই প্রদীপের আলোতে পথ চিনে ওরা দুটি ভাই আবার এই গাঁয়ে ফিরে আসবে।

সাত-সমুদ্দুর তের
নদীর পারে
(ভ্রমণ কাহিনী)
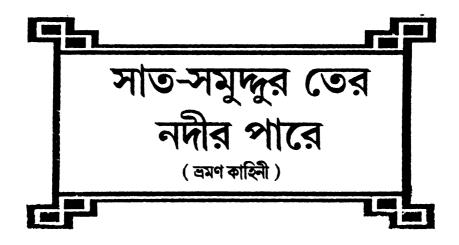
আজ ১লা বৈশাখ, ১৩৫৯ সাল। আমাদের নববর্ষ।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেছে — যদিও কাল রাত্তিরে সাড়ে বারোটার আগে ঘুমোতে যেতে পারি নি। আগের দিন সন্ধ্যায় সবুজ সাথী আসর বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়েছে।

অতি ভোরে ঘুম ভাঙবার দুটি জরুরী কারণ আছে।

প্রথম কারণ হচ্ছে, আজ সব পেয়েছির আসরের নববর্ষ উৎসব দেশবন্ধু পার্কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—আজই আমাকে দুপুর বারোটার সময় কে-এল-এম বিমানযোগে ইউরোপ রওনা হ'তে হবে। ভিয়েনাতে International Conference in Defence of Children-এ (আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলন) ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছি।

একদিকে নববর্ষ উৎসবের প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে ইউরোপ যাত্রার সকল রকম কর্ম-ব্যস্ততার দরুণ চাঞ্চল্য।

এই দুইটি কাজের ঘণ্টা যখন মনের গহনে সকল সময় বাজছে তখন কি আর বেশি অবধি ঘুমোবার অবকাশ কিংবা উপায় আছে? অতি প্রত্যুষে বিহঙ্গ তাই নীড় ছেড়ে উঠেছে।

সময় অল্প, কিন্তু কাজ অগুন্‌তি।

ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে চট্‌পট্‌ সব শেষ ক'রে ফেলতে না পারলে দু' নৌকায় পা দেবার মতোই অবস্থা হবে আমার।

কিন্তু পাকা মাঝির মতো বৈঠা চালিয়ে তীরে পৌঁছুতে হবে। তাই প্রাতঃকৃত্য খুব শীগ্‌গির শেষ ক'রে ফেললাম।

তারই ফাঁকে সেদিনকার কাগজ পড়া হয়ে গেল। হঠাৎ বাইরে হাঁক শোনা গেল—আমি এসেছি।

আর কেউ নয়, আমাদের সব পেয়েছির আসরের কর্মী জগৎ দত্ত। সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে সকালে ওঠায়।

দু'জন বসলাম বাইরের ঘরে। অন্দরমহল থেকে গরম হালুয়া আর চা এসে পড়তে দু'জনে মিলে তার সদ্ব্যবহার করা গেল। হারুদার বাসায় গিয়ে দমদমে ফোন ক'রে জানতে হবে ঠিক ক'টায় আমাকে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে। সেই সকালেই বলাইবাবু বহুত কসরত ক'রে ফোনের যোগাযোগ স্থাপন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, সাড়ে দশটার মধ্যে আমার যাওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। ইতিমধ্যে হরলাল বর্ধন এসে হাজির।

দেশবন্ধু পার্কে কর্মীরা সব অপেক্ষা করছে। সকাল ঠিক আটটায় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় আসবেন। কাজেই উৎসবের আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থা ওরই মধ্যে শেষ ক'রে ফেলতে হবে।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে দেশবন্ধু পার্কের দিকে পা চালিয়ে দিলাম। ওখানে পৌঁছে দেখি, আসরের কর্মীরা অনেকেই এসে হাজির।

যেখানে রাজ্যপাল নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে বসবেন — সেখানে চাঁদোয়া খাটানো হয়ে গেছে। উমাশঙ্করের পরিচালনায় ছেলেরা বিরাট মাঠে লম্বা লম্বা চুনের দাগ কাটছে। এইখানে সার দিয়ে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে সমবেত ব্যায়াম করবে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন আসরের ছেলেমেয়েরা দীর্ঘ শোভাযাত্রা ক'রে দেশবন্ধু পার্কে এসে জমায়েত হচ্ছে। তাদের হাসি-খুশী মুখ দেখলে অতি বৃদ্ধেরও আবার লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

স্বেচ্ছাসেবকের দল চারদিকে দড়ির বেড়া দিয়ে উৎসব-মণ্ডপ রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। ব্যাণ্ডদলও এসে বাজনা শুরু ক'রে দিয়েছে।

কেন্দ্রের কর্মীরা সবাই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম ক'রে চলেছে। এরই এক ফাঁকে শিল্প-বিভাগের কর্মীরা নববর্ষের সুন্দর প্রাচীর পত্র হাতে নিয়ে, মণ্ডপের সামনে দিব্যি ক'রে ঝুলিয়ে দিল। দিবা, নিশা সবাই পরিশ্রম করছে। আসরের যেসব মেয়ে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে রাজ্যপালকে বরণ ক'রে নেবে তারাও সার দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে মঙ্গল-শঙ্খ।

হাসিমুখে আমাদের যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দবাবু এসে হাজির হ'লেন। বললেন, আমি ঠিক সময়ে এসে পেছি। মাঠে ছেলেমেয়েরা সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন ফোটা-ফুলের বাগান। মাইকওয়ালা তার মাইক নিয়ে তৈরী।

সবাইকার মনে-প্রাণে উৎসবের বাঁশী বেজে উঠেছে, এমন সময় পার্কের সদর পথ থেকে জনতার সাড়া জাগলো — এসে গেছেন — এসে গেছেন —

এগিয়ে গেল আসরের কর্মীর দল। সম্পাদককে সাথী ক'রে আমিও ছুটলাম। রাজ্যপালকে সঙ্গে নিয়ে এলাম উৎসব মণ্ডপে। সেখানে আসরের মেয়েরা শঙ্খ বাজিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। রাজ্যপাল-পত্নী আসবেন জানিয়েও আসতে পারেননি তাঁর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখি বহু প্রতিনিধিরা এসে জমায়েত হয়েছেন। সিনেমা তোলবার জন্যে এসেছেন উৎসাহী ক্যামেরাম্যান, নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদের দেখলাম— আর পেলাম যুগান্তরের বন্ধুদের।

সংস্কৃত স্তোত্র দিয়ে বর্ষবরণ শুরু হ'ল।

তারপর এক বছর যে সব সোনার কাঠিকে আমরা হারিয়েছি তাদের স্মৃতির অর্ঘ্য প্রদানের জন্য সকলে এক মিনিটকাল দাঁড়িয়ে রইলাম।

শুরু হ'ল—আমাদের আসরের উদ্বোধন-সঙ্গীত "জাগো কিশোরী কিশোরী"।

নববর্ষের পুণ্য-প্রভাতে গানখানি এত মিষ্টি শোনাল যে কি বল্বে।

ইউরোপ যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমি হাজার হাজার সোনার কাঠি ভাই-বোনেদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। মনে হ'ল সকলের শুভেচ্ছা যেন আমাকে বর্মের মতো ঘিরে রয়েছে।

বিবেকানন্দবাবু প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে উদ্বোধন বক্তৃতা দিলেন এবং ছোটদের আর্শীবাদ জানালেন। এর পর শুরু হ'ল ছেলেমেয়েদের সমবেত ব্যায়াম।

এরই ফাঁকে রাজ্যপাল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজই যখন আপনার ইউরোপ যাত্রা, তখন ত' চারটি মাছের ঝোলভাত খেয়ে নিতে হবে? আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম,—অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে চলে গিয়ে কাজ শেষ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কেননা, সাড়ে নটার সময় আমাকে বেরতে হবে।

যখন প্রবল উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের মধ্যে সমবেত ব্যায়াম চল্ছে, তার ভেতর বিদায় নিয়ে চলে এলাম উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে। কেননা—দমদম বিমানঘাঁটির জন্যে তৈরী হ'তে হবে।

বাসায় ফিরে গরম ভাত, তারই সঙ্গে খাঁটি গাওয়া ঘি, মাছভাজা আর দই দিয়ে বেশ আরাম ক'রে খাওয়া শেষ করলাম। আগে থেকেই কথা ছিল আমার প্রতিবেশী বন্ধু প্রভাসবাবু তাঁর গাড়ি ক'রে দমদম পৌঁছে দেবেন ; তাতে সুবিধে হবে এই যে, পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমাকে গিয়ে তুলে দিয়ে আসবে আর ফেরার সময় প্রভাসবাবুর সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে আসতে পারবে। প্রভাসবাবুর মেয়ে কুহু টিপ পরে তৈরী হয়ে আছে, সে-ও জ্যাঠাকে দমদম পৌঁছে দিয়ে আসবে আর এরোপ্লেন দেখবে। আমার চার ছেলেমেয়ে বুবু, টুটু, পুলক, ছুটুর মধ্যে— ছুটুকে কোনো রকমে বাদ দেওয়া গেছে। ওদিকে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে— হারুদার মেয়ে বুচ্‌কি, ছেলে টুটু, আর বিনোদবাবুর মেয়ে সুনন্দা।

ওরা সবাই মিলে গাড়ি দখল ক'রে বসল।

পাড়াসুদ্ধু সবাই যে আমার কত আপনার ব'লে মনে করেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই সুদূর বিদেশ যাওয়ার প্রাক্‌কালে। তেতলা থেকে নন্তুদা চিৎকার ক'রে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, কবিবন্ধু শৈলেন রায় এসেছেন বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে, বৌদি (হারুদার স্ত্রী), সেলু তা'র ভাই ভাইবোনেরা উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ির দোর-গোড়ায়, বিনোদবাবু আর তাঁর স্ত্রী অতি নিকট আত্মীয়ের মতো উপস্থিত হয়েছেন, বেলা বোনদের নিয়ে তাদের বাড়ির সামনে হাজির , বাঁটুল ভাইদের বাড়ির মেয়েরা দোতলা থেকে জানলা খুলে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন—

বন্ধুবর প্রভাসবাবুর পাশে গিয়ে বসলাম। সকলের সমবেত শুভেচ্ছা আর প্রীতি-জ্ঞাপনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে। দমদমের সারাটা পথ আমাদের কুহু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি ক'রে ভারী আনন্দ দিল।

দমদমে পৌঁছে জানা গেল কে-এল-এম বিমান বেশ খানিকটা দেরি ক'রে ফেলেছে। আমরা সবাই মিলে কে-এল-এম বিমানের অফিসে গিয়ে হাজির হ'লাম। সেখানে আমার জন্য আর একটি বিস্ময় জমা হয়ে ছিল। আমার বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু প্রভাংশু গুপ্তের (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড) আত্মীয় এই অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মী, এখানকার সর্বজন-পরিচিত মিঃ সেন। তাঁকে পেয়ে আমার ভারী সুবিধে হয়ে গেল। তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে আমার মালগুলি ওজন ক'রে লেবেল এঁটে দেবার ব্যবস্থা করলেন আর আমি তৃষ্ণার্ত জেনে—আইসক্রীম সোডা পান করালেন।

ইতিমধ্যে সব পেয়েছির আসরের কর্মীদল একে একে আসতে লাগল আমাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্যে। তখন বুঝলাম যে, আমাদের নববর্ষ-উৎসব শেষ হয়ে গেছে।

প্রথম এলেন অনিলবাবু কল্যাণীয়া দিবাকে সঙ্গে করে। জগু আর জগৎ এসে হাজির। তারা আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে খুব হৈ-চৈ শুরু ক'রে দিল। আরো খানিক বাদে আমাদের মূল সত্যসেবী—রমাকান্ত দত্ত একেবারে মালা নিয়ে এসে হাজির। এরা এই বিমানঘাঁটিতে একটা মজাদার দৃশ্যের সৃষ্টি না ক'রে ছাড়বে না দেখছি! আমাদের দু'জন ক্যামেরাম্যান বন্ধুও এসে হাজির। উৎসাহ তাদের অপরিসীম। ছবি না তুলে ছাড়বে না। আমাদের হরলাল ভাই এসেই আমাকে ধমক দিতে শুরু করল। আমি পাউণ্ড ভাঙিয়ে ইটালির মুদ্রা লিরা নিয়েছি কিনা। যখন জানতে পারল যে, আমি সে সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থাই করিনি তখন সে আমায় টান্‌তে টান্‌তে টাকা-কড়ি বিনিময়ের অফিসে নিয়ে গেল। চার পাউণ্ডের বিনিময়ে পেলাম ৭৫৬০ লিরা। মহানন্দে তখন ফিরে এলাম অপেক্ষা করবার প্রশস্ত কক্ষে। প্রস্তাব উঠল সবাই মিলে ছবি তুল্‌তে হবে।

অফিসের বাইরে সুন্দর বাগানের পাশে এসে আমরা হাজির হ'লাম। প্রভাসবাবু, অনিলবাবু, জগু, জগৎ, হরলাল, বুবু, টুটু, পুলক, বুচ্‌কি, সুনন্দা, দিবা (মিনতি), ছোট টুটু—এমন কি বাচ্চা কুহুকে নিয়ে আমরা সবাই ফটো তুল্‌লাম।

খবর পাওয়া গেল যে, এইবার কাস্টম অফিসে গিয়ে যথারীতি সঙ্গের মালপত্র দেখাতে হবে। সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাস্টম হাউসে হাজির হ'লাম। দল বেঁধে যাত্রীদের 'পাসপোর্ট' দেখাতে হ'ল। কাস্টমের কর্মচারীরা আমায় খাতিরই করলেন বল্‌তে হবে। কেননা—তাঁরা ভেতরের কোনো জিনিস না দেখেই ছেড়ে দিলেন। অবশ্য পরিচয় দিয়েছিলাম যে, আমি যুগান্তর কাগজের সাংবাদিক। এরপর টিকা দেবার নিদর্শন দাখিল করতে হ'ল স্বাস্থ্য-বিভাগে।

এ !ান থেকে মুক্তি পেয়ে ভিতরের বিরাট প্রাঙ্গণে আসতেই দেখি অনেক দূরে -- আগত ভদ্রলোকদের অপেক্ষা করবার গণ্ডিবদ্ধ জায়গা থেকে আসরের শিল্পী গোপাল দে আর শৈলেন দাশ আমায় হাত-ইশারা ক'রে ডাক্‌ছে। তারাও আমার হাতে একটি পরম প্রীতির নিদর্শন-মালা তুলে দিল। আর দেখা হ'ল শিল্পী বন্ধু ধীরেন বলের সঙ্গে। সেও দেরী ক'রে এসেছে। কিছুই কথা হ'তে পারল না। কেননা, কে-এল-এম অফিসার জানিয়ে দিলেন যে, তখন আমাকে ঘরে গিয়ে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এলাম অপেক্ষামাণ যাত্রীদের পাশে। এখন আমি ছাপ-দেওয়া আলাদা লোক হয়ে গেছি। যারা আমায় বিদায় দিতে এসেছে আর তাদের সঙ্গে দেখা কবা বা কথা বলার সুযোগ জুটবে না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক এল। এইবার আমাদের বিমানে চড়তে হবে। দল বেঁধে Run way -র ওপর দিয়ে সবাই এগিয়ে চললাম বিমানের দিকে। দূর থেকে আসরের কর্মীরা আমায় দেখতে পেয়ে হাত তুলে, রুমাল নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে লাগ্‌লো। আমার হাতে ছিল ওদের দেওয়া ফুলের মালা। আমি তাই নেড়ে ক্রমাগত সম্ভাষণের জবাব দিলাম।

কিছুক্ষণ সময় গেল যন্ত্র গরম হ'তে। তারপর প্রচণ্ড শব্দ ক'রে আকাশে পাখা মেলে বিরাট গরুড় পক্ষী উড়ল নীল গগনে। আমি জানালা দিয়ে ওদের সবাইকে দেখ্‌তে পেলাম। কেননা, আমি পাশের দিকের আসনে বসেছিলাম। দেখলাম তখনো ওরা হাত নাড়ছে, রুমাল ওড়াচ্ছে, মাথা দুলিয়ে চিৎকার করছে। বাঙ্‌লা মায়ের স্নেহ-কোমল মাটি আমার কাছ থেকে দূরে—দূরে, আরো দূরে চলে গেল।

হ্যাঁ, বল্‌তে ভুলে গেছি যে, বিমান ওড়াবার আগে বিমান-বালিকা এসে আমাদের কোমরে বেল্ট্ বেঁধে দিয়ে গেছে — আর দিয়েছে Chewing gum.

বিমান আকাশে ওড়াবার ঠিক আগের মুহূর্তে লাল সাবধানী অক্ষর জ্বলে ওঠে—"Don't smoke, Fasten your Belts" তখুনি চুপচাপ ভালো মানুষ হয়ে বেল্ট্ বেঁধে শান্ত সুবোধ বালকের মতো ব্যবহার না করলেই বিপদ। অবশ্য অন্য সময় যাত্রীরা ইচ্ছা করলে ধূমপান করতে পারেন—তাতে কোনো বাধা নেই।

বিমান দ্রুতবেগে ওপরে উঠতে লাগ্‌লো—কলকাতা শহর তালগোল পাকিয়ে খেলাঘরের মতো ছোট্ট হয়ে আস্তে আস্তে দৃষ্টিপথ থেকে কোথায় মিলিয়ে গেল।

কাছের মানুষগুলি যখন দূরে যায় তখন নতুন পরিবেশে আশে-পাশে তাকাবার অবকাশ ঘটে। নানা ধরনের যাত্রী আছে এই ডাচ্ বিমানখানিতে। ইন্দোনেশিয়ান,

আমেরিকার লোক, খাস বৃটিশ, জাপানী যাত্রী, পাকিস্তানী যাত্রী সবাই এসে এই উড়ন্ত মুসাফেরখানায় জমায়েত হয়েছে।

বিমানখানির ভেতর মায়েদের সঙ্গে শিশুরও অভাব নেই। তাদের শুইয়ে রাখ্‌বার ছোট ছোট অভিনব খাটেরও ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান মানুষের সুখ-সুবিধের জন্যে যে কতখানি মাথা খাটিয়েছে তা এই বিমানে (বিশেষ ক'রে কে-এল-এম—এ) উঠলে বোঝা যায়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সরকার মশাই আমায় ব'লে দিয়েছিলেন যে, বিমানের রাজা হচ্ছে কে-এল-এম প্লেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, খাওয়া-দাওয়া ও আতিথ্যের রাজসিক বন্দোবস্ত নাকি আছে এখানে। বিমানে উঠে বুঝ্‌লাম যে, যতীন্দ্রবাবু এতটুকু বাড়িয়ে বলেন নি। যাত্রীদের আরামের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা ত' আছেই—তা ছাড়া আছে তড়ি-ঘড়ি রকমারী খাবার পরিবেশনের ঘটা। বলা বাহুল্য সবই বিনামূল্যে পরিবেশিত হয়। তার মানে হচ্ছে — টিকিট কেনার সময় যে দাম দেওয়া আছে তার বেশি এক কড়িও এঁরা বাড়তি আদায় করেন না। Sea sickness-এর মতো Air sickness ব'লেও একটা কথা আছে। পাছে যাত্রীরা সেই রোগে ভোগে সেইজন্যে প্লেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনা বালিকারা এসে একরকম সুগন্ধী জল দিয়ে রুমাল ভিজিয়ে দিয়ে যায়। তাই দিয়ে ঘন ঘন মুখ. চোখ, কপাল মুছে ফেল্‌তে হয়—একেবারে অব্যর্থ ঔষধি। মন-মেজাজকে ঠাণ্ডা করতে দেরি লাগে না।

যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ সিগারেট খাচ্ছেন, কেউ নানাদেশীয় পত্রিকা পাঠ করছেন—আবার অপরে ঘুমের আয়োজন ক'রে ব'সে আছেন।

আমার যে ঘুম না পেয়েছিল তা নয়।

হঠাৎ একি কাণ্ড! হি-হি ব্যাপার - গায়ে হুঁ-হুঁ কাঁপুনি। দারুণ শীত লেগেছে।

বিমান কত ওপরে উঠে গেছে কে জানে!

মাথার ওপরেই ছোট ছোট বাক্স। তাতে যাত্রীদের জন্যে কম্বল সাজানো থাকে। শীতের প্রচণ্ড তাড়ায় অনেকেই একখানি ক'রে কম্বল টেনে নিয়ে দিব্যি ঘুমের আয়োজন ক'রে নিলাম।

হঠাৎ সাবধান-বাণী শোনা গেল—করাচী এসে যাচ্ছে, সবাই তৈরী হয়ে নাও। বিমানের লোকরা একটি ক'রে ছাপানো ফর্ম দিয়ে গেল—তাতে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। সেইগুলি পূরণ করে পাস্‌পোর্টের সঙ্গে জমা দিলে তবে করাচী এয়ার-পোর্টে ঢুকতে দেবে। অন্যান্য যাত্রীর মতো আমিও ফর্মটি পূরণ ক'রে দিলাম।

হ্যাঁ, ইতিমধ্যে এক বাক্স ক'রে চকোলেট দিয়ে গেছে প্রত্যেক যাত্রীকে — তা ছাড়া, দুপুরে জুটেছে লাঞ্চ। প্রথমে কথা ছিল—দমদম্‌ এয়ার-পোর্টে লাঞ্চ

দেওয়া হবে। কিন্তু বিমান এসে পৌঁছতে দেরি করায় সেই লাঞ্চ আমরা পেলাম আকাশ-পথে। লাঞ্চ খাওয়ার পদ্ধতিটা কলকতার বহু নাম-জাদা হোটেলে আগে থেকেই রপ্ত করা ছিল। তবে বিমানের ওপরে শুনেছিলাম 'বিফ্' দেয়। তাই ভয়ে ভয়ে মাংসটা বাদ দিয়ে বাকী অন্যান্য বস্তুতে উদর ভর্ত্তি করা গেল। কলকাতার বাসার ভাত অনেকক্ষণ হজম হয়ে গিয়েছিল। তাই বহুক্ষণ বাদে বিমানের ওপরকার লাঞ্চটা মুখরোচক ব'লেই মনে হ'ল।

আবার সেই লাল সাবধান-বাণী—বেল্ট্ বেঁধে বসো।

কাজে কাজেই সবাইকেই শান্ত সুবোধ ছেলে হয়ে বসতে হ'ল।

করাচী বন্দরে আমরা গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন কলকাতার সময় পৌনে ছটা; ওদের সময় এক ঘণ্টা কম—পৌনে পাঁচটা।

তার মানে—কলকাতার একঘণ্টা পরে করাচীতে সূর্যদেব মুখ দেখান।

বিকেলের আলো বেশ ভালো লাগলো করাচীতে বিমান থেকে নেমে। পাস্পোর্ট জমা দেবার পালা সাঙ্গ ক'রে—কে-এল-এম বাসে চেপে আমরা গিয়ে হাজির হ'লাম—ওদেরই মনোমুগ্ধকর বিশ্রাম-ভবনে (Rest House)।

প্রথমেই হাতে হাতে একখানি ক'রে চিরকুট মিলল। তাতে লেখা রয়েছে, এই স্লিপ্‌টি জমা দিলে তোমার মনোমত এক গেলাস স্নিগ্ধ পানীয় মিলবে।

আমি আমার প্রিয় পানীয় 'অরেঞ্জ বে.গ্লাস্' জোগাড় ক'রে টেবিলে বসলাম আর এই প্রথমে চিঠি লিখতে বসলাম করাচী থেকে। আমার ছেলেমেয়েদের কাছে চিঠি লেখা শেষ ক'রে একজন পরিচারিকাকে ডাকলাম। তিনি জানালেন চিঠি ফেলতে কিন্তু পয়সা দিতে হবে। আমার কাছে ছিল ভারতীয় মুদ্রা—তাই চার আনা দিয়ে চিঠিখানি পোষ্ট করতে তাকে অনুরোধ করলাম।

করাচীতে কে-এল-এম বিশ্রাম-ভবনের বাগানটি ভারী সুন্দর আর আরামপ্রদ। বাথরুমে ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলে সেই বাগানে বেড়াতে লাগলাম। মধুর দখিনা বাতাস বইছিল বাগানখানিতে। গরমও তীব্র নয় এখানে। নাতিশীতোষ্ণ বলা চলে। ফুলের বাগানের ভেতর বেড়াতে বেড়াতে এক জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এঁর নাম কেন্‌জো জোসিদা। ইনি টোকিও থেকে লণ্ডন যাচ্ছেন একটা Internatioal Conference উপলক্ষে। ভদ্রলোক খুব আলাপী। কিছুদিন আমেরিকাতেও পড়াশুনা করেছেন। আমাকে দেখে অনুমান করলেন —আমি নাকি তারই সমবয়সী—বছর ছত্রিশ হবে। যখন জানালুম এখন আমার অনেক বয়স, তিনি ভারী অবাক হ'লেন।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তিনি আমার একটি ফটো তুলতে চাইলেন। তাঁর ইচ্ছে আমরা দু'জনে এক সঙ্গে ছবি তুলি। তখন প্রশ্ন উঠল তাহলে ক্যামেরাতে ছবি তুলবে কে? তিনি নিজেই উৎসাহিত হয়ে একজন মুসলমান বেয়ারাকে

ডেকে নিয়ে এলেন। সে বেচারী জীবনে বোধ করি ক্যামেরা স্পর্শ করে নি। কিন্তু জাপানী ভদ্রলোকের অদম্য উৎসাহ। তিনি সব বুঝিয়ে দিলেন ওকে—কি ক'রে ফটো তুলতে হয়। তাঁরই নির্দেশে আমরা দু'জন বিকেলের পড়ন্ত রোদে ফোটা-ফুলের বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেই বেয়ারা তুলল ফটো। তুললো মানে একটা ক্লিক্ শব্দ শোনা গেল। ফটো যে কি রকম হল তা' মা যশোদাই জানেন।

আমি অনুরোধ করলাম, ফটো যদি ভালো হয়—তবে এক কপি যেন আমি পাই। তখন দু'জনের মধ্যে ঠিকানা বিনিময় হ'ল।

এই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আর একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বয়স তার আঠার বছর। সে যাচ্ছে লণ্ডনে ইংরেজী পড়তে। ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল থেকে এসেছে। ছেলেটি বাড়ি ছেড়ে এসে ভারী মনমরা হয়ে পড়েছে। তাকে একটুখানি উৎসাহ দেওয়া আর প্রেরণা জোগান দরকার।

স্বপনবুড়োর কাজই ত' ওই। দেখ্তে পেলাম , ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমার কাজ তা হ'লে বিদেশেও ঠিক আছে। ছেলেটিকে বেশ খানিকটা প্রবোধ দিলাম। বাড়ীর কুশল প্রশ্ন করলাম। কিন্তু মুশ্কিল বাধলো এই যে, ছেলেটি ভাল ক'রে ইংরেজী বলতেও পারে না। কি ক'রে যে লণ্ডনে ইংরেজী পড়াশুনা চালাবে সেই কথা ভেবে শঙ্কিত হ'লাম। আমিও যে খুব ভালো ইংরেজী জানি তা নয় — তবে কথা-বার্তা দিব্যি চালিয়ে নিতে পারি — কোথাও আটকায় না।

এর খানিক বাদে আমাদের ডিনার টেবিলে ডাক পড়ল। জাপানী ভদ্রলোক, সেই তরুণ ছাত্র ও আমি এক টেবিলে বসলাম। দেখলাম খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে সেই জাপানী ভদ্রলোক খুব ওয়াকিবহাল। আমরা দু'জনেই দিব্যি মাংস রুটি চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের ছাত্র-বন্ধুটি হাত গুটিয়ে বসে রইল।

আমি দেখলাম সমূহ বিপদ। তখন বেয়ারাটিকে ডেকে আমিই মুরুব্বি সেজে তাকে ডিম দিতে বললাম। ডিম পেয়ে ছেলেটি তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াটি শেষ করল। নইলে ওকে অভুক্তই থাক্তে হ'ত। করাচীতে একরকম মিষ্টি বাতাবী লেবু খাওয়ালো—ভারী সুন্দর তার স্বাদ। বাঁধাকপি সেদ্ধটা যে খুব ভালো লাগলো তা নয়—তবে মাংসের সঙ্গে শাকসবজি খেতে হয় বলেই ওটা নুন মাখিয়ে খেয়ে ফেল্লাম। শুনেছিলাম মুসলমান বাবুর্চিরা মাংস খুব ভালো রান্না করে। কলকাতার হোটেলের চাইতে করাচীর রান্না মাংসে যে খুব বেশী উপাদেয় সেকথা হলফ করে বলতে পারি না। তবে ক্ষিদের সময় খেতে মন্দ লাগল না।

খাওয়ার পাট শেষ করে দেখা গেল করাচীর আকাশে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—

রাশি রাশি তারা ফুটেছে আকাশে, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে ঃ

বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল
রাজার বাগানে ফুটেছে বকুল,
পারুল রজনীগন্ধা।

সত্যি করাচীর সেই বাসন্তী-সন্ধ্যা আমার মনে বেশ দোলা দিয়ে গিয়েছিল। মৃদু মন্দ সমীরণ আর ফুলের সমারোহের মধ্যে সেই মধুর সন্ধ্যায় করাচীকে ভালবেসে ফেলেছি।

জানি না—অন্য ঋতুতে তার রূপ কেমন।

জাপানী ভদ্রলোক বলেছিলেন ঃ তিনি এবং তার এক বন্ধু টোকিওতে পুস্তকের ব্যবসা করেন। ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃত নিয়ে লেখা যদি বই তিনি পান, তবে জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে রাজী আছেন। তবে লেখকের সঙ্গে দুইটি শর্ত থাক্‌বে। প্রথম হচ্ছে, জাপানী ভাষায় কপিরাইট তাঁদের থাকবে, দ্বিতীয় সাড়ে সাত পার্সেণ্ট কমিশন লেখক পাবেন। আমি জানালাম, কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারব।

আবার বাসে ক'রে সবাই ফিরে এলাম করাচী এয়ার-পোর্টে। সেখানে স্থানীয় কর্মচারীর কাছ থেকে যে যার পাসপোর্ট উদ্ধার করে বিমানে আরোহণ করা গেল।

একটা কথা পাঠক-পাঠিকাদের বলতে ভুলে গেছি যে, আমার এই চলতি পথের কাহিনী বিমানে বসেই লিখতে শুরু করেছি। প্রত্যেকের আসনের সামনে অস্থায়ী ভাবে ছোট্ট টেবিল তৈরী করা যায়। খাওয়া-দাওয়া আর লেখাপড়া এই টেবিলের ওপরেই চলে। আমিও চটপট টেবিল সাজানো পদ্ধতি শিখে নিয়ে এই লেখা শুরু ক'রে দিয়েছি। যদিও বিমান চলা-কালে টেবিলটা একটু কাঁপে, তবু আমার উৎসাহের অভাব নেই। কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে সমানে লিখে চলেছি। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের ভূমিকাটি মনে পড়ছে ঃ

তোরি হাতে বাঁধা খাতা
তারই শ খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে
মস্তিষ্ক-কোটর বাসী—
চিন্তা-কীট রাশি রাশি
পদ-চিহ্ন গেছে যেন রেখে।

সব পেয়েছির আসরের কেন্দ্রের কর্মীরা রওনা হবার আগে এই খাতাখানি

আমার হাতে তুলে দিয়েছে। সেই খাতার পাতাগুলি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার ক'রে চলেছি আমি।

করাচীতে ডিনারটি বেশ পরিপাটি রকমই হয়েছিল। কথায় বলে, ভুঁড়ি আর মুড়ি ঠাণ্ডা থাকলে—সবকিছুই ঠাণ্ডাভাবে চল্‌তে পারে। ভুঁড়িভোজনের পর যেটা হওয়া স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে তাই হ'ল। বিমানে ফিরে এসে লম্বা ঘুম দিলাম—কম্বলখানি টেনে নিয়ে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ জোর আলো জ্বলে উঠল।

কিরে বাবা। আচম্‌কা এত আলোর ঝলকানি কেন? কোনো বিপদ-টিপদের সংকেত নাকি?

জানা গেল ভয় পাবার মোটেই কিছু নেই। যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

কলকাতার সময়ে তখন রাত প্রায় আড়াইটে।

যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে কফি দেওয়া হবে। বাঙালী বাড়ি হ'লে ততক্ষণ হাঁক-ডাক পড়ে যেত।

—ওরে রামা, ও ঝি, শীগ্‌গির উনুনে আগুন দে। বাবুকে চা ক'রে দিতে হবে।

ফলে পাড়াসুদ্ধু সবাই জেনে গেল, বাবু চা খাবেন।

কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপার আলাদা। শুধু আলো জ্বালিয়ে জানিয়ে দেওয়া হ'ল —তোমার এখন জাগা দরকার, কফি তৈরী।

অত রাত্তিরে আচম্‌কা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে—রাগ একটু হবারই কথা। কিন্তু গরম কফি খাইয়ে সেটা পূরণ করিয়ে দিল। ডাচ বালিকার মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছা করলে—তাকে দেখন-হাসি ব'লেও ডাকতে পারেন।

হাতে হাতে চলে এলো একটি কাগজ তাতে ছবি আঁকা আর লেখা। সেই কাগজে ব'লে দেওয়া হয়েছে—এই বিমানের ক্যাপ্টেন কে, পরিচারক-পরিচারিকাদের নাম কি, বিমান এখন কোন্ অঞ্চল দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ভেতরের আর বাইরের উত্তাপ কত, বাগদাদ পৌঁছতে আর কত দেরি—এই সব খুঁটিনাটি খবর। খবরটি পড়ে পরবর্তী যাত্রীদের হাতে চালান করে দিতে হবে। এইভাবে গোটা বিমানের যাত্রীরা জানতে পারবে সন্দেশটি।

শেষকালে সকলের পড়া হয়ে গেলে বিমান-বালিকাকে ডেকে আমি বললাম, এই ভ্রমণের একটা কাহিনী লিখছি। কাগজখানি কি আমি পেতে পারি? মেয়েটি মৃদু হেসে কাগজখানি আমার হাতে এনে দিল। আমি সযত্নে ভাঁজ ক'রে সেটি পকেটে রেখে দিলাম। মুখে বললাম, ধন্যবাদ।

স্মিতহাস্যে বিমান-বালিকা প্রস্থান করল।

তারপর এসে গেল সেই বিখ্যাত "Thief of Bagdad"-এর রাজ্যি। কলকাতার সময় তখন রাত সাড়ে তিনটে। স্থানীয় সময় রাত একটা। বিমান থেকে বেরুতেই তীব্র শীতল কন্‌কনে্ হাওয়া যেন দু'গালে চড় মেরে গেল।

এতটা যে ঠাণ্ডা হবে আগে বুঝতে পারি নি। তা হলে যথারীতি সাবধান হয়ে ওভার কোটটা গায়ে দিয়ে বেরোতে পারতাম। যাই হোক গতস্য শোচন নাস্তি।

হি-হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বাগদাদ রাজ্যের বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছলাম। আগে থেকেই আমাদের পাসপোর্ট সংগ্রহ ক'রে নেওয়া হয়েছিল। সত্যি, বেশ শীত পড়েছে এই বাগদাদ রাজ্যে। বোধ করি বাগদাদের চোরের দলও এই নিশুতি রাতে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে্ আকাশে ফুটে রয়েছে রাশি রাশি তারা। যেন ভেল্‌ভেটের ওপর মণি-মুক্তা কেউ সাজিয়ে রেখেছে থরে থরে। বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তীব্র কন্‌কনে্ হাওয়ার জন্যে বাইরে দাঁড়ায় কার সাধ্যি।

এই শীতের রাত্রে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হ'ল—ইন্দোনেশিয়ার এক মন্ত্রীর সঙ্গে। ইনি Public Works Dept-এর মন্ত্রী। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, তিনি কিছুদিন আগে দিল্লীতে বেড়াতে এসেছিলেন—ভারতের Public Works-এর গতি-প্রগতি সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। ভারতের সংগঠনমূলক কাজের নমুনা দেখে তিনি সত্যি মুগ্ধ হয়েছেন। যদিও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে এত দ্রুত কাজ করা সম্ভবপর হবে না—তবু একথা নিশ্চয় যে, তাঁরা দেশ গড়বার কাজে এগিয়ে যাবেন বলেই আশা রাখেন।

ভদ্রলোক খুব অমায়িক। একটা দেশের মন্ত্রী বলে তাঁর কোনো গর্ব কিংবা গাম্ভীর্য নেই। বয়সেও বেশ তরুণ বলে মনে হল।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল—করাচী থেকে ত' কলকাতায় চিঠি লিখেছি—এই দারুণ শীতের রাত্রে যদি "বাগদাদের চোরের দেশ" থেকে দেশে চিঠি লেখা যায় তবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা চাঞ্চল্য আর অভিযানের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকবে!

যে কামরায় বসে আমরা চা-বিস্কুট খেয়েছিলাম—সেখানে এগিয়ে গিয়ে একটি বেয়ারাকে কাগজ, খাম, ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে যে, চিঠি লিখবার কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই।

কি আর করা যাবে! বাগদাদ হেন দেশে উচ্চবাচ্য করা বিশেষ উচিত হবে বলে মনে হল না। একে ত' বাগদাদ চোরের রাজ্যি, তার ওপর হারুণ-অল-রসিদ কোন্‌খানে ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে কে জানে! কোনো কিছু বেয়াদবি দেখলে হয়ত হাতে মাথা কেটে নেবে।

মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি হলঘর। সেইখানেই এসে সব যাত্রী জমায়েত হল—আর এদিক-সেদিক বেরিয়ে বেড়াতে লাগলো। এক কোণে একটি ছোট্ট ঘর। কাচের জানালা দিয়ে দেখা গেল—সেখানে ফোন করবার ব্যবস্থা আছে। একটি লোক আপাদ-মস্তক কম্বলে ঢেকে দিব্যি ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। এই যে এতগুলি প্রাণী চলাফেরা করছে, হাসি-ঠাট্টা-তামাসা চালিয়েছে—সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। পৃথিবীর কোনো গোলমালেই তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে বলে মনে হল না।

হলের মধ্যে দুটি তিন-চার বছরের শিশু দিব্যি কলহাস্যে আসর জমিয়ে তুলেছে। একটি শিশু একজন ইন্দোনেশিয়ার মায়ের ছেলে আর একটি কোন ইউরোপীয় শিশু। পরস্পরের জানা-শোনা নেই—দেখা-সাক্ষাৎ নেই। এই বিমানেই মিলন—আর বাগদাদের নিশুতি রাত্রে তাদের আনন্দ-আসর। হয়ত এর পর আর জীবনে দেখা হবে না। কিন্তু আবার যদি কোনো দিন সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে বাধে—তবে কে বলতে পারে—এই দুটি শিশু একদিন যুবক হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়বে না। কিন্তু নিশুতি রাত্রের এই শিশু দুটির কলহাস্য আর ছুটোছুটি কেবলি কি এই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে না—যে মানুষ আসলে মানুষ? সে যে জাতেরই হোক না কেন। সবাইকার সঙ্গে যেন একটা অদেখা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। বিমানে উঠে বিভিন্ন জাতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়াতে একথা আরো বেশী করে মনের কোণে জাগতে থাকে। হঠাৎ দেখা গেল আর একটি ঘরে একটি ভদ্রলোক খটাখট করে টাইপ করে যাচ্ছেন। মনে ভাবলাম—এঁর কাছে চিঠি-লিখবার কাগজ, খাম ইত্যাদি থাকতে পারে। সরাসরি জানালার কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম। তিনি একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, চিঠি লেখবার ব্যবস্থা অবশ্যই আছে—কিন্তু আপনাদের দশ মিনিটের মধ্যেই প্লেনে গিয়ে উঠতে হবে। চিঠি লিখবার সময় আর কোথায়?

খবর শুনে আর আপত্তি করা চললো না।

খানিক বাদেই অবশ্য আহ্বান এলো আবার আকাশচারী হবার জন্যে। সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত দুটো বুকে গুঁজে কোন রকমে আমরা সবাই ছুটতে ছুটতে গিয়ে বিমানে উঠে নিজের নিজের জায়গা করে নিলাম।

ইতিমধ্যে প্রত্যেকেরই মুখ চেনা হয়ে গেছে। একটা আত্মীতায়বোধও জেগেছে সবাইকার মনে। এবার বাগদাদ থেকে ডাচ বিমানের সব কর্ম্মচারী বদলি হয়ে এলো। পরিচারক, পরিচারিকা, মায় ক্যাপ্টেন অবধি। সবাই যেন আরো ফিট্‌ফাট্ সুন্দর, কায়দা-দুরস্ত পোষাক পরে এসেছে। এদের আরো সুদর্শন বলা চলে।

অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাকি রাতটা ঘুমোবার জন্যে দেহ

এলিয়ে দিলেন। প্রত্যেক আসনের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা আছে যে, সেটা ওপরের দিকে একটু টিপে দিলেই—ইজি চেয়ারের আরামদায়ক আকার ধারণ করে। তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির আরাধনা করতে ভালো লাগে। ওদিকে একটি ইন্দোনেশিয়ার মহিলা খুব সৌখীন পোষাক পরে—মুখে রঙ লাগিয়ে এসেছেন। তিনি বিশেষ একটি ভঙ্গী নিয়ে ঘুমের আরাধনা শুরু করে দিলেন।

সম্প্রতি আর দুটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এঁরা দুজনেই কলকাতার মোটা মাইনের চাকুরে। একজন বার্ড কোম্পানীতে চাকরী করেন বললেন। ছ'মাসের ছুটি নিয়ে হোম—মানে—লণ্ডনে চলেছেন। আগামী কাল সন্ধ্যেবেলা এঁরা দুজন লণ্ডনে পৌঁছবেন। নিজেরাই যেচে এসে আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন। আমারও বেশ ভাল লাগলো তাঁদের সঙ্গে নানা কথা বলে। কিন্তু যদি কলকাতা সহর হত তবে এঁরা বোধ করি আমার মতো নেটিভের সঙ্গে কথা বলতেই চাইতেন না। ভারত থেকে বাইরে এসে বিমানযাত্রার শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা একেবারে উঠে গেছে।—কেউ আর হরিজন নয়,—সব একাকার হয়ে গেছে।

বিমানে এসে আমি কিন্তু সরাসরি কম্বলের তলায় আশ্রয় নিলাম না। খাতাখানি খুলে আমার আসনের ওপরকার ছোট আলোটি জ্বেলে এই ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসলাম।

পাশেই বিমানের চাকার একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে—পায়ের নীচে বাগদাদ সহর দীপালীর আলোর মালার মতো খানিকক্ষণ ঝিকিমিকি করে—আস্তে আস্তে আলেয়ার মত দূরে মিলিয়ে গেল।

আমি জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে দেখ্ছি—মন্ত্রমুগ্ধের মতো লিখে চলেছি।

শেষ রাত্তিরের আলো-আঁধারীর মধ্যে লিখতে ভারী ভালো লাগছে। সবাই যখন ঘুমোচ্ছে—আমি তখন একা জেগে ছোট্ট আলোটি জ্বেলে পাতার পর পাতা প্রলাপ রচনা করে চলেছি—এই ভাবটি আমার নিজের কাছে খুব উপভোগ্য মনে হচ্ছে।

লিখতে বসে কলমটাকে নিয়ে কিন্তু ভারী বিপদে পড়েছি।

মাঝে মাঝেই কালীর স্রোত বন্ধ হয়ে আস্ছে। হাত আর মন যখন ক্রমাগত রচনা করে যেতে চাইছে—লেখনী কেবলি পদে পদে বাধার সৃষ্টি করছে—দ্রুতবেগে এগোতে দিচ্ছে না।

অনেকক্ষণ ধরে কলমটা ঝেঁকে নিয়ে তবে আবার দু'লাইন লিখতে পারছি। হয়ত যে কথা মনের কোণে উঁকি মারছে—লেখনী তা খাতার পাতায় ধরে রাখতে পারছে না।

এইভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলেছে আমার রচনা। দু পা এগোয় ত' চার পা পিছিয়ে আসে।

আরো খানিকটা লেখবার পর ভারী ঘুম পেলো।

তখন খাতার পাতা দিলাম গুটিয়ে, লেখনী করলাম বন্ধ, তার পর কম্বলটা টেনে—আসনটাকে ইজি-চেয়ারের মতো করে দিলাম লম্বা ঘুম।

হঠাৎ বিমানের ঘোষণায় ঘুম ভেঙে গেল।

বিমান থেকেই জানানো হল যে, ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি দেখা যাচ্ছে, যাত্রীরা যেন সবাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নেন।

লাফিয়ে উঠল সবাই সঙ্গে সঙ্গে। যে ভিসুভিয়াসের গল্প ছেলেবেলা থেকে সবাই পড়েছে—ছবি দেখেছে "লাষ্ট ডেজ অফ পম্পেই" ...... সেই ভিসুভিয়াস কি না দেখে থাকা চলে? আমার মতো যাঁদের আসন একেবারে জানালার ধারে তারা সবাই বসে বসেই দেখতে লাগলেন, আর যাঁরা ভেতরের দিকের আসনে বসেছিলেন—তাঁরাও সহযাত্রীদের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন কিংবা লাজ-লজ্জার বালাই ছেড়ে দিয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ভিসুভিয়াস ত' আর অগ্নি উদ্গার করছে না। কাজেই অন্যান্য পাহাড় থেকে তাকে আর আলাদা করে চেনা যাবে কি ভাবে? দুরন্ত ছেলে ভিসুভিয়াস এখন ঘুমিয়ে আছে। শিব ঠাকুর হচ্ছেন শান্ত...সদাশিব। মাটি দিয়ে যেমন খুশী গড় আর বেলপাতা দিয়ে পূজো করো ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু সেই সদাশিব যখন সংহার-মূর্তিতে পৃথিবী ধ্বংস করতে প্রলয়-নাচন সুরু করেন তখনই তিনি হন নটরাজ। মানুষ নটরাজ মূর্তিকে ভয়ের সঙ্গে ভালবাসে। ভিসুভিয়াস ধ্বংসের অবতার বলেই লোকে দারুণ ভীতির সঙ্গে তার নাম স্মরণ রাখে। সুতরাং তার সেই চরম মূর্তি না দেখলে মনে ধরবে কেন? জানিনা, কবে আবার এই দামাল ছেলে ভিসুভিয়াস কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করে হঠাৎ জগৎবাসীকে ডেকে বলবে— "ম্যাঁয়-ভূখা হুঁ!"

ভিসুভিয়াস যদি না মনের খোরাক জোটাতে পারল—প্রাণভরে চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে দিল— নীচের তরঙ্গসঙ্কুল নীল বারিরাশি। আমাদের ঠিক তলায় ভূমধ্যসাগর আত্মপ্রকাশ করছে। এই সাগরের স্বচ্ছ নীল জল আর তার ভেতর ছোট ছোট দ্বীপগুলি এত সুন্দর অংশ জলরাশি ভেদ করে সাগরের মধ্যে ঢুকে গেছে সেই আঁকা-বাঁকা দাগগুলি এত উঁচু থেকে অবিকল ছবিতে আঁকা ম্যাপের মত দেখাচ্ছিল।

ভূমধ্যসাগরের খোলা হাওয়া আমাদের দেহ আর মনকে একেবারে উন্মুক্ত করে দিল।

এর পর সেই মধুর পরিবেশে কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক

বুঝতেও পারি নি। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির গান গাওয়া ছড়া শুনে যেন আপনিই চোখের পাতা মুদে এসেছিল।

হঠাৎ একটা স্নিগ্ধ আলোতে তাকিয়ে দেখি — সূর্যোদয় হয়ে গেছে — রবির সোনালী কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে নীল আকাশের দিক্-বিদিকে —, সেই সোনালী আলো প্রতিফলিত হচ্ছে নীচে ভূমধ্যসাগরের নীল জলে। এখন আবার ছবির রূপ সম্পূর্ণরূপে পাল্‌টে গেল। মনে অদেখা পটুয়া যেন বিরাট ক্যান্‌ভাসে তার মায়া-তুলি দিয়ে তেল-রঙে একটি বিচিত্র ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

ইতিমধ্যে বিমান-বালিকাদের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেছে। রোমে আসবার বহু আগেই যাত্রীদের প্রাতঃরাশ (Break fast) শেষ করে দিতে হবে। তারপর তারা গুছিয়ে নেবার সময় পাবেন।

কে. এল. এম. কোম্পানীকে প্রশংসা করতেই হবে। যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এখানে একেবারে রাজসিক ব্যবস্থা। কোনো রকম ত্রুটি এরা রাখ্‌তে দেন না। এই বিমানে যাত্রীদের জন্যে মদের খরচই অঢেল। কিন্তু স্বপনবুড়োর ও বালাই নেই। কাজেই আমি কফি, চক্‌লেট, কমলালেবু, আপেল ইত্যাদি দিব্যি খেতাম। বাক্স-বাক্স দামী চক্‌লেট এরা যাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে। আমি নিজে এত চক্‌লেট পেয়েছিলাম যে, খেতে না পেরে বাক্সসুদ্ধ বিমানেই ফেলে আস্‌তে হয়েছিল। তখন দেশের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়েছিল বারবার। আমি বুড়ো মানুষ আর কত চক্‌লেট খেতে পারি? ছোটরা হাতে পেলে আনন্দ করে খেত।

কাজেই কে. এল. এম. বিমানে প্রাতরাশ যে ভালোভাবেই সম্পন্ন হল — সেকথা বলাই বাহুল্য।

ইতমধ্যে বিমান থেকে ঘোষণা এল যে, রোমের যাত্রীরা তৈরী হয়ে নিন। আমার বিশেষ গোছাবার কিছু ছিল না। একটা সুট্‌কেস ত' কে. এল. এম. কোম্পানীই উপহার দিয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই বিমান প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক যাত্রীকে একটি করে সুট্‌কেস উপহার দিয়ে থাকে। সেই সুট্‌কেসে ভর্তি ছিল আমার প্যান্ট সার্ট জামা ধুতি ইত্যাদি। আর একটি ছিল এ্যাটাচি কেস। তাতে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, জামবাক্, টুথ পাউডার, তোয়ালে, ব্রাস, মাথার তেল ইত্যাদি টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস। আর সঙ্গে ছিল আসরের ছেলেমেয়েদের দেওয়া ওদেশের ছোটদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অভিনন্দন-পত্র, রাখী, পুতুল ইত্যাদি।

আমাদের সব পেয়েছির আসরের সংগঠনী আর ইংরেজীতে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পত্রিকাও কিছু আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বিতরণ করবার জন্য।

সুতরাং আলাদা করে গুছিয়ে নেবার আমার কিছুই ছিল না।

আমার ইউরোপে আসবার পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা এই অবকাশে বলে নিই। শেষ মুহূর্তে আমার পাসপোর্ট মিলল। সেইজন্য এত তাড়াতাড়ি রওনা হতে হল যে, নতুন করে কোনো পোষাক তৈরী করবার সময়ই ছিল না। তা ছাড়া, সবকিছুই অতি ব্যয়সাপেক্ষ। পোষাকের সমস্যার সমাধান আমি অতি সহজেই করে ফেলেছিলাম। যেদিন যাওয়া ঠিক হল সেই দিন সন্ধ্যাবেলা আমার বহুকালের বন্ধু রূপবাণীর ভূতপূর্ব ম্যানেজার শ্রীসুধীর গুপ্তের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। তার দুটি দামী গরম সুট ছিল। তিনি এক কথাতেই সেগুলি বের করে নিয়ে এলেন এবং তাঁর বৈঠকখানায় পরীক্ষামূলক ভাবে পোষাকগুলি পরে দেখা হল। তিনিও আমার মতো খাটো মানুষ। চমৎকাব 'ফিট্' করে গেল পোষাকগুলি। কে দেখে বল্‌বে যে, এগুলি আমার জন্য বিশেষ করে তৈরী হয় নি। সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে তিনি বললেন, O K

গুপ্তের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘকালের। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন গাঢ় ও প্রীতি এত গভীর যে ধন্যবাদের প্রয়োজন না করে তিনি নিজেই প্যাক্ করে দিলেন পোষাকগুলি। বগলদাবা করে বাড়ী নিয়ে এলাম। এবার প্রশ্ন জাগল —সার্টের। আমি নিজে সার্ট কোনো কালেই পরি না। ধুতি পাঞ্জাবী আমাব চিরকালের পোষাক। কিন্তু যাচ্ছি শীতেব দেশে। ধুতি পাঞ্জাবী সেখানে চলবে না—এই কথাই বন্ধুরা বলে দিলেন। অদ্ভুতভাবে আমার গায়ের মাপের সার্টও পাওয়া গেল। এম. পি. প্রোডাকসন্সের হারুদা—আমার সাম্‌নের বাড়ীতে থাকেন,—আমার ঘনিষ্ঠতম কল্যাণকামী প্রতিবেশী,—তার ছেলে সেলু। সেলুর সার্টগুলি চমৎকার আমার গায়ে মানানসই হয়ে গেল। মনে হল যেন আমারই জন্যে দর্জি মাপ নিয়েছিল। গায়ে কিছুমাত্র বেমানান দেখাল না। সেলুও খুব খুশী—তার সার্টগুলি ইউরোপ বেড়িয়ে আসবে শুনে। শেষ পর্যন্ত একমাত্র সমস্যা ছিল জুতো। সুধীর গুপ্তের পরামর্শে এক জোড়া আমেরিকান অ্যালবার্ট কিনে নিলাম। এইভাবে আমি রাতারাতি পোষাকের সমস্যা সমাধান করি। আমার কত বন্ধু ইংলণ্ডে পড়তে গিয়েছে—তারা জামা পোষাকের জন্যে যেভাবে দু হাতে খরচ করেছে এবং বহু আগে থেকে যে রকম ছুটোছুটি কবেছে—দেখে হক্‌চকিয়ে গেছি। কিন্তু আমার ইউরোপ যাত্রার পোষাক সংগ্রহ করতে এক বেলার বেশী সময় পাই নি।

এবার বিদায় নেবার পালা।

বিমানের যাত্রা সাঙ্গ হতে চলল। এরই মধ্যে অনেকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে গিয়েছে,—তাঁদের ঠিকানা আমি নিয়েছি, আমার ঠিকানা তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। প্রাণ খুলে আলাপ করেছি আমরা পরস্পর। বিশ্বের রাজপথের

যাত্রী আমরা। সবাই যেন সবাইকার নিকটতম আত্মীয় হয়ে পড়েছিলাম —এই চব্বিশ ঘন্টার ভেতর।

কথা আছে সকাল ৯টায় আমরা ইটালীর রাজধানী রোমে উপস্থিত হব।

বিমান-বালিকা এসে জানিয়ে গেল যে, আমাকে আগে নামতে হবে। কারণ কাস্টম অফিসের ব্যাপারে অনেক ঝামেলা শেষ করা দরকার। রোমে নামবার যাত্রীর সংখ্যা খুব কম। অনেকেই সোজা লণ্ডন যাচ্ছেন।

আবার সেই লাল অক্ষরের সাবধান-বাণী জ্বলে উঠলে—Don't smoke, Fasten your Belts. আমরাও সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বেল্ট্ লাগিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। বিমান বাজপাখীর মত দ্রুতবেগে নীচে আসছে। গোটা রোম শহরটি বিমানের ওপর থেকে ভারী মজার দেখায়। ছেলেরা যেমন তাদের প্রদর্শনীতে খেলাঘর তৈরী করে ঠিক সেই রকম। মাঝে মাঝে সবুজ মাঠ ... তার ফাঁকে ফাঁকে দালান কোঠা—চওড়া রাস্তা—চার্চ ইত্যাদি চোখের সামনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তারপর বিমান নেমে এল রোমের বিমান-ঘাঁটির বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে (Run way)। বিমান-ঘাঁটির বিরাট উঠোনকে Run way বলে। আমরা তিনটি যাত্রী আগে নেমে গেলাম। তারপর অন্যান্য যাত্রী রওনা হয়ে গেলেন বিশ্রাম-কক্ষে। রোমে নামবার আগে বিমান বাথরুমে গিয়ে চমৎকার করে দাড়ি কামিয়ে নিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবার বেশ ব্যবস্থা আছে। বিমানের ভিতর পায়খানার ব্যবস্থাটিও ভাল।

মালপত্রের যে রসিদ ছিল তাড়াতাড়ি বের করে কে. এল. এম. বিমানের লোকের হাতে দিলাম। অন্য লোকের মালপত্র সব এসে গেল —কিন্তু আমার সুটকেস আসে না।

ব্যাপার দেখে চক্ষু ত' চড়কগাছ।

সুটকেস যদি হারিয়ে থাকে তবে ত' বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে একেবারে ব্যোম ভোলা—দিগম্বর সেজে বেড়াতে হবে। অত দুঃখেও রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন মনে পড়ল—

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়"

ওদিকে কে. এল. এম. বাস বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অপর আরোহীরা মালপত্র নিয়ে বাসে উঠে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আমি না গেলে বাস ছাড়তে পারছে না। এখান থেকে আমরা যাব রোম শহরের ভেতর কে. এল. এমের সিটি-অফিসে।

এক যাত্রী-দম্পতি মনে মনে আমায় গাল দিচ্ছিলেন কিনা তাঁরাই ভাল বলতে পারেন-কিন্তু আমি তখন তেত্রিশ কোটিরও যদি ডবল হয় ত' ছেষট্টি কোটি দেবতার নাম জপ করছি।

আমার প্রার্থনা বুঝি ভগবানের দরবারে গিয়ে পৌঁছল। দেখি কে. এল. এমের সেই লোকটি সুটকেস হাতে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার দিকে আস্‌ছে।

যাক্‌, এতক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। হৃষ্ট মনে উঠলাম গিয়ে বাসে।

বাস দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল—রোম শহরের উদ্দেশ্যে। রোম শহরের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও পৃথিবী-বিখ্যাত। সভ্যতায়, স্থাপত্য শিল্পে, জ্ঞানে গরিমায়, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে রোম শহর একদা মানব সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। প্রচলিত প্রবাদ আছে—"Rome was not built in a day." রোম শহর তৈরী সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প শোনা যায়। বহুকাল আগে এইখানে দুই ভাই ছিল—তাদের নাম হচ্ছে রেমো আর রোমোলো। তাদের মা জন্মের পরই দুই জনকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে কোথায় পালিয়ে যায়। একটি নেক্‌ড়ে বাঘ (Wolf) রেমো আর রোমোলোকে পালন করে বড় করে তোলে। বড়ো হয়ে দুই ভাই পরিকল্পনা করলে যে এইখানে একটি বড় শহর গড়ে তুল্‌তে হবে। কে শহরটি গড়বার দায়িত্ব নেবে এই দুইজনের মধ্যে দারুণ ঝগড়ার সৃষ্টি হল। প্রথমে মুখের কথা —তারপর মারামারি। সেই দ্বন্দ্বে রেমো মারা যায়। পরে রোমোলো রোম শহর তৈরী করে এবং তার নামানুসারেই শহরের নামকরণ হয়—"রোম"।

বাস দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে আর সেই সঙ্গে আমার চোখ দুটি সার্চলাইটের মত চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে সব কিছু দেখে নেবার চেষ্টা করছে। বিগত যুদ্ধের বোমা বর্ষণের সাক্ষ্য এখনো রোম শহরের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তবু বলতে হবে রোম বিরাট—রোম অভিনব—রোমে তুলনা শুধু রোম।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যটকদল আজও এখানে এসে তার শিল্পকলা আর স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম রোম শহরের ওপর দিয়ে কিন্তু মনে ছিল—ভাবনা-চিন্তার একটা বিরাট আলোড়ন। এখানে সময় অত্যন্ত কম। কাউকে চিনিনা। রাস্তাঘাট সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। তবু খুব তাড়াতাড়ি অষ্ট্রিয়া দেশের 'ভিসা' সংগ্রহ করে রাত্রের ট্রেনেই ভিয়েনা রওনা হতে হবে। আবার কলকাতা থেকে শুনে এসেছিলাম যে, অষ্ট্রিয়া এম্‌ব্যাসী দুপুরবেলাতেই বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং ঝড়ের বেগে কাজ করলে যদি কৃতকার্য হওয়া যায়। যুগান্তরের শ্রীরবীন্দ্র রায়চৌধুরী আমায় বলে দিয়েছিলেন বিমান থেকে নেমে খাওয়া-দাওয়ার দিকে কোন দৃষ্টি না দিয়ে আগে অষ্ট্রিয়ার ভিসা সংগ্রহ করবেন। যদি পেয়ে যান ত' নিজের ভাগ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন।

কাজেই মনে ভয় ছিল যথেষ্ট।

আমার সম্বলের মধ্যে ছিল কলকাতার এক বন্ধুর লেখা চিঠি— রোমের এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে। তাঁকে যদি পাওয়া যায় ভাল। নইলে যাকে বলে একেবারে অথৈ জলে পড়তে হবে।

তখন কোথায় অষ্ট্রিয়া-এম্ব্যাসী আর কোথায় আমি। আরো একটি বিপদের কথা যে, রোম শহরে ইংরেজী ভাষা একেবারে অচল। এখানে ফ্রেঞ্চ অথবা জার্মান ভাষা বেশী চলে।

সবকিছু জড়িয়ে শঙ্কার কারণ ছিল বৈকি।

কে. এল. এম. বিমান-প্রতিষ্ঠানের সিটি-অফিসে পৌঁছে প্রথমেই খোঁজ নিলাম ইংরেজী বল্‌তে পারেন—এমন কোনো অফিসার আছেন কিনা। জানা গেল —ভাঙা ইংরেজী বল্‌তে পারেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে কলকাতা থেকে আনা চিঠি দেখিয়ে অনুরোধ করলাম সেই ভদ্রলোকের অফিসে একটা ফোন করে দিতে, তিনি যেন দয়া করে এসে আমার সঙ্গে কে. এল. এম. সিটি-অফিসে সাক্ষাৎ করেন। ফোন করার পর ভদ্রলোক আমায় জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এক্ষুণি আসছেন—আমায় অপেক্ষা করতে বললেন।

নতুন করে উৎসাহ বোধ করলাম। অকূল সমুদ্রে যেন একখানি তরণী খুঁজে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক যখন আসছেন। তখন একটা ব্যবস্থা হবেই।

খুব অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবার পরই একখানি গাড়ী নিয়ে ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। তিনি আমার মালপত্র ঐ অফিসে জমা রেখে তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে অনুরোধ করলেন। কথাবার্তা গাড়ীতেই হবে। ভদ্রলোক তাঁর অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত আছেন। যেতে যেতে আমার প্রয়োজনের কথা তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি উত্তর করলেন যে, কাজের চাপে তাঁর পক্ষে আমার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার এম্ব্যাসীতে যাওয়া সম্ভবপর হবে না—তবে তিনি অফিসে এসে তার পরিচিত আর একজন মেয়েকে ফোন করে ডাকবেন—তিনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, মেয়েটি কিন্তু আদৌ ইংরাজী জানেন না—ফ্রেঞ্চ তার মাতৃভাষা। কি করে আমি তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা চালাব সেই হল আর এক সমস্যার ব্যাপার।

যাই হোক ভদ্রলোক তাঁর অফিসে এসে মেয়েটিকে ফোন করে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এই মেয়েটি এসে হাজির হল। এঁদের একটি মহিলার কাগজ আছে এবং তাঁরা সমাজ সংগঠনের কাজ করে থাকেন। মেয়েটি ভদ্রলোকের কাছে সবকিছু জেনে নিয়ে আমাকে নিয়ে রওনা হল। যদিও আমরা পরস্পর কথা বলতে পারছি না তবু পথ চলতে চলতে আমাদের ইঙ্গিতে আলাপ চলতে লাগলো।

সেই রামায়ণে পড়েছিলাম —

রাম নাড়ে হাত
আর বানর নাড়ে মাথা
কেউ না বুঝিতে পারে
নর-বানরের কথা।।

—আমাদের অবস্থাও হল অনেকটা তাই! আমি ইংরেজীতে কথা জিজ্ঞেস করি—আর মেয়েটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমার কথার জবাব দেয়।

এইভাবে কিছুটা পথ চলবার পর সে একটি ট্যাক্সির সন্ধান পেল এবং একরকম জোর করেই আমার হাত ধরে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। আমি শুধু তাঁকে জানিয়ে দিলাম—অস্ট্রিয়ান এম্‌ব্যাসী।

এইবার একটা সুবিধে এই হল যে, আমাদের ট্যাক্সি-চালক কাজ চলা গোছের ইংরেজী বলতে পারে। এখন থেকে সে আমাদের দোভাষী রূপে কাজ চালাতে লাগল।

মেয়েটি বললে, আমি তোমাকে অষ্ট্রিয়ান এম্‌ব্যাসী অফিসের সামনে নামিয়ে দেব—তুমি সোজা ওপরে উঠে যাও। ওপরের তলায় অফিস। সেখানে যে অষ্ট্রিয়ান মহিলা আছেন তিনি ভালো ইংরেজী জানেন। কাজেই তোমার আর কোনো অসুবিধা হবে না।

এইবার আমি আবার মনে জোর পেলাম।

ইংরেজী বলতে পারেন এমন কোনো মানুষ পেলে আমি আর কোনো কিছু ভাবিনে।

কিন্তু ওপরে উঠছি ত' উঠছিই। তলা কি আর শেষ হবে না? ক'তলা বাড়ী কে জানে! পা দুটো যেন ভেঙে আসতে লাগলো। তাই বলে হতাশ হলে চলবে না।

অবশেষে পাওয়া গেল—অষ্ট্রিয়ান এম্‌ব্যাসী। আগেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম —পার্লে ভু আংলে? মানে, ইংরেজী বলতে পার?

যে মহিলাটি সামনে বসেছিলেন—তিনি দূরের একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমি আর ইতস্তত না করে সটান সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

দুই তিনটি মহিলা ঘরে বসে লেখাপড়ার কাজ করছিলেন। যিনি মাঝখানের চেয়ারে ছিলেন তার বয়সটা বেশ বেশী। কাজেই আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে ইংরেজীতে কথা বলতে শুরু করলাম।

আমার জবাবে যখন তিনি ইংরেজীতেই কথা বলা শুরু করলেন তখন যেন আমার প্রাণে দখিনা সমীরণ বইতে লাগলো। ইংরেজী কথা যে এত মিষ্টি তা কি আগে বুঝতে পেরেছি!

যাই হোক অতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি. আজই আমার ভিয়েনাতে রওনা হওয়া প্রয়োজন। কাজেই ভিসা করে দিতে হবে। ওখানকার ঘড়িতে সেই সময় সাড়ে বারোটা বাজে! এক্ষুণি অফিস বন্ধ হয়ে যাবে!

ভদ্রমহিলা আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি একটু সামনের বারান্দায়

গিয়ে চেয়ারে বসুন। আমি কতগুলি দরকারী কাগজপত্র নিয়ে আসছি। সেগুলি ভর্তি করে দিলেই আপনি 'ভিসা' পেয়ে যাবেন। কোন চিন্তা নেই।

বুঝলাম, মরুভূমির মাঝখানেই মরূদ্যান পাওয়া যায়। হৃষ্টচিত্তে গিয়ে বারান্দায় দেহ এলিয়ে দিলাম।

তা হলে আজ ভিয়েনা রওনা হতে পারব ! আমার জন্যে নীচে যে মেয়েটি অপেক্ষা করছিল—তার জন্য সত্যি দুঃখ হচ্ছিল;অকারণ তাঁকে আমি কষ্ট দিচ্ছি। তা ছাড়া, এই এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠাও তার পক্ষে আরও মুস্কিল ছিল।

যাই হোক বেশীক্ষণ ভাববার অবকাশ না দিয়ে বৃদ্ধ মহিলাটি কতকগুলি কাগজ-পত্র নিয়ে হাজির হলেন এবং বললেন, আপনি এগুলি ভর্তি (fill up) করুন। যেগুলো নিজে বুঝতে না পারবেন আমি এসে ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনি কয়েক মিনিট বাদেই এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হল?

আমিও হাত চালিয়ে কাজ গুছিয়ে ফেলেছি, কাগজপত্রগুলি ওঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভিসা পেতে আমার মিনিট পাঁচেকের বেশী দেরী হল না।

এত শীগ্‌গির কার্যোদ্ধার হবে তা' আমি বুঝতে পারি নি।

বৃদ্ধা মহিলাটিকে ধন্যবাদ দিয়ে দ্রুতবেগে সিঁড়িগুলি টপ্‌কে টপ্‌কে নীচে নেমে এলাম। দেখি মেয়েটি ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলে, কাজ সমাধা হয়েছে কিনা? আমি মাথা নাড়তেই সে এক গাল হেসে ফেলল, তারপর আমার হাত ধরে আবার গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

ট্যাক্সিচালককে সে কি বলল আমি বুঝতে পারলাম না।

আরো খানিকক্ষণ চলবার পর দেখি ট্যাক্সি রেলওয়ে স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে।

এইবার ভিয়েনার টিকিট কেনার পালা।

আমার সঙ্গে Traveller's চেক্ ছিল। কলকাতার টমাস্ কুক্ কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। রোম থেকে ভিয়েনার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে দিল মেয়েটি আর সেই সঙ্গে "আন্তর্জাতিক শিশু-রক্ষা সম্মেলনের" সম্পাদিকাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিল যে, ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে আমি আজ রাত্রের গাড়ীতে রোম থেকে রওনা হচ্ছি। ট্রেনের টিকিটের দাম লাগলো—দশ হাজার ছয় শ ষাট লিরা।

স্টেশন থেকে বেরবার সময় ভিচিয়া মৃদু হেসে বলল, তোমার অতি দরকারী কাজগুলি ত' একরকম শেষ করা গেল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে? চলো, একটি রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক।

কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সে একরকম জোর করেই আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল এই মেয়েটির কার্যকলাপ দেখে আমি একেবারে থ' বনে গেলাম। আমাকে একেবারে বিদেশী-শিশু মনে করেছে নাকি? খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা একটা রেস্তোরাঁয় এসে হাজির হলাম। ইতিমধ্যে ট্যাক্সি-চালক তার পরিচিত একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জেদ করছিল, কিন্তু আমার সাংবাদিক-বন্ধু ডেলা ভিচিয়া তার কথায় বিন্দুমাত্র কান দেয় নি—সোজাসুজি নিজের জানা একটি রেস্তোরাঁয় চলে এল।

সেখানে রেস্তোরাঁর মালিককে আমায় খাবার দিতে নির্দেশ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জানালে যে, সে এক্ষুণি ফিরে আসছে। আমি ট্যাক্সি-ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু ডেলা ভিচিয়া মৃদু হেসে জবাব দিলে, ট্যাক্সিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি যে—

তারপর পলক ফেল্‌তে দেখি সে প্রস্থান করেছে। আপন মনে বসে লাঞ্চ খাওয়াটা শেষ করলাম। রেস্তোরাঁ-মালিক খুব খাতির করে কি কি জিনিস আমি ভালোবাসি খবর নিয়ে আমায় খাবার সরবরাহ্ করতে লাগল।

বুঝলাম—এই খাতির সাংবাদিক ডেলা ভিচিয়ারই প্রাপ্য। খাওয়া হয়ে গেলে পাওনা মিটিয়ে দিতে চাইলাম—কিন্তু রেস্তোরাঁর মালিক কিছুতেই আমার কাছ থেকে খাবারের দাম নেবে না।

বুঝলাম আমার সাংবাদিক বান্ধবীর নির্দেশ আছে। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল ত' মেয়েটিকে নিয়ে। আমার এই তরুণী-অভিভাবিকা কি আমাকে এক কানা কড়িও খরচ কবতে দেবে না?

যা ভেবেছি ঠিক তাই।

ডেলা ঝড়ের মতো এসে ঢুক্‌লো—সোজা ছুটে গেল রেস্তোরাঁর মালিকের কাছে, নিজের মাণিব্যাগ খুলে আমার খাবারের পাওনা মিটিয়ে দিতে গেল। আমি একেবারে হা-হা করে পড়লাম এ তুমি কি করছ কি?

কিন্তু কার কথা কে শোনে? টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আমার সুটকেশ হাতে নিয়ে একেবারে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসল।

বুঝলাম প্রতিবাদ করা বৃথা।

শুধু প্রশ্ন করে জানলাম—এইবার আমরা যাব ওদের কাগজের কার্যালয়ে মহিলা-পরিচালিত কাগজ—নাম "Noi donne".

ওখানে পৌঁছবামাত্র ডেলা সকলের আগে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে হাঁকিয়ে দিল। আমার মুখ দেখেই সে অনুমান করেছিল যে, এইবার আমি একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছি। ওর কাণ্ড-কারখানা দেখে সত্যি আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম! রোমের এই মেয়েটি আতিথেয়তায়

সত্যি আমাকে একেবারে আশ্চর্য করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ত' আর ডেলার অতিথি নই!

ডেলার সঙ্গে ওপরে উঠে দেখি—অনেক মেয়ে এই মহিলা কাগজটির সঙ্গে জড়িত। তারা সবাই আপন আপন কাজ করে যাচ্ছিল। এই কার্যালয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ডেলা আলাপ করিয়ে দিল—তার নাম ফ্লোরিয়ানা মার্টিনেটো। ফ্লোরিয়ানা ইটালীর মেয়ে হলেও চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে। অত্যন্ত আলাপী। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে আমার গল্প জমে উঠলো। ফ্লোরিয়ানা তাদের কাগজের বিশেষ সংখ্যাগুলি এনে আমায় দেখাল। একথাও জানাল যে, তাদের একজন প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই 'আন্তর্জাতিক শিশু-রক্ষা সম্মেলনে' যোগদানের জন্যে ভিয়েনা রওনা হয়ে গেছে। কথা-প্রসঙ্গে ফ্লোরিয়ানা বললে, আমাদের অফিসের একটি ভ্যান আছে,—তুমি যদি রোম শহর দেখতে চাও তবে আমি তোমাকে নিয়ে এক্ষুণি বেরোতে রাজী আছি।

আমাদের দেশে কথায় বলে,—পাগ্‌লা, ভাত খাবি? না, আঁচাব কোথায়? আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। এমন সুযোগ হাতে পেয়ে কে ছাড়ে? তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলাম। আমরা "Noi donne" পত্রিকার ভ্যানে চেপে রওনা হলাম—রোম পরিক্রমায়।

বিরাট ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে এই রোম শহরের। কথিত আছে, সাত পাহাড়ের শিখরের ওপর রোম শহর দাঁড়িয়ে আছে। শিল্প-সম্ভারে রোম শহর পরিপূর্ণ। কোনো বিদেশী রোম শহরে গিয়ে হাজির হলে একেবারে তালকাণা হয়ে যায়। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আগে দেখ্‌বে? এক ঔদরিক ব্রাহ্মণের সামনে প্রচুর খাদ্য-সম্ভার এনে ধরলে তার যে অবস্থা হয়—বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষেও রোম তেমনি লোভনীয় আর আকর্ষণের স্থান।

সেদিন বিকেলে ফ্লোরিয়ানার সঙ্গে আমি যে জায়গাগুলি দেখলাম—তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দিচ্ছি ঃ—

(১) সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার—চমৎকার জায়গা। সামনে বিরাট চত্বর—মাঝে বড় বড় ফোয়ারা সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আসলে এটা হচ্ছে ধর্মস্থান, গির্জা। সৌধ-গাত্রে অসংখ্য মূর্তি স্থাপতা-শিল্পের অনুপম নিদর্শন; দেখলে শিল্পী-মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। সেন্ট পিটারের ভেতরে খ্রীষ্টানরা নিজ নিজ দোষ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করে। নবীন রোমের তরুণ-তরুণীরা গির্জায় বিশ্বাসী নয়। ফ্লোরিয়ানার সঙ্গে আলাপ করেই সেকথা বেশ বুঝতে পারলাম।

(২) জিয়ানিকোলো (Jianicolo)—রোমের সাতটি পর্বতের অন্যতম। এখানে দাঁড়ালে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে চোখে পড়ে।

(৩) গ্যারিবল্ডি ও এ্যানিটার বিরাট প্রস্তর-মূর্তি—ভারতের ছেলে-মেয়েদের কাছে গ্যারিবল্ডি ও এ্যানিটার নাম বিশেষভাবে পরিচিত। আমি নিজেও এ্যানিটার জীবনী 'শিশুসাথী'র পাতায় লিখেছি অনেক দিন আগে। স্থাপত্য-শিল্প হিসেবে মূর্তি দুটি মনে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে।

(৪) গ্যারিবল্ডির সেনাপতিদের মূর্তিসমূহ—এই স্থানটিও অতি মনোরম এবং মূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য। তৃণাচ্ছাদিত নির্জন স্থান অতি চিত্তাকর্ষক এবং মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। এখানকার সবুজ পরিবেশ ও চতুর্দিকের রাজ্যগুলি সত্যি সুন্দর।

(৫) ধর্মের প্রচণ্ড শাসনকালে পোপের অধীনে যে বিরাট প্রাসাদ ও চার্চগুলি ছিল—তার আকার ও সৌন্দর্য আপনা থেকেই বিস্ময় জাগিয়ে তোলে।

(৬) ক্যাম্পিডোজিলো (Campidojlio)—৭টি পাহাড়ের অন্যতম। এখানেও বহু উল্লেখযোগ্য মূর্তি আছে। Costore, Polluce ইত্যাদি। প্রাচীন রোমের রাজনৈতিক চেতনা এইখানেই প্রথম জাগ্রত হয়। Costantino এখানে সর্বপ্রথম খৃষ্টান রাজত্বের সূচনা করেন। তাঁর বিরাট স্মৃতি তোরণ রয়েছে এইখানে।

(৭) কলোসিয়াল থিয়েটার—প্রাচীন যুগের রোমান সম্রাটরা এইখানে ক্রীতদাসদের সিংহের মুখে ছেড়ে দিত এবং হাজার হাজার দর্শক নিয়ে বসে পৈশাচিক উল্লাসে উপভোগ করত—কিভাবে সেই হতভাগ্য ক্রীতদাসেরা ক্ষুধার্ত সিংহদের মুখে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়! বর্তমান পৃথিবীর বহু পর্যটক এসে স্থানটির ছবি তুলে নিয়ে যায়।

(৮) দান্তের গৃহ—রোম শহরে কবি দান্তে যেখানে বাস করতেন এখনো সে গৃহটি দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ীর সামনে ফলক দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

(৯) টাসোর বিখ্যাত ওক বৃক্ষ।

(১০) Penteon (প্রাচীন যুগের পেগানদের ধর্মমন্দির)—জগদ্বিখ্যাত শিল্পী রাফেলকে এই প্যান্টেন টেম্পলে সমাধি দেওয়া হয়—

(১১) রোমের একমাত্র নদী—টাইবার।

(১২) জুলিয়াস সিজারের বিরাট মূর্তি।

(১৩) রোমো ও রোমালো দুটি ভাই একটি নেকড়ের কাছে মানুষ হয়েছিল বলে প্রতীক হিসেবে একটি নেকড়েকে এখন খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। বহু ছেলে-মেয়ে দেখতে যায় ও খাঁচার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত স্থানগুলি দেখবার পরও ফ্লোরিয়ানার সঙ্গে গাড়ী করে রোমের ভেতর দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। যত দেখি, আঁশ যেন আর মেটে না। রোমের আর্ট-গ্যালারী পৃথিবী-বিখ্যাত। কিন্তু সেখানে

যাবার আর সময় ছিল না। কারণ বেলা চারটের মধ্যে আর্ট-গ্যালারী বন্ধ হয়ে যায়। তাই মনে মনে স্থির করে রাখ্‌লাম—ফিরতি পথে সেটি দেখতে হবে।

ফ্লোরিয়ানা প্রস্তাব করল, চল, তোমায় ইটালীর সিনেমা দেখিয়ে দিই। কিন্তু দুটি কারণে সম্মত হলাম না। প্রথম, দেখতে গেলে কিছুতেই টিকিটের দাম নিতে চাইবে না—নিজেই দিয়ে দেবে। দ্বিতীয়—সারাদিন ঘুরে ঘুরে শরীরটা সত্যি ক্লান্ত লাগছিল। সেই সকালবেলা বিমান থেকে নামার পর থেকেই যে বিরামবিহীন অভিযান সুরু করেছি—তার ফাঁকে এতটুকু বিশ্রাম হয় নি।

জবাব দিলাম, ইটালীর সিনেমা দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হতাম, কিন্তু এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

ফ্লোরিয়ানার আদেশে গাড়ী ঘুরে এল আবার তাদের পত্রিকার কার্যালয়ে।

আমাদের সঙ্গে ইটালীর একজন সমাজসেবী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনিও রোম দেখার সময় নানারকম ঐতিহাসিক গল্প বলে আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

কার্যালয়ে বসে মহিলা-কাগজটি সম্পর্কে অনেক কিছু খবর শোনা গেল। ফ্লোরিয়ানা আমাদের "সব পেয়েছির আসর" সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করায় আমাদের ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলা, ব্যায়াম, পৌষ-পার্বণ উৎসব প্রভৃতির অনেকগুলি ফটো দেখালাম। ভারতীয় মেয়েদের শাড়ী পরার নমুনা দেখে ফ্লোরিয়ানা খুব কৌতুকবোধ করল এবং বেশ মনোযোগের সঙ্গে ছবিগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার সময় আমার ছিল না। সন্ধ্যের মুখে ভিয়েনাগামী গাড়ীতে গিয়ে স্থান সংগ্রহ করতে হবে। ওখানে খোঁজ নিয়ে জান্‌তে পারলাম যে, এই বিশেষ গাড়ীটিতে বেশ ভীড় হয়।

ফ্লোরিয়ানাকে আমাদের আসরের দু একটি ছবি দেওয়া আমার উচিত ছিল। কিন্তু ভিয়েনাতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের দেখাতে হবে বলে আমি একটি ছবিও হাতছাড়া করতে পারলাম না। সেজন্য মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল।

এইবার দুই সাংবাদিক বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। ডেলা ভিচিয়া আর ফ্লোরিয়ানা মার্টিনেটো। অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, তোমাদের দুই বান্ধবীর প্রীতির কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। ভারতের ছেলে-মেয়েদের কাছে তোমাদের আতিথ্য ও সৌজন্যের কথা জানিয়ে বলব, ভারতের সঙ্গে ইটালীর মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হোক।

ওরা করমর্দন করে আমায় বিদায় দিল। ওদের অফিসের ভ্যান আমায় স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেই সমাজসেবী ভদ্রলোকটি নিজ হাতে আমার সুটকেশ বয়ে ট্রেনে পৌঁছে দিলেন। ওদের আন্তরিকতায় আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। বিদেশীকে ওরা কত সহজে আপনার করে নিতে পারে।

সময়মত স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম বলে—কোনমতে জায়গা করে নিতে পারলাম। ফ্লোরিয়ানা সত্যি কথাই বলেছে,—এই ট্রেনটিতে খুব ভীড়। শুধু ইউরোপেই নয়—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভিয়েনা একটি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যকর স্থান। বহু জায়গা থেকে দলে দলে নর-নারী এই সময় ভিয়েনার দিকে ছোটে। অস্ত্র-চিকিৎসায়ও ভিয়েনার জগৎ-জোড়া খ্যাতি আছে। আমাদের ভারতবর্ষ থেকেও বহু ধনী ভিয়েনাতে যায় দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করাতে।

আমি যে কামরায় স্থান পেয়েছিলাম—সেখানে আমার পাশেই একটি বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি ইংরেজী বলতে পারেন কিনা। প্রত্যুত্তরে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। মহিলাটির নানা বই পড়বার খুব আগ্রহ। যৌবনে এই আগ্রহের বশেই তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। সঙ্গে তাঁর দুটি বান্ধবী আছেন। এঁদের নিয়ে তিনি নিজের বাড়ীতে যাচ্ছেন। আমি বিদেশী এবং সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আসছি শুনে বিশেষ আগ্রহে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন।

আমরা যে ট্রেনে চলেছি তাকে বেশ সুন্দর ও আরামপ্রদ বলে অভিহিত করা চলে। পাশাপাশি দু'জন করে বসতে পারে। বসবার ব্যাপার স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। For Ladies only কথাটা এদেশে একেবারে হাস্যকর। পুরু গদীর ওপর মখমলের মতো আরামপ্রদ আসন, ওপরে সুটকেশ ইত্যাদি রাখবার বাঙ্ক, ভাঁজকরা টেবিল, তার ওপর খাবার রেখে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া সম্পন্ন করতে পারা যায়,—কাছাকাছি সুন্দর ও পরিপাটি 'টয়লেট', কিছুরই অভাব নেই এই ট্রেনে। যাত্রীরা অতি সহজেই পরস্পরের সঙ্গে আলাপ জমাতে উৎসুক। একটু আগ্রহ থাকলেই হল।

বৃদ্ধা অষ্ট্রিয়ান মহিলাটির নাম—ফ্র্যান রোজ হুজের। কিন্তু আমি তাঁকে অষ্ট্রিয়ার মাসিমা বলেই উল্লেখ করবো। কারণ সারাটা রাস্তা তিনি আমাকে মায়ের স্নেহে আগলে রেখেছেন এবং সকল রকমের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

আমরা এখন ইটালীর গ্রামাঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলেছি। দুধারে যতদূর দৃষ্টি যায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি।

হঠাৎ একটা স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম— দলে দলে ছেলে-মেয়েরা নেমে খাবারওয়ালাদের ঘিরে বিষম ভীড় লেগে গেছে।

অষ্ট্রিয়ার মাসিমা আমাকে সচেতন করে দিয়ে বললেন, বাছা এইখান থেকে রাত্তিরের খাবার কিনে নাও। নইলে পরে বিপদে পড়বে।

আমি জিজ্ঞেস্ করলাম, কি খাবার, কি তার নাম, কিছুই ত' জানিনে।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, হুঁ! বুঝেছি। আমার হাতে কিছু পয়সা দাও ত'।

ওভারকোটের পকেটে ছিল—ইটালী দেশের নোট লিরা। কিছু তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গেলেন এবং ভীড় ঠেলে খাবার কিনে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলেন। বললেন, এইবারে ধর দেখি—

চেয়ে দেখি স্যাণ্ডুইচ, নানারকম কেক আর দিব্যি পুরুষ্ট কলা। খাবারের নমুনা দেখে মন সত্যি উল্লসিত হয়ে উঠল। ওদেশের স্যাণ্ডুইচ কিন্তু আমাদের মতো নয়। মোটা পাউরুটি, তার মাঝখানে দিব্যি মাংসের স্তর। খেতে সুস্বাদু সে কথা বলাই বাহুল্য। সবাই এই বস্তুটি বেশ আনন্দ করে খাচ্ছে। কলাও খুব মিষ্টি আর মুখরোচক। আমাদের দেশের কলার চাইতে আকারে ও ওজনে বড়।

মাসিমার মত বুড়ী মানুষকে খাটিয়ে নিলাম বলে সত্যি লজ্জা অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মাসিমার মুখচোখের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তিনি যেন তাঁর কর্তব্য পালন করলেন। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে খাবারগুলি গ্রহণ করলাম। তিনি বাকি পয়সা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগলেন।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অষ্ট্রিয়ার মাসিমার সঙ্গে আলাপ আরো ঘরোয়া এবং আন্তরিক হয়ে উঠল। আমি বললাম, দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে এই স্নেহশীলা মাসিমার কথা আমি গল্প করব। তাতে তিনি ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসতে লাগলেন। বোধ করি খুব ভালো লাগল কথাটা। কিন্তু পরক্ষণেই গলাটা খাটো করে উত্তর দিলেন, আমার মধ্যে এমন আর কি আছে যে, ঘটা করে গল্প করতে হবে? অতি সাধারণ মানুষ আমি। আমিই বা রসিকতা করতে ছাড়বো কেন? বললাম, অতি সাধারণের মধ্যেই ত' অনন্যসাধারণ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের মনটাই হচ্ছে আসল। হয়ত একথা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না, তাই চুপ করে রইলেন।

মাসিমার সঙ্গে অনেক পত্র-পত্রিকা ছিল। মাঝে মাঝে তাও দেখ্‌তে লাগলাম। অধিকাংশ কাগজই জার্মান ভাষায় ছাপানো। তাই ছবি দেখা ছাড়া—পড়বার আর যো ছিল না।

অষ্ট্রিয়ার মাসিমা তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে আমার নোট বইয়ে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা লিখে দিলেন। আমিও লিখে দিলাম আমার ঠিকানা তাঁর খাতার পাতায়।

ইতিমধ্যে ট্রেনের "রেস্তোরাঁ কারে" যাঁরা নৈশ-ভোজন সমাপন করবেন—তাঁরা নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন সেই দিকে। যাঁরা অত্যন্ত ভোজনবিলাসী কিংবা বড়লোক তাঁদেরকেই কেবলমাত্র "রেস্তোরাঁ কারে" গিয়ে ডিনার খেতে দেখা গেল। নতুবা অধিকাংশ যাত্রী নিজ নিজ কামরায় বসে সঙ্গে আনা খাবার খেয়েই নৈশ-ভোজন সমাপন করলেন। লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম, এর ভেতর দিয়ে বেশ একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠল বিভিন্ন যাত্রীর মধ্যে।

গল্প-গুজব আর মাঝে মাঝে বই পড়ার ভেতর দিয়ে ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে

এলো। এরই মধ্যে অনেকে ঘুমের আয়োজন করে নিয়েছেন। কেউ কেউ দিব্যি ঘুমিয়েও পড়েছেন।

দুটি ফুটফুটে চমৎকার সুন্দরী মেয়ে হঠাৎ আমাদের কামরায় এসে হাজির হল। তাদের চোখে মুখে সরল হাসি আর অনাবিল চঞ্চলতা। কিন্তু দুটি আসন খালি ছিল না আমাদের কামরায়। কাজেই একটি মেয়ে বসবার জায়গা পেল, আর একজন চলে গেল অন্য ঘরে। তাদের সঙ্গের মাল তারা আমাদের ঘরেই রেখে গেল। দুটি মেয়ের মধ্যে ভারী ভাব। এরাও ভিয়েনা যাবে। একজন এ ঘরে, আর একজন পাশের ঘরে এই ব্যবস্থা বোধ করি ওদের আদপেই ভালো লাগল না। তাই খানিক্ষণ বাদে এসে অন্য মেয়েটি এই ঘরের মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেল। সুটকেশ ইত্যাদিও বয়ে নিয়ে গেল নিজেরাই ধরাধরি করে। ইউরোপে একটি জিনিস লক্ষ্য করছি যে, সবাই স্বাবলম্বী। ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক—নিজের মালপত্র নিজেই বহন করে নিয়ে যায়। এ জন্য কেউ বড় একটা কুলিকে ডাকে না। মহিলা পর্যন্ত নিজ নিজ জিনিসপত্র সানন্দে বয়ে নিয়ে চলেছে। গরীব-বড়লোকের বালাই নেই। এই যে স্বাবলম্বনের রীতি—বাইরে থেকে গিয়ে এই ব্যবস্থাটা সত্যি ভালো লাগে এবং সত্যিকারের শিক্ষণীয় বলে মনে হয়। আমাদের দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সুটকেশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। একটু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা পর্যন্ত নিজের সুটকেশ হাতে তুলে নিতে লজ্জা বোধ করে—সেজন্যে ডাক পড়ে কুলির। বিদ্যাসাগরের সেই কুলি সাজার গল্পটি ত' আমাদের দেশে অমর হয়ে আছে!

ইউরোপের যে তিনটি দেশে আমি ঘুরেছি—ইটালী, অষ্ট্রিয়া, আর সুইজারল্যাণ্ড—সর্বত্রই এই স্বাবলম্বী হবার প্রথাই আমার মনকে আকর্ষণ করেছে। নিজের মাল নিজে বইবার জন্যেই প্রত্যেকে খুব কম জিনিস নিয়ে পথে-ঘাটে চলাফেরা করে। যা নেহাত না হলে চলবে না—শুধু সেই সমস্ত জিনিসই সঙ্গে থাকে। বাড়তি বস্তু একটিও না।

অবশ্য ইউরোপ ভ্রমণের একটা প্রকাণ্ড সুবিধে আছে। প্রত্যেক হোটেলেই—বিছানাপত্তরের এমন সুব্যবস্থা যে, শুধু পরিধেয় পোষাক নিলেই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি মহা আরামে ভ্রমণ করা চলে।

কিন্তু আমাদের দেশে কল্‌কাতা থেকে ঘাটশীলা যেতে হলেই বাক্স, ড্যাক্স, ট্রাঙ্ক, তোষক, সতরঞ্চি, কম্বল, বালিশ, লোটা, থালা, কড়াই, উনুন, ধামা, কুলো সব কিছু গুছিয়ে জবরজঙ্গ সেজে রওনা হতে হবে। এতে ভ্রমণের আনন্দ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। ওদেশে সুটকেশটি নাও, আর বেরিয়ে পড়। ভোজনং যত্র তত্র— শয়নং হট্ট-মন্দিরে অবশ্য নয়—কিন্তু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সর্বত্র

এমন পরিপাটি যে, সেজন্য কেউ বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। ভাল এবং আরামদায়ক ব্যবস্থা পাওয়া যাবে— এ ত' জানা কথা। শুধু অর্থের তারতম্যে আরামের উনিশ-বিশ। ইউরোপে কোথাও খাদ্যে ভেজাল নেই। কাজেই খাবার খেয়ে অসুখ করবে—একথা কারো মনে জাগে না। মানুষের খাদ্যে যারা ভেজাল মেশায়, তারা দেশকে অতি সহজেই রসাতলে পাঠিয়ে দিতে পারে। দেশের এত বড় শত্রু ইউরোপে খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে ঠক্ বাছতে গাঁ উজাড়! মরুক না লোক,—বেড়ে যাক না শিশু-মৃত্যুর হার···আমি নিজে আটার সঙ্গে পাথর, চালের সঙ্গে কাঁকর আর ছেলেদের দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে পয়সা কামিয়ে নিই না। কিসের ভয়? অথচ ধর্ম ও পরকালের অনুশাসন আমাদের দেশেই অধিক। ওদেশে নাস্তিকের সংখ্যা বেশী, কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন এবং আগ্রহশীল। পরশুরামের সেই মজার কথাটা মনে পড়ে—। সেই খাদ্যে ভেজাল মেশানো সম্পর্কে যে কথাটি অমর হয়ে আছে। "পাপ হোবে ত' কাসেম আলির হোবে। হামি না আঁখসে দেখি—না নাকসে শুঁকি।" মানুষের খাদ্য সম্পর্কে ভাবের ঘরে চুরি ইউরোপে কোথাও নেই!

হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। মেয়েদের নিজের মাল-পত্তর বয়ে নিয়ে যাওয়া দেখে যে কথাগুলি মনে হচ্ছিল—তাই বলতে গিয়ে একটু দূরে চলে গিয়েছিলাম।

এই স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারটা বিদ্যাসাগর মশাই কত বছর আগে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—তবু আমাদের চেতনা নেই!

চোখ বুজে নিজের দেশের সঙ্গে ওদের কর্মশক্তির তুলনা করছিলাম—আর মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম।

এটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা বটে, রাত্তিরে শুয়ে থাকার কিন্তু ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আবার আলাদা ভাড়া দিয়ে আসন চিহ্নিত করে রাখতে হয়। খুব বড়লোক না হলে সহসা সে ব্যবস্থা কেউ করতে যায় না।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, অনেকেই নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। অষ্ট্রিয়ার মাসিমাও গুড়িসুড়ি মেরে তাঁর আর দুই বান্ধবীর মাঝখানে জায়গা করে নিয়েছেন। আমাদের গাড়ীতে কোন ছেলে-পিলে ছিল না। থাকলে তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা হত সেটা ভালো করে বলতে পারব না।

এক একটা স্টেশনে ট্রেন থামছে, যাত্রীদল উঠে আসছে কিন্তু কোনো কামরায় স্থান নেই দেখলে আর সেখানে ঢুকে অকারণ ভীড় বাড়াচ্ছে না। ট্রেনটাতে রয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টানা বারান্দা—যাকে করিডোর বলা হয়। যারা

বসবার স্থান পাচ্ছে না—সেইরকম মেয়ে-পুরুষ বিনা দ্বিধায় 'করিডোরে' দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে আসছে। এ জন্যে মেয়ে কিংবা পুরুষ কারোই কোনো অভিযোগ নেই। কিংবা ভেতরের পুরুষরা নিজেরা দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েদেরও জায়গা করে দিচ্ছে না। প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্বে পথের কষ্ট সহ্য করছে—নারী—নারী বলেই কারো কাছ থেকে উপরি সুযোগ-সুবিধে আদায়ের জন্য বিন্দুমাত্র সচেষ্ট নয়। আমাদের দেশের ট্রেনগুলিতে 'বিশজন বসিবেক' এর জায়গায় যেমন প্রয়োজনবোধে ৫০ জনও ঠেলে ঠুলে উঠে, কারো ঘাড়ে ট্রাঙ্ক এবং কারো কোলে বিছানা ফেলে দিয়ে জায়গা করে নেয়—এখানে তেমন কোনো হুটোপাটি কিংবা 'জবরদখলের' পালা নেই। স্থান ভর্তি হয়ে যাবার পর যে যাত্রী ট্রেনে উঠেছে সে নির্বিবাদের 'করিডোরে' দাঁড়িয়ে যাবে এইটেই স্বাভাবিক চলিত নিয়ম।

এমনও দেখলাম, বহু তরুণ-তরুণী সারারাত করিডোরে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে, কিন্তু ভেতরে এসে বসবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নি। অথচ রাত্রিরে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। বরফ জমেছে বাইরে।

গাড়ীর মৃদু ঝাঁকুনিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানতেও পারি নি। ঘুম পেলে যাত্রীরা নিজেরাই কামরার সবগুলি আলো একেবারে নিভিয়ে দেয়। তখন একান্ত মনে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় আর কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

আমাদেরও কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি।

ভোরের স্নিগ্ধ আলো আর ফুরফুরে হাওয়া আলতো করে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল।

তারপরই প্রথম যে বস্তুটির প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে 'টয়লেট্'। 'বাথরুম' কিংবা 'ল্যাভেটরী' বললে ইউরোপে কেউ বুঝতে পারবে না। 'টয়লেট্' নামটি সর্বত্র প্রচলিত। মুখ ধোয়া থেকে সুরু করে প্রসাধন পর্যন্ত সমস্ত প্রাতঃকৃত্য ওই একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সম্পন্ন হয় বলেই বোধ করি এই মধুর নামকরণ করা হয়েছে।

অবশ্য আমাদের গাড়ীতে দেখলাম, অনেকেই মুখ না ধুয়েই নিজেদের সঙ্গের খাবার সকালবেলা দিব্যি খেয়ে যাচ্ছে। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই স্বাস্থ্যকর কিংবা রুচিসম্মত বলে মনে হল না। কাজেই 'টয়লেটের' সন্ধানে বেরতে হল।

সেখানে অপ্রত্যাশিত রূপে আলাপ হল ভিয়েনার এক অধ্যাপকের সঙ্গে। তিনি নিজে থেকেই এসে পরিচয় করলেন এবং একথাও আনন্দের সঙ্গে আমাকে জানালেন যে, তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছেন। চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন ভদ্রলোক। এই রকম একটি আলাপী লোকের সন্ধান পেয়ে আমিও বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আমার অতিথি হিসেবে আর দু'টি মেয়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গেও আপনার পরিচয় করিয়ে দিই—

দুটি হাস্য-মুখরা মেয়েকে দু'হাত দিয়ে ধরে টানতে টানতে এনে হাজির করলেন প্রফেসর। তাকিয়ে দেখি, কালকে রাত্রে যে দু'টি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে আমাদের কামরায় প্রথম গিয়েছিল—তারপর স্থান পরিবর্তন করে নিয়েছিল—এরা তারাই।

বললাম যে, ওদের দু'টিকেই কালরাত্রে আমাদের কামরায় দেখেছি, কিন্তু পরিচয় হয় নি।

প্রফেসর খুব আনন্দের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজনের নাম 'রুথ' আর একজনের নাম 'ফেলিসিটাস'। দু'টি মেয়েই কথায়-বার্তায়, আনন্দে-কৌতুকে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে। কিন্তু এরা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে আসে নি। আমাদের দেশ সম্পর্কে ওদের দু'জনেরই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের বিষয়ে মজার মজার সব প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন 'সব পেয়েছির আসরে'র ফটোগুলি এনে ওদের দেখালাম। ওরা যেন সাত রাজার ধন মাণিক খুঁজে পেল। ছবি দেখে প্রশ্নের পরিমাণ আরো গেল বেড়ে। কত প্রশ্নের জবাব দেব আমি? ওরা বললে, ভারতবর্ষ দেখবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু জীবনে হবে কিনা সন্দেহ। প্রফেসরের ইঙ্গিতে মেয়ে দু'টি ওদের সঙ্গের ফল বের করে আমায় খেতে দিল। খেতে খেতে হাসি-পরিহাসের ভেতর দিয়ে চলল—নানারকম আলোচনা আর গল্প।

ওদের দু'জনের ফটো আমাকে উপহার দিল। আর আমার ঠিকানা লিখে নিলেন প্রফেসর ভদ্রলোক। ভারতের মেয়েদের শাড়ী পরার ধরন দেখে ওদেশের মেয়েদের কি দারুণ কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। মনে হয় কোনো নামকরা ব্যবসায়ী যদি ওদেশে শাড়ী পরানোর কায়দা মেয়েদের দিয়ে হাতে-কলমে চালু করে (Demonstration) নানা ধরনের শাড়ীর কারবার করে তবে বড়লোক হয়ে যেতে বেশী বিলম্ব হবে না।

রুথ আর ফেলিসিটাস কিন্তু চুপ করে বসে নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঢেউ আসছে তাদের কাছ থেকে।

—ভারতবর্ষের নদীগুলি বুঝি খুব বড়ো? তাজমহল দেখতে কেমন? ভারতীয় শিল্প আর নৃত্য .... বলুন না সে সম্পর্কে কিছু।

হঠাৎ ট্রেন থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখি ইটালীর আলো-ঝলমল পূবাকাশ, যেন এক বিদেশী অভিযাত্রীর কাছে তার সোনালী আখরে লেখা আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে দিয়েছে। এতো ভালো লাগল সকালবেলাকার ইটালীর অফুরন্ত সৌন্দর্য।

আমার নতুন পাওয়া প্রফেসর বন্ধু, রুথ ও ফেলিসিটাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে টানা-বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সত্যি সেই সকালবেলা মন হরণ করে নিল—ইটালী দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দূরে দীর্ঘ পাহাড়-শ্রেণী—তার শিখরে শিখরে বরফ জমে এক নয়ন-বিমোহন শোভার সৃষ্টি করেছে। সামনে সবুজে ঢাকা ঢেউ-খেলানো উঁচু-নীচু উপত্যকা। ওদেশের কৃষাণ মেয়েরা দল বেঁধে চলেছে ক্ষেতের কাজ করতে .... কণ্ঠে তাদের সুমিষ্ট পল্লী-সঙ্গীত। এক কলি কানে আসতেই ট্রেন দ্রুতবেগে তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সুরটা যেন আমার কাছে অজান্তে গচ্ছিত রেখে গেল।

মাঝে মাঝে সন্ধান পাওয়া গেল পাহাড় ও উপত্যকার লুকোচুরি খেলা। কখন ছুটে ট্রেনের কাছে এসে উৎসুক মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, কেমন লাগল? আবার কখন দুরন্ত মেয়ের মতো বেণী দুলিয়ে—ছুটে চলে যাচ্ছে দূরে দূরে—যেখানে দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মাটির কানাকানি কথা।

হঠাৎ ট্রেনটি হয়ত একটা সুড়ঙ্গ-পথে (টানেলে) ঢুকে গেল। চারদিক একেবারে অন্ধকার। ইটালীর প্রকৃতিরাণী দুষ্টুমি করে চোখ টিপে ধরেছেন বুঝি? মনে হয় এমনি মজার ব্যাপার?

উপত্যকাগুলি একেবারে সবুজে সবুজে চেয়ে আছে। চমৎকার টলটলে নীল জলের হ্রদ—তারি পাশে হয়ত সুন্দর কয়েকটি হোটেল। মনে হয় সব ফেলে দিয়ে ঐখানে গিয়ে ডেরা বাঁধি। অবাক হয়ে দেখলাম, অনেক জায়গায় সবুজ উপত্যকার ওপরেই রাশি রাশি পেঁজা তুলোর মত নরম তুষার জমে রয়েছে। এত হাল্‌কা আর এত ধবধবে যে স্পর্শ করছে ইচ্ছা করে।

ট্রেনে চলতে চলতে কোনো কোনো শহরকে অবিকল দার্জিলিং বলে মনে হয়। তেমনি উঁচু-নীচু রাস্তা। ঢেউ খেলানো পথের দু'ধারে সাজানো-গোছানো ছোট বাড়ী। চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া উঠ্‌ছে। রাস্তা দিয়ে মোটর চলাচল করছে, মাঠে ছেলের দল খেলা করছে। মেয়েরা ছাদে রঙীন জামা ইত্যাদি রোদ্দুরে শুকুতে দিচ্ছে। ট্রেন দেখে হয়ত খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

ঝরনা দেখতে চাও? তাও প্রচুর মিলবে এই পথে। একবারে ট্রেনের কাছাকাছি—পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আস্‌ছে মাটি-মায়ের স্নিগ্ধ স্তন্যধারা। শুধু দু'চোখ মেলে দেখো—আশ মিট্‌বে না। মনে হবে—আঁজলা পুরে নিয়ে চোখে দি—পান করি প্রাণভরে।

ওদেশের গাছগুলির ধরন বেশ।

এমন এক-একটি ভঙ্গী করে উঠ্‌ছে যে মনে হবে—খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে যাই ছবি আঁক্‌তে। আমাদের আসরের যেসব ছেলেমেয়ে ছবি আঁক্‌তে পার—তারা আমার কথা খানিকটা আন্দাজে বুঝে নিতে পারবে।

সময় চলে যাচ্ছে—শরতের মেঘের মতো হালকা হাওয়ার ভেলায় চড়ে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে যে সব কিছু ভুলে থাকা যায়, সেইদিন কিছুটা টের পেয়েছিলাম।

চমক ভাঙল অষ্ট্রিয়ার মাসিমার কণ্ঠস্বরে।

তিনি বল্লেন, এক্ষুণি যে স্টেশন আসছে তার নাম হচ্ছে অর্নল্ড-স্টেইন—এটা অষ্ট্রিয়া দেশের প্রথম স্টেশন। এইখানেই তোমাকে ইটালী দেশের নোট লিরা বদলে অষ্ট্রিয়া দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করে নিতে হবে।

মাসিমার কথা কথা শুনে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। সত্যাই ত'। একেবারে বাস্তবকে ভুলে প্রকৃতির পূজো করলে ত' চলবে না। পথ চলতে গিয়ে যেগুলো নেহাত দরকারী কাজ, তা চট্‌পট্ সেরে ফেলতে না পারলে বিপদ আমারই।

ট্রেন এসে থামতে প্রথমেই 'পাসপোর্ট' ও 'ভিসা' পরীক্ষার ধুম্ পড়ে গেল। রোম শহরে আমার ত' অষ্ট্রিয়ান্ ভিসা নেওয়াই ছিল। তাই ভাবনার কিছু ছিল না। সেখানে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তৈরী হলাম মুদ্রা বিনিময় করবার জন্যে। মাসিমা প্ল্যাটফর্মের ওপরেই একটি জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওইটেই হচ্ছে এক্সচেঞ্জের অফিস। ইংরেজী জানা লোক ওখানে মিলবে। কোনো ভয় নেই—সোজা চলে যাও। গাড়ী এখানে বেশ খানিকক্ষণ থাক্‌বে।

আশ্বাস পেয়ে নেমে গেলাম প্ল্যাটফর্মে। বলা বাহুল্য, সাইনবোর্ড সব জার্মান ভাষায় লেখা। সোজা জানলার কাছে গিয়ে ইংরেজীতে নিজের দরকারের কথা বললাম। জবাব এলো ভাঙা ভাঙা ইংরেজীর টুক্‌রো কথায়। যাক্ ব্যাপারটা বুঝলেই আমার কাজ হবে। খুব তাড়াতাড়ি আমার প্রয়োজন মিটে গেল।

অষ্ট্রিয়া দেশে মুদ্রা পেয়ে প্রয়োজনমতো কিছু খাদ্য কিনে নেওয়া গেল। এইবার একটু সাহস বেড়েছে··· আর ওদেশের নামও দু'একটা বল্‌তে পারলাম। এবার খাবার কিনলাম—দোকানে। একটি খাবারের দোকানের কাউন্টারের ভেতর ঢুকে গিয়েছিলাম। বিদেশী বলেই হয়ত আপত্তি করল না। যে খাবারগুলো পছন্দমত মনে হল, হাত দিয়ে দেখিয়েও দিলাম। এ অঞ্চলে মেয়েরাই সব খাবার বিক্রি করে থাকে এবং যত্ন করে প্যাক করে দেয়।

সারাটা দিন ট্রেনে থাকতে হবে এবং অনেক রাত্রিতেভিয়েনায় নামিয়ে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল—সেই কথাই বল্‌ছি।

ইউরোপ ত' শীতের দেশ—তার ওপর সারাদিন ট্রেনে বসে থেকে থেকে শরীরটা যেন ঝিমিয়ে এসেছিল। মনে হল এই সময় যদি এক কাপ গরম চা পাওয়া যায় ত' বেশ হয়। ট্রেনের লম্বা বারান্দা দিয়ে গাড়ীর যে-কোন কামরায় যাওয়া চলে। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাজির হলাম গিয়ে রেস্তোরাঁ-কারে।

দোকানের লোকদের যত চায়ের কথা বলি—কেউ বুঝতে পারে না—কেবল পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গোটা ইউরোপে চা খাওয়ার প্রচলন নেই। সবাই খায় কফি। তা-ও এক কাপ—দু'কাপ নয়। যখন আসর জমে ওঠে, কাপের পর কাপ কফি চলতে থাকে। ভারতবর্ষে আর ইংলণ্ডেই চায়ের প্রচলন বেশী। এ হেন জায়গার রেস্তোরাঁয় গিয়ে যখন আমি চায়ের কথা তুললাম—তখন সেখানকার লোকেরা এমন মুখের ভাব করল যেন আমি মঙ্গল গ্রহের কোনো খাবার চেয়েছি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম অষ্ট্রিয়ার মাসিমার কাছে। তাঁকে বললাম, জার্মান ভাষায় লিখে দিন ত' চায়ের নাম একটা কাগজে। তিনি ত' হেসেই আকুল। বল্লেন, রেস্তোরাঁর লোকেরা বুঝতে পারে নি বুঝি কথা? কিন্তু কি চা চাই? র'টি, না দুধ দিয়ে?

আমি জবাব দিলাম, দুধ আর চিনি মিশিয়ে বেশ আমেজ করে এক কাপ গরম চা খেতে চাই। সেই কথাই আপনাদের ভাষায় বেশ ফলাও করে লিখে দিন। আমি ত' ওদের বোঝাতে গিয়ে হিম্‌সিম্ হয়ে গেছি।

মাসিমার লেখা চিরকুটখানি নিয়ে যখন দেখালাম—তখন ওরা মাথা নাড়তে লাগল। আমায় খাতির করে বসাল। জিজ্ঞেস করল, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি কিনা। ওদের ধারণা, ভারতবর্ষের লোকেরাই নাকি খুব চা খায়।

যাই হোক খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বেশ দামী সেটে চা এলো। লিকার, চা, দুধ, চিনির কেক সব বিভিন্ন পাত্রে রাখা। চা ঢাল্‌বো কি, টি-সেট্‌ই তাকিয়ে দেখবার মতো। যেন কোনো লর্ড চায়ের অর্ডার দিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, চা খেয়ে খুশী হতে পারলাম না। লিকার অতি পাত্‌লা—কোনো রকম চায়ের স্বাদ কিংবা গন্ধই পাওয়া গেল না। মিছিমিছি—ওই এক কাপ চায়ের দরুণ চার-পাঁচ টাকা বিল আদায় করে নিল। এর চাইতে আমাদের দেশের যে-কোন দোকানে অনেক ভাল চা তৈরী হয়।

যাই হোক—কফির দেশে যে চা মিলল এই ঢের। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, চা খেলে? আমি বললাম, হুঁ। কিন্তু কেমন চা পেলাম সেটা ব্যাখ্যা করে বললাম না।

রাত্রি গভীর হতে চলল, অনেকেই খাবার কিনে রাত্তিরের আহার শেষ করে ফেলল। আমিও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম।

এইবার ভিয়েনা শহর এসে যাচ্ছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ভিয়েনাতে নামবে। তাই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

ভিয়েনার দু'টি স্টেশন। একটি 'ওয়েস্ট পান্‌হো' আর একটি 'ইস্ট পান্‌হো'। অর্থাৎ পশ্চিম স্টেশন এবং পূর্ব স্টেশন। পশ্চিম স্টেশনে নেমে গেলেন—আমার পূর্ব-পরিচিত অধ্যাপক, রুথ আর ফেলিসিটাস্‌কে সঙ্গে নিয়ে। আরো

অনেকে নাম্‌লেন—অষ্ট্রিয়ার মাসিমাও। মাসিমা ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে চিঠি দিতে বললেন, এবং অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে না ভুলি। যাঁর কাছ থেকে স্নেহ পেয়েছি—তাঁকে ভোলা কি এতই সোজা? আমার মনের মণিকোঠায় দেবতার চাইতে মানুষরাই ত' অক্ষয় হয়ে আছে। মনের অলিন্দে তারা ভীড় করে এসে দাঁড়ায়···তাদের ভুলব কেমন করে?

সেই বহু প্রতীক্ষিত ভিয়েনা শহরে এসে অবশেষে গাড়ী থাম্‌ল। দলে দলে যাত্রী নেমে যেতে লাগ্‌ল। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই। আমার আশা আছে কেউ-না-কেউ স্টেশনে আমাকে নিতে আসবেন। রোম শহর থেকে সাংবাদিক বান্ধবী ডেলা ভিচিয়া "আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতি"র সম্পাদিকার কাছে টেলি করে দিয়েছে।

কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম—প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে গেল, কিন্তু প্রতীক্ষমান কেউ নেই। তবে কি আমার টেলি এঁরা পান নি?

বেশ অসুবিধে বোধ করতে লাগলাম। প্ল্যাটফর্ম যখন সত্যি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল—তখন বুঝলাম টেলিগ্রামেরই হয়ত গোলমাল হয়ে থাক্‌বে। নিজেকেই সন্ধান বের করে নিতে হবে।

একজন পুলিশকে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। সে কিছুটা ইংরেজী জানে। কাছেই তাদের হেড কোয়ার্টার। আমাকে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হল। দেখলাম, পুলিশের রাত্তিরে থাক্‌বার জন্যে ছোট ছোট সব বিছানা রয়েছে। যার যখন ডিউটি শেষ হবে—বাকি রাতটা সে এইখানে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

আমার পুলিশ সহচরটি খুব উৎসাহী। নিজেই এসে ক্রমাগত ফোন করে জানতে পারল—-ভিয়েনার মিউজিক হলে—তখনও শিশুরক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন চলছে।

আমাকে অপেক্ষা করতে বলে সে তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেল ডেকে নিয়ে এলো একটি ট্যাক্সি। আমার সুটকেশগুলি নিজেই ওতে চাপিয়ে দিল। ওদের দেশী ভাষায় ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে কোথায় যেতে হবে সব বুঝিয়ে বলল। তারপর আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো জিজ্ঞেস করল, সঙ্গে পয়সা-কড়ি আছে ত'?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। পুলিশ তখন ট্যাক্সিওয়ালাকে যেতে অনুরোধ করল।

আমি এদের ব্যবহারে সত্যি অভিভূত। ভাবতে লাগলাম, আমাদের দেশের পুলিশের কি এই দৃষ্টান্ত থেকে শেখবার কিছু নেই? মানুষের ব্যবহারই ত' মানুষকে আপনার করে তোলে।

দ্রুতবেগে ট্যাক্সি ভিয়েনার রাজপথ ধরে এগিয়ে চলল। ট্যাক্সি যখন ভিয়েনার

বিখ্যাত "মিউজিক হল"-এর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো তখন আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন চলছে।

কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন এবং আমি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি এই খবর জান্‌তে পেরে আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ট্যাক্সি-ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে মিউজিক হলের ভেতর গিয়ে ঢুক্‌লাম।

এই পৃথিবী-বিখ্যাত হলটি এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হলের বিবরণ আর অধিবেশনের কথা পরে লিখব; এখন এই অবকাশে জানিয়ে রাখি আমার ভিয়েনা পৌঁছতে দেরী হয়েছিল কেন? আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের ভারতীয় আহ্বায়ক সমিতি যখন আমার নাম প্রস্তাব করলেন—তখন তাঁদের বিশেষ অনুরোধেই আমি পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করি। বিশিষ্ট পুলিশ-কর্মচারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী এ ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং আমি যাতে তাড়াতাড়ি 'পাসপোর্ট' পেয়ে বিদেশে রওনা হতে পারি সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু কেন জানি না—পুলিশের এস-বি বিভাগ আমার কাগজপত্র আটকে রাখলেন এবং জানালেন যে অনুমতির জন্য দিল্লীতে চিঠি লিখতে হবে। গেল দিল্লীতে চিঠি...কিন্তু সেখান থেকে জবাব আর কিছুতেই আসে না। লাল ফিতের বন্ধনীতে সে যে কোথায় আটকে পড়ে রইল—তার সন্ধান করে বের করে আনবার জন্যে বিশল্যকরণী সংগ্রাহক পবন-নন্দনের হয়ত প্রয়োজন হত।

আমি পুলিশের এস-বি বিভাগকে জানালাম যে, জীবনে কোনো দিন রাজনৈতিক আবর্তে নিজেকে জড়াই নি, কেবলমাত্র সংগঠনমূলক কাজ করেছি এবং ছোটদের জন্যে পুস্তক রচনা করেছি। সুতরাং আমার পাসপোর্ট পাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি কি করে উঠতে পারে? আরও একটি বলবার কথা এই যে, আমি যে কারণে ভিয়েনা যেতে চাইছি সেটা কিশোর-কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়। ওখানে যে কোনো রকম রাজনৈতিক আলোচনা হবে না—সে আশ্বাস ইতিপূর্বেই পাওয়া গেছে। এসব বিষয় সত্ত্বেও কেন যে পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না—সেই কারণটাই আমি জান্‌তে চাই।

কিন্তু পুলিশের এস-বি বিভাগ—অতি ভদ্রলোক; সুতরাং তাঁদের এক কথা। কোন কারণও দেখাবেন না এবং পাসপোর্টও দেবেন না। ওদিক রওনা হবার দিন এগিয়ে এল। কিন্তু আমি কোনো দিক দিয়েই প্রস্তুত নই। না অর্থের দিক দিয়ে, না পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে, না পাসপোর্ট সংগ্রহের দিক থেকে। কাজেই "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"—এই শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য করে শালগ্রামের শোয়া-বসা সমান জ্ঞানে অবস্থান করতে

লাগলাম। ওদিকে সম্মেলন এসে গেল। বুঝলাম—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়। কিন্তু মাটির মানুষ ত' একেবারে ভগবান হয়ে সমস্ত চেষ্টা বন্ধ করে 'ব্যোমভোলা' স্বরূপ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

হঠাৎ খেয়াল গেল—তাই ত। কলকাতার ভূতপূর্ব চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর. গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী। তিনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। যুগান্তর কার্যালয় থেকে ফোন করে সব কথা জানালাম তাঁকে। বললাম একজন সাহিত্যককে পাসপোর্ট না দেবার কি কারণ থাকতে পারে?

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন শ্রীযুক্ত গুপ্ত আমার কাহিনী। তারপর বললেন, একথা আমায় আগে বলেনি নি কেন? আমি এক্ষুনি আপনার কাগজপত্র তলব করে পাঠাচ্ছি, দু'ঘন্টার মধ্যে আপনার পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আবার আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল। বুঝলাম যাওয়াটা নেহাতই কপালে আছে। দিনটি ছিল শুক্রবার। সন্ধ্যার দিকে আবার ফোন জানতে পারলাম যে, পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগামী কাল শনিবার সকাল দশটায় রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে শ্রীযুক্ত সোমের কাছ থেকে ওটা চেয়ে নিতে হবে।

হিসেব করে দেখা গেল যে, শনিবার মাত্র তিন ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে এবং তার ভেতরেই রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে, আলিপুর ইটালিয়ান কনসোলেট অফিস থেকে ইটালীর ভিসা যোগাড় করতে হবে; কে এল. এম. অফিসে গিয়ে সিট্ বুক করতে হবে, টমাস কুক্ অফিসে ট্রাভেলার্স চেক্ সংগ্রহ করতে হবে, আর যোগাড় করতে হবে—কর্পোরেশন থেকে হেল্থ সার্টিফিকেট। লোকে বর্ধমান যেতে হলেও ভেবে-চিন্তে তার কাপড়-জামা গুছিয়ে নেবার সময় পায়, কিন্তু আমি সে সুযোগও পেলাম না। একেবারে হিট্লারী "ব্লিৎস্ক্রিগ" পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ সমাপ্ত করতে হল।

কর্পোরেশনের হেলথ সার্টিফিকেট আবার শনিবার পাওয়া গেল না। সেজন্য রবিবার সকালে ধাওয়া করতে হল—বালিগঞ্জের সরকারী টিকা দেবার অফিসে। মাঝখানে এই রবিবারটিই ছিল হাতের মুঠোর মধ্যে; সোমবার ১লা বৈশাখ রওনা হতেই হবে। আমার যে সব বন্ধু ইউরোপ গিয়েছেন তাদের দেখেছি ক'মাস আগে থেকে উদ্যোগ-পর্ব সুরু করতে। কিন্তু আমি যেন কলকাতার কাছেই কোথাও বন-ভোজন করতে যাচ্ছি—এইভাবেই তৈরী হয়ে নিতে হল। এই উদ্যোগ-পর্বের ব্যাপারে সব পেয়েছির আসরের কর্মী হরলাল বর্ধন আমায় খুব সাহায্য করেছে। আমার সঙ্গে সে না-খেয়ে-দেয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি না করলে আমি কিছুতেই সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারতাম না।

এইভাবে দেরী করে পাসপোর্ট পাওয়ার জন্যেই আমার ভিয়েনায় পৌঁছুতে

অযথা বিলম্ব হয়েছিল। আমার ইউরোপ যাত্রায় আর কিছু না থাক্ একটি অভিযানমূলক চাঞ্চল্য ও নাটকীয় পরিস্থির উদ্ভব হয়েছিল। আমার বাড়ীর লোকেরাই ভালো করে বোঝবার সুযোগ পায় নি যে, আমি ইউরোপ যাত্রার জন্য হঠাৎ প্রস্তুত হয়েছি। নিকট আত্মীয়-স্বজন, অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব সবাই খবরটা জানতে পারেন আমি রওনা হয়ে যাবার পরে।

এইবার আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা-সম্মেলন সম্পর্কে যে কথা বল্‌ছিলাম—সেই আলোচনায় ফিরে আসা যাক্।

ভিয়েনার মিউজিক হলটি অতি সুন্দরভাবে সাজান হয়েছিল। সভাপতির মাথার ওপর তিনটি ছেলের ছবি প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে একটি বিরাট প্রাচীর-চিত্র স্থাপিত হয়েছিল। উত্তরে আইসল্যাণ্ড থেকে সুরু করে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত এবং পূর্বে অষ্ট্রিয়া থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে আমেরিকা পর্যন্ত ৬৪ দেশের ছয়শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্ম, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, চীন, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলির উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ কে. সি. চৌধুরী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। ডাঃ চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন—তাতে দেখা যায় যে, একমাত্র রাশিয়া ছাড়া অন্য দেশের শিশুদের অবস্থা সত্যই নৈরাশ্যজনক।

সম্মেলন কক্ষটি (মিউজিক হল) ৬৪টি দেশের জাতীয় পতাকা দ্বারা শোভিত ছিল। এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান ও বক্তৃতাবলী ছয়টি ভাষায় প্রচার করা হয়। সেই ভাষাগুলি হচ্চে যথাক্রমে, ইংরাজী. জার্মান, ফরাসী, ইটালী, রুশ ও স্প্যানিশ।

প্রত্যেক প্রতিনিধির টেবিলের ওপর বিভিন্ন হেডফোন থাকতো। যখন একটি বক্তা বক্তৃতা দিতেন সঙ্গে সঙ্গে সেই বক্তৃতাটি ছয়টিভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করার ব্যবস্থা হত। নিজের আসনে বসে চিহ্নিত হেডফোন ব্যবহার করে সেই বিশেষ ভাষায় বক্তৃতা শোনার ব্যবস্থা ছিল।

ভারতবর্ষ থেকে যে সকল প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাঁদের নাম—ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, মিসেস ওয়াদিয়া, শ্রীযুক্তা শান্তা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শেফালী নন্দী, শ্রী অমল সাহা, ডাঃ ধ্রুবরঞ্জন সরকার ও শ্রীঅখিল নিয়োগী।

ফরাসী প্রতিনিধির প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের ৫২ জন সদস্য নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয়, ভারতীয় প্রতিনিধি দলের ডাঃ কে. সি. চৌধুরী তার সদস্য নির্বাচিত হন।

ফরাসীদেশের প্রতিনিধি অধ্যাপক মনোত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশুদের সম্পর্কে এক সাধারণ রিপোর্ট পেশ করেন।

ইটালীদেশের প্রতিনিধি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক বিবরণী দাখিল করেন। বৃটিশ সদস্য মিঃ কিলবার্ন শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেন।

জার্মানি সদস্য ম্যাডাম গুরু সচিরৎস বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নাইজেরিয়ার সদস্য এবং শেষ অধিবেশনে রুশ ও রুমানিয়ার সদস্য সম্মেলনের পৌরহিত্য করেন।

ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ চৌধুরী বলেন যে, ভারতে শিশুর সংখ্যা ১৪ কোটির মত। তাদের কল্যাণকর আরো বহু প্রতিষ্ঠানের এখন প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে দেশে অর্থেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ডাঃ চৌধুরী শিশু-চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এই সম্মেলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, প্রতিবৎসর ১লা জুন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেন শিশু-দিবস পালন করেন এবং এই বিশেষ দিনটিতে যেন শিশুদের কল্যাণজনক কাজ সম্পাদিত হয়।

শিশুদের স্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা, শিক্ষা ও উন্নতির জন্য সকল দেশ আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের আদর্শ গ্রহণ করবে বলে এই সম্মেলনে আশা প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন সেজন্য সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই একটি ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—সম্মেলন পরিচালনার কার্যালয়ে।

প্রত্যেক দেশ থেকেই প্রতিনিধিরা কিছু কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সব পেয়েছির আসরের ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল বাঙ্গলার নিজস্ব খেলনা পুতুল আর রাখি। আমি দু'টো জিনিসই প্রেসিডেন্টকে উপহার দিলাম। 'রাখি' যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের নিদর্শন, সেকথা সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। সকলেই ভারতের "রাখির" বিশেষ প্রশংসা করলেন এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলেন।

৬৪টি দেশের সব প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ হওয়া সম্ভবপর নয় এবং সকলেই এই ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তবু যাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। আলাপ হল নিউইয়র্কের নিগ্রো মেয়ে মলি লুকাসের সঙ্গে। নিগ্রোদের সঙ্গে আমেরিকানরা কিরূপ অভদ্র ব্যবহার করে, সেই সব কাহিনী মেয়েটি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করল। মেয়েটির বয়স একেবারে কম। হয়ত সে কোনো বিদ্যালয়ে পড়ে। তার সঙ্গে তার বন্ধু এক

আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ মেয়েও ছিল। সেও তার কথা সকল দিক দিয়ে সমর্থন করল। কালো আর সাদা হলেও ওদের দু'জনের মধ্যে বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে দেখতে পেলাম। শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি সে নিউইয়র্কে ফিরে যাবে না। মলি লুকাস একাই চলে যাচ্ছে দেশে। মলি তার ঠিকানা লিখে দিল আমার নোটবুকে আর যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করলে।

আলাপ হল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মিসেস ভেনা বারহনের সঙ্গে। আমাদের সব পেয়েছির আসরের যে ছাপান সংক্ষিপ্ত পরিচয় পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলি প্রত্যেক প্রতিনিধিকে দিলাম। তাঁরা বিশেষ যত্ন-সহকারে রেখে দিলেন নিজ নিজ দেশে নিয়ে যাবেন বলে। ভারতের কিশোর-আন্দোলন সম্পর্কে অনেকের সঙ্গে আলোচনা হল। আমাদের আসরের কথা, মণিমেলার কথা, বোম্বাই-এর বালকানজী-বাড়ীর কথা ওদের জানিয়ে দিলাম।

বার্লিনের মেরী ক্রুড ও ডারমিনির সঙ্গে বেশ আলাপ হল। এঁরা দু'জনেই খোলাখুলি আলোচনা করতে ভালবাসেন এবং সব দেশের খবরই অল্প-বিস্তর রাখেন। দু'জনেই চমৎকার ইংরাজী বলতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি সিলি ফিসার খুব গল্পিমেয়ে। তিনিও তাঁর দেশের অনেক কাহিনী বললেন এবং ঠিকানা দিয়ে চিঠিপত্র লিখতে বললেন। বললাম, আলাপই শুধু হচ্ছে কিন্তু এইসব দেশে যাবার সুযোগ ত' আর কোন কাল হবে না। চীনদেশের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ উ-চো জেনের সঙ্গে আলাপ হল। ইনি খুব বিদ্বান আর মহাশয় ব্যক্তি। বিদ্যার কোনো রকম অহঙ্কার নেই। সকলের সঙ্গে একভাবে মেলামেশা করছেন।

আলাপ হল পাকিস্থানের প্রতিনিধি মিসেস আলি মহম্মদের সঙ্গে। মহিলাটি এত মিশুকে যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার করে নিতে পারেন। দূর দেশে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার কোন লক্ষণ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলাম না। ভিয়েনাতে থাকতে মিসেস আলি মহম্মদ সম্পর্কে যে মজার ঘটনা ঘটেছিল সেই কথাই এই ফাঁকে বলে রাখি। প্রথমে গিয়ে তিনি অন্যান্য ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধির মত শাড়ী পরেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন। তার ফলে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা তাঁকে ভারতের প্রতিনিধি বলে গণ্য করতেন এবং সেই ভাবেই আহ্বান জানাতেন। পাছে পাকিস্থানের নাম উহ্য হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তখন তাড়াতাড়ি শাড়ীর পরিবর্তে সালোয়ার ইত্যাদি পরিধান করতে শুরু করে দিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি কিন্তু অত্যন্ত অমায়িক এবং খুবই আলাপী। আমরা যে সবাই এক দেশ থেকেই গিয়েছি, সে বিষয়ে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। মিসেস আলি মহম্মদের দেশ হচ্ছে লাহোরে। তাঁর আন্তরিকতার কথা কোনো দিনই ভুলতে পারব না।

সিরিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন—মৌনা ফউয়াজ নামে এক তরুণী শিক্ষয়িত্রী। দেখতে এত সুন্দরী যে, চোখ মেলে তাকিয়ে থাক্‌তে হয়। তাঁর সঙ্গে সিরিয়া দেশ সম্পর্কে অনেকক্ষণ বসে আলাপ হল। ও দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য নাকি খুবই ভাল এবং খাদ্যেরও কোনো অভাব নেই। ওদের স্বাস্থ্য যে ভালো সে কথা আমরা ওঁকে দেখেই অনুমান করে নিতে পেরেছিলাম। তরুণী শিক্ষয়িত্রীটি তাঁদের দেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী সম্পর্কেও কিছু বললেন। মহিলাটি বিবাহিতা। তাঁর স্বামী অন্যত্র চাকরি করেন। তিনি আছেন শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে।

আমি এবং আর একজন ভারতীয় প্রতিনিধি নিজেদের মধ্যেও বাঙলা ভাষায় আলোচনাকালে —'মুস্কিল' কথাটার উল্লেখ করতে তিনি হেসে বললেন, কি 'মুস্কিল' 'মুস্কিল' করছেন? ওটা ত' আমাদের দেশের কথা। শুনে আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। পরে তাঁকে আমরা বুঝিয়ে দিলাম যে, আরব ও পারস্যের বহু শব্দ এইভাবে বাঙলা ভাষার মধ্যে নিজের স্থান নিয়েছে।

ঘরোয়া বৈঠকে সময় ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আরো অনেকের সঙ্গে তাড়াতাড়ি মৌখিক আলাপটা সেরে নিলাম, কিন্তু তাঁদের নামগুলি আর আজ স্মরণ করতে পারছি না। ঐ দিনই দুপুরবেলা—চীন দেশের প্রতিনিধিরা—সমগ্র এশিয়া দেশের প্রতিনিধিদের এক প্রীতিভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ মধুর বলে মনে হয়েছিল।

যে চীন দেশীয় মেয়েটির পাশে আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তাঁর নাম হচ্ছে—হুয়াং চিয়েন জু।—ইনি সাংহাই শহরের ওয়াই. ডব্লু. সি. এ. তে থাকেন। জাতিতে ইনি খৃষ্টান কিন্তু নিজের দেশের কথা বল্‌তে গিয়ে আনন্দে ও উৎসাহে একেবারে যাকে বলে পঞ্চমুখ। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই—জীবনের বিভিন্ন স্তরে চীন দেশের কেমন উন্নতি হয়েছে—সেকথা তিনি আমায় ভোজ চলা কালে নিম্নস্বরে সব বুঝিয়ে দিলেন। মেয়েটি এত মিশুকে যে খুব তাড়াতাড়ি পরকে আপন করে নিতে পারেন!

ভোজের গোড়াতেই যে কৌতুকজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই কথাই আগে বল্‌ছি। এই জাতীয় ভোজের নিয়ম হচ্ছে—আগে সব দেশের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পান করতে হয়। প্রথমেই সকলেই সামনে মদ পরিবেশিত হল। দাঁড়িয়ে উঠে কাচের গেলাস ঠোকাঠুকি করে স্বাস্থ্য পান করতে হবে। তখন আমার সমূহ বিপদ! আমিও খাব না—হুয়াংও কিছুতেই ছাড়বেন না। বললেন, স্বাস্থ্য পানের নামে ওটা করতেই হবে। নইলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হয়। আমি তাঁর কানে কানে বললাম, আচ্ছা সামনে জলের গেলাস রয়েছে—তাই থেকে কাজ চালিয়ে দিলে কেমন হয়? তিনি একান্ত নাছোড়বান্দা। কাজেই বাধ্য হয়ে কুইনিন গেলার মতো কিছুটা ঢক্ করে গিলে ফেললাম।

হুয়াং খুশী হয়ে আমায় সার্টিফিকেট্ দিলেন যে এইবার ভদ্রতা-সম্মত কাজ হয়েছে। ভারত সম্পর্কেও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আমিও সাধ্যানুসারে তার জবাব দিতে লাগলাম।

আমার উল্টো দিকে বসেছিলেন—বোম্বাই অঞ্চলের প্রতিনিধি মিসেস ওয়াদিয়া। এখন মুস্কিল হচ্ছিল এই যে, সব চীনা ভদ্রলোক ত' ইংরেজী জানে না—! তার ফলে মিসেস ওয়াদিয়া চীনদেশ সম্পর্কে আলাপ করতে পারছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল—হুয়াং চিয়েনের সঙ্গে একটু আলাপ করেন। কাজেই তিনি আমায় ডেকে বললেন, মিঃ নিয়োগী, আমি কি আপনার সঙ্গে জায়গাটা বদল করতে পারি? আমি জবাব দিলাম, বিশেষ আনন্দের সঙ্গে। খুশী মনে আমি তাঁদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনার সুযোগ করে দিলাম।

সেদিনের ভোজটি আন্তরিক আলাপ-আলোচনার এবং খাদ্যের দিক থেকে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। চীন দলের নেতা সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন এক-একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

পাল্টা ধন্যবাদের পালা চুকে গেলে—ভোজ-সভা সমাপ্ত হল। তখন সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালে প্রতিনিধিদের নিয়ে ছবি তোলার ঘটা পড়ে গেল। আমাদের ভারতের প্রতিনিধিরাও ক্যামেরা নিয়ে অনেক ছবি তুললে।

ভিয়েনাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের যিনি দোভাষী ছিলেন সেই অক্লান্ত কর্মী তরুণী মিস্ হেলেন পিঙ্কনার সম্পর্কে এপর্যন্ত কিছুই বলা হয় নি। এ রকম একটি কর্মঠ মেয়ে আমি আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এই অষ্ট্রিয়ান তরুণীর এত প্রখর দৃষ্টি ছিল যে, সব সময়েই তাঁর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তিনি নিজে ইংরেজী খুব ভালো জানতেন বলে আমাদের কথাবার্তা চালানোর খুব সুবিধে হয়েছিল। দোভাষীর কাজ ছাড়াও বন্ধু হিসেবে তিনি আমাদের কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছেন এবং নানাভাবে তাঁর সঙ্গদান করে বিদেশে আমাদের উৎফুল্ল রেখেছেন। মোট কথা, সুদূর ভিয়েনা শহরে তাঁকে আমরা প্রকৃত সুহৃদরূপে পেয়েছিলাম—যার জন্যে আমাদের কোনো অসুবিধেই হয় নি। হেলেন প্রিঙ্কনারের চশমায় ঢাকা চোখ দু'টি দেখে মনে হয় তিনি সব সময়েই খুব পড়াশুনা করিয়া থাকেন। যারা গ্রন্থ কীট হয় তাদের কিন্তু বাস্তব জগতে বিশেষ কাজের মেয়ে বলে মনে হয় না। কিন্তু মিস্ পিঙ্কনারের মধ্যে একাধারে ধরা পড়েছে—জ্ঞানানুশীলন ও কর্মকুশলতা। অথচ বয়স্ তার এমন কি বেশী।

মিস্ পিঙ্কনারের সঙ্গে একদিন গেলাম—ওখানকার সেরা দৈনিক কাগজের অফিসে। এই কাগজটির নাম হচ্ছে Fleisch Mark। সারা অষ্ট্রিয়ার এই কাগজের

মতো প্রচার আর কারও নেই। মিস্ পিক্সনার কাগজের প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। সুদূর ভারতবর্ষের আমি একজন সাংবাদিক শুনে তিনি খুব খাতির করে আমায় তাঁর খাস কামরায় নিয়ে গেলেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। যুগান্তর-এর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি পরিচয়-পত্র আমার সঙ্গে ছিল—সেটি তাঁকে দেখালাম। একথাও জানালাম যে, "যুগান্তর" হচ্ছে বর্তমানে ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক। সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে ঘরোয়া আলোচনা চল্‌ল।

এই কাগজের অফিস থেকেই ছোটদের আর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম "Unser Zeitung". ছোটদের এই সচিত্র কাগজখানি রোটারীতে বহু বর্ণে ছাপা হয়। কিন্তু ছাপা এত সুন্দর যে, দেখে মনে হয় না রোটারীতে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি একখানি ছেলেদের কাগজ আমায় উপহার দিলেন। হঠাৎ একটি জরুরী ফোন আসায় প্রধান সম্পাদক কার্যান্তরে চলে গেলেন এবং আমার সঙ্গে সাংবাদিক জর্জ আউয়ারের আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলেন। এই সাংবাদিক বন্ধুটি বয়সে তরুণ, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁর জানবার খুব আগ্রহ। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কার্যালয়টি ঘুরে দেখালেন। আমি যে সুদূর ভারত থেকে এসে সংবাদপত্রের অফিস পরিদর্শন করলাম—খবর হিসেবে সেটা তাঁরা নোট করে নিলেন। আমি নিজে জার্মান ভাষা জানিনে বলে সে সংবাদ কাগজটিতে কবে প্রকাশিত হয়েছিল বলতে পারব না।

মিস্ পিক্সনার বললেন, তাঁর এক বোন এই সংবাদপত্রে কাজ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সে সময় তিনি অফিসে উপস্থিত ছিলেন না বলে আলাপ করা আর হয়ে উঠল না। মিস্ পিক্সনারের অন্যত্র কাজ ছিল বলে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আগেই চলে গেলেন।

ফেরবার মুখে সাংবাদিক বন্ধু জর্জ আউয়ার বললেন, আপনি হয়ত রাস্তা ভুল করে ফেলবেন—চলুন, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি আপত্তি জানিয়ে উত্তর দিলাম, না-না, তাতে আপনার কাজের অনেক ক্ষতি হবে।

কিন্তু তিনি আমার কোনো আপত্তিই শুনলেন না। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। চলতে চলতে তিনি বললেন, প্রধান সম্পাদকের নির্দেশ আছে আপনাকে আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে। সাংবাদিকের সৌজন্যবোধ দেখে সত্যি মুগ্ধ হলাম। দু'জনে গল্প করতে করতে রাজপথ ধরে চলতে লাগলাম। আলোচনার বিষয় ছিল সাংবাদিকতা, শিশুদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি এবং আরো কিছু-কিছু। আমরা ট্রামে কিংবা বাসে করেই আসতে পারতাম। কিন্তু তখন

হাঁটতেই ভালো লাগছিল। বিকেলবেলা দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়েরা নানা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে চলেছে। তাদের স্বাস্থ্য ও চলনভঙ্গী লক্ষ্য করবার মতো। ভিয়েনার রাজপথে সব সময়ই দেখেছি ছেলেমেয়েরা মুড়ি-মুড়কির মতো আপেল, কমলালেবু, কলা, চকোলেট, ক্রীমের তৈরী খাবার ইত্যাদি খেতে খেতে চলেছে। রুগ্ন স্বাস্থ্যের ছেলে মেয়ে বড় একটা চোখে পড়েনি। দেখে দেখে শুধু ভেবেছি—আমাদের ভারতবর্ষেও ত' প্রচুর ফল জন্মে, কিন্তু কয়জন অভিভাবক তাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন সময়কার ফল খাওয়াতে পারেন? অন্য দেশের প্রাচুর্য দেখে এটা ঈর্ষার কথা নয়। শুধু মনে-মনে ভাবা যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কবে এইরকম প্রচুর পুষ্টিকর আহার পাবে এবং তারই ফলে স্বাস্থ্য হবে তাদের চোখ মেলে দেখবার মতো। নিজের দেশের ছেলে-মেয়েদের রোগা টিং-টিঙে চেহারার কথা কেবলি মনে পড়ত এবং এদের সঙ্গে তুলনা করে ভারী মুষড়ে পড়তাম! মনে মনে আওড়াতাম—

"দিন আগত ঐ
ভারত তবু কৈ?
সে কি রহিল সুপ্ত সব জন পশ্চাতে?"

সাংবাদিক বন্ধুটি আমায় হোটেলের দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন এবং বলে গেলেন যে, আর একদিন তিনি আসবেন। একদিন নয়—তার পর দু'দিন তিনি এসেছিলেন এবং একদিন ফোনও করেছিলেন। কিন্তু আমি ভিয়েনা শহর তখন চষে বেড়াচ্ছি—তাই তাঁর সঙ্গে আর মোলাকাত হয়নি।

শুধু অকারণ পুলকে ভিয়েনা শহরের রাজপথ ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোথায় লুকিয়ে আছে ওদের জীবনী-শক্তির মূলমন্ত্র? এত দ্রুতবেগে ওরা হাঁটে কি করে? ওদের দিকে তাকালে মনে হয়—সবাই যেন ছুটছে ট্রেন ধরবার জন্য! এক মুহূর্ত দেরী হলেই ট্রেন ফেল হবার সম্ভাবনা।

অনেক সময় পার্কে গিয়ে বসতাম—ছোটদের খেলা দেখতে আর ওদের সঙ্গে মেশবার জন্যে। ছোটদের আলাদা একটা ভাষা আছে। সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত না করেও যে ছোটদের সঙ্গে দিব্যি মেলামেশা করা যায়—এটা আমি বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি। ভাষার বন্ধনকে অতিক্রম করেও ছেলেমেয়েরা যে মিষ্টি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করে নেয়—বুঝি তার তুলনা মেলে না। ছোটদের নিজেদের মধ্যেও এই মিতালীর আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করেছি বিমানে চলাকালে। কেউ কারো ভাষা জানে না তবু বন্ধুত্ব ঠিক জমে যাচ্ছে।

কোনো কোনো সময় ট্রামে ছোটদের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমে যেত। ওদের সঙ্গে মা কিংবা দিদি যদি থাকতেন—তবে তাঁরা এই জাতীয় 'আন্তর্জাতিক প্রীতিতে'

বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করতেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের আলাপ জমানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। কোনো কোনো দিন মজার ব্যাপারও যে না ঘটত তা নয়। একটি ছেলেকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম,—বল ত' ইণ্ডিয়া কোথায়? সে বই খাতা-পত্তর নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে ইস্কুলে যাচ্ছিল। এই জাতীয় একটি প্রশ্ন শুনে সে সত্যি হক্‌চকিয়ে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল—সুদূরের কোনো গ্রহ সম্বন্ধে তাকে কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে। ওর মা ছেলেকে জবাব দিতে খুব উৎসাহ দিলেন—কিন্তু অবাক, ছেলেটির মুখ থেকে আব কোনো কথা বেরল না।

আর একদিন অন্যরকম একটি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। ট্রামে করে আমি একা-একাই যেন কোথায় যাচ্ছি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার ওপাশে এক ভদ্রলোক এসে বসলেন—তাঁর চেহারাটা অবিকল হিট্‌লারের মতো দেখতে। আমি তাকিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। এমন অদ্ভুত মিল সচরাচর দেখা যায় না। সেইরকম মুখ, চোখ, চিবুক, এমন কি বাটারফ্লাই গোঁফ আর চুল অবধি। হিট্‌লার কি তার গোর থেকে উঠে এল নাকি? যত তাকিয়ে দেখি তত আমার বিস্ময় বেড়ে যায়। আসল হিট্‌লার যে অনেক নকল হিট্‌লার পুষে রাখতেন—এই ভদ্রলোককে দেখলে সেকথা অবিশ্বাস করবার যো থাকে না। কোন সিনেমা কোম্পানী যদি হিট্‌লারের জীবনী নিয়ে ছবি তৈরী করেন তবে এই ভদ্রলোককে মনোনীত করে নিলে অর্ধেক কাজ এগিয়ে থাকবে। আমার সঙ্গে যদি ক্যামেরা থাকতো তবে আমি ফটো তুলে এনে দেখাতে পারতাম—সত্যি ভদ্রলোক অবিকল হিট্‌লারের মত কিনা। পরে ভেবে দেখলাম—হিট্‌লার ত' অষ্ট্রিয়া দেশেরই মানুষ।

কি আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য। আমাদের দেশেও আমরা অনেক সময় নকল রবীন্দ্রনাথ, নকল গান্ধীজী, নকল নেতাজী নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু এরকম চেহারার মিল খুব একটা চোখে পড়েনি।

ভিয়েনা শহরের রাস্তাঘাটগুলি বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। পথ চলতে গিয়ে কেউ পোড়া সিগারেট, অকেজো কাগজ, কলার খোসা কিংবা কোন জঞ্জাল রাস্তায় ফেলে না। সেজন্য আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট আছে। কলকাতা শহরে যেমন রাস্তার বাঁদিকে ট্রাম-বাস থেকে নামতে হয় ওখানে উল্টো—সব ডানদিকে। এজন্যে আমাদের প্রায়ই ভুল হত। ভিয়েনার গাড়ীগুলি খুব স্পীড দিয়ে চলে। এজন্যে যেখানে-সেখানে রাস্তা পার হওয়া খুব বিপজ্জনক। কোনো কোনো রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলের রাস্তা বেশ উঁচু-নীচু ঢেউ খেলানো। দিব্যি ছায়ায় ঢাকা পথ। পথ চলতে গিয়ে বিকেলের দিকে দেখা যায় মাঝে মাঝে রাস্তার কোণে দিব্যি নিরিবিলি জায়গায় .... ছোট ছোট

চেয়ার টেবিল পাতা—আশেপাশে ফুল-লতা-পাতা-টব দিয়ে সাজান। দলে দলে মেয়ে পুরুষ এইখানে এসে বসে কফি পান করে, গল্প গুজবে আসর জমিয়ে তোলে, তারপর যে যার আবাসে চলে যায়। বিকেলের দিকে যেদিন মিঠে রোদ ওঠে সেদিন এইসব জায়গায় স্থান খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। সব কিছুতেই এরা সৌন্দর্যের সন্ধান করে। মনে হয় জীবনকে এরা উপভোগ করতে জানে

একদিন গেলাম এখানকার স্কুল দেখতে। ছেলেমেয়েরা তখন দল বেঁধে খেলাধুলা করছে। খানিকটা খেলাধূলা দেখে ফিরে এলাম। ক্লাশের ভেতরটা আর দেখা হল না।

রবিবার দিন দুপুর থেকে ভিয়েনার ছেলেমেয়েদের কোনো প্রলোভন দেখিয়েই আর শহরে আটকে রাখা যাবে না। প্রত্যেকের পিঠে ঝোলানো একটি করে থলে আর হাতে স্যুটকেশ। ওরা চলেছে দল বেঁধে কোনো পাহাড়ের নীচে কোনো নদীর ধারে, কোনো নদীর গাঁয়ে কিংবা নির্জন ঝর্ণাতলায়। সেখানে সারাদিন আনন্দের ভেতর দিয়ে বন-ভোজন করবে, খেলাধুলা করবে, ছবি আঁকবে। কেউ কেউ আবার ছিপ নিয়ে চলেছে। পুকুরে কিংবা নদীতে মাছ ধরবে। যারা খুব ছোট তাদের সঙ্গে অভিভাবকেরাও চলেছেন। থলেতে তাদের জন্যে নানারকম খাবার আর ফল। এইসব দল যে কি আনন্দের সঙ্গে বাস ভর্তি করে শহর ছেড়ে চলে যায় তা দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। মনে হয় আনন্দ এদের জীবনে উপচে পড়ছে। অথচ মজা এই যে, এখনো ভিয়েনা শহরে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। ভাঙ্গা গির্জা, বোমায় গুঁড়িয়ে যাওয়া বাড়ী এখনো যুদ্ধের সাক্ষ্য দেয়। তবু এই জাতি প্রাণ-স্পন্দনে উচ্ছল।

ভারতবর্ষ থেকে যে সব প্রতিনিধি ভিয়েনাতে গিয়েছিলেন তার ভেতর বোম্বের মিসেস ওয়াদিয়া শুনতে পাই কোটিপতির স্ত্রী। এঁর স্বামী ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মস্কোতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছেন—আর ইনি এসেছেন এখানে। নামকরা ধনী-পত্নী হলেও সকলের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেশবার একটা সহজাত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মিসেস ওয়াদিয়ার। অবশ্য একটা ব্যাপারে ইনি নিজের আভিজাত্য বজায় রেখেছেন যে, নিজে আলাদা নামকরা হোটেলে নিজের ব্যয়ে রয়েছেন। তবে চলাফেরা ও মেশার দিক দিয়ে ইনি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় চলেন। সেখানে নিজের কোনো গর্ব বা অহঙ্কার নেই। আমাদের সঙ্গে কতদিন পায়ে হেঁটে ভিয়েনার পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যে-কোনো খাবারের দোকানে ঢুকে আমাদের খাইয়েছেন, অনর্গল গল্প বলেছেন আমাদের কাছে। মিসেস্ ওয়াদিয়া আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরতেন আর বলতেন, কটা টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি সেগুলো খরচ করে যেতে হবে ত'। তাই পথে বেরিয়েই বা দোকানে ঢুকে মার্কেটিং করতে শুরু করে দিতেন

তা' চকোলেট হোক, স্যুটকেশ হোক আর জুতোই হোক। নিজের ছেলেমেয়ের কথা বলতে খুব ভালবাসতেন মিসেস্ ওয়াদিয়া। ওদের যে বোম্বেতে ফেলে এসেছেন সেজন্য মনে মনে বোধ করি অস্বস্তি বোধ করতেন। নিজের স্নেহশীল বাবার কথা বলতেও এই মহিলাটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। খুব ছেলেবেলা থেকেই বাপের কাছে নাকি ছিল তাঁর যত আবদার।

একদিন মিসেস্ ওয়াদিয়া প্রস্তাব করলেন চলুন, আজ একসঙ্গে বেড়ানো যাক। কিন্তু তার আগে সকলেরই কিছু-না-কিছু ছুট্‌কো কাজ হাতে ছিল। মিসেস্ ওয়াদিয়া প্রস্তাব করলেন আসুন ঠিক দেড়টার সময় মিলব. তারপর একসঙ্গে রওনা হওয়া যাবে। তিনি একটি গির্জার ঠিকানা বলে দিলেন। সেই রকমই কথা পাকা হয়ে গেল।

যথাসময়ে পৌঁছে দেখি চার্চের ভেতর মিসেস্ ওয়াদিয়া একটি মহিলার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন। খানিক পরেই শ্রীমতী শেফালী নন্দী ও মিস পিক্নার এসে হাজির হলেন। চার্চের অভ্যন্তরভাগটা সত্যি দেখবার মতো। অনেকদিনের পুরানো। বিগত যুদ্ধের সময় বোমা-বর্ষণের ফলে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—এখন নূতন করে সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু কাজ এখন শেষ হয়নি। কিছুক্ষণ ভেতরে ঘুরে ঘুরে আমরা চার্চটা আগে ভালো করে দেখে নিলাম। তারপর পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরলাম। মিসেস্ ওয়াদিয়ার কথা যা বলছি ঠিক তাই। দু' পা এগিয়ে যান আর জিনিস কিনতে চান। অমুককে স্যুটকেশ কিনে দিতে হবে। অমুককে একজোড়া ভালো জুতো কিনে দেব কথা দিয়েছি। এ-দোকান ও-দোকান সে-দোকান অবশ্য সঙ্গে বেড়ানটাও বাদ যাচ্ছে না। ঘুরে ঘুরে যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন মিসেস্ ওয়াদিয়া প্রস্তাব করলেন চলুন, একটা দোকানে ঢুকে কেক্, কোল্ড্ ড্রিঙ্ক ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা যাক। বেশ খানিকটা আনন্দে কাটল সেই দোকানে।

হ্যাঁ, একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। আমরা যখন চার্চ থেকে বেরিয়ে আসি সেই সময় একটা লোক চার্চের পক্ষ থেকেই ভিক্ষা চাইছিল। অবশ্য ভিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের মোটেই ছিল না। আমরা চলেই আসছিলাম। কিন্তু লোকটি মিসেস্ ওয়াদিয়ার সাজ-পোশাক দেখে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে পাকড়ে ধরল। তিনি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তাকে একটি কি দিলেন—তারপর আমরা সবাই মিলে পথ চলতে লাগলাম। কিছুটা পথ চলে আসবার পর হঠাৎ শোনা গেল—পিছন থেকে চীৎকার করে কে আমাদের ডাকছে। ব্যাপার কি? আমরা থমকে দাঁড়ালাম। দেখা গেল—সেই লোকটি ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছে, হাতে তার মিসেস্ ওয়াদিয়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। ওই যে তিনি খুচরা পয়সা বের করতে ওটা খুলেছিলেন—ভুলে সেটা না নিয়ে এসে

ঐখানে ফেলে এসেছেন। মিসেস্ ওয়াদিয়া বললেন, দেখছেন কাণ্ড? ওকে কিছুই দিতে চাইনি—অথচ সেই লোকটাই আমার ব্যাগটা বাঁচিয়ে দিল। অনেক দরকারী জিনিসপত্র আছে ব্যাগটাতে। লোকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা পথ চলতে শুরু করলাম।

এক সন্ধ্যায় আমরা-মিসেস্ ওয়াদিয়ার ওখানে গল্প করতে গেছি। সঙ্গে রয়েছেন ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী আর মিসেস্ মুখার্জী।

ড্রয়িং-রুমে বসে গল্প হচ্ছিল। মিসেস্ ওয়াদিয়া চলে যাচ্ছেন, আবার কার সঙ্গে কবে দেখা হবে ঠিক নেই। মনোরম সন্ধ্যায় আসরটি বেশ জমে উঠেছে। ওদিকে রাত্রি যে গভীর হয়ে গেছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ মিসেস্ ওয়াদিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, অ্যাঁ, একেবারে সাড়ে নটা বেজে গেছে যে। এখন ত' আর আপনাদের উঠতে দিতে পারিনে। আমি ডিনারের কথা বলে আসি হোটেলে—

ডাঃ চৌধুরী যত আপত্তি করতে যান—মহিলাটি তত আমাদের ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন। তাঁর ভয় অবশ্য কিছুমাত্র অমূলক নয়। এখন সব হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে—কাজেই রাত্তিরে হয়ত আমাদের খাওয়াই হবে না। তিনি আমাদের কোন নিষেধ না শুনে হোটেলে আমাদের তিনজনের ডিনারের ফরমাস করলেন। ওঁকে নিয়ে আমরা চারজন খেতে বসলাম। সেদিন খেতে খেতে ওঁর কাছে নানারকম গল্প শুনে—ওঁর মধ্যে যে একটি কল্যাণময়ী নারী বাস করে তার সন্ধান পেলাম। মেয়েরা ঘরকে কেন্দ্র করে গল্প বলতে এত ভালোবাসে। ওঁর ছেলে-মেয়ের কথা, স্বামীর কথা—নিজের খামখেয়ালীর কথা শোনাতে শোনাতে হাসি ও কৌতুকে উপ্‌ছে পড়ছিলেন মহিলাটি।

ইতিমধ্যে তাকিয়ে দেখি আমাদের পাশের টেবিলে এসে বসেছেন—কনফারেন্সে পূর্ব-পরিচিতা—Womens' International Democratic Federation-এর সভানেত্রী এবং বার্লিনের একটি মেয়ে। তাঁদের সঙ্গেও অনেক আলাপ-আলোচনা হল। ভারতের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের সভানেত্রী একটি শুভেচ্ছা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবেন—এই কথা তিনি আমায় জানালেন।

সেদিন রাত্রে আমরা মিসেস্ ওয়াদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন ভিয়েনার নিশুতি পথে পা দিলাম তখন নিকটবর্তী গির্জায় বারোটা বাজে।

একদিন গেলাম—একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে। ইউরোপের ছেলেমেয়েদের যে রকম বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় চিকিৎসা করা হয়—সেটা দেখতেও এত ভাল লাগে। আমাদের দেশের নামকরা হাসপাতালগুলিতে যদি সেইভাবে চিকিৎসার নিয়ম প্রচলিত হয় তবে শিশু-মৃত্যুর হার অনেক কমে যাবে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইউরোপের বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার

পন্থা প্রচলন করতে যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন আমাদের গরীব দেশ সেটা সংগ্রহ করতে পারবে না। সরকারের এবিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তবু আমাদের দেশের ধনীরা যদি মুক্তহস্তে দান করেন তবেই এই জাতীয় বিজ্ঞান-সম্মত শিশু-চিকিৎসাগার খোলা যেতে পারে। সরকার যদি অন্যান্য বিভাগের অযথা ব্যয় কমিয়ে এইদিকে দৃষ্টিপাত করেন তবে বেশ কিছুটা সংগঠনমূলক কাজ হতে পারে। বিদেশে বহুসংখ্যক শিশু-চিকিৎসক পাঠিয়ে তাঁদের যথাযোগ্যভাবে শিক্ষা দিয়ে আনাও সরকারের একান্ত কর্তব্য।

ইউরোপের ছেলেমেয়েদের কিরকম রোদ্দুরে নিয়ে শরীরে সূর্যের তেজ লাগানো হয় সে দৃশ্যও দেখবার মতো। আমাদের দেশেও ঠাকুমা-দিদিমারা প্রচুর সরষের তেল মাখিয়ে ছেলেমেয়েদের রোদ্দুরে ফেলে রাখেন। তাঁদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়—তেলে-জলে শরীর। সূর্যের তেজ বহু রোগের জীবাণু নষ্ট করে দেয়—একথা আজ বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে। আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমারা এই নিয়ম কিন্তু বংশপরম্পরায় পল্লী-অঞ্চলে চালু রেখেছেন।

ওদেশের হাসপাতাল এত ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে পরিষ্কার যে, ধারণা জন্মে—দেবালয়ের মতো পবিত্র মনে করে সেগুলি সব সময় সকল গ্লানি মুক্ত করে রাখা হয়। সত্যি একটি সুন্দর দেবালয়ে প্রবেশ করলে মন যেমন পবিত্র হয় তেমনি মনোভাব হয় ইউরোপের একটি হাসপাতালের অভ্যন্তরে ঢুকলে। ওরা মাটির মানুষকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করবার মন্ত্র গ্রহণ করছে।

ভিয়েনার পথে-ঘাটে ভিক্ষুক বিশেষ চোখে পড়েনি। একদিন দেখলাম, একটি পার্কের ধারে একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোক চৌকা ধরনের একটি বড় বাক্স বসিয়ে হাতল দিয়ে ঘোরাচ্ছে। তার ভেতর থেকে নানা গৎ শোনা যাচ্ছে। এই হচ্ছে তাদের ভিক্ষা করবার প্রথা। মুখ ফুটে কিছু চাইছে না। যার যা খুশী দাও।

ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বোমার আঘাতে ধ্বংস বাড়ীঘর-দোর চোখে পড়ে। একটা যুদ্ধে ছোটরা যে কি রকম নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে সেটাও চোখ মেলে দেখা যায় এবং আমাদের সম্মেলনেও সেকথা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়।

রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের একটি উৎসব দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমাদের দেশের বিভিন্ন কিশোর-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যাই—তাই বিদেশী ছেলেমেয়েদের উৎসব, নাচ-গান প্রভৃতি দেখবার কৌতূহল বড় কম ছিল না।

অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল—ভিয়েনার সেই বিখ্যাত মিউজিক হলে।

আমন্ত্রণ-লিপি একটি পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছতে আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি প্রেক্ষাগৃহ একেবারে পূর্ণ। নীচে—ন স্থানং তিলধারণং। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যখন জানতে পারলেন যে, আমি সুদূর ভারতের লোক তখন বিশেষ যত্ন করে পেছনকার দরজা দিয়ে আমায় ঢুকিয়ে একেবারে লিফ্‌টে করে সোজা ওপরে নিয়ে এলেন। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি আসন আলাদা করে রাখা হয়েছিল। আমার বরাত ভালো—সেই একটি আসনে স্থান পেলাম। আনামার একটি নিগ্রো মহিলাও আমার মতো দেরী করে এসেছিলেন—তাঁর স্থানও হল আমার পাশে। নিগ্রো মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর নাম—জেলিসিয়া স্যানটিঙ্গস্। এমন ভরাট ও জমজমাট প্রেক্ষাগৃহ আমি আর কখনও দেখি নি। কয়েক হাজার লোক সেখানে স্থান পেয়েছিল—কিন্তু তবু এত চুপচাপ যে, ছুঁচটি পড়লেও বুঝি তার শব্দ শোনা যাবে। মঞ্চটিকে সুন্দর করে সাজান হয়েছিল। একটি কিশোরী মেয়ে এসে এক-একটি বিষয়ের ঘোষণা করে যাচ্ছিল আর শুরু হচ্ছিল অনুষ্ঠান। এই উৎসবে মাইকের ব্যবস্থাটি দেখলাম একটু অন্যরকম। মঞ্চের বাইরে প্রেক্ষাগৃহের ঠিক সামনে দর্শকদের মাথার ওপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে লম্বা ধরনের মাইকগুলি। ওদিকে মঞ্চে হয়ত একসঙ্গে একশ-দেড়শ ছেলেমেয়ে গান গাইছে—এই বিশেষ মাইকগুলি তখন চালু রয়েছে। গানের প্রত্যেকটি কথা চমৎকারভাবে শোনা যাচ্ছে—এতটুকুও জড়িয়ে যাচ্ছে না। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছি—সেটা কোনো দিনই ভুলতে পারব না। দলে দলে ছেলেমেয়ে মঞ্চে এসে ঢুকছে—কি সুন্দর তাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের কায়দা, কি অপরূপ তাদের স্বাস্থ্য—সবকিছুকে জড়িয়ে মনে হয় যেন নিপুণ শিল্পীর আঁকা একটি ছবি দেখছি।

ওদের নাচ কিন্তু ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। যেন ব্যায়ামের কসরত ও নাচকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটা নতুন ধরনের ড্রিল তৈরী করা হয়েছে। তাতে সমবেত ব্যায়ামের অভিনব কলা কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু নৃত্যের সহজাত লালিত্যের একান্ত অভাব। অবশ্য অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যেকটি যে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় সে বিষয়ে কারো দুইমত থাকতে পারে না।

যখন কোনো বিশেষ গান কিংবা নাচ দর্শকবৃন্দের ভালো লাগে তারা এমন সমবেতভাবে হাততালি দিতে শুরু করে যে, সারা প্রেক্ষাগৃহ গমগম্ করতে থাকে। এই হাততালি বহুক্ষণ ধরে চলে। হাততালি যখন কিছুতেই থামতে চায় না—তখন যে শিল্পীদল গান কিংবা নাচে অংশগ্রহণ করেছিল তারাও মঞ্চের সম্মুখে এগিয়ে আসে এবং দর্শকদের সঙ্গে হাততালিতে যোগদান করে এবং সেই সমবেত হাততালিতে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হয়। এই অনুষ্ঠানে

মঞ্চের উপর প্রায় দেড়শ থেকে দু'শত চেয়ারও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে এবং তাদের সাহায্যে সুন্দর খেলা দেখান হয়। কোনো বিশিষ্ট অতিথিকে মালা দেওয়ার একটা বিশেষ প্রথা আছে। প্রথমত সেই অতিথিকে মঞ্চে হাত ধরে নিয়ে আসা হয়। একজন তাঁর পরিচয় মাইকের সাহায্যে করে দেয়, তারপর একদল মেয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে মাল্যদান করে। সেই বিশেষ অতিথিটি তখন অবনত মস্তকে প্রেক্ষাগৃহের সোল্লাসধ্বনির উত্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনেক রাত্তিরে যখন উৎসব শেষ হল—তখন কি হাততালির ধুম। যেন হাততালি দিয়েই ওরা অনুষ্ঠানটিকে জিইয়ে রাখতে চায়। ভিয়েনার রাজপথে তখন প্রচণ্ড শীত নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি ওভার-কোটটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

এইবার একটি মজার গল্প শোনাই। ইউরোপের ভূতের গল্প বললে লোকে ত' হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমি একদিন গভীর রাত্রে লম্বা ভূতের মতো কি একটা দেখেছিলাম। সেই কাহিনীটি বলব। আমি যে হোটেলে থাকতাম তার নাম--হোটেল "স্টাড ট্রিয়েস্ট"। এই হোটেলের ২০ নং ঘর আমার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। ঘরের সামনে দিয়ে লম্বা টানা বারান্দা গেছে, তাতে কার্পেট পাতা। সেই বারান্দার দুই পাশে সব ঘর—মাঝখানকার ওই টানা বারান্দায় মাঝে মাঝে আলো জ্বলছে। একদিন একটু বেশী রাত্তিরে কি একটা অনুষ্ঠানের পরে হোটেলে ফিরছি। হোটেলের প্রত্যেক ঘরের পৃথক চাবি থাকে— হোটেল থেকে বেরবার সময় সেটি পোর্টারের হাতে জমা দিয়ে যেতে হয়—আবার হোটেলে ফিরে সেই চাবি চেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে পারা যায়। যে সময় বোর্ডাররা থাকেন না তখন পরিচারিকা কামরায় ঢুকে ঘর গুছিয়ে, বিছানা পেতে দিয়ে আসে। আমিও যথারীতি ঘরের চাবি পোর্টারকে জমা দিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে চাবি চেয়ে নিয়ে গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে ওপরে উঠে এলাম। অত রাত্তিরে লিফ্‌ট আর ব্যবহার করি নি। সারা হোটেল তখন ঘুমে অচৈতন্য—সব ঘর বন্ধ—কেউ কোথাও জেগে নেই। আমার ঘরের সামনেকার টানা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মনে হল—একটা বিরাট লম্বা লোক সট্‌ করে সরে গেল। আমি অবাক হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এত দীর্ঘ একটা লোক এলই বা কোত্থেকে—আর সে চট্‌ করে সরেই বা গেল কোথায়? শেষকালে ভাবলাম—যুদ্ধের সময় এখানকার বহু লোক ত' অপঘাতে প্রাণ হারিয়েছে—তারাই কেউ হয়ত বিলিতি-ভূত হয়ে এই হোটেলে নিশীথ রাতে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যাই হোক মনে বল আনবার জন্যে আবার গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে ঘরের চাবি খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ভয় যে পেয়েছিলাম সে কথা বলা চলে না;

তবে হঠাৎ অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম—একথা অস্বীকার করতে পারব না।

একদিন একটা হোটেলে ছোট্ট একটি টেবিলে বসে একা লাঞ্চ খাচ্ছি। আমার সামনের সিটটি খালি। হঠাৎ একটি তরুণী এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এখানে বসতে পারি? আমি জবাব দিলাম, নিশ্চয়ই। তরুণী একটি অফিসে চাকরি করেন। টিফিনে লাঞ্চ খেতে এসেছেন। বললেন, এই হোটেলে আমি রোজ লাঞ্চ খাই—এদের খাবার ভালো। কি কি খাবার এরা ভাল রান্না করে সে বিষয়ে তরুণীটি আমায় উপদেশ দিলেন। তিনি একথাও জানালেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি চাকরি নিয়ে এশিয়া অঞ্চলে গিয়েছিলেন এবং চীন ও ভারতবর্ষে কিছুকাল কাটিয়ে এসেছেন। মেয়েটি খুব আলাপী। অল্পক্ষণের ভেতরই আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে তুললেন। ভারতবর্ষ যে তাঁর ভালো লেগেছে একথা সুদুর ভিয়েনাতে বসে একজন বিদেশিনীর মুখে শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম এবং তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

ভিয়েনার অপেরা পৃথিবী-বিখ্যাত। আগেকার দিনে বসন্ত সমাগমে—ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায় ভিয়েনায় এসে ভীড় করতেন এখানকার সৌন্দর্য আর অপেরা উপভোগ করবার জন্যে। ইউরোপীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয়—রাশিয়ার জার, জার্মানীর কাইজার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, ইংলণ্ডের রাজা অনেকেই আসতেন এখানে বসন্ত যাপনের উদ্দেশ্যে—এমনি ছিল পুরাকালে ভিয়েনার মোহ। ভিয়েনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মনোরম তেমনি ভিয়েনার সুন্দরীও নাকি পৃথিবী বিখ্যাত।

এই ভিয়েনা শহরের অপেরা দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল। কিন্তু যখন কোনো সঙ্গী-সাথী জুটল না—আমি স্থির করে ফেললাম নিজেই যাব অপেরা দেখতে। কেন না—ভিয়েনাতে এসে যদি জগদ্বিখ্যাত অপেরা উপভোগ করে না যাই তবে চিরজীবন একটা ক্ষোভ থেকে যাবে।

হোটেল থেকে ফোন করে ব্যবস্থা করে ফেললাম।

অপেরা হাউসে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম—তখন অভিনয় শুরু হতে আর বেশী বিলম্ব নেই। দলে দলে—সুবেশা নারী ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ এসে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকছেন, অনেকে ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। আমার সিট ফোনে রিজার্ভ করা ছিল। যথারীতি দর্শনী দিয়ে ও টিকিট সংগ্রহ করে ভেতরে এসে ঢুকলাম। প্রেক্ষাগারটি খুব ঝকমকে না হলেও সুরুচিসম্মত—এবং প্রাচীনতার ছাপ বহন করছিল। ওপর নীচ সব জড়িয়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রায় হাজার আসন আছে বলে মনে হল।

এদিনকার গীতি-নাট্যটি ছিল—দু'টি পরিবারের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। এক

বাড়ীর ছেলে আর এক বাড়ীর মেয়ে তাদেরই মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী। অপেরা বলতে যা বোঝা যায় এ নাটকখানি ঠিক তাই। সংলাপ সাধারণ ভাবে না বলে আগাগোড়া গানের ভেতর দিয়ে চালান হয়েছে। বাড়ীর কর্তা থেকে শুরু করে দাসী পর্যন্ত সবাই গান গাইছে—আর সে গান তারা এত চড়া সুরে গেয়ে চলেছে যে, সারা প্রেক্ষাগৃহ গম্-গম্ করছে।

মঞ্চটি ঘূর্ণায়মান। দৃশ্যপট বদলানোর একটি অভিনবত্ব লক্ষ্য করলাম। আমরা কলকাতায় রঙমহলের ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দেখি যখন দৃশ্য পরিবর্তন করা হয়—সব আলো তখন নিভিয়ে দিয়ে রীতিমত অন্ধকার করে ফেলা হয়। কিন্তু ভিয়েনার ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দেখলাম—নাটকের পাত্র-পাত্রী অভিনয় করছে—হয়ত তারা একটা ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল—তারা উঠে দাঁড়ালো বাইরে বেরবে বলে; কিন্তু তাদের আর মঞ্চ ছেড়ে যেতে হল না। পুরো আলোর মধ্যে পেছনকার দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল। দর্শক দেখতে পেল—ড্রইং-রুম নদীর ধারে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আগেকার দৃশ্যের কিছুটা দুই পাশে সরে গেল—কিছুটা ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোটাটাই একেবারে ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপার। সুইচ্ টিপে দিলেই হল। আর এই যে দৃশ্য-পরিবর্তন সেটা অন্ধকার করে হয় না। একেবারে দর্শকবৃন্দের চোখের সামনে সব কিছু ঘটে থাকে। দর্শকবৃন্দ দেখল; যারা ড্রইং-রুমে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল—তারাই নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যদিও কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, কেন না—অভিনয়টি হচ্ছিল জার্মান ভাষায়—তবু নাটকের বিষয়বস্তু বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি। তা ছাড়া, গানের সুর ও সেই সঙ্গে অভিনয় অর্কেস্ট্রা সকল দিক দিয়েই উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Music when soft voices die vibrates in the Memory." সেদিনকার অর্কেস্ট্রা শুনে বার বার সেই কথাই মনে হয়েছিল। কখনো সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত সুর-ধারা বন্যার মতো দুকূল প্লাবিত করে দর্শকের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল.... আবার কখনো সেই সুর অতি মৃদুভাবে কানে-কানে কথা বলার মতো—দক্ষিণ সমীরণের মতো—মিলিয়ে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের সে কি করতালি ধ্বনি। সঙ্গীতের প্রভাব যে কতখানি—তা যেন সারা মন দিয়ে অনুভব করতে পারছিলাম। পুরীর সমুদ্রে স্নান করার মত। কখনো ঢেউয়ের দোলায় তিন তলার মতো উঁচুতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—আবার পরমুহূর্তেই সাঁ করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বেলাভূমিতে।

অভিনয় শেষ হয়ে গেলেও সুরের ধারা মনে ঝঙ্কার তুলতে লাগল।

অভিভূতের মত প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমি যে অঞ্চলে ফিরে আসব তার ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছি, কিন্তু ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য

লাইনের ট্রাম কিন্তু তখনও চলছে। পরে আসল খবরটা জানা গেল। তখন বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি ডেকে হোটেলে ফিরে আসি।

সেদিন রাত্রে তন্দ্রার ঘোরেও ভিয়েনার অর্কেস্ট্রার মূর্ছনা শুনতে পেয়েছিলাম।

একদিন দুপুরবেলা একটি লাঞ্চ খেতে গিয়ে কি রকম কৌতুকজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই ঘটনা বলছি। আমার সঙ্গে ছিলেন অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি ডাঃ ধ্রুবরঞ্জন সরকার। দু'জনে গিয়ে ত' ঢুকলাম একটি হোটেলে। অন্যান্য খাবার খাওয়ার পর মুখ বদলানোর জন্য চাওয়া গেল—মিষ্টি কোনো খাবার। খাবার পরিবেশনকারিণী দুধে সেদ্ধ করা ভাত (পায়েসের মতো) আর সেইসঙ্গে মিষ্টি জেলি এনে হাজির। তখন ত' আর ফেরত দেবার উপায় নেই। তাই দু'জনে মেখে নিলাম। আমি বললাম, মন্দ কি? ইউরোপে বসে দিব্যি পায়েস খাওয়া চলছে। ওখানকার দুধ কিন্তু খুব খাঁটি। খেতে মন্দ লাগল না। কিন্তু ডাঃ সরকার কিছুই খেতে পারলেন না। সব ফেলে দিয়ে পালিয়ে এলেন। একদিন এক হাসপাতালের ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেতে গেলাম দু'জনে। বোতলে জমান খাসা দৈ পাওয়া গেল। মাত্র নয় আনা পড়ল। এক বোতল খেলে একেবারে পেট ভরে যায়। দৈ-এর স্বাদও খুব ভালো ছিল। আমাদের জলযোগের দৈ তার কাছে এগোতে পারে না। অথচ এক বোতল দৈ-এর দাম আমাদের দেশে অনেক বেশী পড়বে। সেদিন দৈ-এর সঙ্গে নরম পাঁউরুটি খেতে খুব ভালো লেগেছিল।

ভিয়েনাতে 'ইণ্ডিয়া লিগেশন' অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন—শ্রীরামস্বামী। একদিন সেই অফিসে বেড়াতে গেলাম। ঢুকেই বারান্দাতে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখে সেই বিদেশে এত ভালো লাগল—মনে হল যেন কোনো আত্মীয়কে খুঁজে পেয়েছি। রামস্বামী সেদিন অফিসে ছিলেন না। কোথায় ট্যুরে গিয়েছিলেন। তাঁর সহকারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আমাদের আলাপ হল। বেশ ভদ্রলোক ও আলাপী মানুষ। আমাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। তাঁর কাছ থেকে যথাযোগ্য সদুত্তর পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষ থেকে কয়েকজন তরুণ ডাক্তার ভিয়েনাতে গেছেন—চিকিৎসাবিদ্যায়—বিশেষ করে অস্ত্রোপচারে পারদর্শিতা অর্জন করতে। তার ভেতর বাঙালী ডাক্তারও আছেন। একদিন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল। এই মধুর স্বভাব তরুণদের সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভালই লাগল। তাঁরা চিকিৎসাবিদ্যায় খ্যাতি লাভ করে যখন দেশে ফিরে আসবেন—ভারতের উপকার হবে বলেই আমরা আশা করতে পারি।

ভিয়েনার যে অধ্যাপকের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল এবং যিনি তাঁর বাসায় যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—একদিন তাঁর ওখানে যাওয়া গেল। কিন্তু

অধ্যাপক বাসায় ছিলেন না। তাই তাঁর নামে একটি চিরকুট রেখে চলে এলাম। সেই চিরকুট পেয়ে অধ্যাপক আবার আমার হোটেলে ফোন করলেন। তিনি বাসায় ছিলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং আর একদিন তাঁর ওখানে যেতে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু চারিদিকের ছুটোছুটিতে আমি সময় করতে পারি নি বলে অধ্যাপকের গৃহে আর যাওয়া হয়নি। এই অধ্যাপকের গৃহ ইণ্ডিয়া লিগেশন অফিসের কাছে।

সুযোগ পেলে যে বিদেশীকে অনেকে ঠকাবার চেষ্টা করে এবার তারই একটা উদাহরণ দেব। একদিন আমাদের হোটেলের পোর্টার কোন কাজে অন্যত্র যায় এবং তার এক আত্মীয়কে অফিসঘরে বসিয়ে রাখে। এই সময় ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ ধ্রুববঞ্জন সরকার আমায় একটি জরুরী কাজে ফোন করেন। ফোনে কথা বলে যখন নিজের ঘরে চলে আসছি তখন সেই পোর্টারের আত্মীয় আধা বুড়ো ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে বললেন যে, আমাকে ফোনের চার্জ দিতে হবে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চার্জ কিসের? আমার একটি বন্ধু আমায় ফোন করেছেন নিশ্চয়ই তিনি চার্জ দিয়েই ফোন করেছেন। ফোন যিনি পান তিনি চার্জ দিতে যাবেন কোন্ নিয়মে? এতে সেই বুড়ো ভদ্রলোক বললে যে, আমাদের হোটেলে নিয়ম আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, আসল ব্যক্তির সাময়িক অনুপস্থিতিতে এই বৃদ্ধ একটু উপরি লাভ করতে চায় বিদেশীর কাছ থেকে। আমি জবাব দিলাম, কোন দেশে এ নিয়ম নেই এবং এজন্য আমি এক পয়সাও দেব না। আমার উত্তর শুনে বৃদ্ধটি একেবারে দমে গেলেন।

নেতাজীর স্ত্রী-কন্যার কাহিনী

দিনটি ছিল রবিবার।

তার আগের দিন বিকেল পাঁচটায় ভারতীয় প্রতিনিধি দল "কাফে কাইগার গার্স্টেনে" নেতাজী সুভাষ বসুর সহধর্মিণীর সঙ্গে একটি ঘরোয়া চায়ের মজলিসে মিলিত হন। সেই সন্ধ্যায় সাধারণ ভদ্রতাসূচক আলাপ-আলোচনা চলে। তাতে কিন্তু আমার মন ভরে না। তাই বিদায় নেবার সময় বললাম, আমি কিন্তু নেতাজীর মেয়ে অনিতাকে দেখতে চাই, আলাপ করতে চাই, আর চাই ভাব জমাতে। ছোটদের সঙ্গে আসর জমানোই যে আমার কাজ। শ্রীমতী বসু মৃদু হেসে সম্মতি দিলেন এবং বললেন, পরদিন রবিবার দুপুর দুটোয় যেন আমি তাঁদের বাসায় যাই। আমার নোটবুকের পাতায় নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিলেন।

নেতাজীর কন্যা—সে ত' ভারতবর্ষেরই ঘরের মেয়ে—আমাদের আপনার লোক—তাকে আরো আপনার করে নিতে হবে,—"সব পেয়েছির আসরের" সোনার কাঠি করে নেব তাকে—এই আশা-আকাঙ্ক্ষায় রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

সকালবেলা জানতে পারলাম, আমাদের যোধের প্রতিনিধি মিসেস্ ওয়াদিয়া আজ চলে যাচ্ছেন। তাঁকে যথাসময়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তৈরী হলাম—শ্রীমতী বসুর বাসায় রওনা হবার জন্যে।

ভিয়েনার ট্রামে বিভিন্ন সংখ্যা লেখা থাকে। কোন্ ট্রামে যেতে হবে, সে কথা আগের দিন শ্রীমতী বসু আমায় ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলেন। টেলিফোন নম্বরও লিখে দিয়েছিলেন আমার খাতায়। একবার ভাবলাম, রওনা হবার আগে টেলিফোন করে যাই। কিন্তু এনগেজমেন্ট ত' হয়েই আছে তাই তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়লাম। ট্রামে উঠলাম বটে, কিন্তু কোথায় নামতে হবে আমার জানা ছিল না। ট্রামের কণ্ডাক্টারকে জানিয়ে রাখলাম সে কথা। কণ্ডাক্টার লোক ভাল। সম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে বললে, ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হবে।

ট্রাম ছুটে চলেছে আর আমি শুধু ভাবছি—অনিতা এখন কত বড়টি হয়েছে, দেখতে কেমন হয়েছে—তার বাবার মত হয়েছে কিনা, কোন্ ক্লাসে পড়ে সে, আমাদের দেশে যাবার আগ্রহ তার আছে কি না—এই সব কথা।

হঠাৎ চমক ভাঙলো ট্রামের কণ্ডাক্টারের কথায়। চেয়ে দেখি আমরা একটি টার্মিনাসে এসে পৌঁছে গেছি। কণ্ডাক্টার আমাকে নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল

এবং বললে, চলুন—আপনাকে গলিটা চিনিয়ে দিয়ে আসি। আমি যাব ফেরোগাসীতে। গলির মুখটা দেখিয়ে দিয়ে সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

নম্বর ধরে ধরে এগিয়ে চললাম। রবিবারের দুপুর, নির্জন রাস্তা, দু ধারে বাড়ী আর মাঝে মাঝে লম্বা গাছ। আমি যে সংখ্যাটি চাই তা খুঁজে পেতেও বেশী বিলম্ব হল না। দরজায় কড়া নাড়লাম। একজন এসে দরজা খুলে দিয়ে গেল। শ্রীমতী বসুর সাদর আহ্বান কানে এল—ভেতরে চলে আসুন।

ঢুকেই দেখি—বারান্দা পেরিয়ে ছোট্ট একটি পরিষ্কার উঠোন, ওধারে একটি সুন্দর নির্জন বাগান। সেই বাগানের একটি গাছের তলায় একটি বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চে যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁদের দেখেই চিনতে পারলাম—অনিতার দিদিমা, অনিতার মা—আর অনিতা। শ্রীমতী বসুর সঙ্গে ত' আগের দিনই আলাপ হয়েছিল। তিনি এগিয়ে এসে সাগ্রহে করমর্দন করলেন এবং নিজের মা ও মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা যে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন—সে কথা জানালেন।

ওদিকে চেয়ে দেখি অনিতা আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ভাব করবে না আড়ি করবে সেটা বোধ করি ঠাহর করতে পারছে না। আমি ওকে আদর করে কোলের কাছে টেনে নিলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কপালের খানিকটা, চোখ, নাক আর ঠোঁট একেবারে সুভাষচন্দ্রের মত। ভাবলাম, আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমার মুখে একটি কথা শোনা যায়—"পিতৃমুখী কন্যা সুখী হয়।" তাই হোক, মনে মনে এই কামনা জানালাম।

শ্রীমতী বসু ততক্ষণে আমায় নিয়ে লম্বা বারান্দায় বসিয়েছেন। মাঝখানে একটি বড় টেবিল পাতা। তার চারপাশে আমরা চারজনে বসলাম। দুপুরবেলায় এতটা পথ আসায় আমায় তেষ্টা পেয়েছিল। আমি শ্রীমতী বসুর কাছে এক গেলাস খাওয়ার জল চাইলাম। তাতে অনিতার দিদিমা কি যেন বলে উঠলেন—তাঁর মাতৃভাষায় (জার্মান)। উনি কি বলছেন জিজ্ঞেস করতে অনিতার মা উত্তর করলেন, মা বলছেন, আপনার জন্যে খাবার, কফি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা আছে। শুধু জল কেন?

জবাবে আমি হেসে বললাম, জল চাইছি আমি তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে, সুতরাং সেইটিই আগে মঞ্জুর হোক।

অনিতার মা আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আদেশে তৃষ্ণার জল নিয়ে এলো ছোট্ট মেয়ে অনিতা। নেতাজীর মেয়ের হাতের ঠাণ্ডা জল পেয়ে যে আরো মিষ্টি লাগল সে কথা ত' তোমরা না বললেও বুঝে নিতে পারবে।

আমরা কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম ইংরেজীতে। অনিতার মা এত ভালো ইংরেজী বলেন যে, না বলে দিলে বোঝবার যো নেই যে তাঁর মাতৃভাষা জার্মান। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছিল—অনিতার দিদিমার। তিনি ক্রমাগত শ্রীমতী বসুকে প্রশ্ন করছিলেন, আমি কি বলছি জানবার জন্যে। শেষকালে ঠিক হল—আমরা ইংরেজীতেই কথাবার্তা চালিয়ে যাব—আর অনিতার মা দোভাষীরূপে আমাকে ও অনিতার দিদিমাকে আমাদের পরস্পরের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবেন। এইভাবেই তখন এগিয়ে চলল আলোচনা।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমতী বসু বললেন, রবিবারটা আমরা মোটেই বাসায় থাকিনা। অনিতাকে নিয়ে সোজা চলে যাই—কোন গ্রামে বা কোন পাহাড়ের ধারে, কিংবা কোন ঝর্না-তলায়। সেইখানেই আনন্দের ভেতর দিয়ে সারাটা দিন কাটে। সঙ্গে থাকে খাবার। আবার সন্ধ্যেবেলা তিনজনে ঘরে ফিরে আসি।

আমি দুঃখ প্রকাশ করে উত্তর করলাম, তা হলে ত' আপনাদের একটা রবিবারের আনন্দ মাটি করে দিলাম।

—না-না, তা কেন? জবাব দিলেন শ্রীমতী বসু। আপনার সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ করেও কি আমরা কম আনন্দ পাব? তা ছাড়া, আপনি অনিতাকে দেখতে চেয়েছেন। তাতেও ত' আমাদের খুশী হবার কথা।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে দেখি—অনিতা তখনও অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। নতুন মানুষ, আলাপ জমিয়ে তুলবে কিনা এখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি। কতই বা ওর বয়েস হবে? জিজ্ঞেস করলাম ওর মাকে। এই নয় বছর চলছে অনিতার। আদর করে ওকে আমার কাছে টেনে নিলাম। এইবার কৌতূহলের কুয়াশা বোধ করি কেটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে অনিতা এগিয়ে এল, আদর করে কোলে তুলে নিলাম ওকে। ভিয়েনার ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য যে রকম ভাল, অনিতার কিন্তু তা নয়। মনে হয় যেন একটু রোগা। আর একটু মোটাসোটা হলে বোধ করি ভালো লাগত।

কানে-কানে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ক্লাসে পড় তুমি? অনিতা জবাব দিল, ক্লাস ফোর।

শ্রীমতী বসু বললেন, মাতৃভাষার সঙ্গে ও একটু একটু ইংরাজীও শিখছে। আমার সঙ্গে অবশ্য ও ইংরাজীতেই কথা বলতে লাগল। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজী বেশ মিষ্টি শোনালো অনিতার মুখে।

ওর আসল নাম ANITA (এ্যানিটা), কিন্তু আমি বাংলা করে নিয়ে সোজাসুজি নামকরণ করে বললাম 'অনিতা'। তাতে অবশ্য ওঁদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি উঠল না।

আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা অনিতা, কি কি বিষয় তোমার ভাল লাগে?

জবাব এলো---সেলাই, ইতিহাস আর ভূগোল।

—ইতিহাসটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়বে। জানবে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের ভারতবর্ষের কথা। তোমার পিতৃভূমির কথা। আর সব সময় মনে রাখবে—কত বড় মাপের মেয়ে তুমি। অনিতা ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

কিন্তু অনিতার মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বড় বাপের মেয়ে—এইটেই ত' জীবনে একমাত্র গর্ব থাকা উচিত নয়। বরং আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন যেন ও নিজে মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি শ্রীমতী বসুর চোখে-মুখে একটা স্থির সঙ্কল্প ···· একটি নীরব-তপস্যার স্ফুলিঙ্গ যেন ফুটে বেরচ্ছে।

অনিতার মাথায় আমি হাত রাখলাম। মনে মনে হয়ত সেই কামনাই করলাম যে, অনিতা মানুষ হয়ে যেন তার পিতৃভূমিতে ফিরে যায়। তার পিতার মহান আদর্শ—দেশকে গড়ে তোলবার বিরাট দায়িত্ব যেন সে গ্রহণ করে।

আমাদের কথাবার্তা যেন ক্ষণিকের জন্যে দুঃখে ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা করবার জন্য বলে ফেললাম, জানেন মিসেস্ বোস, নেতাজী প্রতিষ্ঠিত বাঙলা দৈনিক কাগজ "বাঙলার কথা"-তেই প্রথম আমার সাংবাদিক জীবনের হাতে-খড়ি হয়। তখন তিনি নেতাজী হন নি, ছিলেন—বাঙলার আদরের সুভাষচন্দ্র। সে আজ কতকালের কথা।

আলোচনার মোড় ঘুরে গেল······শ্রীমতী বসু আনন্দ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতার স্বাস্থ্য এখন কেমন। বিভিন্ন ঋতুতে কলকাতার উত্তাপ কেমন থাকে?

আমি "ফুল্লরার বারোমাসী"র মতো কলকাতার ছয় ঋতুর ব্যাখ্যা করলাম। তিনি ভয় পেয়ে কৌতুক করে হাসতে হাসতে বললেন, ওরে বাবা। তা হলে আমি কখনও কলকাতায় যাচ্ছিনে।

আমি প্রশ্ন করলাম, কেন যাবেন না শুনি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি ভিয়েনার মেয়ে, ভিয়েনাতে জন্মেছি, চিরকাল ভিয়েনাতে আছি, আর ভিয়েনাতেই মরতে চাই। একটা বিষণ্ণ ভাব যেন তাঁর চোখের ওপর ছায়া ফেলল। আমি সে সম্পর্কে আর বিশেষ কোনো প্রশ্ন তাঁকে করলাম না। অনিতাকে উপলক্ষ করেই আলোচনা তখন গড়িয়ে চলল ছোটদের শিক্ষা নিয়ে। ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে কিনা তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে আমি জানালাম যে, দেশবন্ধু যখন কলকাতার মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা, তখন থেকেই এই প্রচেষ্টা চলছে বটে ···· কিন্তু সারা ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের এখনও যথেষ্ট দেরী আছে।

শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে, ইউরোপের সব দেশেই

এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমাদের স্বাধীন দেশেও যে সে ব্যবস্থা আশু প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে, স্বীকার করতেই হল।

বিভিন্ন দেশের ছড়া, গান ও নাচ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলতে লাগল। আমি ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের নাচ ও গানের কথা বললাম। ঠাকুমা-দিদিমার মুখে-মুখে কি জাতীয় ছড়া সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, তার উল্লেখ করলাম—তার ইতিপূর্বে আমাদের "সব পেয়েছির আসরের" যে সংগঠনী ওঁদের উপহার দিয়েছিলাম—তাই খুলে আমাদের সোনার কাঠির নাচ-গানের কথা, ভারতের কিশোর-আন্দোলনের কথা সব বুঝিয়ে বললাম। আমাদের সংগঠনীর প্রচ্ছদপটের ওপর মেয়েদের যে ছবি আছে লক্ষ্য করে ...লাম—অনিতার দৃষ্টি তা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

ইতিমধ্যে অনিতার দিদিমা কোন্ ফাঁকে উঠে গেছেন—আমি আদৌ লক্ষ্য করিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, এক বিরাট প্লেট ভর্তি নানারকম পিঠে নিয়ে এসে তিনি টেবিলের মাঝখানে রাখলেন।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, এ আপনি করছেন কি? অনিতার মা হাসতে হাসতে বললেন, ভয় নেই। আসুন না, সবাই মিলে খাই। ওঁর এই আন্তরিকতা আমার খুব ভালো লাগল। সবাই মিলে খাওয়া শুরু করে দিলাম। অনিতা প্রথমটা লজ্জা পাচ্ছিল—তাকেও কাছে টেনে নিলাম। খেতে খেতে আবার গল্প চলল।

আমি বললাম, বাঙলাদেশে এক রকম পিঠে আছে—তার নাম 'পাটি-সাপ্‌টা'—আপনাদের এই পিঠেও কিন্তু অবিকল সেইরকম। শুনে অনিতার দিদিমা খুব হাসতে লাগলেন, আর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, খাও-খাও আরো খাও। লজ্জা করো না।

পিঠের সঙ্গে চলেছে—গরম কফি। এক কাপ ফুরিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে অনিতার দিদিমা আর এক কাপ ভর্তি করে দেন। কিন্তু আমি যে কফি-খোর মানুষ নই, সে কথা তাঁকে বোঝান মুস্কিল। দূর দেশের অতিথির আপ্যায়নে তাঁকে বিশেষ তৎপর দেখা গেল।

অনিতাকে বললাম, ইস্কুলে তুমি কি কি বই পড নিয়ে এসো—আমি দেখব। উৎসাহে ও আনন্দে অনিতা ঝলমল করে উঠল। ছুটে গিয়ে সমস্ত বই এনে আমার কোলের ওপর ফেলে দিল। তারপর আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল কোন্‌টা কি বই। পাতা উল্‌টে-উল্‌টে দেখাতে লাগল তার নানারকম মজাদার ছবি।

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে আমি শ্রীমতী বসুকে জিজ্ঞেস করলাম, সারাদিন আপনার কি রকম করে কাটে? বলুন না। আমার শুনতে ভারী ইচ্ছে করছে।

অনিতার মা একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, আচ্ছা তা হলে শুনুন। এই ছোট্ট অনিতাকে কেন্দ্র করে আমাদের তিনজনের সংসার। আমাকে অফিসে চাকুরি করতে হয়। ফিরতে রাত নটা, দশটা---কোনদিন এগারোটাও হয়ে যায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, তা হলে ত' আপনাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়! ম্লান হেসে তিনি জবাব দিলেন, One should work hard to live। কি অব্যক্ত বেদনার কথা বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন আমি সেটা বেশ বুঝতে পারলাম। দুঃখিত হলাম তাঁর মনের গভীরতম ক্ষতের কথা অজান্তে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি বলে।

আমাদের আলোচনার ধারাকে সহজ করে নেবার জন্যে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা, এটা কি আপনাদের নিজের বাড়ী? কত দিন এখানে আছেন?

উত্তরে অনিতার মা বলেন, না না, এটা আমাদের নিজের বাড়ী নয়। গত ৩৮ বছর ধরে এখানে আমরা আছি। আমার জন্ম থেকে এই বাড়ীতেই'ত রয়েছি। আর কোথাও উঠে যাবার কথা আমরা ভাবিনা। এই বাড়ীর সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই বাড়ীতে আমার বাবা ছিলেন—তাঁর খুব বইয়ের শখ ছিল। এখনও তাঁর হাতে-গড়া লাইব্রেরী রয়েছে এই বাড়ীতে। এই বাড়ীতেই আপনাদের নেতাজী এসে বাস করতেন। ইউরোপের যুদ্ধ চলাকালে এই বাড়ীই ছিল তাঁর হেড কোয়ার্টার। ঝড়ের মতো বেরিয়ে যেতেন কিছুদিনের মতো—জার্মানী কি কোথায় কে জানে! তখনও জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন মিঃ বোস—তারপর হঠাৎ একদিন আবার এই বাড়ীতেই ফিরে আসতেন।

শ্রীমতী বসু মুখ ফুটে না বললেও বেশ বুঝতে পারলাম, নেতাজী যখন অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন ভিয়েনার এই ছোট্ট স্নেহ-নীড়ে ফিরে আসতেন —সেবার আশায়, সাহচর্যের কামনায়, আর আসতেন অতি গোপনীয় ও জরুরী কাগজ-পত্র তৈরী করার প্রয়োজনে।

আমাদের ভারতের ইতিহাসে এই জাতীয় বৈদেশিক মহিলার সাহচর্য আর প্রেরণা ত' নতুন নয়। কবি মাইকেলের সহধর্মিণী হেনরিয়েটা কবির অতি বড় দুর্দিনে কবিকে প্রেরণা দিয়ে, সেবা দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র-শিষ্যা-নিবেদিতা বিদেশী মহিলা হয়েও ভারতের জনগণের সর্ববিধ মুক্তি-কামনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিদেশিনী মহিলা অ্যানি বেসান্ত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সহধর্মিণী নেলী সেনগুপ্তা সকল রকম দেশের কাজে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন----এসব কাহিনী আমরা ভুলব কি করে? সান্ত্বনা এই যে, তাঁরা ভারতের সম্মান পেয়েছেন।

শ্রীমতী বসুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, এই বিদেশিনী মহিলা সেক্রেটারীরূপে নেতাজীর অতি গোপনীয় কাগজপত্র রচনায় সাহায্য করেছেন, পুস্তক-প্রণয়নে সকল রকমে সহযোগিতা করেছেন, স্ত্রীরূপে নেতাজীর অতি দুর্দিনে সেবা দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, প্রেম ও প্রীতি দিয়ে দূর বিদেশে আগলে রেখেছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস যখন লিখিত হবে—এই "কাব্যে-উপেক্ষিতা" কি তাঁর প্রকৃত মর্যাদা পাবেন না ? ভবিষ্যতের ইতিহাস-প্রণেতার কাছে আমি শুধু সবিনয়ে প্রশ্নটি উল্লেখ করে রাখলাম।

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলাম আমি। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরল না।

সেই থম্‌থমে পরিবেশকে হাল্‌কা করে দিল, নেতাজীর মেয়ে অনিতা।

শুধলে, আচ্ছা, ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের কথা বল না। আমি তাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, তার চাইতে তুমি বলো—তোমার জন্মদিন কোন্ তারিখে ?

মনে মনে এই বাসনা রইল—তারিখটা জেনে রাখি। তারপর ভারতবর্ষ থেকে সুবিধেমত ওকে জন্মদিনের উপহার পাঠিয়ে অবাক করে দেব।

অনিতার মা বললেন—নয় বছর আগে ২৯শে নভেম্বর ও আমার কোলে এসেছিল। চুপি চুপি তারিখটা টুকে রেখে দিলাম আমার নোটবুকে।

হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা, সারা ভারতবর্ষ কিভাবে নেতাজীর জন্মদিন পালন করে আপনি কি তা জানেন? শ্রীমতী বসু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, বিশ্বাস করুন, সব খবরই আমি রাখি। এমন কি উৎসবের ছবি পর্যন্ত আমার কাছে আছে।

আমি ইতিমধ্যে অনিতার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছি, এবং অনিতাও হয়ত মনে মনে বিশ্বাস করেছে যে, লোকটা আমি নেহাত খারাপ নই। ওর স্কুলে কেমনভাবে লেখাপড়া শেখায়, ওর বন্ধু কে-কে, কি তাদের নাম···এইসব খবর নিতে আমি যখন ব্যস্ত, তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি—কি কথা নিয়ে অনিতার দিদিমাতে আর তার মা'তে কথা কাটাকাটি চলছে।

আমাকে নিয়ে কোনো ব্যাপার নয়ত? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি নিয়ে আপনাদের ঝগড়া চলছে······? আমি কি তার ভেতর নাক গলাতে পারি না ? (*May I pock my nose into it ?*) *অনিতার মা হেসে বললেন, আমাদের মা-*মেয়েতে ঝগড়া হচ্ছে—আপনাকে কোথায় বসালে আরামদায়ক হবে তাই নিয়ে। মা বলছেন আমাদের ড্রইং-রুমে নিয়ে বসাতে। আর আমি বলছি—বারান্দার এই ঝিরঝিরে হাওয়াতেই ভালো। কেমন, আমি ঠিক বলি নি?

অনিতার দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তাঁর একান্ত ইচ্ছে যে, আমি গিয়ে ভেতরে তাঁদের ড্রইং রুমে বসি। কাজেই চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে

বললাম, বারে। আপনাদের বাসায় বেড়াতে এলাম আর ড্রইং রুমে বসব না? চলুন, সবাই মিলে সেইখানে বসে আসর জমিয়ে তুলি।

দিদিমা খুব খুশী হয়ে উঠে পড়লেন সবাইকার আগে। বাঃ! ছোট্ট গুছোনো ড্রইং রুমটি। একদিকে অনিতার দাদামশায়ের লাইব্রেরী, অন্যদিকে বসবার কৌচ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম।

অনিতা ছুটে এসে আমাকে শুধোল, আচ্ছা, তোমার ছোট্ট মেয়ে আছে? প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, তোমার চাইতেও ছোট, তিন-চার বছর বয়স।

—কি নাম বল না।

—ছুটু।

তক্ষুনি ছুটে সে নিজের মায়ের কাছে চলে গেল। গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মায়ের কানে-কানে কি যেন বলল। আমি ব্যস্ত হবার ভান করে বললাম, আমার নামে অনিতা মায়ের কাছে নালিশ করছে না ত'?

অনিতার মা মৃদু হেসে বললেন, না-না। ওর ইচ্ছে হয়েছে আপনার ছোট্ট মেয়েকে ও একটা গল্পের বই উপহার দেবে।

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, তাই নাকি? অনিতার দেওয়া উপহার নিয়ে গেলে ত' আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা লোফালুফি শুরু করে দেবে।

মায়ের সম্মতি পেয়ে অনিতা ছুটে গেল—গল্পের বই নিয়ে আসতে। তক্ষুণি বইটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে ফিরে এল। আমি বললাম, তুমি যে বইটা দিচ্ছ তাতে কিছু লিখে দেবে না? একেবারে গিন্নি-বান্নির মতো সে কলম নিয়ে লিখতে বসে গেল। তাকিয়ে দেখি সে লিখছে "To little Chutu from Anita. Vienna 20th of April 1952" ছোট্ট অনিতার স্নেহের দান আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। এই ছবির বইখানার নাম "THREE TALES" বইখানাতে অনেক ছবি আছে। আর সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বইখানার একটি লাইন জার্মান ভাষায় লেখা আর পরবর্তী লাইন ইংরেজীতে তারই অনুবাদ। এইভাবে গোটা বইটা ছাপা হয়েছে। অস্ট্রিয়ার যেসব ছেলে মেয়ে তাড়াতাড়ি ইংরেজী শিখতে চায় তাদের জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু বই দিয়েই অনিতা খুশী নয়, ভিয়েনা শহরের একটি ছাপান কার্ড নিয়ে এল। এইটি সে আসরের ছেলে-মেয়েদের উপহার দিল। নিজের হাতে লিখে দিল "Best greetings from Vienna, Anita."

আমি বললাম, এই উপহার দেওয়াতে আসরের সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেল। তুমিও সব পেয়েছির আসরের সভ্যা হয়ে গেলে। তোমার কার্ড আমি কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেব। ভারতবর্ষ থেকে তার নামে কার্ড আসবে জেনে অনিতা খুব খুশী।

শ্রীমতী বসু এইবার পৃথিবীর নানান দেশের রূপকথার আলোচনা শুরু করলেন এবং ভারতবর্ষের রূপকথা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বিষ্ণুশর্মা, ঈশপ, ও হান্স আণ্ডারসনের গল্পের আলোচনা করে ভারতবর্ষের রূপকথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁকে কিছু বললাম। বিষ্ণুশর্মার নাম উল্লেখ করতে তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, আচ্ছা একটা বিষয় আপনার কাছে আমার জানবার আছে। এক মিনিট। তিনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে একটি ইংরেজী বই নিয়ে এলেন। ওটা হাতে দিতে দেখলাম বিষ্ণুশর্মার "পঞ্চতন্ত্রের" ইংরেজী অনুবাদ। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, পড়তে পড়তে একটা জায়গায় আমি আটকে গেছি। আচ্ছা বলুন ত' 'গরুড়' মানে কি? আমি জবাবে বুঝিয়ে দিলাম যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতা এবং বিষ্ণুরই আর এক নাম নারায়ণ। নারায়ণের বাহন হচ্ছে গরুড়। গরুড় পাখীর বৈশিষ্ট্য কি সেটাও তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম। মনে হল তিনি আমার ব্যাখ্যায় খুশী হয়েছেন।

কথা প্রসঙ্গে জানালেন দেখুন, আমি প্রতিবেশী কারো সঙ্গে মিশি না। কাজ আর লাইব্রেরী .... এই নিয়েই আমার জীবন কাটে। ভারতবর্ষের কিছু কিছু রূপকথা যদি ইংরেজীতে তর্জমা হয়ে থাকে— তবে আমায় পড়বার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন? আমি সানন্দে সম্মত হলাম। [কলকাতা থেকে আমি কতকগুলো বই অনিতাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ইংরেজীতে অনূদিত ভারতবর্ষের রূপকথা এখনো ভাল রকম সংগ্রহ করতে পারিনি।]

শ্রীমতী বসুর লাইব্রেরীর মাথার ওপর একটি প্যাঁচার মূর্তি আছে। তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্যাঁচাকে ভারতবর্ষের লোকেরা কি মনে করে?

আমি উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষে লক্ষ্মী দেবী হচ্ছেন Goddess of Wealth, তার বাহন হচ্ছে প্যাঁচা। জ্ঞানের (Wisdom) প্রতীক রূপেও প্যাঁচা সর্বত্র আদৃত হয়ে থাকে। তিনি বললেন, কিন্তু কোনো কোনো দেশ মনে করে থাকে প্যাঁচা হচ্ছে Sign of foolishness! আমি উত্তরে জানালাম, অন্ততঃ ভারতবর্ষে সেই মতবাদ প্রচলিত নেই। তবে কুনো লোককে কেউ কেউ প্যাঁচার সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকে বটে। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতার ব্যাখ্যা তিনি শুনতে চাইলেন। আমি আমার মনোমত ব্যাখ্যা তাঁকে শুনিয়ে দিলাম।

এক বিষয়ের পর আর এক বিষয়ের আলোচনায় আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। শিশুশিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, শেষকালে আমরা রাজনীতিতেও এসে পৌঁছলাম। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগনের অনেক খবরই তিনি রাখেন। এই দেশের একটি ইংরেজী কাগজ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বললেন, ওই কাগজটা আমি রীতিমত পড়ি। কাগজটা তাঁর টেবিলের ওপর [illegible] সেই সঙ্গে আরো অনেক সাময়িক পত্রিকাও দেখলাম। নেতাজীর

জীবিতকালে তিনি কোন্ কোন্ রাজনৈতিক অঞ্চল থেকে আঘাত পেয়েছেন সেকথাও বেদনার সঙ্গে জানালেন।

বেলা দুটো থেকে প্রায় ৪।। টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে আমাদের আলোচনা হল। শ্রীমতী বসু এত সুন্দর গল্প করতে পারেন যে, চুপচাপ বসে শুনতে ইচ্ছে করে। আমাদের দেশে অন্নপ্রাশনের উৎসব কেমন হয় সে সম্বন্ধে তিনি চমৎকার গল্প করলেন। একবার বসু পরিবারের কোন আত্মীয় ভিয়েনাতে ছিলেন। তাঁর এক সন্তানের মুখে ভাত হয়েছিল। পায়েস ইত্যাদিও রান্না হয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় মতে। অন্নপ্রাশন-উৎসবে দেওয়া সমস্ত সাজানো খাবার ভাগাভাগি করে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের খেয়ে ফেলতে হয় এবং সেই ব্যাপারে অনিতা যে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিল তিনি আমায় সে গল্পও শুনিয়ে দিলেন।

ভারতবর্ষে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছেন কিনা সেই আলোচনা করতে গিয়ে অনিতার মা আমায় জানালেন যে, তাঁদের পরিচিত ভিয়েনার এক ভদ্রলোক নাকি ভারতবর্ষে গিয়ে সন্ন্যাসী-জীবন যাপন করছেন।

বেলা পড়ে এল। এখন আমায় বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আমার কৌতূহলের শেষ নেই। জানালাম, দেখুন, আর একটি কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস করব।

তিনি উত্তর করলেন, বলুন—

—নেতাজীর শেষ চিঠি আপনি কবে পেয়েছেন? এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

পাথরের মূর্তির মতো তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর করলেন, গত ১৯৪৩ সালে জাপান থেকে তিনি আমাকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি একবছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে ১৯৪৪ সালে ভিয়েনাতে আমার হাতে এসে পৌঁছয়। তারপর আমি আর তাঁর কোনো খবরই পাই নি।

মনে হল, এই খবরটি বলতে গিয়ে অসহ্য বেদনায় তিনি যেন নীল হয়ে গেলেন।

যখন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম অনিতার দিদিমা তাঁর মেয়ের মারফৎ আমায় অনুরোধ করলেন—আবার ভিয়েনায় আসতে। শ্রীমতী বসু বললেন, Mother gives their good wishes to your Family.

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অনিতাকে আদর করে যখন বাড়ী থেকে পা বাড়াতে যাব—অনিতার মা দু'পা এগিয়ে এসে বললেন, আপনি হয়ত রাস্তা ভুল করে ফেলবেন, অনিতা আপনার সঙ্গে যাক।

সত্যি বিস্ময়ে আমার মাথা নত হয়ে এলো। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে এতখানি আপনার করে নিয়েছেন। আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম— কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই শুনলেন না। মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন আমার

সঙ্গে। অনিতাও খুব উৎসাহী। আমার সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, চলো তোমায় একেবারে ট্রামে বসিয়ে দিয়ে আসব।

অনিতার ছোট্ট হাতখানি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে পথ চলতে চলতে বললাম, অনিতা, তুমি যখন লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে—তখন একবার তোমার পিতৃভূমি দেখতে যেও। দেখবে সে দেশ কতো বড়। সেই দেশের সবাইকে তুমি আপনার করে নিতে পারবে না?

ছোট্ট মেয়ে অনিতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমায় তুলে দিলে একটা ট্রামে। তারপর বলল, এইবার আর তোমার পথ হারাবার ভয় নেই। ওকে কোলে তুলে আদর করে বিদায় দিলাম।

অনিতা ভিয়েনার পথ দিয়ে ছুটে চলেছে ওর মায়ের কাছে। মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানাল। আমি যেন আর ওর দিকে ভালো করে চাইতে পারছি না। মনে জাগছে অন্য কথা। আজ যদি আমাদের ভাগ্যগুণে নেতাজী আমাদের মাঝখানে থাকতেন—ভারতের এই দুঃখ, দৈন্য, এই গ্লানি, এই প্রাত্যহিক আত্মহত্যা—তার কি লাঘব হত না?

অনিতার দিকে আর একবার তাকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম; তোমাদের কাছে লুকব না, কিসের বেদনায় জানি না—দু'চোখ আমার জলে ভরে এলো!

ভারতের মেয়ে কি কোনদিন ভারতে ফিরে আসবে না?

ভিয়েনা দেখা আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের আসরের খেলাধূলা বিভাগের রবীন সরকার বর্তমানে লণ্ডনে আছে। পত্রযোগে তার সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছিল যে সে ভিয়েনাতে আসবে—তখন আমরা দু'জন একসঙ্গে লণ্ডনে চলে যাবো।

যে কোন কারণেই হোক রবীন এসে ভিয়েনায় পৌঁছতে পারে নি। তাই একা একা আর অতদূর লণ্ডনে যাওয়ার উৎসাহ বোধ করলাম না। ও যদি আসত তবে এই ফাঁকে আমার লণ্ডনটা দেখা হয়ে যেত। রবীন আসবে এই আশাতেই দিন কয়েক থাকলাম, তারপর স্থির করে ফেললাম—সুইজারল্যাণ্ড দেশটি দেখে বিমানযোগে দেশে ফিরে যাব।

শ্রীমতী বসুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড দেখার বাসনা ব্যক্ত করেছিলাম। তাতে তিনি উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহর অতি সুন্দর জায়গা। সেখানে তাঁর এক বান্ধবী থাকেন তাঁর নাম হচ্ছে—মিসেস ইভা ওয়ালটার। "ইণ্ডিয়া ষ্টোর্স" নামে তাঁর একটি দোকান আছে। এই দোকানে ভারতবর্ষের বহু দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাওয়া যায়। শ্রীমতী বসুর পরিচয় নিয়ে জুরিকেই যাবো স্থির করে ফেললাম। বিমানে না গিয়ে ট্রেনে যাওয়াই স্থির করলাম। তাতে সুইজারল্যাণ্ড দেশটি আরো কাছাকাছি দেখবার সুযোগ পাব।

প্রথমে ডাঃ চৌধুরী প্রস্তাব করেছিলেন যে, বাসে করে যাওয়াই ভাল। তাতে সুইজারল্যাণ্ডের গ্রামগুলি আরো ভাল করে দেখবার সুবিধে হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, বাস রুট তখনও খোলে নি। এই বাস রুটটি খুলবে গ্রীষ্মকালে। এখানে বলা প্রয়োজন যে অষ্ট্রিয়া কিম্বা সুইজারল্যাণ্ডের গ্রীষ্মকাল তখনও আসে নি।

ভিয়েনার কে. এল. এম. অফিসে গিয়ে ঠিক করে এলাম যে, আমি রোম থেকে বিমানে দেশে ফিরব এবং কবে আমার সিট্ চাই সেটাও জানিয়ে দিলাম ওদের অফিসে। ওরা আমষ্টারডামে ফোন করে জানতে পারলেন যে, সিট এখন খালি নেই। তবে এর মধ্যে যদি কেউ যাওয়া বাতিল করে তবে সিট পাওয়া যাবে।

পাকাপাকি খবর জানবার জন্যে তাঁরা আমাকে বিকেলবেলা আবার অফিসে যেতে বললেন। বিকেলে গিয়ে খবর পেলাম যে, ভারপ্রাপ্ত কর্মী অনেক তদ্বির করে আমার নির্ধারিত দিনেই সিট্ পেয়েছেন। আমি যেন সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে যথা সময়ে রোমে গিয়ে হাজির হই।

এদিকে তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সন্ধ্যের পর গাড়ী। আগে থেকে টিকিট কিনে রেখেছিলাম সিটি অফিসে। সন্ধ্যের মুখে একটা হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে নিচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ সরকার। তিনি আমায় ট্রেনে তুলে দেবেন। খাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। তবু খাচ্ছি আর গল্প করছি এমন সময় মিস্ পিক্সনার এসে হাজির। আমাদের গল্প চলতে লাগল। ডাঃ সরকারের ইচ্ছে এক বছর ভিয়েনায় থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। সেই জন্যে তিনি একটি নিরিবিলি ঘর সস্তায় খুঁজছিলেন। মিস্ পিক্সনারকে অনুরোধ করতে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন ভরসা দিলেন।

গল্প করতে করতে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে আমরা খেয়াল করি নি। হঠাৎ মিস্ পিক্সনার হাত ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, আপনার বড্ড দেরী হয়ে গেছে যে। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণে হোটেলে ফিরে গিয়ে স্যুটকেশগুলি নীচে নামিয়ে আনবার ব্যবস্থা করুন।

আমাদের কোনো কিছু বলবার কিম্বা আপত্তি করার আগেই তিনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেলেন। ডাঃ সরকার আর আমি তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এসে স্যুটকেশগুলি গুছিয়ে নিলাম। এর মধ্যে শ্রীমতী শেফালী নন্দী একটি স্যুটকেশ দিয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতে। ইতিমধ্যে মিস্ পিক্সনার ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। এমন একটি করিৎ-কর্মা মেয়ে কদাচ দেখা যায়। স্যুটকেশগুলি ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে কিভাবে যে আমাদের

একটু উপকার করবেন—সে বিষয়ে মিস্ পিক্সনারের প্রখর দৃষ্টি। বারণ করলে তিনি শুনবেন না। সত্যি, কি ভাষায় তাকে ধন্যবাদ জানাব এই কথাই বার বার ভাবছিলাম। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। ভিয়েনার এই হিতৈষী বান্ধবীর কথা কোন দিনই ভুলতে পারব না।

ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম এবং ডাঃ সরকারের সহায়তায় স্যুটকেশগুলি নিয়ে নির্দিষ্ট প্লার্টফর্মে হাজির হলাম।

ভিয়েনা থেকে ভারতবর্ষে যথা সময়ে চিঠি পৌঁচ্ছিল না। তাই ডাঃ সরকার তাঁর বাবার কাছে লেখা একটি জরুরী চিঠি আমার সঙ্গে দিয়ে দিলেন এবং হাওড়ার এক হাসপাতালে ফোন করে তাঁর সহকারীকে একটি প্রয়োজনীয় কথা যেন বলি এই অনুরোধ জানিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ট্রেনে উঠে একটি কামরায় ঢুকে আমার পুরানো পন্থা অবলম্বন করলাম। মানে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম—কেউ ইংরেজী জানেন কিনা?

একটি বৃদ্ধা মহিলা আর একটি তরুণী এক কোণে বসেছিলেন। তরুণীটি আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, ইংরেজীতে কথা বলা তার অভ্যেস আছে।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ত' এদেশের মেয়ে, কোথায় ইংরেজী শিখলেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

তরুণী জবাব দিলেন, আমি এক সময় ভিয়েনাতে এক আমেরিকান অফিসে কাজ করেছি—সেইখানেই ইংরেজী বলতে শিখেছি।

বৃদ্ধা মহিলাটি জানালেন যে, তিনি এই তরুণীর মা। তরুণীটি সওদা ইত্যাদি করতে মায়ের কাছে শহরে এসেছিলেন। তার স্বামীর ঘর পল্লী অঞ্চলে। সেইখানেই তিনি ফিরে যাচ্ছেন।

বৃদ্ধা মহিলাটি আমাকে ডেকে তাঁর কাছে বসালেন, বললেন, আমি ত' নেমে যাচ্ছি। আমার বাড়ী ভিয়েনা শহরেই। তোমরা দু'জনে গল্প করতে করতে যাও—সে বেশ ভালই হবে। মেয়ের একটি পথের সাথী জুটল বলে তিনি খুব খুশী হলেন।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করে বৃদ্ধা মহিলাটি ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। তখন আমাদের দুইজনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সুরু হল। তরুণীটি সুন্দরী, আরো সুন্দর তার স্বাস্থ্য। তিনি বলতে লাগলেন তার নিজের কথা। আমেরিকান অফিসে কাজ করবার সময় এই দেশেরই একজন তরুণের সঙ্গে তার আলাপ হয়। তরুণটি বিমানের ইঞ্জিনীয়ার। আলাপ ক্রমে প্রীতিতে পরিণত হয়—তারপর তারা পরস্পরকে বিয়ে করেন। সুখের সংসার তাদের, একটি নদীর ধারে চমৎকার বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী, বাড়ীর পেছনে উঁচু পাহাড়—সেখানে বরফ জমে থাকে। তরুণীটি বাড়ীতে গো-পালন করেন, শাক-সব্জীও প্রচুর হয় নিজের বাড়ীতে।

পরিশ্রম করতে এতটুকু পেছপা নন। সম্প্রতি কিছুদিন হল তাদের একটি মেয়ে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মেয়ে বলতে একেবারে অজ্ঞান। সেই মেয়েরই নানা রকম পোষাক আর খেলনা কিনতে তরুণীটি শহরে এসেছিলেন। ভিয়েনাতে এসে থাকবার কোনো অসুবিধাই নেই। কেননা তার বাপ-মা ভিয়েনাতে বসবাস করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাদের বাড়ী যখন নদীর ধারে—তখন নিশ্চয়ই খুব নদীতে সাঁতার কেটে স্নান করেন?

তরুণী হেসে ফেললেন। বললেন, না, ছোট নদী। পাহাড়ী নদীও বলতে পারেন। সেই বরফ গলা জলে নামবে কার সাধ্যি? তবে তার ভিতর ছিপ ফেলে মাছ ধরা চলে।

তরুণীটি দেখলাম, নিজের ছোট্ট সংসারের কথা বলতে খুব ভালবাসেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি ত' মেয়েকে ফেলে চলে এসেছেন। আপনার স্বামী যাবেন কর্মস্থলে, তখন আপনার মেয়েকে কে দেখবে?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি অল্প বয়সের একটি পরিচারিকা রেখেছি। সে দিন-রাত্রির আমার কাছে থাকে, আর আমার মেয়েকে খুব ভালবাসে। তার ভরসাতেই ত' আমি বাইরে বেরতে পারি। কিভাবে তার স্বামী আর মেয়ে দরজার গোড়ায় তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে-মেয়েটি কিভাবে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই সব কথা বলে তরুণীটি একেবারে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন।

তারপর তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, শুধু নিজের সংসারের কথাই ত' বলছি। এইবার আপনার বাড়ীর গল্প করুন—আমি শুনব। আমি উত্তর দিলাম, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আমি এসেছি। কোন্ উদ্দেশ্যে ভিয়েনাতে এসেছিলাম—সেকথাও তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

ভারতবর্ষের নাম শুনে তরুণী উত্তর দিলেন আমার স্বামীর খুব ইচ্ছে যে ভারতবর্ষ দেখেন। সুযোগ পেলেই বিমানে করে তিনি ভারতবর্ষ দেখতে যাবেন।

তারপর মেয়েটি আবার বললেন, না-না। খালি খালি নিজের কথাই বলছি। এইবার আপনি বলুন আপনার নিজের বাড়ীর কথা, ছেলে-পুলের কথা, তাদের মায়ের কথা, শুনতে আমার ভারী ভালো লাগবে।

এই অষ্ট্রিয়ান দুহিতার সরল ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল। বুঝলাম, নারী সব দেশেই সমান। স্নেহশীলা, নীড়-প্রিয়, আর সকল সংসারের খুঁটিনাটি কথা জানবার জন্যে একান্ত উৎসুক। ভেবে দেখতে গেলে বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের কলকাতার শহরে যে মহিলাটি সিনেমা কিম্বা থিয়েটার দেখতে গিয়ে পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে রান্না আর গহনার আলোচনায় মত্ত হয়ে ওঠেন এবং অপরের

সংসারের খুঁটিনাটি সব খবর জানবার জন্যে উৎসুক হন তার সঙ্গে এই অষ্ট্রিয়ান তরুণীর মূলত কোন তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু এই যে, এঁরা অতি ছেলেবেলা থেকেই স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করবার সুযোগ পান, উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন, নিজের প্রয়োজন মত কাজ জুটিয়ে অর্থোপার্জনে আত্মনিয়োগ করেন আর মনোমত মানুষ পেলে বিয়ে করে নিজের ঘর বাঁধবার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

আজকের দিনে আমাদের শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েও ত' ঠিক এই পথ ধরেই জীবনে এগিয়ে চলেছে। কাজেই সত্যিকারের তফাৎটা আর কোথায়?

তরুণীটির অনুরোধে আমার বাড়ীর কথা, কে কে আছে—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে হল। ছোট ছোট অকিঞ্চিৎকর প্রশ্নে তিনি আমাকে সব সময় সজাগ করে রাখলেন। বুঝলাম, বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ এঁর কত বেশী। অনেক রাত পর্যন্ত আমবা দু'জনে ঘরোয়া গল্প করলাম। আমরা উভয়েই রাত্রির খাওয়া শেষ করে এসেছিলাম, কিন্তু পরের দিনের Break fast-এর খাবার সঙ্গে ছিল। কামরায় তাকিয়ে দেখি আশে-পাশে সবাই ঢুলছে—অনেকে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে।

হয়ত সারা রাতই আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ভয়ানক ঘুম পাচ্ছিল। তাই আমার সহযাত্রিণীকে শুভ-রাত্রি (Good-night) জানিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। তিনিও শুভরাত্রি জানিয়ে কম্বলে নিজের দেহ ঢেকে নিলেন।

রাত্রি আরো গভীর হয়ে এল।

আমাদের কামরায় যারা যারা ছিল সবাই চোখ বুজে নিদ্রা দেবীর ধ্যান করতে শুরু করে দিয়েছে। কারো কারো বা মৃদুমন্দ নাকের ডাকও শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ এক একটা স্টেশন যখন এসে যাচ্ছে—মাইকে জার্মান ভাষায় যাত্রীদের জ্ঞাতব্য বিষয় শোনা যাচ্ছে। তখনই আচমকা ঘুমে-কাতর যাত্রীদের তন্দ্রা যাচ্ছে ভেঙ্গে। তারা মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছে স্টেশনের কর্তৃপক্ষকে। খামোখা এই ঘোষণা দিয়ে—তাদের সুখ-নিদ্রাকে ভাঙ্গাবার কি দরকার ছিল বাপু। স্টেশনের লম্বা করিডোরে অনেক স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিস্‌-ফিস্‌ গল্প বলছিল। এই শীতের রাত্তিরে তাদের চোখে ঘুম নেই।

শেষ রাত্তিরের দিকে কি একটা স্টেশনে গাড়ী থামতে একটি শ্রমিক মেয়ে আমার পাশে এসে বসল। কতই বা তার বয়েস হবে, ষোল কি সতেরো। সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রতিদিন যায় কোনো কারখানায় কাজ করতে। অত্যন্ত গরীব তারা—তাই উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছে। গরীব-তাই বলে দৈন্যের ছাপ তার পোষাকে কিংবা চেহারায় কোথাও নেই। বাহুল্যবর্জিত আঁটো-আঁটো পোষাক, নিটোল স্বাস্থ্য আর মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

শেষ রাত্তিরে যেতে হয় বলে ট্রেনে যতক্ষণ থাকে ঘুমিয়ে নেয়। ওকে ঘুমনোর একটু সুবিধে করে দিলাম।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতে চোখ যেন একেবারে জুড়িয়ে গেল।

একদিকে পাহাড়—অন্যদিকে শ্যামল বনভূমি—নানা ফুলে ছাওয়া। ট্রেন থেকে দেখে মনে হল—যেন টেকনিকালার ছবি দেখছি।

টয়লেটে মুখ ধুয়ে সঙ্গে যে খাবার ছিল তাতে মনোনিবেশ করলাম। দেখলাম—আমার সহযাত্রিণীও তাঁর খাবারের পুঁটলি খুলে ফেলেছেন। গল্প করতে করতে খাওয়া চলল। সেই যে শ্রমিক মেয়েটি আমার পাশে এসে বসেছিল—তাকে খেতে অনুরোধ করলাম। মেয়েটি অত্যন্ত লাজুক—কিছুতেই খাবে না। তখন তার হাতে একটি কেক গুঁজে দিতে নিল।

এর পরের স্টেশন হচ্ছে অষ্ট্রিয়ার বর্ডার। আমার সহযাত্রিণী তরুণী ও শ্রমিক মেয়েটি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নেমে গেল। সহযাত্রিণীটি নিজের হাতেই সব মাল বয়ে নিয়ে গেল—কোন রকম কুলির ব্যবস্থা নেই এ সব স্টেশনে।

ট্রেনের জানলা থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম তরুণীটি কত ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলেছেন। এখান থেকে বাসে করে তাকে যেতে হবে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শিশু-কন্যা আর তার স্বামী। তাদের জন্যে কত কি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন—ওর ছোট নীড়ের আনন্দ ভোগ করে নেবার জন্যে যেন তরুণীটি অনাবিল উল্লাসে একরকম উড়ে চলেছেন। ইউরোপ পরিভ্রমণের সময় এইটেই বারে বারে লক্ষ্য করেছি যে, সবাই নীড়ের কাঙাল, যুদ্ধের অভিসম্পাতকে নতুন করে বরণ করতে কেউ রাজী নয়।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রথম স্টেশনে আবার সেই পাসপোর্ট পরীক্ষার হল্লোড়, লোকজনেব নামা-ওঠা—একটা বিরাট কর্মব্যস্ততা। আমি স্টেশনে নেমে অষ্ট্রিয়ার মুদ্রা বদলে সুইজারল্যাণ্ডের মুদ্রা সংগ্রহ করে নিলাম। তারপর এসে বসলাম নিজের কামরাটিতে।

যতই ট্রেন সুইজারল্যাণ্ডের ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল প্রকৃতি রাণীর অভিনব প্রাচুর্যে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের রামায়ণে আছে রাবণ রাজা যখন সীতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সীতাদেবী তার দেহের বহুমূল্য অলঙ্কার ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন যাতে সেই পথ অনুসরণ করে রামচন্দ্র সীতার সন্ধান পেতে পারেন।

সুইজারল্যাণ্ডের পথে পথে এই যে সবুজ, নাল, লাল, হল্‌দে, বেগুনীর সমারোহ একি অলকাপুরীর পথ নির্দেশ? ওদিকে পর্বত শ্রেণী তুষারের মুকুট পরে আকাশের মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিয়েছে; পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে কলস্বরা ঝর্ণা, নীল জলের কি পরিপূর্ণ উচ্ছল নদী, কাক চক্ষু

হ্রদ আর তার তীরে তীরে পটুয়ার তুলিতে আঁকা ছবির মত সব বাড়ী... এদিকে শ্যামল উপত্যকায় রাশি রাশি নাম-না-জানা ফুল ফুটে রয়েছে।

আমাদের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর অবশ্য দেখি নি ... কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে কেবলি মনে হচ্ছিল যেন কোনো প্রেক্ষাগৃহে বসে রঙীন চলচ্চিত্র দেখছি। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্ অংশটা আগে দেখব? ট্রেনের ডাইনে তাকালে বাম দিকে ভালো ভালো সুন্দর জিনিসগুলি হাত-ফস্কে চলে যায়। প্রকৃতিরাণী যেন ওড়নার আড়ালে মুখ ঢেকে লুকোচুরি খেলতে সুরু করে দিলেন। তার ওপর আবার মাঝে লম্বা টানেলের ভেতর ট্রেন ঢুকে যাচ্ছে। তখন কিন্তু অন্ধকার। যেন কোন কৌতুকময়ী চোখ টিপে ধরেছেন। এক একবার মনে হচ্ছিল আরো কয়েক জোড়া চোখ যদি সাময়িক ভাবে ধার পাওয়া যেত ত' খুব ভাল হত।

মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস্ সুইজারল্যাণ্ডে এসেছিলাম তাইত' দু'চোখ দিয়ে প্রকৃতির পূর্ণ পেয়ালা পান করতে পারলাম। মনে জাগল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লাইন—

"আহা কি দেখিলাম জন্ম-জন্মান্তরে ভুলিব না।"

চেরীফুল ফোটা প্রান্তরের সে কি নয়ন-ভোলান দৃশ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"ডান দিকেতে তাকাই যখন
বায়ের লাগি কাঁদেরে মন
বামের দিকে চাইলে পরে
দখিন ডাকে আয়রে আয়।"

দু'পাশের জীবন্ত ছবি দেখে-দেখে এত আত্মহারা হয়ে পড়ছিলাম যে, কামরা আবার যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেছে সেদিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ কার কর্কশ কণ্ঠে ধ্যান ভেঙে গেল।

তাকিয়ে দেখি আমাদের কামরায় একটুও ঠাঁই নেই কিন্তু তারই মধ্যে একটি দেশোয়ালী লোক খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি আর তার নোংরা বোঁচ্‌কা-বুঁচকি নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে এবং একটি শক্ত ট্রাঙ্ক বা স্যুটকেশ দিয়ে একটি মহিলার পায়ে আঘাত করেছে। মহিলার সঙ্গে একটি তরুণ যুবক ছিল। সে যতই আপত্তি করছে— দেশোয়ালী লোকটি তার কথা কিছুতেই শুনতে রাজী নয়। সেই লোকের কর্কশ চীৎকারে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেছে। লোকটির চেহারা দেখলেই বোঝা যায় একেবারে অশিক্ষিত গেঁয়ো মানুষ, সভ্যতার বা ভদ্রতার কোনো ধার ধারে না। সে কিছুতেই নড়বে না ওখান থেকে।

পরবর্তী স্টেশনে তরুণ যুবকটি একটি টিকিট চেকারকে ডেকে নিয়ে এলো। তখন সেই ভদ্রলোক দেশোয়ালী লোকটিকে বাইরের লম্বা বারান্দায় গিয়ে বসতে বললেন। এতক্ষণে সমস্ত কলহের মীমাংসা হল।

একটি চমৎকার কবিতা পড়তে পড়তে হঠাৎ ছন্দ-পতন ঘটলে যেমন রসজ্ঞ পাঠক হোঁচট খেয়ে হুমড়ি দিয়ে পড়ে আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছিল। যাই হোক মহাযুদ্ধের পর পুনরায় শান্তি স্থাপিত হওয়ায় আবার নড়ে-চড়ে বসলাম।

প্রকৃতি দেবী কিন্তু ঠিক তেমনি দু'হাতে সৌন্দর্য ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছেন সীতাদেবীর মতো।

এক সময়ে দেখা যায় যে, ট্রেন অনেক উপরে উঠে এসেছে— জানালা দিয়ে ঝুঁকে তাকালে চোখে পড়ে বহু নীচে পার্বত্য নদীতে ছেলেমেয়ের দল ছোট ছোট নৌকা করে মাছ ধরছে ··· আনন্দে ঘুরে ফিরে নৌকা বাইছে আর গান গাইছে সমবেত কণ্ঠে।

যেন একখানি কবিতার খাতা ছিঁড়ে ফেলে কোনো অদেখা রসিক ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বময়। যে দিকে তাকাও একটি 'সনেট্' কিম্বা একটা গানের কলি চোখে ধরা পড়বে।

হঠাৎ একবার 'টয়লেট' যাওয়ার প্রয়োজন হল।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি— সেই দেশোয়ালী লোকটি একটা বোতলের ভেতর থেকে পচা মাছ বের করে খাচ্ছে। দেখেই গাটা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল।

'সুর' আর 'অসুর' এত কাছাকাছি বাস করে যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

অবশেষে এক সময় জুরিক ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

মজা এই যে যতক্ষণ ট্রেনে ছিলাম এতটুকু বৃষ্টি হয় নি। জুরিক ষ্টেশনে পৌঁছবার একটু আগে থেকে ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। বুঝলাম এইবার একটু ভেজাবে।

আমার সঙ্গে ছিল একটি ভারতীয় গরম টুপি। এতদিন সেটা কোন কাজেই আসেনি। এইবার স্যুটকেশ থেকে ওটাকে বের করে মস্তকের উপর রাজমুকুটের মত বসিয়ে দিলাম। নিজেকে কেমন দেখতে হয়েছে একবার জানবার ভারী ইচ্ছে হল। কিন্তু টয়লেটে যাবার সময় ছিল না তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে দুটি ভারী স্যুটকেশ এবং আর একটি অ্যাটাচি কেস। স্টেশনে স্যুটকেশ দুটি জমা দিয়ে রসিদ নিলাম। অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে শ্রীমতী বসুর বান্ধবী মিসেস ইভা ওয়ালটারের ঠিকানা ছিল।

শ্রীমতী বসু বলে দিয়েছিলেন যে, স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটি ছোট নদী পার হতে হয় পুলের ওপর দিয়ে। সেখান থেকে তাঁর দোকান বেশী দূরে নয়। স্কাফেলগাছিতে এই দোকান—নাম 'ইণ্ডিয়া স্টোর্স'। স্টেশন থেকে বেরিয়ে

একটু বাঁয়ে হাঁটতেই নদীটি পেলাম। নদীর ওপারে চলে গেলাম। সেখানে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে—স্কাফেলগাছি বেশী দূরে নয়।

আরো খানিকটা পথ চলবার পর মিলল আমার আকাঙ্ক্ষিত রাস্তা। তারই তিন নম্বরের বাড়ী আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। অতি সহজেই পাওয়া গেল 'ইণ্ডিয়া স্টোর্স'।

কলিং বেল টিপতেই একটি পরিচারিকা বেরিয়ে এল। আমি মিসেস ইভা ওয়ালটারের সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে সে আমায় দোতলায় পাঠিয়ে দিল। মিসেস ওয়ালটার তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। একটি বৃদ্ধা মহিলা দোকানে বসে কি সব কাজ-কর্ম করছিলেন।

আমি কোত্থেকে আসছি, কি উদ্দেশ্যে আসছি সব তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে দোকানের ভেতরে নিয়ে বসালেন এবং বললেন, এক্ষুনি ফোন করে মিসেস ওয়ালটারকে আপনার আসার খবর জানাচ্ছি। খবরটা তাঁকে দিয়ে বৃদ্ধা মহিলা বললেন, একটু বাদেই মিসেস ওয়ালটার আসছেন। আপনি বসুন। আপনাকে এক কাপ কফি তৈরী করে দেব কি?

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দিলাম, না-না, কফির কোনো দরকার নেই, আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

বৃদ্ধা মহিলাটি আমার টেবিলের ওপর অনেকগুলি ম্যাগাজিন এনে দিলেন—সময় কাটাবার জন্যে। তাকিয়ে দেখলাম, তার ভেতর ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিনও আছে। আপন মনে পত্রিকাগুলির পাতা ওলটাতে লাগলাম।

দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখি ভারী সুন্দর করে সাজানো রয়েছে 'ইণ্ডিয়া স্টোর্স'। শাড়ী থেকে সুরু করে বহু দুষ্প্রাপ্য ভারতীয় বস্তু এই দোকানে বিক্রী হয়। অজন্তা, ইলোরা, তাজমহল প্রভৃতির ছবি দিয়ে দেয়ালগুলি ভর্তি। এক জায়গায় দেখলাম—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে মিসেস ইভা ওয়ালটারের ছবি টাঙানো রয়েছে। বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন, পণ্ডিত নেহেরু যখন এই অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিলেন তখন এই ফটোটি তোলা হয়েছিল।

বহু দূর দেশে ভারতের দুষ্প্রাপ্য বস্তুর এই বিপণিটি দেখে সত্যি খুব ভাল লাগল। কত রকম মূর্তি যে এখানে সাজান রয়েছে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

একটু বাদেই মিসেস ইভা ওয়ালটার এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন শ্রীমতী বসু কেমন আছেন?

আমি জবাব দিলাম, শ্রীমতী বসু তার সংসার আর অফিস নিয়ে এত ব্যস্ত যে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনার চিঠির তিনি জবাব দিতে পারেন নি। সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আপনার বাসার কাছাকাছি আমার জন্যে একটি হোটেল ঠিক করে দিতে বলেছেন এবং আমি যাতে জুরিক শহর ভালো করে দেখতে পারি তার [illegible] করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মিসেস ওয়ালটার হাসতে হাসতে বললেন, সব কিছু হবে। তিনি টেলিফোনটি তুলে নিলেন।

কিন্তু মজা এই যে, যে-হোটেলেই ফোন করেন খবর পাওয়া যায় সেটি একেবারে ভর্তি, একটি কামরাও খালি নেই।

মিসেস ওয়ালটার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইউরোপের ভেতর একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডেই যুদ্ধের আঁচ লাগেনি। সেই জন্যে অন্যান্য দেশের চাইতে এখানকার আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে। তা ছাড়া বহু বিদেশী এখানে বেড়াতে আসেন। তাই চট্ করে এখানকার হোটেলে জায়গা পাওয়া শক্ত।

মিসেস ওয়ালটার কিন্তু হাল ছাড়লেন না। আবার নিজের হাতে ফোন তুলে নিলেন। অবশেষে একটি হোটেলের সন্ধান পাওয়া গেল। হোটেলটি মিসেস ওয়ালটারের দোকানের খুব কাছেই। নাম হোটেল ক্রোনে (KRONE)। তিনটি বোন হোটেলটি চালায়, খাওয়া-দাওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে, অথচ বেশ সস্তা।

মিসেস ওয়ালটার নিজে এসে হোটেলটি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। ওবেলার খাওয়া-দাওয়ার পাট আমি ট্রেনে থাকতেই চুকিয়ে ফেলেছি। এখন আমার একটু ঘুমের প্রয়োজন। হোটেল পরিচালিকা বোনদের সঙ্গে আলাপ হল। একমাত্র বড় বোনই ইংরেজীতে কথাবার্তা চালাতে পারেন। একটি সুন্দর কামরা আমায় ছেড়ে দিলেন। আমার দেহ-মনও ছিল খুব ক্লান্ত। বাইরে ঝির-ঝির করে তখন বৃষ্টি পড়ছে। অকারণে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা মনে জাগছিল।

জুতো খুলে গুন্ গুন্ করে গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে পাখীর পালকের মত লেপের তলায় তলিয়ে গেলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানতেও পারি নি। যখন ঘুম ভাঙ্গল—প্রায় সন্ধ্যে হয়-হয়।

হাত মুখ ধুয়ে পোষাক বদলে মিসেস ওয়ালটারের 'ইণ্ডিয়া স্টোর্সে' গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন, এখনও ঝির-ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে—আজ আর জুরিক শহরে কিছু দেখতে পারবেন না। তার চাইতে আমার বোনকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি। 'খুব কাছেই একটা সিনেমা হাউসে আমেরিকান ছবি—'হোটেল সাহারা' দেখানো হচ্ছে। বেশ মজার ছবি, দেখে আনন্দ পাবেন।

প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। এই ঝির-ঝির বৃষ্টির মধ্যে আর কোথায় ঘোরা যাবে? তা ছাড়া অনেকদিন ত' সিনেমা দেখিনি। এখানকার হাউসও দেখা হবে।

মিসেস ওয়ালটারের বোন আর আমি রওনা হলাম। সারা রাস্তা তিনি গল্প করতে করতে চললেন—আমাকে শুধু হুঁ-হাঁ দিয়ে যেতে হল। মেয়েরা গল্প করতে সত্যি পটু।

চট করে কোথায় ঢুকে একটি টিকিট কিনে আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে বললেন,

আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে। আপনার সঙ্গে ছবিটি উপভোগ করতে পারলাম না বলে খুব দুঃখিত। আপনি ছবিটি দেখুন। কাল আবার দেখা হবে।

আমি তাকে টিকিটের দাম দিতে গেলাম তিনি কিছুতেই নেবেন না। শেষকালে ছেলেমানুষের মতো একছুটে পালিয়ে গেলেন। দূর থেকে বললেন, বাই—বাই—

অগত্যা ছবি-ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ছোট্ট সিনেমা হল। একেবারে যাকে বলে Little Theatre অথচ সিটগুলি ভারী আরামপ্রদ। আড়াইশ তিনশর বেশী সিট নেই। টিকিটের দাম একটু বেশী। 'হোটেল সাহারা' খুব উপভোগ্য ছবি। কলকাতায়ও দেখানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি হাস্যমুখর কাহিনী। ভারী খুশী হলাম ছবিখানি দেখে।

ছবি দেখার পর বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিনেমা সংলগ্ন একটি সুন্দর রেস্তোরাঁ। সব রকম খাবারই পাওয়া যায়। সেইখানে রাত্তিরের আহার শেষ করে হোটেলের দিকে পা চালিয়ে দিলাম। তখনও জুরিকের আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওভারকোটের ওপর ছাতা চড়িয়ে দলে দলে নরনারী পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেই রাত্তিরে জুরিকের হোটেলে ঘুমটি খুব আরামদায়ক হয়েছিল।

সকালবেলা ভাঙবার পর কাচের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি বারি পতনের বিরাম নেই

এই আবহাওয়ায় মিসেস ওয়ালটারকে আর বিব্রত করতে ইচ্ছে হল না। তাই গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে আর মাথায় টুপি দিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম শহর পরিক্রমায়।

প্রথমেই একটি ভালো ব্যাঙ্কের সন্ধান নিতে হবে। সঙ্গে যে টমাস কুকের ট্রাভেলার্স চেক আছে তা না ভাঙালে চলবে না। হাতের খুচরো টাকা-কড়ি ফুরিয়ে গেছে।

পথ চলছি আর লোককে জিজ্ঞেস করছি, ব্যাঙ্ক কোথায়? হঠাৎ দেবকন্যার মতো আবির্ভূতা হলেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিসেস আলি মহম্মদ।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি এখানে?

মিসেস আলি মহম্মদ উত্তর দিলেন, ভিয়েনা থেকে আমি জুরিকে চলে এসেছি সুইজারল্যাণ্ড দেখবার জন্যে।

মাথা নেড়ে বললাম, আমারও ত' ওই একই উদ্দেশ্য। "Great men and women think alike"

তিনি হাসতে লাগলেন।

প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, এদিকে ব্যাঙ্ক কোথায় বলতে পারেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ও! চেক্ ভাঙ্গাবেন বুঝি? আমিও ত' এই মাত্র ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।

তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। বিদেশে একেবারে পরমাত্মীয়ার মত। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে দুজনে পথ চলতে লাগলাম।

সুন্দর মাতৃভূমি থেকে দুজনে একই উদ্দেশ্যে বিদেশে এসেছি— আমাদের কথাবার্তায় এই আন্তরিকতাটা বেশ ফুটে উঠছিল। গল্পে গল্পে খানিকটা পথ দুজনে অতিক্রম করে তিনি আমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে হাজির করলেন। ওখানে কাজ শেষ হতে খুব দেরী হল না।

মিসেস্ মহম্মদ বললেন, আমার একটু দরকার আছে, এইবার আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। তারপর যে যার পথে এগিয়ে গেলাম।

জুরিক শহরকে আমি দেখলাম যেন একটি ফুটফুটে কিশোরী কেবলই চোখের জল ফেলছে। ভিজে চোখে কৌতূহলের সঙ্গে সে এই বিদেশীর দিকে তাকাল, কিন্তু তার সঙ্গে ভালো করে ভাব করতে পারলাম না।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভালো। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দেশ বলে এদেশের কোন ক্ষতি ত' হয়ই নি, বরং যারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করেছে তাদের কাছে বহু জিনিস বিক্রী করে সুইজারল্যাণ্ড বড়লোক হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের বহু নামকরা ধনী আর ব্যবসায়ী সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে আসে—প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করবার জন্যে, অবসরে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে আর স্বাস্থ্যলাভের আশায়। সেই কারণেই সুইজারল্যাণ্ডের শহরগুলিতে টাকার ছিনি-মিনি চলে। স্থানীয় লোকেরা সময়ে অসময়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেয়—আর সেই জন্যেই সুইজারল্যাণ্ডের শহরগুলির হোটেলে চট্ করে কামরা খালি পাওয়া যায় না। সুইজারল্যাণ্ডের শহরগুলিতে যে খাদ্য পাওয়া যায় তা ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভাল। জুরিকের যেখানে আমি উঠেছিলাম—সেই তিন বোনের হোটেলে আমি নদী ও হ্রদের যে মাছ খেয়েছিলাম তার স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে রয়েছে। আমাদের হোটেলের সামনে যে নদী তাতে বৃষ্টিতে ভিজে আমি মাছ ধরতে দেখেছি। নানারকম সুস্বাদু মাছ ওঠে সেই নদীতে। জুরিকের ছেলেমেয়েরা খুব হাসি-খুশী আর প্রমোদপ্রিয়। বৃষ্টি বলে তারা মুখ গোমড়া করে ঘরের কোণে বসে থাকে নি। দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, হাস্য মুখর আনন্দ-চঞ্চল।

জুরিকের ট্রাম বাসও খুব ঝকঝকে তক্তকে। আমি আগাগোড়া ট্রামেই ঘুরে বেড়িয়েছি। এখানকার লোকেদের ব্যবহার খুব ভালো। বিদেশীদের সঙ্গে

সহযোগিতা করতে সর্বদাই তৎপর। জুরিকের রাস্তা-ঘাট কোথাও সমতল, কোথাও বা ঢেউ-খেলানো। আশে-পাশের দৃশ্য অতি চমৎকার সে কথা ত' আগেই বলেছি। সারাদিন বৃষ্টির মধ্যে আমি কেবলি ট্রামে করে ঘোরাঘুরি করেছি শহরের একমাথা থেকে আর এক মাথা অবধি।

স্টেশনে যে স্যুটকেশগুলি জমা দিয়ে এসেছিলাম, হোটেলে পৌঁছেই পোর্টারকে দিয়ে সেগুলো আনিয়ে নিয়েছিলাম। সেজন্য তাকে বক্‌শিস দিয়ে খুশী করতে হয়েছিল। সারাদিন ধরে শুধু বৃষ্টি।

তবু যে আবহাওয়া আমাকে এতটুকু দমাতে পারেনি এবং ওভারকোট আর টুপি সম্বল করে আমি যে শুধু টহল দিতে পেরেছি সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু আমার মন পড়ে রয়েছে রোমে। আসার সময় রোমের আর্ট-গ্যালারী দেখে আসতে পারিনি, যাওয়ার পথে ও জিনিসটা বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না। আর একটি জরুরী কাজ তখনও বাকি আছে। জুরিক শহরে যে ইটালীয়ান কনসোলেট আছে সেখানে গিয়ে ইটালী প্রবেশের 'ভিসা' আবার যোগাড় করতে হবে। তার মানে হচ্ছে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে যতবার ঢুকতে হবে ততবার নতুন 'ভিসা' সংগ্রহ করে নিতে হবে। তার অর্থ—অর্থব্যয়। বৃষ্টি দেখে ভয় পেলে চলবে না। ছুটলাম আবার সেই ভিসা সংগ্রহ করতে। প্রথমবার গিয়ে শুনলাম ভিসায় যিনি নাম স্বাক্ষর করবেন তিনি অফিসে নেই। কাজে কাজেই আবার যেতে হবে। চুপচাপ বসে থেকেও কোন লাভ নেই। যতক্ষণ ছুটোছুটি ততক্ষণ দেখা। আবার খানিকটা ঘোরাঘুরি করে, হোটেল থেকে নিজেই ফটো নিয়ে ইটালীয়ান কনসোলেটে আবার হাজির হলাম। এখানে একটা ব্যাপারে ইটালীয়ান ভিসার একটু কড়াকড়ি দেখলাম। অস্ট্রিয়া থেকে যখন সুইজারল্যাণ্ডের ভিসা সংগ্রহ করি তখন নতুন করে ফটোর প্রয়োজন হয়নি। পাসপোর্টে যে ফটো ছিল তাতেই কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ড থেকে যখন ইটালীর ভিসা' জোগাড় করতে গেলাম—আবার নতুন করে ফটোর প্রয়োজন হল। এ কড়াকড়ির হেতু কি ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। যাই হোক, নতুন করে টাকাও দিতে হল—আবার ফটোও দাখিল করতে হল।

সারাদিন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ঠিক করলাম সেইদিন সন্ধ্যের ট্রেনেই রোম যাত্রা করব। বেশ বুঝতে পেরেছিলাম ভিসা জোগাড় করে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে তাই হোটেলের পোর্টারকে বলে গিয়েছিলাম—সে যেন স্যুটকেশগুলি নিয়ে 'ইনফরমেশন অফিসের' সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করে—আমি এসে তাকে খুঁজে নেবো। ইটালীয়ান কনসোলেট থেকে ফিরে দেখি, পোর্টার আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার সারা

দেহ একেবারে বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। ওর জন্যে মায়া হল। চার ফ্রাঙ্ক বক্‌শিস দিলাম।

তখনো ট্রেনের একটু দেরী ছিল। স্টেশনের একটি কুলির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। কি রকম তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী কথায় কথায় জেনে নিলাম। প্রশ্ন করলাম, দিনে কি রকম উপায় কর তুমি?

কুলিটি উত্তর দিল, গড়ে পনের ফ্রাঙ্ক আমার উপার্জন হয়। হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেল—প্লাটফর্মে গাড়ী দিয়েছে, সবাই ছুটছে ভাল স্থান সংগ্রহের আশায়। বেশী ভারী মাল ছিল বলে আমাকেও কুলি যোগাড় করে ছুটতে হল। কুলিকে বলে দিলাম ভালো একটি কামরায় যেন আমাকে তুলে দেয়।

জুরিক থেকে রোমে যে ট্রেনটি চলাচল করে সত্যি সেটি আরামদায়ক। এখানকার তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীতেও তা দুর্লভ। সুতরাং অকারণ বেশী পয়সা খরচ না করে আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটই ক্রয় করেছিলাম। সহযাত্রী ও সহযাত্রিণীরা সবাই ভদ্র, সুতরাং অসুবিধের কোন কারণ ছিল না।

কুলি তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল। ভেলভেটের মতো নরম গদি-আঁটা একটি কামরায় সে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে তার পারিশ্রমিক চাইল। লোকটিকে খুশী করে বিদায় দিলাম।

এইবার আমার সহযাত্রী পেলাম এক কাব্য-রসিক ইটালীয় ভদ্রলোককে। শিক্ষিত ভদ্রলোক, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বেশ জ্ঞান আছে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও পণ্ডিত জওহরলালের খবর রাখেন। ইটালী দেশের বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি সেইগুলি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন আর ইংরাজীতে ভাবার্থ করে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে খুব জমে উঠল। বাঙলা কবিতার নমুনাও দিতে হল আমাকে। ভদ্রলোক জীবনে অনেক কিছু করেছেন। যাযাবরের জীবনও যাপন করেছেন বেশ কিছু দিন। সম্প্রতি পল্লী-অঞ্চলে একটি নিরিবিলি নীড় রচনা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন বলে স্থির করেছেন। ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে। কিন্তু মনের আনন্দ কিংবা কাব্যের রস হৃদয় থেকে শুকিয়ে যায় নি। যখন আবৃত্তি করতে সুরু করলেন, নিজের ভাবে নিজেই মশগুল থাকলেন।

সঙ্গে কিছু স্যাণ্ডুইচ আর ভাল কেক কিনে নিয়েছিলাম জুরিক থেকে। এতেই রাত্রের আহার সমাধা করে ফেললাম। সকলেই সঙ্গের খাবার নিয়ে নৈশ-ভোজ সমাপন করলেন। খুব বড়লোক না হলে ট্রেনের রেস্টুরেন্ট কারে বড় কেউ একটা যায় না।

লোকজন উঠছে নামছে, নতুন মানুষ, নতুন মুখ, ক্ষণিকের পরিচয়, বেশ

লাগছিল। দু'দিন বাদে কোথায় বা থাকব আমি আর কোথায় বা থাকবেন এঁরা? মাঝে মাঝে একটা আধ্যাত্মিক ভাব মনে জাগছিল। আমি ত' রোমের পথে ট্রেনে চেপে চলেছি, কলকাতার মানুষরা এখন কে কি করছে? তাদের এখন দুপুর রাত। অনেকেই ফ্যান খুলে দিয়ে ঘুমচ্ছে কিন্তু আমি শীতে ওভার-কোটটা টেনে নিলাম।

ভাবতে কিন্তু বেশ মজা লাগে।

ধর্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, পৃথিবীতে সব চাইতে দ্রুতগামী হচ্ছে মানুষের মন। এক মুহূর্তে লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করতে পারে। আমিও ত' ঠিক তাই করছি। সুইজারল্যাণ্ড থেকে এক মুহূর্তে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছি।

যখন জুরিক থেকে রওনা হয়েছিলাম, সেই কিশোরী ফুটফুটে মেয়েটির চোখ থেকে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। শ্যামল উপত্যকায়, ফুলের উদ্যানে, সুবিস্তীর্ণ হ্রদে, পাহাড়ের কিনারে কিনারে দেখে এলাম তার চোখের জলের ফোঁটা।

এখন ট্রেন থেকে দেখছি বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে। লোকজনের কোলাহল, নতুন পরিবেশ, নতুন মুখের আনাগোনা। কিন্তু এইটুকু লক্ষ্য করেছি যে জীবন এদের কানায়-কানায় পূর্ণ।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রাচুর্যের সঙ্গে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের যদি তুলনা করা যায় তবে একটি প্রশ্নই শুধু মনে জাগে যে, আমাদের দেশ কবে এমনি স্বচ্ছলতায় ভরে উঠবে? সবাই মিলে সংগঠনের পথে হাত মেলালে কি আমরা 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' হয়ে উঠতে পারবো না?

কবিগুরুর কবিতাই এই নিশীথ রাতে বারে বারে মনে জাগতে থাকে—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষ-পট। এ দৈন্য মাঝারে কবি—
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

রাত্রি সাড়ে এগারোটায় ট্রেন সুইজারল্যাণ্ডের বর্ডারে এসে হাজির হল। এর পরেই সুরু হবে ইটালীর এলাকা। রেলের কর্মচারীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা দেবার ধুম পড়ে গেল। ট্রেনের বহুলোক এখানে নেমে গেল এবং বহু নতুন মানুষের আমদানি হল।

রাত্রি সাড়ে বারোটায় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম বিখ্যাত ষ্টেশন মিলানে। অত রাত্তিরেও একদল মেয়ে-পুরুষ কাদের যেন বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছে। তাদের চেঁচামেচি আর আনন্দধ্বনিতে তন্দ্রা গেল ভেঙে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। এখানেও অনেক নতুন মুখের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

নতুন যারা ট্রেনে উঠল, তারাও নিজ নিজ জায়গা করে নিয়ে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হল। কেউ কম্বল টেনে নিল, কেউ বা নিজের ওভারকোটের মধ্যেই কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে থাকল। ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি আবার তার মায়া-পরশ বুলিয়ে দিল সারা কামরাটায়।

মনে খুব ভয় ছিল পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে থম্‌থমে মেঘলা আকাশ দেখব কিনা! কিন্তু সূর্য্যিঠাকুরকে ধন্যবাদ—তার সোনালী কিরণ আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা করে নিল। এখানে দৃশ্য পাল্‌টে গেছে—ইটালীর প্রকৃতিরাণী ঘোমটা খুলে আমাদের বললেন, "সুস্বাগতম্"। বৃষ্টিধোয়া মালিন্যহীন সুন্দর মুখখানি তাঁর। যেন স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে ঝলমল করছে।

স্যাণ্ডরের কিছু কেক তখনো অবশিষ্ট ছিল। টয়লেটে ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে সেই কেকের সদ্ব্যবহার করা গেল।

অনেকে এখনও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছে। তাদের যেন ওঠবার আদৌ ইচ্ছে নেই।

কাব্যরসিক ভদ্রলোকটি শেষ রাত্তিরে নেমে গেছেন। যারা সকালের রোদ্দুরে জেগে উঠেছেন তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব চলতে থাকল। অনেকেই রোম পর্যন্ত যাবে। কাজেই তাড়াহুড়োর কিছুই নেই।

সাধারণ গেরস্ত গোছের এক ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি ইণ্ডিয়াতে যে যাব, সেটা জাহাজে না—বিমানে?

—বিমানে।

—তাহলে ত' অনেক খরচ।

—তা খরচ আছে বৈকি। জবাবে আমি জানালাম।

আমি যে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলাম এবং তাঁদের অর্থেই ফিরে যাচ্ছি, সেকথা আর ভদ্রলোককে বললাম না। কেননা তাহলে কিসের নিমন্ত্রণ, সেটা আবার ব্যাখ্যা করে বলতে হত।

আমরা রোম টার্মিনাসে গিয়ে হাজির হলাম সকাল এগারোটায়। এখান থেকে এয়ার টার্মিনাস খুব বেশী দূর নয়।

সেখানে গিয়ে আগে স্যুটকেশগুলো গছিয়ে দিতে হবে। দুটো ভারী স্যুটকেশ ছিল বলে কুলির সাহায্য নিতে হল। সাধারণতঃ কুলির সাহায্য কেউ নেয় না।

স্ত্রী-পুরুষ সবাই নিজের মাল নিজে বহন করে। স্টেশন ছেড়ে আসবার আগে সুইজারল্যাণ্ডের মুদ্রা ফ্রাঙ্ক বদ্‌লে লিরা নিয়ে নিলাম। মুদ্রার ব্যাপারে ইটালিই হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে গরীব দেশ। আসলে এদের কোন মুদ্রাই হাতে পড়ল না। শুধু কাগজের নোট। তা যেমন ছেঁড়া তেমনি নোংরা। হয়ত একটি নোটের অর্ধেকটা নেই। তাও দিব্বি চলে যাচ্ছে। আমাদের দেশে কিন্তু ছেঁড়া নোট কিছুতেই চলবে না।

যাই হোক, সেন্ট্রাল বিমান-অফিসের কে. এল. এম. ঘাঁটিতে আমার মাল-পত্তর জমা দিয়ে সেইখানকার টয়লেটে ভালোভাবে দেহকে পরিষ্কার করে আনুষঙ্গিক কাজ সমাপ্ত করলাম। এইবার শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হল। খিদেও পেয়েছিল খুব। লাঞ্চটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতে হবে, নইলে আমার পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে আর্ট-গ্যালারী দেখা হবে না।

রোমের বিখ্যাত আর্ট-গ্যালারীর কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। তা না দেখে কি দেশে ফিরতে পারি?

মনের বিলাস তখনি মধুর হয়ে ওঠে যখন দেহের খোরাকে কিছুমাত্র কমতি থাকে না। এয়ার টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে স্টেশনের কাছে একটি ভালো রেষ্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলাম।

ক্ষুধাকে উপশম করবার জন্যেই অর্ডার দিলাম, চিকেন ফ্রাই। কিন্তু যে চিকেন ফ্রাই পাওয়া গেল, তা টাটকা ত' নয়ই, আগের দিনের বাসি। মনের ব্যথা মনে চেপে আনুষঙ্গিক আরো কিছু খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। অকারণ বেশ কিছু পয়সা গচ্চা গেল! যাওয়ার সময় রোমে সাংবাদিক বান্ধবী ডেলা ভিচিয়ার কৃপায় খাবারটা ভালো পাওয়া গিয়েছিল। সুযোগ সুবিধা পেলেই রোমের দোকানদাররা বিদেশীদের ঠকিয়ে নেয়। এই রকম একটা বদনাম ওদের দীর্ঘকাল ধরে আছে। রেস্তোঁরায় এই ব্যবহারে বুঝতে পারলাম যে, ওদের বদনামটা মিথ্যে নয়।

যাই হোক, রাস্তায় নেমে ট্রাফিক পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আর্ট গ্যালারী দেখ্‌তে কোন্ ট্রামে উঠব। প্রথম ত' আর্ট গ্যালারী জিনিসটা কি, তাই বোঝাতেই আমার খানিকটা সময় কেটে গেল। অনেক কসরৎ করে বিষয়টি যখন বোঝানো গেল, সে তখন একটি বিশেষ ট্রামে আমায় চাপিয়ে দিল।

আশা রইল—ইংরেজী জানে এমন কাউকে ট্রামের ভেতর খুঁজে নেব। আমাকে হতাশ হতে হয়নি। একটি তরুণ যুবককে পেলাম—যিনি কিছুকাল লণ্ডনে বাস করেছেন।

তিনি বললেন, এই ট্রাম ত' সরাসরি আর্ট-গ্যালারীতে যাবে না, আপনাকে এক জায়গায় ট্রাম বদল করতে হবে। আচ্ছা আমি না হয় বলে দেব'খন আপনাকে।

তরুণ যুবকের সহায়তা: গাড়ী বদল করে অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম, তারপর ট্রামের কণ্ডাক্টার আম :ক আর্ট-গ্যালারীর সামনে নামিয়ে দিল।

দেখলাম, আরও অনেকে টিকিট কেটে আর্ট-গ্যালারীরর ভেতর ঢুকছে; আমিও মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রওনা হলাম।

ভেতরে ঢোকবার ময় প্রশ্ন করলাম, ক'টা পর্যন্ত গ্যালারী খোলা থাকে?—জবাব পেলাম বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

এই সময়ের মধ্যে সব কিছু দেখে নিতে হবে।

কিন্তু র্ট-গ্যালারীর ভেতর ঢুকে একেবারে যাকে বলে ডোম-কানা হয়ে গেলাম। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আগে দেখি? যে দিকে তাকাই, শুধু ছবি আর পাথরের মূর্তি।

তবে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার প্রশংসা করতেই হবে। প্রতি ঘরের নম্বর দেওয়া আছে। সেই নম্বর অনুসরণ করে চললে দেখবার কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসে।

পৃথিবীতে যত রকম ছবি আঁকবার পদ্ধতি (Technique) আছে এই আর্ট-গ্যালারীতে তার নমুনা অতি বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অতি প্রাচীন ধরনের ইটালীর তৈলচিত্র থেকে শুরু করে অতি-আধুনিক পিকাসো পদ্ধতির চিত্রও এই অপরূপ শিল্প-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে।

ওয়াটার-কালার, অয়েল-কালার, প্যাস্টেল, ক্রেয়ন, সস্, পেন্সিল সব কিছুতেই আঁকা ছবি বাছাই করে এই বিশ্ববিখ্যাত ইটালীর আর্ট-গ্যালারীতে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমাদের যামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথের টেক্‌নিকে আঁকা ছবিও প্রচুর দেখতে পেলাম।

ছোটদের আঁকা ছবি—যা আমরা হয়ত হেলা ভরে ফেলে দি, তাও স্থান পেয়েছে এই আর্ট-গ্যালারীতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম-করা শিল্পীর ছবিও এই শিল্প-সংগ্রহে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো শিল্পীর ছবি চোখে পড়ল না!

এ বিষয়ে আমাদের দেশের শিল্পীবৃন্দের পক্ষ থেকে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে।

ইটালীর ভাস্কর্য জগতের সেরা। এই আর্ট-গ্যালারীতে যে সব ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে তা বিস্ময়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দেখতে ইচ্ছে করে। এক একটি মূর্তি এমন সজীব যে, মনে হয় গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে এক্ষুনি ঘুম থেকে জেগে উঠে কথা বলতে শুরু করবে। এ যেন কোন মায়াদানবের মায়াপুরী। সব কাল-ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। কোন রাজপুত্র এসে যদি সোনার কাঠির ছোঁয়া দেয় তবে এক মুহূর্তে সবাই প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠবে। জেগে উঠবে এই গ্ল্যাডিয়েটর, ওই

হারকিউলিস, তার সাঙ্গোপাঙ্গের দল, ওই শিকারী আর তার কুকুর, কষ্টি-পাথরে তৈরী ওই সুন্দরী ঘুম থেকে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসবে। ছেলের দল জেগে উঠে হল্লা-হাসিতে এই নির্জন প্রকোষ্ঠ মুখরিত করে তুলবে। কত যুগ আগে ইটালীয়ান শিল্পীর তুলিতে আঁকা ওই যুদ্ধ-বিগ্রহ সজীব হয়ে উঠবে। বন্দুকের আওয়াজ আর কামানের শব্দে এখানে কান পাতা দায় হয়ে উঠবে। ওই যে পরীরা ঝরনা-জলে স্নান করছে, ওরা কি গুণগুণ্‌ করে গান গাইতে সুরু করে দেবে না?

ভাবতে ভাবতে আমি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এ-কক্ষ থেকে ও-কক্ষ এ-রাজ্যি থেকে ও-রাজ্যি পরিক্রমার যেন শেষ নেই। এ কোন মায়াপুরীতে এসে উপস্থিত হলাম?

ঘুরতে ঘুরতে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে যাতে বিশ্রামের জন্য বসতে পারে, সেজন্য কক্ষগুলির মধ্যে কৌচ ইত্যাদি বসানো আছে। তার চারদিকে ফুলের টব দিয়ে অতি সুন্দরভাবে সাজান। অনেক স্ত্রী-পুরুষ বিভিন্ন কক্ষ-পরিক্রমায় ক্লান্ত হয়ে ওখানে বসে সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ করছে। আমাকেও দুই-একবার এইভাবে বসে পা দুটিকে ক্ষণিক অবসর দিতে হল। একবার এমন জলতেষ্টা পেলো যে, খুঁজে খুঁজে একটি নির্জন প্রাঙ্গণে গিয়ে একটি জলের কল আবিষ্কার করলাম। সেখানেও কত রকম মূর্তি সাজানো রয়েছে। যাই হোক, ঠাণ্ডা জলে তৃষ্ণা দূর করা গেল।

আবার শুরু হল বিভিন্ন কক্ষ-পরিক্রমা। একটি বিরাট মূর্তির সংস্কার করা হচ্ছে। মূর্তিটি দোতলা সমান উঁচু, তার চারদিকে বাঁশের ভারা বেঁধে কাজ চলছে। সেখানেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মেরামতের কাজ দেখলাম।

এই বিচিত্র শিল্প-সম্ভার প্রদক্ষিণ করতে করতে মনে হল ছবিই হচ্ছে একমাত্র ভাষা যা পৃথিবীর সব দেশের লোক পড়তে পারে। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর লোক অবধি।

এই যে আমি ভারতবর্ষের লোক এসেছি সুদূর রোমে, এদেশের ভাষা আমি বুঝতে পারি না। এরাও জানে না আমাদের দেশের ভাষা। কিন্তু এই উভয় দেশের লোকের সামনের একটি সুন্দর তৈলচিত্র রাখা হোক দেখি। তার মর্মার্থ উভয় দেশের লোকই দেখামাত্রই অনুধাবন করতে পারবে। কাজেই ছবি হচ্ছে এমন এক ভাষা, যা সব দেশের লোক অনায়াসে পড়তে পারে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিরা এমন একটি ঔষধের আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যা নাকি অনুপান-ভেদে সব রকম রোগে কাজ দেবে। মানে, বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে খেলে বিভিন্ন রোগ সারবে। সেই গবেষণার ফল হচ্ছে মকরধ্বজ। আদা ও তুলসী পাতার রস দিয়ে খেলে সর্দি-কাশি সারে, আবার চালের জল

দিয়ে খেলে বায়ুর দমন হয়। এমনিভাবে বিভিন্ন উপায়ে মকরধ্বজ খেলে বিভিন্ন রকম রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। ঔষধ একটি, কিন্তু প্রয়োগ-বিধি পৃথক। ছবিও হচ্ছে ঠিক সেই একটি ভাষা, যা সারা বিশ্বের লোক পড়তে পারে।

আমি নিজে এক সময় ছবি আঁকতাম, সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি। শিল্প-রসিক বলে মনে মনে একটা গর্ব আছে। তবু ইটালীর আর্ট-গ্যালারীতে শিল্প-সম্ভার দেখে মনে হল দিনের পর দিন এখানে তীর্থযাত্রীর মত এলে তবে যদি কিছুটা রস গ্রহণ করা যায়!

৫টায় আর্ট-গ্যালারী বন্ধ হয়ে যেতে সেখান থেকে চলে আসতে হল। ঔদরিকের সামনে নানা রকম মুখরোচক খাবার সাজিয়ে দিয়ে তার খাওয়ার আগেই যদি থালা সরিয়ে নেওয়া হয় তবে সেই পেটুকের মুখের অবস্থা যেমন দাঁড়ায়, আমারও ঠিক সেই রকম ভাব হয়েছিল।

যাই হোক, অনুশোচনা করে লাভ নেই। ধীরে ধীরে সদর রাস্তায় পা বাড়িয়ে দিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে একটি নির্জন পার্কে গিয়ে হাজির হলাম। চারিদিকে সুন্দর গাছপালা লতাগুল্ম, মাঝখানে তক্‌তকে পরিষ্কার পার্কটি যেন ছবি আঁকা।

সেইখানেই রোমের ছেলেমেয়েরা খেলা করছে।

তখনো ছবি দেখার রেশ মনে জাগছিল। তাই চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ ধরে ফুলের মতন ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখলাম।

বিদেশী দেখে কৌতূহলী হয়ে ওরা কাছে এগিয়ে এল।

আস্তে আস্তে ভাব জমে উঠল কয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

রোমে এসেছি, ইচ্ছে ছিল ডেলা ভিচিয়া ও ফ্লোরিয়ানা মার্টিনেটার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে। দেখা হলেই ওদের ঋণের বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠবে। ওরা নানাভাবে আমার জন্যে খরচ করতে থাকবে হয়ত কোনো ওজর-আপত্তি শুনবে না। তাই ঠিক করলাম, দেশে ফিরে গিয়েই দুজঁনের কাছে চিঠি লিখব।

পার্ক থেকে আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম।

পায়ের একটা কড়া ক'দিন থেকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? আজ আর্ট-গ্যালারীতে অনেকক্ষণ হেঁটে কড়ার ব্যথাটা নতুন করে শুরু হল। বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এখন কোন ট্রামে উঠে পড়া।

ষ্টেশনে যাচ্ছে এমন একটি ট্রামে উঠে পড়লাম।

ট্রাম থেকে নেমে কিছু মিষ্টি আর ফল কিনে নিলাম। ক্ষিদেও খুব বেশী নেই। একটু সাত্ত্বিক আহার করা যাক। মিষ্টি মানে অবশ্য ভীম নাগের সন্দেশ

কিম্বা বাগবাজারের রসগোল্লা নয়, নানা রকমের কেক। এ দেশের ফল খুব ভাল। কলা, কমলা, আপেল ইত্যাদি।

একবার ভাবলাম, ঢুকে পড়ি রোমের একটা সিনেমা হাউসে। ইটালীর ছবি দেখে যাই একটা। ইটালীর ছবি অবশ্য কলকাতাতেই দেখা আছে। তাছাড়া পায়ের কড়াটা খুব কষ্ট দিচ্ছিল। তাই সোজা কে. এল. এম. অফিসে গিয়ে হাজির হলাম।

তাড়াহুড়ায় দুদিন দাড়ি কামানো হয়নি। কে. এল. এম. টয়লেটে সব ব্যবস্থাই আছে। বেশ করে দাড়ি কামিয়ে নেওয়া গেল। তারপর যথারীতি সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করে আগে থেকে কিনে আনা ফল আর কেকগুলির সদ্ব্যবহার করলাম।

এয়ার টার্মিনাসের মধ্যেই একটি চমৎকার বুক ষ্টল আছে। পৃথিবীর যত রাজ্যের ম্যাগাজিন সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়। একটি মেয়ে তার ভারপ্রাপ্তা কর্মী। তার সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে সন্ধ্যেবেলা বসে ম্যাগাজিনগুলি উল্‌টে-পাল্‌টে পড়ে, ছবি দেখে মধুর আমেজে সময় কাটিয়ে দিলাম।

হঠাৎ দেখি, শাড়ী-পরা একটি মেয়ে এসে সেখানে ঢুকলেন। পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি বম্বে থেকে আসছেন। যাচ্ছেন লণ্ডনে বেড়াতে। সঙ্গে তাঁর স্বামী আছেন। তিনি বোম্বাই অঞ্চলের একজন নামকরা ব্যবসায়ী। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে দেশের খবর নিয়ে আলোচনা হল।

কিন্তু শরীর আমার সত্যি ক্লান্ত।

খবর নিয়ে জানলাম যে, শেষ রাত্রিতে প্লেন ছাড়বে।

কে. এল. এম. অফিসের এক কোণে ঘুমবার জন্যেও আরামদায়ক সোফা আছে। সেইখানে গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম।

সারা দিনের ছুটোছুটি আর পরিশ্রমে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানতেও পারিনি।

হঠাৎ কাদের কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। তাকিয়ে দেখি, ১১।। টা বেজেছে। যাত্রীরা আস্‌তে শুরু করেছে। একদল যাবে—লণ্ডনের দিকে, আর একদল যাবে পূর্ব-অঞ্চলে (FAR EAST) ।এদের ছেলে পুলেদের হুল্লোড়, মাল-পত্রের ওজন, টিকিট করা......এই সব নিয়েই যত কোলাহল। আমার কিন্তু এ সবের কোন ঝামেলা ছিল না। কেননা আমি ভিয়েনা থাকতেই খবর পাঠিয়ে সিট রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। এখন সময় মত উঠলেই হল।

গল্প-গুজবে আর নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। রাত পৌনে একটায় আমরা কে. এল. এম. বাস যোগে রোমের বিমান-ঘাঁটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের বাস যখন দ্রুতবেগে রোম শহরের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল তাকিয়ে দেখি তখন ট্রাম চলছে। অথচ ভিয়েনাতে কত

আগে ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্ককের এক ব্যবসায়ী ছিলেন আমার পাশে। তিনি বললেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। নিউইয়র্কে সারারাত ধরে ট্রাম চলে।

রোম বিমান-ঘাঁটিতে 'কাষ্টম-বৈতরণী' পার হতে হল। স্যুটকেশ খুলে দেখাতে হল ভেতরে কি কি পদার্থ আছে।

এরপর কে. এল. এম. কর্মীরা যাত্রীদের পরিবেশন করল লেমনেড ও নোন্তা-মিষ্টি নানারকম খাবার। অত রাত্তিরে কিন্তু খেতে খারাপ লাগলো না।

বিমানে উঠে যার যার জায়গা সংগ্রহ করে নেওয়া গেল। প্রত্যেকের আসনের সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এলো Chewing Gum. বিমান ওড়বার পর কিছুদূর উঠতেই এলো লেমনেড। শেষ রাত্রিকে সবাই একটু ঘুমতে চায়। তাই কম্বল টেনে নিয়ে যে যার মতো দেহ এলিয়ে দিল।

সকাল সাড়ে সাতটায় ঘুম ভাঙতে নীচে চোখে পড়ল মিশরের তীরভূমি। ঝল্‌মল্‌ করছে সকালের সোনালী রোদে। আমাদের বিমান ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। সে যে কী সুন্দর দৃশ্য কথার পর কথা গেঁথে বর্ণনা দেওয়া চলে না, শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবার। বিমান-বালিকা সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করে দিয়ে গেল গরম ও উপভোগ্য কোকো। ভারী আরাম লাগছিল তখন। ভূমধ্যসাগর দেখা আর একটু একটু করে কোকোর কাপে চুমুক দেওয়া।

আটটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে আমরা কায়রোতে এসে অবতরণ করলাম। যাবার বেলা কিন্তু কায়রোতে বিমান নামেনি। যাই হোক ফিরতি মুখে একটা নতুন জায়গা দেখা গেল। কায়রোর গল্প এত পড়েছি আর কায়রোর ছবি এত সিনেমায় দেখেছি....এ সেই বিখ্যাত কায়রো। কায়রোর সকালটা কিন্তু বেশ আলো-ঝল্‌মলে। এখানে ওদের মুসলমানী দেশী পোষাক আর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ দুই রকমই চোখে পড়ল।

কায়রোর বিমান-ঘাঁটিতে দোতলার ওপর যাত্রীদের সুবিধের জন্যে একটি নতুন রেষ্টুরেন্ট তৈরী করা হয়েছে। বিমানের কর্মীরা আমাদের সেইখানে নিয়ে হাজির করল।

দেখি প্রাতরাশের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। কমলালেবুর রস, Bread-Butter, ওমলেট, আলু সেদ্ধ, যার যেমন প্রয়োজন। সর্বোপরি রয়েছে চা। ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার দিকে এসে এই প্রথম চা পান করে ভারী আরাম বোধ হল।

এই রেষ্টুরেন্টটির চারদিকে লম্বা লম্বা জানালা। চতুর্দিকে ঘুরলে কায়রোর দৃশ্য সুন্দরভাবে চোখে পড়ে।

স্থানীয় একটি উভচর বিমানকে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছিল। বিমানটি দেখতে খুব ছোট। কায়রোর জাতীয় পতাকা চাঁদ আর তিনটি তারকা নিয়ে সকাল বেলার সমীরণে পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। দূরে একটি ট্রেন যাচ্ছে, তার

প'চটি কামরা। চারিদিকের জানলা ধরে ধরে আমরা দেশটিকে দেখে নিচ্ছিলাম। ওই হচ্ছে সেই পিরামিড স্ফিংক্স-এর দেশ। কত রূপকথা আর কাহিনী এই দেশকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। মিশরের সংস্কৃতি আর সভ্যতা পৃথিবীর কত পুরোনো। এখানে দুটি ছোট্ট স্থানীয় ছেলের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হল। তাদের ইচ্ছে, জানালা বেয়ে উঠে চারদিকের সব কিছু দেখে নেয়। কিন্তু তাতে পড়ে যাবার যথেষ্ট ভয় আছে। কাজেই আমরা দুটি চেয়ার টেনে নিয়ে এসে ওদের জানালার ধারে দাঁড় করিয়ে দিলাম। তখন ওরা ভারী খুশী হয়ে উঠল।

কায়রোতে আমাদের পাসপোর্ট দেখা হল।

বিমানের যন্ত্রগুলি আগাগোড়া পরীক্ষা করে আবার ঠিক বারোটার সময় আমাদের যাত্রা সুরু হল।

ইউরোপে যাওয়ার সময় রাত্রির অন্ধকারে সুয়েজ-খাল কিচ্ছু দেখতে পাইনি। এইবার এমন সুন্দরভাবে খালটি আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ল, সে কী বলব। আগেই বিমান থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল যে বিমানের বাঁদিকে সুয়েজ খাল দেখা যাবে, আমরা সবাই ওৎ পেতেই ছিলাম। আমার সিট্ ছিল বিমানের ডান দিকে, যেই সুয়েজ-খাল এলো অমনি একলাফে উঠে গিয়ে বাঁ দিকের একটি আসন দখল করে নিলাম। এখান থেকে সূর্যের আলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল—গোটা খালটি। কোন্ দিক থেকে এসে সমুদ্রে মিশেছে, চমৎকার ধরা পড়েছিল ওপর থেকে। দুদিকে শুধু বালি—মাঝখানে মোটা রজত-রেখার মতো সেই বিখ্যাত সুয়েজ-খাল। খালের ভেতর যে জাহাজ চলাচল করছিল—সেগুলি দেখাচ্ছিল দেশলাইয়ের বাক্সের মতো। যেন ছেলেরা তৈরী করে খেলাঘরের খালে ভাসিয়ে দিয়েছে।

বিমানের মধ্যে যে সুন্দর টয়লেট আছে তাতে ঢুকে—বেশ করে মাথাটা ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললাম। এখন আর গরম জলের প্রয়োজন নেই, দেশের কাছাকাছি এসেছি।

মাথা ধোয়ার পর মন আরো খুশী হয়ে গেল।

বিমানের ওপরই লাঞ্চের রাজসিক আয়োজন।

লাঞ্চের পর ইউরোপীয় যাত্রীরা যখন প্রচুর মদ খাচ্ছিল তখন আমি কমলা লেবুর রস নিয়ে আরাম করে একটু একটু করে চেখে চেখে মুখে নিচ্ছিলাম।

এবার ফেরবার মুখে আমার পাশে সিট পড়েছিল এক ইটালীর ভদ্রলোকের। বাড়ী তাঁর মিলানে। বড় ব্যবসায়ী, পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অঞ্চলে কনট্রাক্টারী ব্যবসা আছে। দেশ থেকে কর্মস্থলে, মানে ব্যবসার জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক অমায়িক আর আলাপী। আমার কলমটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কলমটা দিয়েই লেখাপড়ার কাজ চালালাম।

ভদ্রলোক গল্প করছিলেন—তাঁর স্ত্রী ছেলে-পুলে নিয়ে থাকেন এক জায়গায়, তাঁর মা-বোন থাকেন অন্য এক শহরে। বোনটির এখন বিয়ে হয়নি, কোন এক মেয়েদের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে গিয়ে মা-বোন আর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসেন। ট্রোয়িয়ানি রেনাটো হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম। আমরা এক সঙ্গে বসেই লাঞ্চ খাচ্ছিলাম আর সেই সঙ্গে গল্প-গুজব চলছিল। খাওয়াটাও দিব্বি জমে উঠেছিল।

হঠাৎ কি ভীমরতি হল বিমান-বালিকাকে জিজ্ঞেস করে বসলাম, কিসের মাংস খাচ্ছি?

খুব খুশী হয়ে জবাব দিল Calf, খুব টাট্‌কা। ট্রোয়িয়ানি রেনাটোও আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, চমৎকার মাংস, খেয়ে যান না—

শাস্ত্র বাক্য—ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্।

কিন্তু তখন আমার অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবছি, কেন মরতে নাম জিজ্ঞেস করতে গেলাম। তা হলে ত' আর এ বিপদে পড়তে হত না। যাই হোক, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গল্প জানা ছিল। একসঙ্গে অনেকে খেতে বসেছেন, হঠাৎ দেখেন ডালের মধ্যে আরশোলা সেদ্ধ হয়ে গেছে। পাছে জানাজানি হলে অন্য কারো ঘেন্না হয় তাই অবলীলা ক্রমে আরশুলা চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন।

আমারও তখন সেই অবস্থা। যদি ঘেন্না বা বিরক্তি প্রকাশ করি তবে পাশের লোক কি ভাববে। তাই যাঁহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন মনে করে দিব্বি হাসি মুখে খাওয়া শেষ করে ফেললাম। গল্পটা শুনে অনেকের হয়ত গা ঘিন্-ঘিন্ করবে কিন্তু আমি অম্লান বদনে সেদিনকার লাঞ্চ শেষ করেছিলাম। শেষের দিকে কমলালেবুর রস খেয়ে অবশ্য শোধন করে নিয়েছিলাম।

হঠাৎ বিমান থেকে ঘোষণা শোনা গেল, বাগদাদে আমরা নাকি বৃষ্টি পাবো।

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখি আকাশ দিব্যি পরিষ্কার-বৃষ্টির কোনো লক্ষ্মণই নেই। কি জানি বিমানের ব্যাপার। অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে ত'—তখন বোধ করি আমরা মেঘের রাজ্যে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে উঠব।

আচ্ছা, দেখা যাক্ কি হয়।

বাগদাদে বিমান গিয়ে পৌঁছল দুপুর ২টার একটু পরে। বৃষ্টির নামগন্ধও নেই! আমরা নেমে গিয়ে যথারীতি পাসপোর্ট দেখিয়ে নানারকম ফল আর কমলালেবুর রস খেয়ে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে ফেললাম।

বাগদাদ বিমান ঘাঁটিতে বেড়াতে বেড়াতে ইন্দোনেশিয়া লিগেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মী মিঃ এম্‌জিটার সঙ্গে আলাপ হল। অল্প বয়সী ভদ্রলোক। অমায়িক প্রকৃতির লোক। নিজে থেকে এসেই আলাপ করলেন। প্রতিবেশী দেশ হিসাবে আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত এই কথাই জানালেন বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে।

শুধু তাই নয়। ভদ্রলোক অনুরোধ করলেন, আমার ফ্যামিলি-গ্রুপ ফটো তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তিনিও পাঠিয়ে দেবেন বলে আমায় জানালেন। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হল বেড়াতে বেড়াতে। ইন্দোনেশিয়ার রূপকথা সম্পর্কেও বেশ কিছুটা আলোচনা হল আমাদের।

বাগদাদ থেকে বিমান ছাড়ল বিকেল সোয়া চারটায়। এখান থেকে দুজন বোরখাপরা মুসলমান মহিলা উঠলেন। তাঁরা বয়স্কা এবং সব সময়ই মালা জপ করছিলেন। জানা গেল তাঁরা যাচ্ছেন করাচী।

বিমান এখান থেকে সোজা করাচী যাবে না। মাঝপথে ডারহানেও থাম্‌বে।

বিমানের চল্‌তি পথে যখন ঝড়-ঝাপ্‌টা কিম্বা আচম্‌কা বায়ুর স্রোত আসে তখন 'বাম্প' করে ধাক্কায়-ধাক্কায় ওপরে উঠে যায়। এই রকম ভাবে হঠাৎ বায়ুর স্রোতের মধ্যে পড়ে আমাদের বিমান ক্রমাগত বাম্প করে ওপরে উঠে যেতে লাগল। এই ধাক্কা অনেকেই সহ্য করতে পারে না। তাদের বমির উদ্রেক হয়। অবশ্য বিমানে প্রত্যেক যাত্রীর সামনেই এক রকম কাগজের ঠোঙা তৈরী থাকে। প্রয়োজন হলে তার মধ্যেই বমি করতে হবে। এই অবস্থাকে বলে Air Sickness। বিমান-বালিকারা তখন খুব তৎপর হয়ে ওঠে আর এক রকম 'লোসন' প্রত্যেকের রুমালে ঢেলে দেয়। তাই ঘন ঘন শুঁকে বমির হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা চলে। ডারহানের পথে ঠিক এই রকম অবস্থা একবার হয়েছিল। অনেকেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। তাকিয়ে দেখি, বোরখা ঢাকা সেই দুটি মুসলমান মহিলা ভয় পেয়ে ক্রমাগত 'আল্লা আল্লা' করছেন আর মালা জপ করে চলেছেন।

যাই হোক এই ভাবটা খানিকক্ষণ বাদেই কেটে গেল। সন্ধ্যের মুখে আমরা ডারহানে গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানকার সাঁঝের বেলার হাওয়াটি খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল।

ডারহানের বিমান ঘাঁটিতে গ্রহ-নক্ষত্র, রাশি-চক্রের যে সুন্দর ছবিটি আঁকা আছে তা সহজেই যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের জ্যোতিষীরা মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক, সিংহ রাশি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ভাগ্য-ফল গণনা করেন। সেই সব রাশিকে নিয়ে এমন সুন্দর ও বিরাট ছবি এঁকে রাখা হয়েছে যা সত্যি কৌতূহলোদ্দীপক।

ডারহান থেকে বিমান ছেড়ে করাচীতে পৌঁছল দুপুর রাত্তিরে। কিন্তু তার আগেই বিমানের ওপর চমৎকার ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল যা আমি খেয়ে শেষ করতে পারিনি। সুপ দিয়ে শুরু করে পুডিং দিয়ে শেষ হয়েছিল সেই ভোজ। সকলের শেষে ছিল কফি। যাদের ইচ্ছে কোল্ড্ ড্রিঙ্কস নিয়েছেন।

করাচীতে বিমান অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক মজার কাণ্ড হয়েছিল। হঠাৎ একদল লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে এমনভাবে D. D. T. স্প্রে করতে শুরু করল যে, যাত্রীরা দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি।

ইউরোপীয় আর আমেরিকান যাত্রীরা ত' চটে-মটেই লাল। একজন আমেরিকান চিৎকার করে বললেন, What do they mean by this! As if we have come to spread cholera jerms here!

কিন্তু কার কথা কে শোনে। ফেজ মাথায় লোকগুলো তাদের কাজ শেষ করে নীচে নেমে গেল।

এখানে পাসপোর্ট দেখানোর এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষারও খুব কড়াকড়ি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একে একে গিয়ে হেল্‌থ অফিসারের কাছে স্বাস্থ্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

আমিও ছিলাম দলের মধ্যে সকলের সঙ্গে। আমার নাম আর ঠিকানা দেখেই হেল্‌থ অফিসার একেবারে বাঙলায় বলে উঠলেন, ও। আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন? আচ্ছা, যান—যান। তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন, আর কোন কিছু প্রশ্ন করলেন না।

বুঝলাম তিনি বাঙ্গালী মুসলমান। দূর দেশ থেকে এসে এই প্রথম বাঙ্গলা শুনে এত ভাল লাগল যে কী বলব। ভদ্রলোককে যে ধন্যবাদ দেব সে কথা পর্যন্ত ভুলে গেলাম! তার বাঙালী-প্রীতি দেখে সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দুঃখের কথা, ভদ্রলোকের নামটি জিজ্ঞেস করতে পারি নি তাড়াতাড়িতে। তখনো আমার পিছনে বহু যাত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের হেল্‌থ সার্টিফিকেট দেখাবার জন্যে। সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়ে গেলে পর আমরা কে. এল. এম. এর বাসে চেপে করাচীর "বিশ্রাম ভবনে" গিয়ে উপস্থিত হলাম।

রাত্রি তখন গভীর।

তবু নানাবিধ ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। আমি আমার প্রিয় পানীয় কমলা লেবুর রস চেয়ে নিলাম।

সুদূর প্রাচ্যে যাবেন এমন কয়েকজন যাত্রী ক্রমাগত মদ্যপান করতে লাগলেন। কে. এল. এম. থেকে যে পরিমাণ সুরা সরবরাহ করল তাতে তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণ হল না বলে নিজেদের মানিব্যাগ খুলে নতুন বোতল আনবার হুকুম দিলেন।

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা মদ্যপান করলে কথাবার্তায় অত্যন্ত দিলদরিয়া হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ঠিক সেই রকম মানুষ। সবাইকে নিয়েই মস্‌গুল হয়ে বসে গল্প শুরু করলেন। তিনি তাঁর ব্যবসার প্রয়োজনে কিভাবে সারা পৃথিবীময় টহল দিয়ে বেড়ান তারই কাহিনী সালঙ্কারে বলতে লাগলেন। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, রোম, জাকার্তা, টোকিও....সব জায়গা নাকি তার কাছে ডাল-ভাত। আমাদের কাছে শ্যামবাজার, ধর্মতলা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ যেমন অনেকটা তাই। প্রচুর টাকা রোজগার করেন, তাই দুনিয়ার সেরা

শহরগুলি যেন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। প্রত্যেক অঞ্চলেই নাকি তাঁদের অফিস আছে। আমি ভদ্রলোকের গল্প শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। রূপোর চাক্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন ভদ্রলোক। ধুলি মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়ে ফিরে আসে। সিদ্ধিদাতা গণেশের অতিপ্রিয় পাত্র বলেই মনে হল।

যাই হোক, শেষ রাত্তিরে আহ্বান এলো আবার বিমানে চাপতে হবে। আমরা একেবারে নিশাচর হয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাদের সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে। বিমানের মধ্যে শুয়ে থাক্‌বার ত' নিয়ম নেই। কোনো ঘাঁটিতে পৌঁছলেই সবাইকে নীচে চলে আসতে হবে, পাসপোর্ট দেখাতে হবে। সেই অবসরে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়াররা যন্ত্র-দানবটাকে আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখে। দূরপাল্লার বিমানগুলির আইন-কানুন অতি কড়া। সেইজন্যে এদের দুর্ঘটনা খুব কম হয়।

আবার বাসে করে বিমান ঘাঁটি, সেখানে দল বেঁধে বিমানারোহণ। সবাই ঢুলু ঢুলু....কেউ ঘুমে, কেউ অতিরিক্ত সুরাপানে।

লাল সাবধান-বাণী ঘোষণা করে বিমান উড়ল আকাশে। এইবার অনেক ওপরে উঠে গেল এই পুষ্পক রথ।

আমাদের খুব শীত করতে লাগল।

তখন বিমান-বালিকা এসে সবাইকে কম্বলে ঢেকে দিয়ে মাথার ওপরকার আলো নিভিয়ে দিল। শুধু পায়ের কাছে মাঝ পথের মৃদু আলো জ্বলতে লাগলো।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেও পারিনি।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল সূর্যিমামার সোনালী আলোয় সারা আকাশ ছেয়ে গেছে।

বিমানে ঘোষণা শোনা গেল সকাল ৯টায় বিমান দমদমে পৌঁছবে। যারা দমদমে নামবেন তৈরী হয়ে নিন। আকাশ পরিষ্কার, আবহাওয়া সুন্দর।

মনে মনে ভয় হল, বাগদাদে বৃষ্টির ঘোষণা হয়েও বৃষ্টির দেখা পাইনি। কিন্তু এখানে আবহাওয়া সুন্দর বলে ঝড়ের মুখে ফেলে দেবে না ত'? ছেলেবেলায় সেই রাক্ষসের গল্প শুনতাম। বন্দী রাজকুমারীকে যে দিন বলে যেত, আজ খুব দূরে যাচ্ছি, সেদিন থাকত কাছাকাছি, আবার যে দিন বলত খুব কাছেই থাকব আজ, সেদিন চলে যেত সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর দেশে।

ইউরোপের একটি চল্‌তি রসিকতা আছে, এক ভদ্রলোক Weather Report শুনে তবে নিজের পোষাক রোদ্দুরে দিতেন। যে দিন ঘোষণা থাকত খুব বৃষ্টি হবে সেইদিন তিনি আলমারী থেকে গরম স্যুট বের করে ছাদে দিতেন।

যাই হোক দেশের কাছাকাছি এসে গেছি।

তাড়াতাড়ি টয়লেটে ঢুকে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে তৈরী হয়ে নিলাম। দমদমে নামব আমি আর আমার ইটালিয়ান বন্ধু ট্রুয়িয়ানি রেনাটো। বিমান-বালিকা যেন তৈরী হয়েই ছিল। আমাদের আগে ব্রেকফাষ্ট খাইয়ে দিল। এ যেন বাড়ীর দুটি লোক বিদেশে যাচ্ছে তাদের খাওয়া-দাওয়ার আগে ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার এক ফাঁকে এসে বিমান-বালিকাটি আমাদের দুজনকে 'প্যারিসের সেন্ট' উপহার দিয়ে গেল। কে. এল. এম. এর প্রীতির নিদর্শন। আমরা যেন তাদের প্রীতি ও পরিচর্যার কথা এই মিষ্টি সুগন্ধের মতই মনে রাখি।

আবার সেই লাল আলোর সাবধান-বাণী, কোমরে বেল্ট বাঁধা আর chewing gum-এর ব্যবহার।

নিজের দেশ।

ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলাম। ১লা বৈশাখ রওনা হয়েছিলাম বলে অনেকে অগস্ত্য-যাত্রার ভয় দেখিয়েছিলেন। ফাঁড়া কাটিয়ে আবার ফিরে আসা গেল।

বিমান থেকে অবতরণ করে দেখি কে. এল. এম. কর্মী মিঃ সেন স্মিতহাস্যে নীচে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর সাহায্যে কাস্টম-বৈতরণী পার হওয়া গেল। যে ভদ্রলোক কাস্টমের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, তিনি আমার নামটা জানতেন। তাই বিব্রত না করে একেবারে ছেড়ে দিলেন।

ট্রুয়িয়ানি রেনাটো অনুরোধ করলেন, তিনি যাতে পাকিস্তানের বিমানে চেপে চট্রগ্রাম রওনা হতে পারেন সে ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে। আমি মিঃ সেনকে সেই অনুরোধ পৌঁছে দিলাম। তিনি আনন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন।

সেদিন কে. এল. এম. বাসে কলকাতাগামী আর কোন যাত্রী ছিল না। মিঃ সেন আমাকে সেই বাসে চাপিয়ে দিলেন। এর ড্রাইভারটি খুব আমুদে আর গল্পীলোক। জানাল, গতকাল রাত্তিরে কলকাতায় দারুণ বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথ ঘাট নাকি একেবারে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। আমরা রাত্রে বিমানে বসে কোন আভাসই কিন্তু পাইনি।

ড্রাইভার ভদ্রলোক আমাকে একেবারে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যেতে রাজী হলেন। পাড়ার মধ্যে বাস ঢুকতেই সর্বপ্রথম লক্ষ্মী ঠাকুরুণের সঙ্গে দেখা। আমাদের মা লক্ষ্মী। উত্তরা-শ্রী সিনেমার সর্বজনপ্রিয় হারুদা[illegible] মেয়ে।

সে আমাকে দেখতে পেয়েই সারা পাড়ায় চিৎকার করে জানিয়ে দিল, কাকাবাবু এসে গেছেন—

প্রথমে কথাটা কেউ বিশ্বাসই করেনি। কৌতূহলীদের ভীড় জমে গেল বাতায়নে-বাতায়নে।

যাবার দিন যাঁরা শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন আজও তাঁরা আমায় সাগ্রহে গ্রহণ করলেন।

বিমান-বাস থেকে নামতেনামতে রবীন্দ্রনাথের সেই কটি লাইন মনে পড়ল—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি।
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

শর্ম্মিষ্ঠা - দেবযানী

(নৃত্য - নাট্য)
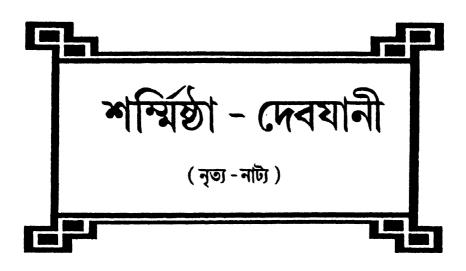
—ঃ চরিত্রলিপি ঃ—

শর্ম্মিষ্ঠা	...	দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা
দীপিতা, ছন্দিতা ও	...	
নন্দিতা	...	শর্ম্মিষ্ঠার সখীবৃন্দ
দেবযানী	...	দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা
পূর্ণিকা	...	দেবযানীর সখী
মলয়া	...	চঞ্চলা কন্যা
বৃষপর্ব্ব	...	দৈত্যরাজ
শুক্রাচার্য্য	...	দৈত্যকুলগুরু
যযাতি	...	মহারাজা, দেবযানীর স্বামী
যদু, তুর্ব্বসু	...	দেবযানীর পুত্র
দ্রুহ্য, অনু, পুরু	...	শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র
মহামন্ত্রী	...	মহারাজ যযাতির প্রধান মন্ত্রী

এবং

তাপসকুমারগণ, নায়কগণ ও আশ্রম-কন্যার দল

প্রথম অঙ্ক

।। প্রথম দৃশ্য ।।

[দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের রাজ্যের নাম বৃষপর্ব্বপুর। সেই রাজ্যে চৈত্ররথ নামে একটি বন ছিল। সেই বনের মধ্যে সুন্দর টলটলে জলে ভরা এক স্নিগ্ধ সরোবর। এই সরোবরে রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা মাঝে মাঝে সখীদের নিয়ে স্নান করতে আসে। দৈত্যরাজের গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীও সখীদের নিয়ে এই একই সরোবরে স্নানের আনন্দ উপভোগ করতে কোনো কোনো সময়ে এসে থাকে।

সেদিন সারা রাজ্য জুড়ে বসন্ত-উৎসব। আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তার সখীদের নিয়ে চৈত্ররথ বনে সেই সরোবর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সুন্দর উপবনের মতই সেই স্থানটি। নানা বৃক্ষ-লতা, ফলে-ফুলে শোভিত। সরোবরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। বৃক্ষগুলোর মাঝখানে একটি পুরাতন কূপ—দীর্ঘকাল কেউ ব্যবহার করেনি বলে সেই কূপটি শুকিয়ে গেছে।

সময়—সকালবেলা। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সখীদের নিয়ে ফুল-লতা-পাতা-শোভিত সেই মনোরম স্থানে এসে উপস্থিত হ'ল। প্রত্যেকের হাতেই নানা বর্ণের শাড়ি। স্নান-শেষে বেশ পরিবর্ত্তন করতে হবে। সবাই গাছের শাখায় শাড়িগুলি ঝুলিয়ে রাখল।]

শর্ম্মিষ্ঠা। কেমন সুন্দর এই চৈত্ররথ বন। যতবার আসি—আমার চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। রাজপুরীতে উপবনের এই মনোরম শোভা কোথায় মিলবে বল্ ত চিত্রিতা?

চিত্রিতা। সে কথা সত্যি সখি। রাজপুরীর ঐশ্বর্য্যের মাঝে যখন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তখন চৈত্ররথ বনের স্নিগ্ধ সমীরণ প্রাণকে শীতল করে।

দীপিতা। তাই ত রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজপুরীর চাইতে এই বনভূমিতে বেশী সুন্দর দেখায়—

ছন্দিতা। মনে হয়, বনলক্ষ্মী নিজে বুঝে চৈত্ররথ বনে বিচরণ করছেন।

নন্দিতা। সখি, আজ সন্ধ্যায় আমাদের বসন্ত-উৎসব। সেই উৎসবে বসন্ত আবাহনের যে নৃত্য-গীত আমরা প্রদর্শন করব— তারই একটি সুন্দর মহলা দিয়ে নিতে পারি এই নির্জ্জন বন-ভূমিতে।

শর্ম্মিষ্ঠা। সখী নন্দিতা অতি সুন্দর প্রস্তাব করেছে। এত সকালে আমরা স্নান সেরে রাজপুরীতে ফিরে যেতে চাইনে। এসো চিত্রিতা, দীপিতা, ছন্দিতা, নন্দিতা—চৈত্ররথ বনের এই নির্জ্জন পরিবেশে আমরা বসন্ত উৎসবের সেই মধুর নৃত্য-গীত অনুশীলন করি।

[শর্ম্মিষ্ঠা ও সখীদের নৃত্য-গীত শুরু হ'ল]

—গান—

বসন্তে আজ কোন উপবন ফুলের মালায় সাজে,
রামধনু-রঙ জাগল যেন এই ভুবনের মাঝে।
গাইছে কোকিল মধুর তানে,
জোয়ার জাগে প্রাণে প্রাণে,
শীত-বুড়ী যে কাঁথা গায়ে মুখ লুকাল লাজে॥
আকাশ আজি কইছে কথা সবুজ তৃণের সাথে,
বনের হরিণ উল্লাসেতে নৃত্যে আজি মাতে।
কোন্ অজানা বাজায় বাঁশী
কানন মাঝে তাই ত আসি—
বসন্তেরই মধুর পরশ লাগল সকল কাজে॥

[নৃত্য ও গীতে বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠল]

শর্ম্মিষ্ঠা। সারা বনে ফুলের কী শোভা। চল সখি, স্নানের আগেই আমরা বসন্ত-উৎসবের জন্যে ফুল তুলে নি।

ছন্দিতা। সেই ভালো রাজকুমারী, আমরা আঁচল ভর্তি করে ফুল কুড়োই গে চল—

[হাসি-উল্লাসে রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সখীদের নিয়ে একদিকে চলে গেল। অন্যদিক দিয়ে প্রবেশ করল—সখীদের নিয়ে শুক্রাচর্য্যের কন্যা দেবযানী। কণ্ঠে তাদের মধুর গান। তারাও নিজেদের শাড়িগুলি গাছের ঝুলিয়ে রাখল]

[দেবযানী ও সখীদের গানে বন মুখরিত হ'ল]

—গান—

আজি প্রাণ উতরোল মুখখানি তোল তোল
জাগে কোন্ হিন্দোল এ মধু মাসে—
নব এ কি আশা গো মনে এ কি ভাষা গো
সব দুখ-নাশা গো কে হৃদে আসে।
পাপিয়ারা গান গায়, ফুলদল চোখ চায়—
রাখালেরা বনছায় বাজায় বাঁশী ;
ছুটেছে যে তটিনী যেন সে গো নটিনী—
ফুল কি গো ফোটে নি? বদনে হাসি॥

[আবার নতুন সুরে আর নব ছন্দে বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠল। নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে সখীদের নিয়ে দেবযানী আর এক দিকে চলে গেল। এমন সময়ে রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তার সখীদের নিয়ে আবার সেইখানে এসে উপস্থিত হ'ল]

শর্ম্মিষ্ঠা। কী দেখব রে ছন্দিতা?

ছন্দিতা। শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীও তার সখীদের নিয়ে এই বনে এসেছে। ওরা ঐ দিকে গেল ফুল তুলতে।

শর্ম্মিষ্ঠা। তাই নাকি রে? তা হলে চল, আমরা স্নানটা আগেই সেরে ফেলি—

দীপিতা। রাজকুমারী, সরোবরের দক্ষিণ অঞ্চলটা আরো নিরিবিলি।

নন্দিতা। চলো রাজকুমারী, আমরা ঐ দিকে গিয়েই স্নানটা সেরে আসি—

শর্ম্মিষ্ঠা। সেই ভাল রে, সেই ভাল। চল, আমরা আগে থেকেই ঐ নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে স্নানের বিমল আনন্দ উপভোগ করি।

[শর্ম্মিষ্ঠা ও সখীরা অন্যদিকে চলে গেল]

[অপর একদিক থেকে নাচতে নাচতে এসে ঢুকল মলয়া। মলয়া হচ্ছে চঞ্চল সমীরণ। সব কিছুকে নিয়ে কৌতুক করাই তার স্বভাব]

[মলয়ার নৃত্য-গীত শুরু হ'ল]

—গান—

চঞ্চল সমীরণ মলয়া আমি—
কৌতুকে নাচি-গাই দিবস-যামি।
চরণেতে ছন্দ মনে কি আনন্দ
ছুটে চলা কাজ মোর, থাকি না থামি॥

[গাছের ডালে যে সব শাড়ি ঝুলছিল চঞ্চল মলয়া সেইগুলোকে ওলট-পালট করে দিলে। এখানকার শাড়ি ওখানে, আর ওখানকার শাড়ি এখানে—এইভাবে সব কিছু অগোছাল করে দিয়ে মলয়া নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে অন্য এক দিকে চলে গেল। চলে যাবার আগে সে শুধু কৌতুক করে বলল]

মলয়া। শর্ম্মিষ্ঠার শাড়ি আর দেবযানীর শাড়ি জায়গা বদল করে রেখে গেলাম। এইবার যা মজা হবে—আর বলে কাজ নেই।

[মলয়ার প্রস্থান]

[মলয়া চলে যাবার পর শর্ম্মিষ্ঠা স্নান শেষ করে ফিরে এল। তাড়াতাড়িতে ভুল করে নিজের জায়গায় রাখা— দেবযানীর শাড়ি সে পরে নিল। ঠিক তার পরেই এসে উপস্থিত হ'ল দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা তার শাড়ি পড়েছে দেখে দেবযানী রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধস্বরে ডাকল]

দেবযানী। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা—

শর্ম্মিষ্ঠা। কী বলছ দেবযানী?

দেবযানী। কোন্ সাহসে আমার শাড়ি পরেছ? দৈত্যের কন্যা হয়ে তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যার পরিধেয় স্পর্শ করো?

শর্ম্মিষ্ঠা। আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না দেবযানী। জান, আমি এ রাজ্যের রাজকন্যা। তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য দীন ভিক্ষুকের মত দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের স্তব-স্তুতি করে।

দেবযানী। স্তব্ধ হও রাজকন্যা। আমার পিতা শুক্রাচার্য্য তোমার পিতা বৃষপর্ব্বের গুরুদেব। শিষ্যের স্থান চিরকালই গুরুদেবের পদতলে। তুমি সেই শিষ্যের কন্যা। সুতরাং আমার পরিচারিকার মত—

শর্ম্মিষ্ঠা। কি! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-কন্যার স্পর্দ্ধা! আমি এ রাজ্যের রাজকন্যা— আমাকে কিনা পরিচারিকা ব'লে সম্বোধন! এই হীন বালিকার বাঁচবার কোনো অধিকারই নেই—

[শর্ম্মিষ্ঠা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে দেবযানীকে কূপের মধ্যে ফেলে দিল]

শর্ম্মিষ্ঠা। চল সখীগণ, আমরা এক্ষুণি রাজপুরীতে ফিরে যাই। ওদিকে দৃষ্টি দেবার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

[শর্ম্মিষ্ঠা সখীদের নিয়ে চলে গেল]

[কূপের ভিতর থেকে দেবযানী কাতর ক্রন্দন শোনা গেল]

দেবযানী। কে কোথায় আছ— আমায় রক্ষা কর— আমায় বাঁচাও—

[সহসা রাজা যযাতির প্রবেশ]

যযাতি। শিকার করতে এসে তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়। এই ত সামনেই শীতল সরোবর। আগে জল পান করে পিপাসা মেটাই—

[রাজা যযাতি সরোবরের জল পান করলেন]

[আবার দেবযানীর কাতর আর্তনাদ শোনা গেল]

দেবযানী। কে কোথায় আছ—আমার প্রাণ যায়— আমাকে বাঁচাও— আমায় রক্ষা কর—

যযাতি। এ কী! কূপের ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে! ভয় নেই—ভয় নেই— আমি রাজা যযাতি—এক্ষুণি তোমায় উদ্ধার করব—[কূপেব কাছে চলে গেলেন] এই যে আমার হাত ধর— কোন ভয় নেই—

[রাজা যযাতির প্রসারিত সবল বাহু ধরে দেবযানী উপরে উঠে এল]

যযাতি। কে তুমি কন্যা? কি তোমার পরিচয়?

দেবযানী। আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা, দেবযানী। দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ঈর্ষ্যাবশে আমায় কূপে নিক্ষেপ করে চলে গেছে। কে তুমি রাজপুত্র আমার জীবন রক্ষা করলে?

যযাতি। আমি রাজা যযাতি। শিকার করতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তারপর দারুণ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সরোবর লক্ষ্য করে চলে এসেছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম—নারীকণ্ঠের কাতর ক্রন্দন। দেবযানী, তুমি গৃহে ফিরে যাও। তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য হয়তো তোমার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে আছেন। আমি চলি—এই বনের ভিতর থেকে আমর সৈন্য-সামন্ত খুঁজে বের করতে হবে।

[যযাতির প্রস্থান]

[অন্যদিক দিয়ে দেবযানীর সখী পূর্ণিকার প্রবেশ]

পূর্ণিকা। এ কী সখি। তুমি এইখানে বসে আছ। আমি সারা বন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। সখীরাও নানা অঞ্চলে তোমায় অনুসন্ধান করছে—

দেবযানী। সখী, তুমি ঘরে ফিরে যাও। বাবাকে গিয়ে বল— তাঁর মেয়ে মরে গেছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পূর্ণিকা। এ কী অলুক্ষণে কথা বলছ সখি। আজ সারা রাজ্য জুড়ে বসন্ত-উৎসব। দৈত্যরাজ সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তুমি ঘরে ফিরে যাবে না কেন? কিসের তোমার অভিমান? দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা এইমাত্র সখীদের নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে গেল।

দেবযানী। দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা? তার নাম আমার কাছে উচ্চারণ করো না পূর্ণিকা।

পূর্ণিকা। কেন সখি? কী হয়েছে আমায় খুলে বল। [হঠাৎ দেবযানীর দিকে দৃষ্টি ক'রে] এ কী সখি। এতক্ষণ তোমার দিকে ভালো করে তাকাই নি। এ কী তোমার বেশ। স্নান করে ভিজে শাড়ি তুমি বদলাও নি? কী সর্ব্বনাশ। তোমার কপালে কেন রক্ত? কেউ কি তোমায় আঘাত করেছে? আমায় খুলে বল সখি—

দেবযানী। এই মাত্র যার নাম তুমি উচ্চারণ করলে, সেই দৈত্যরাজ-কন্যা আমায় অপমান করেছে, তারপর আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ওই কূপের মধ্যে—

পূর্ণিকা। কী সর্ব্বনাশ। শর্ম্মিষ্ঠার এত সাহস যে, দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে সে আঘাত করে।

দেবযানী। শুধু আঘাত। আমাকে প্রাণে মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। নইলে নারী হয়ে সে অপর এক নারীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে?

পূর্ণিকা। ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন সখি। কিন্তু এই কূপের ভিতর থেকে কে তোমায় টেনে তুলল?

দেবযানী। রাজা যযাতি এই বনে শিকার করতে এসেছিলেন। তিনি আমার কাতর আর্তনাদ শুনে কূপ থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন। রাজা যযাতি সত্যি মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু পূর্ণিকা, আমি আর কিছুতেই গৃহে ফিরে যাব না।

পূর্ণিকা। গুরু শুক্রাচার্য্যকে তবে আমি গিয়ে কী বলব?

দেবযানী। তুই গিয়ে বাবাকে বলবি, দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমায়-অপমান করেছে! আমার জীবননাশের চেষ্টা করেছে! সে যদি আমার দাসী হতে সম্মত হয়— তবেই আমি গৃহে ফিরতে পারি। নইলে এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা।

পূর্ণিকা। সখি দেবযানী, অমি এক্ষুণি গুরু শুক্রাচার্য্যের কাছে যাচ্ছি। যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি, এই স্থান ত্যাগ করে তুমি কোথাও যেও না। আমার মাথার দিব্যি রইল।

[পূর্ণিকা দ্রুতবেগে চলে গেল। একটা করুণ সুর সারা বনভূমিতে ধ্বনিত হতে লাগল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কুটির। ফুল-লতা-পাতা ঘেরা সুন্দর একটি কুটির। হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি এদিক-ওদিক বিচরণ করছে। আশ্রম-কন্যাগণ কলসী হাতে ফুলগাছে জল সিঞ্চন করতে এল। আশ্রম-কন্যাগণ নৃত্য-গীত শুরু হ'ল]

—গান—

যুঁই, বেলি আর অপরাজিতা খুলল যে ভাই দল—
কলসী নিয়ে আয়লো সখি, কে দিবি তায় জল।
ছন্দে তালে আয় না সবে—
বসন্ত-বন্দনা হবে—
কোন্ রূপকার রাত আঁধারে ফুল ফোটাল বল—
কলসী নিয়ে আয়লো সখি, কে দিবি তায় জল।
আশ্রমেরই কন্যা মোরা, ফুলের সাথেই গাই—
মধুর দখিন সমীরণেই নৃত্য করি তাই।
লাজুক কুসুম মেলছে আঁখি—
কুটির মাঝে আর কি থাকি?
বন-হরিণী মোদের সাথে ছুটছে যে চঞ্চল—
কলসী কাঁখে আয় কুমারী, কুঞ্জে দিতে জল॥

[আশ্রম-কুমারীগণ ফুল গাছে জল সিঞ্চন করে চলে গেল। কুঞ্জের মাঝে ভোরের পাখীদের ডাক শোনা যেতে লাগল। ধীরে ধীরে ঊষার আলো ফুটে উঠল। তাপসকুমারগণ বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে পুঁথি-হস্তে আশ্রমে প্রবেশ করল]

[স্তোত্র পাঠ]

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

[দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য স্নান সমাপন করে একটি কমণ্ডলু হাতে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। আর

এসে দৈত্যগুরুর চরণ প্রক্ষালন করে দিল। শুক্রাচার্য্য পদ প্রক্ষালন করে হরিণ-চর্মের উপর উপবেশন করলেন। তাপসকুমারগণ নিজ নিজ পুঁথি নিয়ে গুরুদেবের দুই পাশে সার দিয়ে বসল]

শুক্রাচার্য্য। আজ তোমাদের কী পাঠ আছে বৎসগণ—

১ম তাপসকুমার। আপনি গতকাল গল্প করে আমাদের কাছে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কথা বলছিলেন।

শুক্রাচার্য্য। ঠিক। ঠিক। সেই কাহিনীই আজ শেষ করব।

২য় তাপসকুমার। গুরুদেব, কী করে আপনি সঞ্জীবনী মন্ত্র আবিষ্কার করলেন-- জানতে মনে বাসনা জাগছে।

৩য় তাপসকুমার আপনি আমাদের শোনান সেই কাহিনী—

শুক্রাচার্য্য। বৎসগণ, সঞ্জীবনী মন্ত্রে কথা জানতে হলে—আগে তোমাদের দেব-দৈত্যের যুদ্ধের কথা শুনতে হবে।

৪র্থ তাপসকুমার। বলুন গুরুদেব। আমরা দৈত্যের কুমার। আপনার কাছে বিদ্যা শিক্ষা করতে এসেছি। সব কিছুই আমাদের জেনে রাখা কর্তব্য।

শুক্রাচার্য্য। তবে শোন সেই অতীতের কাহিনী—দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের বিরোধ চিরকালের, কিন্তু যখনই দুই দলের সংগ্রাম শুরু হয়—যুদ্ধে নিহত দৈত্যেরা আর পুর্নজীবন লাভ করতে পারে না। অথচ মজার কথা এই যে, দেবতারা অমর ব'লে সংগ্রামে পরাজিত হয়েও তাঁরা বেঁচে থাকেন। এইভাবে ক্রমাগত যুদ্ধে দৈত্যকুল নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হল। সেই চরম দুর্দ্দিনে দৈত্যরাজ আমায় অনুরোধ করলেন, এমন কোনো মন্ত্রে সৃষ্টি করতে—যা নাকি নিহত দৈত্যদের পুনরায় বাঁচিয়ে তুলবে।

১ম তাপসকুমার। তারপর কী হল গুরুদেব?

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যদের এই দারুণ দুর্দ্দিনে আমি প্রাণপণ করে তপস্যায় উপবেশন করলাম। হয় তপস্যায় জয়যুক্ত হবো, নতুবা মৃত্যু বরণ করব।

২য় তাপসকুমার। আপনি সাফল্য লাভ করলেন গুরুদেব?

শুক্রাচার্য্য। হ্যাঁ বৎস। দীর্ঘ তপস্যার পর বীজমন্ত্রের মত আমার প্রাণে ধ্বনিত হলো এক অনাবিষ্কৃত মন্ত্র। সেই মন্ত্রই হচ্ছে সঞ্জীবনী মন্ত্র। এখন দৈত্যেরা সংগ্রামে নিহত হলেও তাদের আমি এই সঞ্জীবনী মন্ত্রে দ্বারা পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতে পারছি। দৈত্যকুলের সেই সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ আর দেবতাদের ভয় করবার কোনো কারণ নেই।

৩য় তাপস কুমার। সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র আমাদের শিক্ষা দেবেন গুরুদেব?

শুক্রাচার্য্য। যতদিন আমি দৈত্যকুলের গুরু আছি—ততদিন কাউকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই বৎস।

৪র্থ তাপসকুমার। সে কথা সত্য গুরুদেব! যখন আপনি বর্ত্তমান আছেন, তখন দৈত্যকুলের আর কোনো ভয় নেই।

শুক্রাচার্য্য। কিন্তু বৎসগণ, কথায় কথায় বেলা অধিক হয়েছে। দেবযানী সেই প্রত্যুষে চৈত্ররথ বনে গেছে—সরোবরে স্নান করতে। এখনো ত সে ফিরে এল না। ওই আমার একমাত্র কন্যা। তাই আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

১ম তাপসকুমার। আমি একটু অগ্রসর হয়ে দেখব গুরুদেব?

[সহসা আলুথালু বেশে পূর্ণিকার প্রবেশ]

পূর্ণিকা। আর কাউকে যেতে হবে না তাপসকুমার! আমিই এসেছি দুঃসংবাদ বহন করে—

শুক্রাচার্য্য। দুঃসংবাদ? আমার কন্যা দেবযানীর কোনো অমঙ্গল হয়নি তো? পূর্ণিকা, তুমি চুপ করে থেক না, আমায সব খুলে বল। কন্যার জন্যে আমার মন বড় উতলা হয়েছে—

পূর্ণিকা। প্রভু, কী আর বলব? সখী দেবযানী আজ চরম অপমানে অপমানিতা হয়েছে।

শুক্রাচার্য্য। (উঠে দাঁড়িয়ে) অপমান! দৈত্যরাজ্যে কে এমন আছে যে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে অপমান করতে সাহস পায়?

পূর্ণিকা। সে আর কেউ নয় প্রভু, সে দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা।

শুক্রাচার্য্য। শর্ম্মিষ্ঠা! সে তো আমারও স্নেহের পুত্তলি। আর, তা ছাড়া দেবযানীও ত শর্ম্মিষ্ঠার অন্তরঙ্গ বান্ধবী। না—না—পূর্ণিকা, তুমি ভুল সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছ।

পূর্ণিকা। ভুল সংবাদ নয় প্রভু! আমিও দেবযানীর প্রিয় সখী। নিজের চোখে যা দেখে এসেছি—তাই আপনাকে নিবেদন করব।

শুক্রাচার্য্য। তুমি কী বলবে বল পূর্ণিকা। মা আমার বড় অভিমানিনী—সে অসম্মানিতা আমি বেঁচে থাকতে? এ যে আমি কিছুতেই ধারণা করতে পারছি না। বল তুমি, মা কেন চলে এল না তোমার সঙ্গে?

পূর্ণিকা। সখী আর ফিরবে না প্রভু! সেই কথা জানাতেই সে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুক্রাচার্য্য। (কম্পিত কণ্ঠে) মা আমার আর ফিরবে না! এ তুমি কী বলছ পূর্ণিকা? সে কি জানে না,—এই বৃদ্ধ, অথর্ব্ব পিতার দেবযানী ভিন্ন সংসারে আর কেউ নেই?

পূর্ণিকা সে তা জানে প্রভু। তাই ত তাব অভিমান। শুক্রচার্য্যের মত পিতা থাকতে তাকে যখন অপমানিতা হতে হয—সে তখন স্থিব কবেছে প্রাণ বিসর্জ্জন দিযে সেই অপমানের জ্বালা জুড়োবে।

শুক্রাচার্য্য এ তুমি কী বলছ পূর্ণিকা? আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বেঁচে আছি না মবে গেছি? আমি বেঁচে থাকতে আমার কন্যা দেবযানী প্রাণ-বিসর্জ্জন দেবে? বল পূর্ণিকা, কী কবলে দেবযানী আবাব তাব পিতাব কুটিবে ফিবে আসবে?

পূর্ণিকা। এক সর্ত্তে আমাব সখী আবাব ফিবে আসতে পাবে—

শুক্রাচার্য্য কী সে সর্ত্ত আমায় তাড়াতাড়ি বল পূর্ণিকা। আমি আব ধৈর্য্যধাবণ কবতে পাবছি না।

পূর্ণিকা। দৈত্যবাজ বৃষপর্ব্বেব কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা যদি সখীর দাসীত্ব বরণ কবে নেয—তবেই আমাব সখী দেবযানী তাব পিতাব কুটিবে ফিবে আসবে। নইলে প্রভু, সে আব কাউকে মুখ দেখাবে না।

শুক্রাচার্য্য (দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে) এ কী ক'বে সম্ভব পূর্ণিকা? দৈত্যবাজ বৃষপর্ব্ব আমাব শিষ্য—পুত্রতুল্য। তাঁব কন্যাকে আমি কি কবে দাসী হতে বলব। বাজাব কন্যা সে—দুঃখ কী, তা সে জানে না। কোন্ মুখে আমি উচ্চাবণ কবব সে আকাঙক্ষা?

পূর্ণিকা। তবে আমি সখীকে গিযে বলি,—তোমাব আব লোকালয়ে মুখ দেখান চলবে না। অপমানেব জ্বালায় তুমি আত্ম-বিসর্জ্জন কব। পিতা তোমার অক্ষম—

শুক্রাচার্য্য। না—না পূর্ণিকা। কোন্ পাষাণ প্রাণে সে কথা গিয়ে তুমি মাকে বলবে?

পূর্ণিকা। সখীর অপমানেব প্রতিশোধ যদি আপনি না নেন,—তবে সে কথা বলা ছাড়া আমারও যে উপায নেই প্রভু। সখী আমাব অশ্রুজলে বক্ষ ভিজিযে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

শুক্রাচার্য্য। তাইতো। এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য আমি ত্যাগ করব। আমার কন্যাব চেযে আপনার এ সংসারে আর কেউ নেই। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বেব কাছে। তাকে আমি বলব যে, আমার কন্যাব অপমানেব প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে আমিও দৈত্যপুরীতে থাকতে পারব না। এসো পূর্ণিকা, আমাব সঙ্গে—

[পূর্ণিকার সহিত শুক্রাচার্য্যের দ্রুত প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের রাজসভা। একদিকে পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী, অমাত্যদল, অন্যদিকে বসন্ত-উৎসবের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিতা নর্ত্তকীদল। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্ব সিংহাসনে বসে আছেন। ছত্র-ধারিণী চামরধারিণী, তাম্বুলবাহিনী, করঙ্কবাহিনী, প্রতিহারিণী নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। একটি মৃদু বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সহসা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্ব ঘোষণা করলেন—]

বৃষপর্ব্ব। আজ দৈত্যপুরীতে বড় আনন্দের দিন। আজ বসন্ত-উৎসব উপলক্ষে সারা রাজ্য মুখরিত। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আর আমাদের দেবতাদের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে না। দৈত্যরাজ্যে শান্তি বিরাজ করছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কৃপায় আর যুদ্ধে দৈত্যেরা নিহত হচ্ছে না। কারো অকাল মৃত্যু হলে দৈত্যগুরু মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঁচিয়ে তুলছেন। এই ত আমাদের বসন্ত-উৎসবের উপযুক্ত অবসর। বসন্ত-বান্ধবীরা পুষ্পাভরণে প্রস্তুত হয়েই আছে। তাই আমি কামনা করব—ওরা ছন্দময় নৃত্যে মধুময় কণ্ঠে আর মোহময় লীলা-চাপল্যে বসন্তকে আবাহন করুক। আজ আমি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি—এই বসন্ত-উৎসবকে সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলতে।

[বসন্ত-বান্ধবীদের নৃত্য-গীত শুরু হ'ল]

—গান—

ময়ূরপাখায় শতেক রঙের সুষমা জাগে—
বসন্ত আজ খোলে ভীরু মন কী অনুরাগে।
লতায় পাতায় দুলিছে কুসুম,
যতনের নয়নে নাহি আসে ঘুম
তরুণ উষার ঘুম-ভাঙানোর আভা যে লাগে।
কত কানাকানি জাগিছে কুঞ্জে সারাটি বেলা—
অকারণ হাসি, ফিরে তাই আসি—এ কী রে খেলা।
গগনে পবনে মধু সমীরণে
হাতে হাত রাখে কে বা মোর সনে
জীবন-বীণার তার বাঁধা হল কী নব রাগে।

পর্ব্ব। গানে গানে তোমরা এই মধুর সন্ধ্যাকে মোহময় করে তোল। তোমাদের নৃত্যের ছন্দ যেন ইন্দ্রের উর্ব্বশীকে লজ্জা দিতে পারে। দৈত্যপুরীর কোষাগার আজ উন্মুক্ত করে দাও। কোন প্রার্থী যেন আজ প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে না যায়। আজ সারা নিশি জেগে চলবে আমাদের বসন্ত-উৎসব।

[illegible] নিয়ে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ]

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্ব, আজ সারা নিশি ধরে তোমার বসন্তোৎসব চলুক—আমার তা'তে বলবার কিছু নেই। কিন্তু তার আগে আমাকে তোমায় বিদায় দিতে হবে—

বৃষপর্ব্ব। সে কী কথা গুরুদেব। দৈত্যপুরীর যা কিছু আনন্দ তা ত আপনাকেই ঘিরে। এই মধুর মুহূর্ত্তে আপনি কোথায় যাবেন? আর কেনই বা আপনাকে বিদায় দেব?

শুক্রাচার্য্য। আজ দৈত্যরাজ্যে উৎসবেব প্লাবন জেগেছে। শুক্রাচার্য্যের বুকে শত বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা।

বৃষপর্ব্ব। সে কী কথা গুরুদেব। আপনার এ মনোবেদনার কারণ কি? কে আপনার এই মনোব্যথার কারণ? আপনি আদেশ করুন, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যে, সে আর জীবনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

শুক্রাচার্য্য। তুমি পাববে দৈত্যরাজ তাকে শাস্তি দিতে?

বৃষপর্ব্ব। নিশ্চযই পাবব গুরুদেব। হিমালয় মত ধৈর্য্য আপনার। সেই মহান হৃদয়ের শান্তি যে নষ্ট করেছে—তাকে আমি এমন শাস্তি দেব যে, সারা জগৎ আতঙ্কে শিউরে উঠবে। বলুন গুকদেব, কে সে অপরাধী?

শুক্রাচার্য্য। (ধীরকণ্ঠে) অপরাধী রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা।

বৃষপর্ব্ব। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা? শর্ম্মিষ্ঠা আপনাকে অপমান কবার সাহস পায? এ কথা যে বিশ্বাস করতে পারছি না গুরুদেব।

শুক্রাচার্য্য। শোন বৃষপর্ব্ব। ধনমদে মত্ত হয়ে রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার কন্যা দেবযানীকে অপমান করেছে, তার জীবননাশের জন্য দৈত্যকন্যা হয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যার গাযে হস্তক্ষেপ করেছে—তাকে কূপে নিক্ষেপ করে মরণের মুখে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে এসেছে।

বৃষপর্ব্ব। এ কথা বিশ্বাস করতে যে মন চায় না গুরুদেব। শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানীর অন্তরঙ্গ বান্ধবী ও সখী।

শুক্রাচার্য্য। সেই কথাই তো আমি জানতাম দৈত্যরাজ। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি যে, রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা মনে মনে ব্রাহ্মণকন্যাকে হিংসা করে। তার মৃত্যু কামনা করে।

বৃষপর্ব্ব। এ কথা যদি সত্য হয়—তবে আমি অপরাধীর শাস্তি বিধান করব। রাজধর্ম্ম থেকে আমি এতটুকু বিচ্যুত হবো না গুরুদেব। কিন্তু সেজন্য আপনি কেন অভিমান করে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন? দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের চাইতে বড় রত্ন দৈত্যরাজ্যে আর একটিও নেই। আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন গুরুদেব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি গুরুদেব, যে, রাজকন্যার শাস্তি বিধান আমি কববই। কে আছিস্—রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা—

শুক্রাচার্য্য। শোনো বৃষপর্ব্ব, রাজকন্যাকে আহ্বান করার পর্ব্বে তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমি জানি যে, শর্ম্মিষ্ঠার মুখ অবলোকন করে তুমি তুমি তাকে শাস্তি দিতে পারবে না।

বৃষপর্ব্ব। গুরুদেব, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আমি দৈত্যরাজ্যের শুধু মহারাজ নই, ন্যায়ের সিংহাসনে আমি বিচারক। সেখানে মায়া-মমতা ও স্নেহের এতটুকু স্থান নেই। বলুন গুরুদেব, কী প্রতিজ্ঞা আমায় করতে হবে? কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আপনি আমায় কথা দিন যে, কিছুতেই আপনি দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ করে চলে যাবেন না।

শুক্রাচার্য্য। বৃষপর্ব্ব, তোমার গুরুভক্তি দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তবে শোন আমার কথা। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ধনমদে মত্ত হয়ে আমার কন্যা দেবযানীকে অপমান করেছে, তাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে মৃত্যুর কোলে ছুঁড়ে দিয়েছে। ভাগ্যক্রমে রাজা যযাতি সেই সময় মৃগয়া উপলক্ষে সেইখানে—উপস্থিত হন। তিনি দয়াপরবশ হয়ে দেবযানীকে রক্ষা করেছেন। মা আমার মনের দুঃখ প্রতিজ্ঞা করেছে, শর্ম্মিষ্ঠা যদি আজীবন তার দাসী হয়ে থাকে তবেই সে এ রাজ্যে ফিরে আসবে, নইলে নয়। আমার কন্যার প্রতিজ্ঞা যদি রক্ষিত না হয় তবে এ রাজ্যে আমিও থাকতে পারব না দৈত্যরাজ। তাই স্থির করেছি, মেয়ের হাত ধরে আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে যাব।

বৃষপর্ব্ব। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন দৈত্যগুরু। আপনার সম্মুখেই আমি রাজকন্যার বিচার করছি। কে আছিস্—রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে এই রাজসভায় ডেকে নিয়ে আয়—

[প্রতিহারিণীর সঙ্গে শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ]

শর্ম্মিষ্ঠা। আদেশ করুন পিতা।

বৃষপর্ব্ব। তুমি দৈত্যগুরু [illegible]চার্য্যের কন্যা দেবযানীর অপমান করেছ?

শর্ম্মিষ্ঠা। সে আমায় কা[illegible] বলেছিল পিতা—

পূর্ণিকা। অপরাধ মার্জ্জ[illegible] বন দৈত্যরাজ। কিন্তু রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দেবযানী[illegible] ব[illegible]ছিলেন,—'তোমার লজ্জা করে না দেবযানী। জানো, আমি [illegible] ব রাজকন্যা। তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য দীন ভিক্ষুকের [illegible] জ্ঞ বৃষপর্ব্বের স্তব-স্তুতি করে।'

বৃষপর্ব্ব। এই কথা [illegible] লে[illegible] ল দেবযানীকে?

শর্ম্মিষ্ঠা। [illegible] [illegible]তা।

বৃষপর্ব্ব। [illegible]। তুমি আর আমার কন্যা নও। দৈত্যরাজ্যের সম্মানকে তুমি [illegible] লুটিয়ে দিয়েছ। আমি তোমায় আদেশ করছি যে, তুমি আজীবন [illegible]বযানীর দাসীত্ব বরণ করে নেবে। নইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। দৈত্যকুলের পক্ষে সে যে কত বড় ক্ষ[illegible] সে কথা বলে আমি বোঝাতে পারব না।

শর্ম্মিষ্ঠা। আপনি বি[illegible]লিত হ[illegible]বেন না পিতা। রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আমি আন[illegible] দেবযানীর দাসীত্ব বরণ করে নেব। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের এই রাজ্য ছেড়ে চ[illegible] যাওয়ার কোন প্রয়োজনই হবে না।...

[একটি তীব্র সঙ্গীতধ্বনি [illegible]

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

[চৈত্ররথ বনের সরোবর। দৃশ্যপট প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। দেবযানী একটি ফুলের দোলনায় বসে আছে। দৈত্যরাজের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তার পদসেবা করছে। মঞ্চের সম্মুখভাগে সখীর দল নৃত্য-গীতে মেতে উঠেছে]

—গান—

মধুময় এ জীবনে জাগে মধুকর,
এ প্রভাতে আরো মধু তপনের কর।
জাগে অনুরাগ-লতা—
কানে কানে কয় কথা
মনে হয় এ ভুবনে কেউ নয় পর।

রামধনু ওঠে সখি গগনের গায়,
কাননের শাখে-শাখে পাখী গান গায়।
শুনি নদী-কলতান—
ও কি ফিরে পেল প্রাণ?
(আজি) কি কথা বলিতে চায় তোমার অধর?

[সখীদের নৃত্য-গীতে বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠল। দেখা গেল আকাশে সত্যি রামধনু উঠেছে। পাখীদের মধুর কূজনে চৈত্ররথ বন যেন নন্দন-কাননে পরিণত হ'ল। ময়ূর পেখম মেলে নৃত্য করতে লাগল। একটি মধুর ঐক্যতান ধ্বনিত হতে থাকল]

[ঐ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হ'ল ঘোষকের দামামা-ধ্বনি। কোন নরপতি মৃগয়া করতে বহির্গত হয়েছেন—শোনা গেল সেই দুন্দুভিনাদ]

দেবযানী। সখি, কিসের এ কলরব?

পূর্ণিকা। আমি এক্ষুণি দেখে আসছি সখি—

[পূর্ণিকার প্রস্থান]

[সেই কোলাহল ও দুন্দুভিধ্বনি স্পষ্টতর হ'ল]

[পূর্ণিকার প্রবেশ]

দেবযানী। কী দেখে এলে পূর্ণিকা?

পূর্ণিকা। দেখে এলাম রাজা যযাতি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মৃগয়ায় এসেছেন। তিনি এই দিকেই আসছেন।

দেবযানী। [... হয়ে] রাজা যযাতি আবার মৃগয়ায় আসছেন। আজ আমার জীবনের একটি শুভদিন। সেদিন তিনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন

তারপর আর তাঁর দেখা পাইনি। সখি পূর্ণিকা, তুই একটু এগিয়ে গিয়ে রাজাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে আয়—

পূর্ণিকা। আর অভ্যর্থনা করতে যেতে হবে না—রাজা যযাতি ঐ যে এসে পড়েছেন।

[দেখা গেল—রাজা যযাতি প্রবেশ করলেন। দেবযানী তার ফুলের দোলনা থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে রাজাকে অভ্যর্থনা করল]

দেবযানী। আসুন রাজা—সেদিন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারিনি। সেদিন ছিল আমার দুর্দ্দিন। আজ আমার সুদিনে আপনি আমার কুঞ্জে প্রবেশ করেছেন। পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে আমি আজ আপনাকে বরণ করে নেব—

যযাতি। কে তুমি রাজকন্যা, আমি ত তোমায় ঠিক চিনতে পারছিনা?

দেবযানী। এ কী কথা বলছেন রাজা? সেদিন আমার জীবনরক্ষা করে আজ আর আমায় চিনতে পারছেন না?

যযাতি। তোমার জীবনরক্ষা করেছি আমি? কী বিপদ তোমার হয়েছিল রাজকন্যা?

দেবযানী। এত ভুলো মন আপনার? সেদিনও আপনি মৃগয়া করতে এসেছিলেন। ধনমদে মত্ত হয়ে দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমায় এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। আপনি আমার হাত ধরে কূপ থেকে তুলেছিলেন। নইলে আমার জীবন যেত।

যযাতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে।

দেবযানী। রাজা, আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী।

যযাতি। দেবযানী। হ্যাঁ। সেদিন দেখেছিলাম তোমায় তাপসীর বেশে। তোমার সারা অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। আমি তোমার হাত ধরে এই কূপ থেকে তুলেছিলাম। সেদিন আমি আমার ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করেছিলাম। বিপন্নকে বিপদ থেকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেবযানী। রাজা যযাতি, আপনি নিজমুখে স্বীকার করেছেন যে, হাত ধরে কূপ থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন।

যযাতি। হ্যাঁ দেবযানী, সেই ত ক্ষাত্রধর্ম্ম।

দেবযানী। রাজা যযাতি, সেদিন আপনি ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করেছিলেন। আজ মানবধর্ম্ম পালন করুন আর্য্যপুত্র।

যযাতি। [আশ্চর্য্য হয়ে] মানবধর্ম্ম। তুমি কী বলছ দেবযানী?

দেবযানী। রাজা, আমি এই কথাই আপনাকে নিবেদন করতে চাইছি যে, স্বয়ং দেশের রাজা ও রক্ষক হয়ে আপনি কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন। এইবার আপনি তাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে মানবধর্ম্ম পালন করুন।

যযাতি। তুমি এ কী বলছ দেবযানী? তুমি ব্রাহ্মণকন্যা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের

একমাত্র দুহিতা তুমি। আমি ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে কী করে তোমায় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারি?

দেবযানী। কেন পারবেন না রাজা? দেশের রক্ষকরূপে আপনি কুমারী কন্যার ধর্ম্মরক্ষা করতে বাধ্য। কূপ থেকে উদ্ধার করবার সময় আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন। সেই কুমারী কন্যাকে আর কে গ্রহণ করতে পারে রাজা?

যযাতি। কিন্তু দেবযানী, তুমি যে ব্রাহ্মণকন্যা। তোমায় বিবাহ করে আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ মাথায় তুলে নিতে পারিনা।

দেবযানী। আর পিতা যদি সাগ্রহে সম্মতি প্রদান করেন?

যযাতি। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এ বিবাহে কিছুতেই সম্মতি দান করবেন না। শোন দেবযানী, সাপের বিষে একজন মানুষ মারা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপে আমাকে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হবে। না—না দেবযানী, আমি তোমায় বিবাহ করে গুরু শুক্রাচার্য্যের কোপানলে ভস্ম হতে চাইনা।

[সহসা শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ]

শুক্রাচার্য্য। আর আমি যদি তোমায় অনুমতি প্রদান করি রাজা যযাতি?

যযাতি। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন দেব।

শুক্রাচার্য্য। শোন রাজা যযাতি, আমি অন্তরাল থেকে তোমাদের সব কথাই শুনেছি। সর্ব্বত্যাগী তাপস হলেও আমি কন্যার পিতা। কারো না কারো হাতে আমায় একদিন কন্যা সম্প্রদান করতেই হবে। তোমার মতো সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত জামাতা আমি আর কোথায় পাব?

যযাতি। কিন্তু দৈত্যগুরু, ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করে আমি কি অপরাধ করব না?

শুক্রাচার্য্য। না রাজা। দেশের রাজার সকল বর্ণের কন্যাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত আছে।

যযাতি। আপানার অনুমতি পেলে দেবযানীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে আমার আর কোন আপত্তি নেই—

শুক্রাচার্য্য। রাজা যযাতি, আমি সানন্দে তোমায় সম্মতি প্রদান করছি। তবে শোনো রাজা, আমার কাছে তোমায় একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে—

যযাতি। [বিস্ময়ে] কী প্রতিজ্ঞা দেব?

শুক্রাচার্য্য। তোমায় অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমার কন্যা দেবযানীই তোমার প্রধানা মহিষীরূপে স্বীকৃত হবে। দৈত্যরাজের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তার এক হাজার সখীসহ দাসীরূপে দেবযানীর অনুগমন করবে। রাজা যযাতি, তোমায় কথা দিতে হবে যে, শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে তুমি সেবিকার মত ব্যবহার আর কোনো সম্পর্ক তোমার সঙ্গে তার থাকবে না।

যযাতি। আমি অঙ্গীকার করছি দৈত্যগুরু, রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে আমি সেবিকারূপেই রাজপুরীতে স্থান দেব।

শুক্রাচার্য্য। আমি তৃপ্ত হয়েছি রাজা যযাতি। দেবযানীই আমার একমাত্র বন্ধন। তাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি মুক্তসর্ব্বস্ব হলাম। আমার এই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যাকে গ্রহণ কর রাজা—

[শুক্রাচার্য্য দুই হাত এক করে দিলেন]

পূর্ণিকা। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আজ এক্ষুণি এ শুভলগ্নে সখী দেবযানীর গান্ধর্ব্ব মতে বিয়ে হবে। কোথায় ফুলের মালা, কোথায় বরণ-ডালা, কোথায় মঙ্গল-শঙ্খ?

[পুষ্পমাল্য, বরণ-ডালা, ও মঙ্গল-শঙ্খ হাতে সখীদের প্রবেশ]

[সখীদের নৃত্য-গীত শুরু হ'ল]

—গান—

রাজার কুমার এল এবার পক্ষীরাজের রথে—
রাজকুমারীর মধুর স্বপন ভাঙল কোন মতে।
কন্যা এবার নয়ন তোল,
শৈশবেরই সকল ভোল,
আমরা সবাই প্রীতির কুসুম ছড়াই পথে পথে।
মালাবদল দেখে মোরা মুগ্ধ হযে রই...
রাজপুরীতে গিয়ে এবার ভুলবি মোদের সই?
মনের তারে বাজল সানাই,
শুক-সারীতে বাসর জাগাই,
তোরা সবাই মিলন-মেলায় আয় না শতে-শতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজা যযাতির প্রমোদ-কানন। রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তার সখীগণ সহ এইখানে আশ্রয় লাভ করেছে। রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার বড় দুঃখের জীবন। প্রতিদিন রাজপুরীতে গিয়ে তাকে দেবযানীর পদ-বন্দনা করতে হয়। বাকি সারাটা দিন কাটে তার—এই নির্জ্জন প্রমোদ-কাননে। শর্ম্মিষ্ঠা মালা গাঁথে, কিন্তু তার সেই মালা অন্তরের দেবতার পায়ে পৌঁছয় না। যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখা গেল—শর্ম্মিষ্ঠা প্রমোদ-কাননের একাংশে বসে মালা গাঁথছে আর দুঃখের গান গাইছে]

—গান—

আমার জীবনে ঘন কালো মেঘ জাগে,
সুখ-শশীতেই গ্রহণ বুঝি বা লাগে।
আমার ভুবনে নেমেছ বাদল,
প্লাবনে ভরেছে মোর ধরাতল—
ভীরু মন মোর কলুষ হইতে কেবল মুক্তি মাগে।

রাজার দুলালী একি দাসীপনা তোর?
এই দুখ-নিশি কবে বা হইবে ভোর!
দুঃস্বপ্নেই কাটে যে রাত্রি,
ত্রাণ করো মোরে হে বিধাতৃ,
কর্দ্দম থেকে ওগো দয়াময় তুলে নাও অনুরাগে।।

[শর্ম্মিষ্ঠার চার সখী চিত্রিতা, দীপিতা, ছন্দিতা, ও নন্দিতার প্রবেশ]

চিত্রিতা। রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা, তোর চোখের জল কি কিছুতেই শুকোবে না?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি চিত্রিতা, তবু তোরা আমায় রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা ব'লে ডাকবি? আজ আমি মহারাণী দেবযানীর দাসী। যদি ডাকতে হয় তো দাসী শর্ম্মিষ্ঠা বলেই আমায় সম্বোধন করবি।

দীপিতা। এ কী কথা বলছিস সখি? তুই আমাদের কাছে চিরকালের রাজকুমারী, চিরকালের সখী। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শাপে তুই দেশের হিতের জন্যে দেবযানীর দাসীত্ব বরণ করে নিয়েছিস। তোর এই দুঃখের দিন চিরকাল থাকবে না।

ছন্দিতা। একদিন তুই আবার রাজকুমারীর আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'বি। রাহুমুক্ত চাঁদের মতো সেদিন তোর জ্যোতি অসুর রাজ্যকে আলোকিত করে তুলবে।

নন্দিতা। রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার জয়ধ্বনিতে আবার চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠবে—

শর্ম্মিষ্ঠা। সখী, ও কথা তোরা আর আমায় শোনাস্ নি। আমার জীবনে সত্যি কি আর রাহুমুক্ত হতে পারব?

চিত্রিতা। পারবি সখী, পারবি। বিধাতা কখনোই এত অকরুণ হবে না। তা ছাড়া দেশের জন্যে, জাতির জন্যে তুই আত্মোৎসর্গ করেছিস। তার কি কোনো মূল্যই নেই?

দীপিতা। পুণ্যের কাজ—একদিন না একদিন পুরস্কৃত হবেই। তোর এই স্বেচ্ছাকৃত দুঃখবরণ কখনই ব্যর্থ হবে না।

শর্ম্মিষ্ঠা। তবে শোন সখী আমার মনের কথা। আমার জন্যে তোরা যে দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিস—তার তুলনা নেই। আমি হয়তো দেবযানীর

সঙ্গে বাদানুবাদ করে অন্যায় করেছি। আমার সে কৃত কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করছি। কিন্তু তোরা শুধু আমায় ভালোবেসে যে দাসীর দাসী হয়ে নিজেদের জীবনকে সমস্ত সুখভোগ থেকে বঞ্চিত করেছিস—এ বেদনার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

ছন্দিতা। একথা তোর ঠিক হল না রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা। তোর সুখের জন্যেই আমরা তোর আজীবনের সখী ও সহচরী। তোর সুখের দিনে আমরা শুধু আনন্দের অংশ গ্রহণ করব, আর দুঃখের দিনে দূরে দাঁড়িয়ে তোকে অচেনা মানুষের মত মজা দেখব—এ সম্পর্ক ত আমাদের নয়।

নন্দিতা। সখী ছন্দিতা ঠিক কথাই বলেছে রাজকুমারী। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে আমরা ছায়ার মতো রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠাকে অনুগমন করবো—আমাদের এই মধুর ব্রত আমরা কখনই ভঙ্গ করতে পারিনা।

শর্ম্মিষ্ঠা সখী, আমার এই অগৌরবের দাসী-জীবনে তোরাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র বল-ভরসা। তোরাও যদি আমায় পরিত্যাগ করতিস তা'হলে আমি হয়তো মনের দুঃখে আত্মহত্যাই করতাম।

চিত্রিতা। কিছুই তোকে করতে হবে না রাজকুমারী। রাণী হয়ে দেবযানী তোর কথা প্রায় ভুলেই গেছে। একদিন তার সঙ্গে দেখা করে আমিই তোর মুক্তি আদায় করে আনব।

দীপিতা। ঠিক বলেছিস সই। দেবযানী যখন প্রত্যহ প্রার্থীদের প্রার্থনা শোনে—সেই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হব, আর সুযোগ বুঝে তোর মুক্তি ভিক্ষা করে নেব—

শর্ম্মিষ্ঠা। ও কথা মুখেও আনিস্‌নে সখী। ভিক্ষে করে আমি মুক্তি অর্জ্জন করতে চাইনা। তাতে আমার পিতা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের অসম্মান হবে। আমারও মাথা সারা দেশের কাছে হেঁট হবে। তার চাইতে আমি চিরজীবন দেবযানীর দাসীত্ব বরণ করে নেব।

চিত্রিতা। সে পরের কথা পরে হবে। আমরা এখন যাচ্ছি তোর প্রসাধনের আয়োজন করতে—

শর্ম্মিষ্ঠা। [ম্লান হেসে] প্রসাধন। দাসীর আবার কি প্রসাধন সই?

চিত্রিতা। বলেছিস সই। তুই চিরকাল আমাদের রাজকুমারী। আর আমরা চিরদিন তোর ছায়াসঙ্গিনী। আয় সখীরা, চল—। আজ আমরা সখীকে মনোমত করে সাজিয়ে দেব—

[সখীদের প্রস্থান]

[রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা একমনে মালা গাঁথতে লাগল। একটা করুণ সুর নেপথ্য থেকে ভেসে আসছিল। শর্ম্মিষ্ঠার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। এমন সময় অতি সঙ্গোপনে যযাতি সেই উদ্যানে প্রবেশ করলেন]

যযাতি। রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা—

শর্ম্মিষ্ঠা। [হঠাৎ যযাতিকে প্রবেশ করতে দেখে সভ্রমে উঠে দাঁড়াল] মহারাজ, আপনি। প্রতিহারিণীর মুখে সংবাদ পাঠালেই ত দাসী গিয়ে উপস্থিত হ'ত। আপনি কেন কষ্ট করে আবার এখানে এলেন?

যযাতি। দাসী। কিন্তু তুমি ত দাসী নও রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা। দেশের কল্যাণের জন্যে, আর পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে তুমি স্বেচ্ছায় দাসীত্ব গ্রহণ করে নিয়েছ। তোমার মহানুভবতার কথা আমি জানি রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা—

শর্ম্মিষ্ঠা। বারে বারে রাজকুমারী বলে আমায় লজ্জা দেবেন না মহারাজ। আমি আপনার মহারাণীর দাসী। সেই আমার সত্যিকারের পরিচয়।

যযাতি। কিন্তু আরো একটি পরিচয় তোমার আছে। সে পরিচয় হচ্ছে, তুমি রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা। সেই সম্মানের আসন থেকে তোমায় এতটুকু ছোট করার কারো ক্ষমতা নেই। আমি তোমার উদার মনের পরিচয় পেয়েছি রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা। তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার তপঃক্লিষ্টা মূর্ত্তি আমাকে সেই পরিচয়ের সন্ধান দিচ্ছে।

শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে এমন করে বলবেন না রাজা যযাতি। আমি আপনার মহারাণীর দাসী। এ ছাড়া আমার অন্য পরিচয় আছে—একথা মহারানী দেবযানী শুনতে পেলে অত্যন্ত রুষ্টা হবেন।

যযাতি। শোন শর্ম্মিষ্ঠা। মাঝে মাঝে আমি এই প্রমোদকাননে বেড়াতে আসি। কিন্তু তোমার বিষাদ মূর্ত্তি দেখে আমি মনে বড় ব্যথা পাই। মহারাণী দেবযানী তাঁর কুমারী জীবনের কোন অশুভক্ষণে তোমাকে দাসীত্বের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলেন। সে বেদনাময় কাহিনী আমি জানি। কিন্তু তাই তোমার চরম ও পরম সত্য হোক—এ আমি চাইনা। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার এই বিষময় জীবনের আমি পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই।

শর্ম্মিষ্ঠা। [আতঙ্কে] আপনি কি বলতে চাইছেন মহারাজ?

যযাতি। শোনো রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা,—আমি তোমায় গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করতে চাই—

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ ভুলে যাচ্ছেন—আমি মহারাণীর দাসী।

যযাতি। বেশ ভাল কথা। সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে আমি এই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। মহারাণীর দাসীরও আমি পতিত দাবী করতে পারি। তুমি নিজে রাজকন্যা। একথা তোমারও অজ্ঞাত নয় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদের একাধিক বিবাহ-বিধি এই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। আমি গান্ধর্ব্ব মতে তোমায় বিবাহ করছি রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা। সাক্ষী এই নীরব বনভূমির বনদেবতাগণ, সাক্ষী এই অসীম নীলাকাশ, আর সাক্ষী রইলেন—সম্মুখের সরোবরের দেবতা বরুণ।

[রাজা যযাতি নিজের কণ্ঠহার রাজকুমারী শর্মিষ্ঠাকে পরিয়ে দিলেন। শর্মিষ্ঠাও তাঁর হাতের গাঁথা মালা রাজার কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়ে পদধূলি গ্রহণ করলেন। এমন সময় নেপথ্যে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল। শর্মিষ্ঠার সখী—চিত্রিতা, দীপিতা, ছন্দিতা ও নন্দিতা বরণডালা হাতে নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রবেশ করল]

[সখীদের নৃত্য-গীত শুরু হ'ল]

—গান—

হে তাপসী, তব ব্রত ভঙ্গের দিন
নতুন কি সুরে, বাজিল জীবন-বীণ।
দাসী নও তুমি রাজার কন্যা,
পতি পেয়ে তুমি হওগো ধন্যা,
রাজরাণী হলে, আর ত নহ গো হীন।
অগোছাল কেশ বাঁধ আজ কবরীতে—
ক্রন্দনধ্বনি থাকে না যেন গো চিতে।
শুচি হও সখী মুক্তির স্নানে—
ভরুক পরাণ মিলনের গানে,
পতির পথেই মিলবে গো পদচিন্॥

[মঙ্গলশঙ্খ বাজতে লাগল। সখীরা হুলুধ্বনি দিতে লাগল। নৃত্যে ও গীতে বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজা যযাতির প্রমোদ-কানন। প্রথমে বাদ্য-ভাণ্ডারে শব্দ শোনা গেল। পরে একজন ঘোষক এসে ঘোষণা করল—]

ঘোষক। মহারাজ যযাতি এই প্রমোদ-কাননে মহারাণী দেবযানীকে নিয়ে ভ্রমণে আসছেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কেউ যেন তাঁদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে।

—

[দামামা-ধ্বনি সহকারে ঘোষকের প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সুদর্শন ছেলে সেইখানে এসে উপস্থিত হ'ল। এরা শর্মিষ্ঠার ছেলে। এই ঘোষণা শুনে তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল]

দ্রুহ্য। আচ্ছা অনু, আমাদের পিতা রাজা যযাতি ত রোজ রাজপুরী থেকে এসে আমাদের সবাইকার খোঁজ-খবর নিয়ে যান। আজ আবার ঘোষকের ঘোষণা কেন?

অনু। কি জানি দাদা। কিছুই ত বুঝতে পারছিনে।

পুরু। মাতা শর্ম্মিষ্ঠা বলে দিয়েছেন,—আমরা যেন কখন রাজপুরীতে না যাই। আমরা কী অপরাধ করেছি?

দ্রুহ্য। সত্যি কথা ভাই। আমরা মহারাজ যযাতির ছেলে। রাজার পুত্র—রাজকুমার আমরা। কিন্তু রাজপুরীতে আমাদের ঠাঁই নেই।

অনু। আজ পিতা এলে আমি জিজ্ঞেস করব, কেন আমরা রাজপুরীতে যেতে পারিনা। আমরা কি দুয়োরাণীর ছেলে?

পুরু। না দাদা, ওকথা বাবাকে জিজ্ঞেস করিস্ নে। তা'হলে আমাদের মা শর্ম্মিষ্ঠা ভারী কান্নাকাটি করবেন। তোরা কি মায়ের কথা ভুলে গেলি? মা বলেছেন—আমরা চিরকাল এই কাননেই থাকব। রাজপুরীর দিকে কখনো যেন আমরা পা না বাড়াই—

দ্রুহ্য। পা বাড়ালে কী হবে শুনি?

অনু। হয়তো কোনো বিপদ হতে পারে।

পুরু। মা যখন আমাদের বারণ করেছেন—তখন আমাদের উচিত তাঁর কথাই মেনে চলা।

দ্রুহ্য। সে কথা সত্যি। মায়ের মনে কী যেন একটা ব্যথা আছে। কাউকে মনের কথা খুলে বলেন না।

অনু। কোন সময় আমাদের চোখের আড়াল করতে চান না।

পুরু। আর, মা আমাদের কেবলই বারণ করেন যে, কক্ষণো যেন আমরা এই কাননের বাইরে না যাই। আচ্ছা, দাদা, আমরা কি হারিয়ে যাব?

দ্রুহ্য। দূর বোকা। আমরা কি আর ছোটটি-আছি? রাজার কুমার আমরা। ধনুর্ব্বাণ চালাতে শিখেছি।

অনু। আর, অসি-যুদ্ধেও আমাদের সঙ্গে কাউকে এঁটে উঠতে হবে না—

পুরু। তবু মা বলেন, তোমরা খেলাধুলো কর, কিন্তু কক্ষণো বাগানের বাইরে যেও না।

দ্রুহ্য। ওই যে আমাদের পিতা মহারাজ যযাতি এইদিকেই আসছেন—

অনু। সঙ্গে আবার কে?

পুরু। কী ঝক্‌মকে পোষাক। মহারাণী বলেই মনে হচ্ছে—আচ্ছা দাদা, আমাদের মা কেন মহারাণী হলেন না?

দ্রুহ্য। সে কথা মাকে জিজ্ঞেস করব পরে।

অনু। হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল দাদা। এসো, আমরা লুকিয়ে থেকে দেখি—রাজা-রাণী কী করেন এখানে—

[তিনজনের প্রস্থান]

[মহারাজ যযাতি ও মহারাণী দেবযানীর প্রবেশ]

দেবযানী। মহারাজ, কতকাল পরে আবার এই কাননে এলাম। মনে পড়ে—

আমাদের বিয়ের পরে প্রায়ই তুমি এখানে আমাকে বেড়াতে নিয়ে আসতে।

যযাতি। হ্যাঁ মহারাণী। এই প্রমোদ-কানন তখন তোমার খুব ভাল লাগত—

দেবযানী। মহারাজ, তুমি কি বলতে চাও—রাজপ্রসাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্যে আমি এই মধুর কাননের কথা একেবারে ভুলে গেছি? না মহারাজ, সে কথা সত্যি নয়। রাজ্যের প্রজাদের দুঃখের ভার আমাকে নিজের হাতে গ্রহণ করতে হয়েছে। আমি তাদের মা। আমি না দেখলে—তারা কার কাছে গিয়ে নিজেদের মনোবেদনার কথা জানাবে?

যযাতি। সে কথা আমি জানি মহারাণী। আজ তুমি আমার রাজ্যের জননী। দীন-দুঃখী প্রজার অভাব-অভিযোগ তুমিই দূর করছ। সেজন্য আমি নিশ্চিন্ত আছি মহারাণী।

দেবযানী। ও কথা বলে আমার লজ্জা দিও না মহারাজ। তোমার সিংহাসনের পাশে আমি স্থান পেয়েছি,—সেই ত্ আমার পরম গর্ব্ব।

[এমন সময় শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি ছেলের প্রবেশ]

পুরু। তুমি বুঝি এ রাজ্যের মহারাণী?

অনু। কিন্তু আমাদের মা তোমার চাইতেও সুন্দর।

[দেবযানী অবাক হয়ে এই ছেলে তিনটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর যযাতিকে প্রশ্ন করলেন]

দেবযানী। মহারাজ, এই সুদর্শন তিনটি পুত্র কার? এর পূর্ব্বে কখনো ত এদের এই কাননে দেখিনি।

[দেবযানীর প্রশ্নে মহারাজ যযাতি অধোবদন হয়ে রইলেন, সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না]

দেবযানী। একি মহারাজ, আপনি কোন কথা বলছেন না কেন? আপনি কি এদের চেনেন না?

[যযাতি তবু কোনো কথা বলতে পারলেন না]

দেবযানী। [ছেলে তিনটিকে কাছে ডেকে] আচ্ছা, তোমাদের দেখে ত রাজপুত্র বলেই মনে হচ্ছে। কোন্ দেশের রাজপুত্র তোমরা? তোমাদের পিতা মাতার নাম কি?

[রাজপুত্রেরাও সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না, একবার মহারাজ যযাতির মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল]

দেবযানী। ভয় কি তোমাদের? আমি এ রাজ্যের মহারাণী। এস আমার কাছে। আমি তোমাদের বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার দেব।

দ্রুহ্য। পরিচ্ছদের কোনো প্রয়োজন নেই মহারাণী—

দেবযানী। বেশ। তোমাদের আমি দেব মুক্তোর মালা। বল, কে তোমাদের পিতা, কে তোমাদের মাতা? কোন্ দেশে তোমাদের ঘর? এই চোখ-জুড়োনো রূপ তোমরা কোথা থেকে পেলে রাজকুমার?

পুরু। আমাদের পরিচয় তুমি জানতে চাইছ মহারাণী? তার জন্যে কোনো পুরস্কার আমাদের দিতে হবে না। তবে শোন মহারাণী, আমরা ভিন্ দেশের রাজপুত্র নই। মহারাজ যযাতি আমাদের পিতা, দৈত্য রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমাদের মাতা—

[পুরুর মুখের কথা শুনে দেবযানী যেন পাথরের মূর্ত্তি হয়ে গেলেন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন]

দেবযানী। মহারাজ, ওই ছেলেটির মুখে আজ যে কথা শুনছি—তা কি সত্যি?

[মহারাজ যযাতি তবু নীরব]

দেবযানী। চুপ করে থেক না মহারাজ। সত্যকে প্রকাশ করতে তোমার এত কুণ্ঠা কেন? (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) আজ বুঝতে পারছি,— কেন তুমি আমাকে এই প্রমোদ-কাননে নিয়ে আসতে চাইতে না। যতবার আমি এখানে আসবার বাসনা প্রকাশ করেছি—ততবার তুমি নানা অছিলায় আমাকে এড়িয়ে গেছ। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) কোথায় সেই দাসী, ডাকো তাকে—

[ধীরে পদক্ষেপে শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ]

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাণী, দাসী শর্ম্মিষ্ঠা সব সময়ই তোমার আজ্ঞাধীন।

দেবযানী। আজ্ঞাধীন! দাসীর এতদূর স্পর্দ্ধা যে রাণীর সিংহাসনের দিকে হাত বাড়ায়। আমি এই দেশের মহারাণী। আমি এই মুহূর্ত্তে এই দুর্ব্বিনীতা দাসীর বিচার করব। শোন্ দাসী, কেন তুই গোপনে মহারাজের গলায় মালা দিয়েছিলি?

শর্ম্মিষ্ঠা। আপনি উত্তেজিত হবেন না মহারাণী। আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলছি। আমি আপনার দাসী। আপানার পতি হচ্ছেন দেশের নরপতি। দেশের নরপতি যদি তাঁর মহারাণীর দাসীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন—আমি বাধা দেব কোন্ ক্ষমতায়? 'সুতরাং মহারাণী, আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা হইনি। আমি আগেও আপনার দাসী ছিলাম—এখনও দাসীই আছি। আমার পুত্রগণ আপনার সেবক মাত্র।

দেবযানী। এই মনভুলানো কথায় দেবযানী ভুলবে না দাসী। আর মহারাজ, তুমি কী করে তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে একজন দাসীকে তোমার পত্নী বলে গ্রহণ করলে? উত্তর দাও। চুপ করে থেক না।

যযাতি। মহারাণী, তুমি অকারণ উত্তেজিত হচ্ছ। তুমি নিজেই জান, শর্ম্মিষ্ঠা দাসী নয়, দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা,—তোমার সখী। তুমি একথাও জানো যে, ক্ষত্রিয় রাজা দেশের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে পারে। প্রিয়ে, তুমি শান্ত হও। তোমার সখীকে তোমার পাশে ডেকে নাও। তোমার মন থেকে সমস্ত কালিমা মুছে ফেলে দাও—

দেবযানী। বটে। দাসীকে আমি পাশে ডেকে নেব? তাকে দেব আমার সিংহাসনের ভাগ? মহারাজ, তুমি আমার পিতার কাছে যে অঙ্গীকার করেছিলে—সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ কোন্ সাহসে আমি জানতে চাই। এই মুহূর্তে আমি পিত্রালয়ে ফিরে যাব—

[দেবযানী গমনোদ্যত হলেন]

[সহসা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ]

শুক্রাচার্য্য। বৎসে দেবযানি। আমি এক শিষ্যবাড়ী যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, অনেককাল তোমায় দেখিনি; যাবার পথে তোমার কুশল-বার্ত্তা নিয়ে যাই। কিন্তু মা দেবযানী, তুমি এত উত্তেজিত হয়েছ কেন? আর স্বামীর সিংহাসন ত্যাগ করে পিতৃগৃহেই বা যেতে চাইছ কোন্ দুঃখে?

দেবযানী। পিতঃ। মহারাজ আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

শুক্রাচার্য্য। প্রতারণা। কী প্রতারণা করেছে কন্যা? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কথা আমায় খুলে বল—

দেবযানী। মহারাজ যযাতি আমাকে সম্পূর্ণ গোপন করে বহুকাল আগেই আমার দাসী শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেছেন। চেয়ে দেখুন পিতা, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র। এই পুত্রদের কথা তিনি বরাবর আমার কাছে গোপন করে এসেছেন। পিতঃ এ আপনার অপমান, সেই সঙ্গে আমারও অপমান। আমি আর এই পাপপুরীতে কিছুতেই থাকব না। পিতঃ, গ্লানি আর অপমান থেকে আপনি আমায় রক্ষা করুন।

শুক্রাচার্য্য। [গম্ভীর কণ্ঠে] রাজা যযাতি।

যযাতি। আদেশ করুণ দৈত্যগুরু—

শুক্রাচার্য্য। আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহকালে তুমি আমায় যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলে—তা তুমি রক্ষা কর নি। বিশ্বাসভঙ্গের এই অপরাধের জন্যে আমি তোমায় অভিশাপ দেব—

যযাতি। দৈত্যগুরু, আপনার কন্যা দেবযানী আমার প্রধানা মহিষীরূপেই অবস্থান করছেন। সেদিক দিয়ে আমি ত আপনার বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করিনি—

শুক্রাচার্য্য। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ? মহারাজ যযাতি, আমি তোমায় বলিনি—শর্ম্মিষ্ঠা তোমার সেবিকা থাকবে—. আর কোনো সম্পর্ক তোমার সঙ্গে তার হবে না?

[মহারাজ যযাতি নীরব]

শুক্রাচার্য্য। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। নীরব থেকে আমার ক্রোধানল হতে তুমি কিছুতেই অব্যাহতি লাভ করবে না।

যযাতি। ক্রোধ সংবরণ করুন প্রভু। ক্ষত্রিয় রাজার ত একাধিক বিবাহ-বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

শুক্রাচার্য্য। তা আছে। কিন্তু মহারাজ যযাতি, আমার কাছে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সে প্রতিজ্ঞা তুমি রক্ষা কর নি। আজ তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কাছে বাক্যদান ছেলেখেলা নয়।

যযাতি। প্রভু, আপনি ক্ষমা করুন।

শুক্রাচার্য্য। ক্ষমা। হাঃ—হাঃ—হাঃ। তুমি জান, কন্যার চাইতে আপনার জন সংসারে আমার আর কেউ নেই। আমার সেই কন্যার জীবনকে তুমি বিষময় করে তুলেছ। দেবযানীর চোখের জল আমি কিছুতেই সইতে পারছিনে। হ্যাঁ, আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি—এই মুহূর্ত্তে তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশ শুভ্র হয়ে যাবে। তুমি লোলচর্ম ক্ষীণ-দৃষ্টি ও দন্তহীন হয়ে পড়বে। আমার অভিশাপে যৌবন তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে—

[সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মহারাজ যযাতি এক স্থবিরে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর শুভ্র কেশ আর ন্যুব্জ দেহ দেখে আর তাঁকে চিনতে পারা যাচ্ছে না]

যযাতি। প্রভু। আমায় আপনি ক্ষমা করুন। লঘু পাপে আমায় এই গুরু দণ্ড দেবেন না। আমি আপনার জামাতা। আপনি আমায় এই বার্দ্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করুন।

[যযাতি শুক্রাচার্য্যের পদতলে পড়লেন]

শুক্রাচার্য্য। শোন যযাতি। আমার অভিশাপ কখনো ব্যর্থ হবে না। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার জরা নিজে গ্রহণ ক'রে তার যৌবন তোমায় অর্পণ করে, তবেই তুমি আগেকার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরে পাবে। নইলে প্রতিশ্রুতি পালন না করবার শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রাসাদের একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে জরাগ্রস্ত মহারাজ যযাতি উন্মাদের মতো পদচারণা করছেন এবং আপন মনে নিজের ক্ষোভের কথা বলে যাচ্ছেন]

যযাতি। এ আমি কী অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলাম। যে আমার দিকে একবার তাকাচ্ছে—ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই জরার বোঝা সারা জীবন আমি কি করে বইব? এর চাইতে আমার মৃত্যু হোক্—। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আমায় মৃত্যু দিলেন না কেন?

[মহারাজ যযাতি আবার কিছুক্ষণ পদচারণা করলেন]

না—না। আমি মৃত্যু চাই না। মরণের সাম্‌নাসামনি কি করে দাঁড়াব?

এই সুন্দর ভুবনে মৃত্যু কে চায়? নীল আকাশ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। পাখীর কাকলী আমার কানে মধু বর্ষণ করে। নদীর কলতান আমায় কত আশার বাণী শোনায়! ফোটা ফুল আমার চোখে মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দেয়। না—না, মৃত্যুকে আমি বড় ভয় করি। জীবনকে আমি প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে চাই। এই সুন্দর পৃথিবী কি এত শীঘ্র আমার কাছে শূন্যময় হয়ে যাবে? জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে কেউ সহ্য করতে পারে না। ঘৃণায় ওরা মুখ ফিরিয়ে নেবে। কি করে অশ্বপৃষ্ঠে আমি শিকারে যাব? আমার রাজ্যের প্রজারা আমার বীরত্ব দেখে জয়ধ্বনি দেবে না। এই বিশাল রাজ্যের শাসনভার আর আমি কি করে হাতে রাখব? দেবযানীর সামনে—শর্ম্মিষ্ঠার সুমুখে আমি কি করে গিয়ে দাঁড়াব? [আকুল কণ্ঠে] দৈত্যগুরু! তুমি তোমার অভিশাপ ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও। প্রত্যার্পণ কর আমার নব যৌবন। এই সুন্দর ধরণীতে আমার বাঁচবার অধিকার দাও।

[দুই হাতে মুখ ঢেকে মহারাজ যযাতি যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। খানিক বাদে আবার উঠে দাঁড়ালেন মহারাজ যযাতি। কী যেন একটা আশার বাণী ওঁর মনে জেগেছে]

যযাতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে। আমার যৌবন ফিরে পাবার একটা ক্ষীণ আশার আলো এখনো জ্বলছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলেছিল, কেউ যদি আমার জরার ভার গ্রহণ ক'রে তার যৌবন আমায় দান করে তবে আমি আমার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পাব। আমি ডাকব আমার পুত্রদের। তারা কি তাদের পিতাকে এই গ্লানি থেকে উদ্ধার করবে না? ওরে, কে আছিস্ ওখানে?

[একজন প্রতিহারিণীর প্রবেশ]

যযাতি। ওরে এক্ষুণি আমার সব ছেলেদের এখানে ডেকে নিয়ে আয়। দেবযানীর দুই পুত্র—যদু আর তুর্ব্বসু; সেই সঙ্গে শর্ম্মিষ্ঠার তিন ছেলে—দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। দ্রুতগামী অশ্বারোহী সংবাদবাহীকে পাঠিয়ে দাও। এক্ষুণি সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত হতে হবে।

প্রতিহারিণী। যথা আজ্ঞা মহারাজ—

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান]

যযাতি। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। আমার পিতৃভক্ত ছেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—কে আমার জরার ভার নিয়ে আমাকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে পুণ্য-সঞ্চয় করবে। আমি তাদের হাসিমুখগুলি আমার মানসপটে উদ্ভাসিত দেখতে পাচ্ছি—

[দেবযানীর জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর প্রবেশ]

যদু। প্রণাম চরণে পিতা। আপনি আমায় স্মরণ করেছেন?

যযাতি। কে? আমার জ্যেষ্ঠপুত্র যদু? হ্যাঁ, আমি তোমায় ডেকেছি পুত্র। আমি

জানতাম—তুমিই সকলের আগে এগিয়ে আসবে। দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি, আমার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী তুমি। যদু, তুমিই ত' সকলের আগে এগিয়ে আসবে—পিতার জন্যে আত্মোৎসর্গ করতে।

যদু। আদেশ করুন পিতা,—কী আমায় করতে হবে।

যযাতি। তবে শোন পুত্র, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে আমি অকাল জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু জীবনকে আমি এখনো উপভোগ করতে পারিনি। তুমি তোমার যৌবন আমায় প্রদান কর, আর গ্রহণ করো আমার জরা। এক হাজার বছর পরে তোমার যৌবন তোমাকে ফিরিয়ে দেব, আর সেই সঙ্গে বসাব আমার সিংহাসনে। পুত্র যদু, পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। আশা করি, তোমার সম্মতি আমি পাব পুত্র। [যদু নিরুত্তর রইল।] এ কী পুত্র। তুমি এখনো নিরুত্তর? আমার অকালজরা গ্রহণ করে পিতার সেবা করতে তুমি কি সম্মত নও পুত্র।

যদু। আমায় ক্ষমা করবেন পিতা। এই বয়সে আমি যদি আপনার জরা গ্রহণ করি তবে লোকে আমায় উপহাস করবে। ঘৃণায় কেউ আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমার নিজের দিক থেকেও তাতে আপত্তি আছে পিতা। অকাল-জরা গ্রহণ করলে—আমি আর কোনো বীরত্বের কাজ করতে পারব না। আমার ইচ্ছামত কোনো আহার্য্য গ্রহণ করতে পারবো না। আমার অস্ত্রশিক্ষা একেবারে ব্যর্থ হবে। না—না, পিতা আপনি আমায় ক্ষমা করুন—

[যদু নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল]

[মহারাজ যযাতি জ্যেষ্ঠপুত্রের কথা শুনে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। প্রথমে রাগে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছিল না। নিদারুণ ক্রোধে তিনি কাঁপছিলেন। তারপর তিনি পুত্রকে তিরস্কার করতে লাগলেন]

যযাতি। পিতার কথার তুমি অবাধ্য হচ্ছ যদু? তুমি কি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর নি? শাস্ত্র কি তোমায় উপদেশ দেয়নি—
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

যদু। শাস্ত্রের কথা আমি জানি পিতা। কিন্তু মন তাতে সায় দেয় না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ।

যযাতি। মহারাজ। মহারাজ। আমি কি শুধু মহারাজ? আমি কি তোর পিতা নই? যেমন জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও আমার আদেশ লঙ্ঘন করলি—তেমনি আমি তোকে জানাচ্ছি যে, এই সিংহাসন কোনো কালেই তুই পাবিনা! আর তোর বংশের কেউ কখনো রাজা হতে পারবে না। যা,—তুই আমার সুমুখ হতে দূর হয়ে যা—

[নতমুখে যদুর প্রস্থান। অস্থিরভাবে মহারাজ যযাতি পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরে দেবযানীর দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসুর প্রবেশ]

যযাতি। এস তুর্ব্বসু, আমি তোমার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি—। সব কথা তোমার মায়ের কাছে শুনেছ নিশ্চয়।

তুর্ব্বসু। শুনেছি পিতা—

যযাতি। উত্তম। দেবযানীর দ্বিতীয় পুত্র তুমি। আমি তোমায় অনুরোধ করছি, তোমার যৌবন আমায় প্রদান ক'রে আমার জরা তুমি গ্রহণ কর। এজন্যে আমি তোমায় প্রচুর উপহার দেব। আর শোন পুত্র,—এ সিংহাসন তাহলে তোমার।

তুর্ব্বসু। আমায় ক্ষমা করবেন পিতা। সে আমি কখনই পারব না।

যযাতি। পারবে না! আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে একথা বলতে তুমি সাহস পাও?

তুর্ব্বসু। পিতা, জরার বড় দুঃখ। জীবনের কোনো সাধই পূর্ণ করা যায় না। আপনি আমায় এ অনুরোধ করবেন না পিতা।

যযাতি। বটে। দেবযানীর মতই তুই দুর্ব্বিনীত। আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি তুর্ব্বসু—তুই ম্লেচ্ছ দেশের অখাদ্য ভক্ষণ করবি, আর তোর বংশের কেউ কখনো রাজা হতে পারবে না। যা,—আমি তোকে নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদান করলাম।

[তুর্ব্বসু নতমুখে প্রস্থান করল]

[মহারাজ যযাতির আবার সেই অধীর উন্মাদনা। নেপথ্য যন্ত্র-সঙ্গীতে সেই উন্মাদনা পরিস্ফুট। একটু পরে শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম পুত্র দ্রুহ্যের প্রবেশ]

দ্রুহ্য। আমায় ডেকেছেন পিতা?

যযাতি। হ্যাঁ দ্রুহ্য। আমি তোমায় স্মরণ করেছি। শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি,—এসো, আমার পাশে এসে বস। তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে—

[দ্রুহ্য আসন গ্রহণ করল না। দাঁড়িয়ে রইল সে। মহারাজ যযাতি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুহ্যের দুই হাত জড়িয়ে ধরলেন]

যযাতি। দ্রু[illegible] প্রিয় পুত্র আমার, তুমি আমায় এই জরার হাত থেকে রক্ষা ক[illegible] ও তোমার নবীন যৌবন। প্রজাদের ডেকে এই সিংহাসন আমি তোমায় দান করব। কারো সাধ্য নেই যে, আমায় বাধা দিতে পারে! শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম পুত্র তুমি,—তোমার কাছে আমার অনেক আশা।

দ্রুহ্য। আমায় ক্ষমা করুন পিতা। সিংহাসনের লোভ আমার নেই। কিন্তু যৌবনকে আমি [illegible] ভালবাসি! মানুষ জরা[illegible] হলে—ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না! সে [illegible] অবস্থা আমি কল্পনা করতে পারি না পিতা। আপনি অন্য কারো যৌবন গ্রহণ করুন।

যযাতি। তুমি পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করলে? আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি—যে-রাজ্যে চার জাতির কোনো ভেদ থাকবে না—তোমার সন্তানরা সেই দেশের রাজা হবে। কিন্তু আমার অভিশাপে তাদের কোনো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। চিরকাল তারা হা-হুতাশ করে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে। যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে, আমি তোমায় সহ্য করতে পারছিনা।

[দ্রুতপদে দ্রুহ্যের প্রস্থান]

[মহারাজ যযাতির আবার দ্রুত পদচারণা। নেপথ্যে সঙ্গীতের উন্মাদনা। এরই মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার দ্বিতীয় পুত্র অনু মহারাজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল]

যযাতি। [আকুল আগ্রহ] অনু। আমার অনু এসেছ! এসো পুত্র। আমি আকুল আগ্রহে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

অনু। আদেশ করুন পিতা।

যযাতি। তুমি ত' আমার সব খবরই জান পুত্র। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। অনু তুমি আমায় বাঁচাও বৎস।

অনু। আমি কী করতে পারি পিতা?

যযাতি। তুমি আমার অকাল-জরা গ্রহণ করে তোমার যৌবন আমায় দাও। মনে রেখ পুত্র,—এ সিংহাসন তোমার।

অনু। পিতা, আমায় ও অনুরোধ করবেন না। জরাকে আমার বড় ভয়। খেলে কিচ্ছু হজম হবে না। কেবল অম্ল-উদগার উঠবে। রোগ-শোক—সব সময়ই দেহে লেগে থাকবে। দেহে মনে এতটুকু শান্তি থাকবে না। ও আমি কিছুতেই পারব না মহারাজ। তার চাইতে আপনি যুদ্ধ জয় করে আপনার শত্রু দমনের আদেশ দিন,—আমি আপনার আদেশ মাথা পেতে নেব।

যযাতি। বটে! পিতার আদেশ মানা হল না। জরার যে যে অসুবিধের কথা নিজ মুখে এই মাত্র বললি—তোর সন্তান-সন্ততির সবাইকার তাই হবে। তাদের সকলের অকালমৃত্যু হবে—এই আমার অভিশাপ। তুই যা—এ রাজ্য থেকে দূর হয়ে যা! এখানে তোর স্থান হবে না—

অনু। যথা আজ্ঞা মহারাজ। এ পাপপুরীতে আমি আর একদিনও থাকতে চাইনে।

যযাতি। ওরা সবাই আমারা শত্রু। পুন্নামক নরক থেকে ত্রাণ করবে—তাই ত লোকে পুত্র কামনা করে। কিন্তু ওরা আমার দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। দুধ দিয়ে আমি সব কাল-সাপ পুষেছি। কাউকে আর আমার প্রয়োজন নেই।

[এমন সময় ধীর পদক্ষেপে শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর প্রবেশ]

যযাতি। এই যে পুরু—আমাব কনিষ্ঠ পুত্র। একা তুমিই অবশিষ্ট আছ। তুমিও

কি আমার কাছে তোমার অক্ষমতা জানাতে এসেছ? শোনো পুত্র, তোমার যৌবন যদি আমায় দাও—আমি তোমায় দেব সিংহাসন—

পুরু। পিতা, সিংহাসনের লোভে নয়,—তোমার আদেশের জন্যেই আমার যৌবন আমি তোমার চরণে অর্ঘ্য দেব। ধন্য হব আমি। দাও তুমি তোমার জরা। পিতার কথা না শুনলে ইহলোকে-পরলোকে কোথায় আমার স্থান? পিতাকে সুখী করবার জন্যে আমি হাসিমুখে নরকেও যেতে রাজী আছি।

যযাতি। পুত্র পুরু, ধন্য তুমি। তুমি আমায় যে শান্তি দিলে সেজন্যে আমি আশীর্ব্বাদ করছি—তোমার বংশধরেরা ধার্ম্মিক হবে, দীর্ঘকাল এই রাজ্য শাসন করবে, আজ প্রজাদের উন্নতি সাধন করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করবে। তোমাকে আমি এই বর দিচ্ছি যে, তোমার বংশের এক নরপতি ভূ-ভারতের অধীশ্বর হবে।

[পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে দাঁড়াতেই দেখা গেল যে, সে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; আর, মহারাজ যযাতি তাঁর আগেকার যৌবন ও সৌন্দর্য্য ফিরে পেয়েছেন]

তৃতীয় দৃশ্য

[মহারাজ যযাতির প্রমোদ-কক্ষ। সময় সন্ধ্যা নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতে মহারাজ যযাতির মনোরঞ্জন করছে]

—গান—

আজ সন্ধ্যায় যে ফুল ফুটেছে
 কাল হয়ে যাবে বাসি—
ভ্রমর যে তাই কানে-কানে বলে,
 "যুঁই, তোরে ভালবাসি।"
যে চাঁদ আজিকে জ্যোছনা ছড়ায়
তিলে তিলে সে যে ক্ষয়ে যাবে হায়—
আজ যেথা জ্বলে হোমের অনল—
 কাল যে ভস্মরাশি।
আজ যেথা আছে নব-যৌবন
 কাল হয়ে যাবে জরা,
ক্ষণ-ভঙ্গুর এই মেদিনী যে
 শুধুই বেদনাভরা।

ফুলে-ফুলে আজ যত মধু রয়
মন-মৌচাকে কর সঞ্চয়
কাল সে নয়নে অশ্রু ঝরিবে—
আজ যেথা মৃদু হাসি।

[মহারাজ যযাতি অস্থিরভাবে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে উঠলেন উন্মাদের মতো]

যযাতি। না—না, এ জীবনে তৃপ্তি নেই। বাসনার সুরা যত কণ্ঠভরে পান করেছি—ততই পিপাসা আমার বেড়ে গিয়েছে। জীবনকে যত আগ্রহে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি—ততই সে দূরে মরীচিকার মতো অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেছে। পুত্র পুরুকে নিজের জরা দিয়ে হাজার বছর জীবনকে উপভোগ করলাম। অতৃপ্ত মনের রথের অশ্বকে চালনা করলাম চতুর্দ্দিকে। শত্রুকে দমন করে দেশ জয় করেছি, শিকারের আনন্দ উপভোগ করেছি প্রতি বছর; জীবনের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে,—আমি পিপাসাতুরের মতো পান করেছি—কিন্তু কোথায় তৃপ্তি? কোথায় আনন্দ? কোথায় প্রাণের সন্তোষ? যাও—চলে যাও সব আমার সামনে থেকে কাউকে আমি চাইনা।

[নর্ত্তকীরা ভয় পেয়ে সব চলে গেল]

যযাতি। প্রতিহারিণী—প্রতিহারিণী—

[প্রতিহারিণীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

যযাতি। যাও,—এক্ষুণ মহামন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এস—

প্রতিহারিণী। যথা আজ্ঞা মহারাজ—

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান]

যযাতি। হ্যাঁ, আমি মন-স্থির করে ফেলেছি। ভোগের পথে আর নয়,—এইবার ভারতের চিরন্তন ত্যাগের পথে আমায় অগ্রসর হতে হবে—

[মহামন্ত্রীর প্রবেশ]

যযাতি। এই যে মহামন্ত্রী। আজই আমি রাজ্য-পরিচালনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করব। আপনি রাজ্যময় ঘোষণা করে দিন যে রাজকুমার পুরুকে সিংহাসনে বসিয়ে আজই আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করব—

মহামন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, গত কালই ত আপনি অন্য আদেশ দিয়েছেন। আপনি শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হবেন—এই ছিল আপনার মনোবাসনা। তা ছাড়া, নতুন প্রমোদ-ভবন নির্ম্মাণেরও আপনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে আপনি বন্দী করবেন এই ইচ্ছাও আপনি মন্ত্রণা-কক্ষে ব্যক্ত করেছিলেন।

যযাতি। কিন্তু মহামন্ত্রী, আমি মন-স্থির করে ফেলেছি। জীবনে বহু যুদ্ধ জয় করেছি, অনেক শত্রু নিপাত করেছি। বহু রাজ্য আমি করায়ত্ত করেছি। ধর্ম্মমন্দির, অতিথিশালা ও জলাশয় নির্ম্মাণ করেছি প্রচুর। আমার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথায় শান্তি? কোথায় তৃপ্তি? কোথায় বাসনার নিবৃত্তি? তাই আমি স্থির করেছি মহামন্ত্রী, আজই পুরুকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে আমি বনে চলে যাব তপস্যা করতে।

মহামন্ত্রী। আপনি কি আপনার আদেশ আর কিছুতেই প্রত্যাহার করবেন না?

যযাতি। আমায় প্রলুব্ধ করবেন না মহামন্ত্রী। মহারাজ যযাতি একবার যা মনস্থ করে—তা থেকে কিছুতেই সে বিচ্যুত হয় না।

মহামন্ত্রী। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। এক্ষুণি আমি আপনার সঙ্কল্পের কথা রাজ্যময় ঘোষণা করে দিচ্ছি—

যযাতি। হ্যাঁ মহামন্ত্রী। আর দেখুন, রাজকুমার পুরুকে আপনি একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

মহামন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ—

[মহামন্ত্রীর প্রস্থান]

[মহারাজ যযাতি পদচারণা করতে লাগলেন। এমন সময় রাজকুমার পুরুর প্রবেশ]

যযাতি। [পরম আগ্রহে] এসো পুত্র পুরু, আজ তোমার সিংহাসনে আরোহণ করবার শুভলগ্ন সমাগত। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করব।

পুরু। পিতা, আপনি বাসনা করলে আরো দীর্ঘকাল আমার যৌবন উপভোগ করতে পারেন পিতা। পিতাকে সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

যযাতি। তার আর প্রয়োজন হবে না পুত্র। তোমার পিতৃভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে আমি তোমায় আজ সিংহাসনে বসাব। এই মহাভারতের দেশ চিরকাল তোমার পিতৃভক্তির জয়গান করবে। মহামন্ত্রী, আপনি মহারাজ পুরুর অভিষেকের আয়োজন করুন।

[নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি শোনা গেল]

[সহসা সেখানে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা প্রবেশ করলেন]

দেবযানী। পুত্র পুরু, তোমার পিতৃভক্তিতে আমরা দু'জনেই মুগ্ধ হয়েছি। তাই আজ তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি। তুমি পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাগণের কল্যাণ সাধন কর—

শর্মিষ্ঠা। দিদি প্রকৃত কথাই বলেছেন। তোমার রাজত্বে যেন প্রজাগণের কোনো দুঃখ-কষ্ট না থাকে। সমগ্র ভারতভূমি তোমার জয়গান করুক আমরা সেই আশীর্বাদ জানাতেই এসেছি।

যযাতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যি কথা। দেবযানী-শর্মিষ্ঠা পুরুর মায়ের মতোই কথা বলেছেন। আজ আমি প্রকৃত আনন্দলাভ করলাম। এই মুহূর্তে আমার দুই সহধর্মিণী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার হাত ধরে বনবাসে গমন করব। সেইখানে নিভৃতে বসে ভগবানের আরধনা করব।

[শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ]

শুক্রাচার্য্য। এই শুভ মুহূর্তে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর তোমরা।

[নেপথ্যে মাঙ্গলিক বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি]

—ঃ য-ব-নি-কা ঃ—